মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

চৈতন্যদেব ও কর্ম্মবীর প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীঅনাথ নাথ বসু

প্রণীত

প্রকাশক—তুষারকান্তি ঘোষ
২নং আনন্দ চাট্যার্জ্জী লেন।
কলিকাতা ৩।

২য় সংস্করণ—১৩৬৭

প্রিণ্টার—শ্রীমন্মথ নাথ পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭নং ভীমঘোষ লেন,
কলিকাতা—৬

উৎসর্গ পত্র

পরমারাধ্য পূজ্যপাদ স্বর্গীয় কেদারনাথ বসু পিতৃদেব

ও

পরমারাধ্য পূজ্যপাদ স্বর্গীয় রাধিকানাথ বসু পিতৃব্যদেব

শ্রীচরণকমলেষু—

শৈশবে একদিন আপনারা উভয়ে আমার একটি ক্ষুদ্র কবিতা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং ভবিষ্য-জীবনে যাহাতে আমি সাহিত্য সেবা করিয়া আমাদের বংশের ধারা রক্ষা করিতে পারি, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।* শৈশব হইতেই আপনাদিগের আদেশ ধ্রুব তারার ন্যায় লক্ষপথে রাখিয়া তাহা প্রতিপালনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। আপনাদিগের আশীর্ব্বাদে আজ আমি বঙ্গদেশের এক মহাত্মার জীবনচরিত প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আপনারা উভয়ে আজ অমরধামে অবস্থান করিতেছেন। জীবিত থাকিলে আমার এই গ্রন্থ দেখিয়া আপনারা যেরূপ আনন্দ অনুভব করিতেন, অন্য কাহারও পক্ষে সেরূপ আনন্দ অনুভব করা সম্ভবপর নহে। শিশির-কুমার ও তাঁহার সহোদরগণের ন্যায় আপনাদেরও ভ্রাতৃপ্রেম অতুলনীয় ছিল, তাঁহাদের ন্যায় আপনাদেরও হৃদয় পরের দুঃখ দর্শন করিলে বিচলিত হইয়া উঠিত। আমার বিশ্বাস, শিশিরকুমারের চরিত সেই জন্য আপনাদিগেরই গ্রহণের উপযুক্ত। জীবিতাবস্থায় এই গ্রন্থখানি যদি আপনাদের চরণে অঞ্জলি দিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি আমাকে ধন্য জ্ঞান করিতাম। সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইয়া আপনাদিগের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিতেছি, আশাকরি আপনারা উভয়ে সেই অমরধাম হইতে তাহা গ্রহণ করিবেন। সেই-খান হইতে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্যন্ত, সাহিত্য সেবার সহিত স্বদেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। ইতি

আপনাদের অকৃতি সন্তান

অনাথনাথ

---

*আমার পূজনীয় কনিষ্ঠ পিতৃব্য শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তখন মাইকেলের জীবন চরিত প্রভৃতি রচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

মাওবার বসত বাটী।
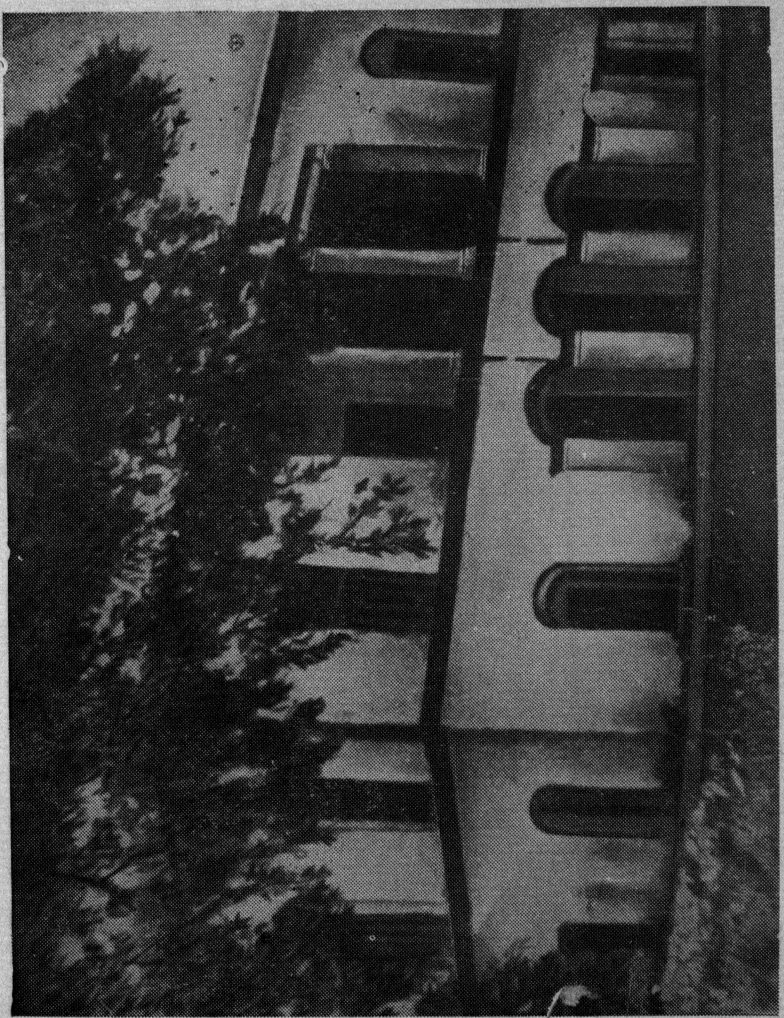
ভূমিকা

যখন আমার পরমারাধ্য পূজনীয় সেজদাদা, বাবু শিশিরকুমার ঘোষ আমাকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া গোলোকধামে চলিয়া গেলেন, তখন আমি সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে, তাঁহার জীবনী লিখিয়া তাঁহার ঋণ কিয়দ পরিমাণে শোধ করিব। আমার সে আশা পূর্ণ হইল না। তাঁহার তিরোভাবের পর আমি অমৃতবাজার পত্রিকা, রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাট ও রুগ্ন দেহ লইয়া এরূপ বিব্রত হইয়া পড়ি যে, এই বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন করা আমার শক্তিতে কুলাইল না। আমার পরম স্নেহাস্পদ পুত্র সদৃশ শ্রীমান অনাথনাথ বসু এই কার্য্য প্রচুর পরিমাণে সমাধা করিয়া আমাকে অশেষ আনন্দ প্রদান করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে অন্তরের সহিত এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, তিনি যেন ভগবানের চরণে মতি রাখিয়া দেশের ও জীবের সেবা-কার্য্যে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হন।

সেজদাদার সহিত আমার যে কি মধুর সম্বন্ধ, তাহা মুখে বলিয়া কি লিখিয়া অপরকে বুঝান সম্ভব নয়। উভয়ে ষাট বৎসর একত্র বাস করিয়া রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি লইয়া যে কত আলোচনা করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের দেহ বিভিন্ন হইলেও হৃদয় অভিন্ন ছিল এবং সেজদাদার মহান আত্মার সহিত আমার ক্ষুদ্র আত্মা জড়িত ছিল বলিয়া তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝিবার সুযোগ আমার ভাগ্যে যেরূপ হইয়াছিল, সেরূপ আর কাহারও হয় নাই। তিনি গুরু, আমি শিষ্য।

যখন তাঁহার মুখ হইতে অমৃতময় উপদেশ ধারা নিঃসৃত হইত, আর তাহা চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় অবসন্ন হইয়া ঢোকে ঢোকে গলধঃ করিতাম, তখন আমার হৃদয় পবিত্র হইত, জগৎ সুখময় বোধ হইত। আমার যে কিঞ্চিৎ বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান আছে, তাহা তাঁহারই চরণসেবা করিয়া অর্জ্জন করিয়াছি। এমন গুণের অগ্রজ মহাশয়ের জীবনী লিখিতে পারিলাম না, এই ক্ষোভ ইহলোকের ন্যায় পরলোকেও আমার হৃদয়ে সতত প্রবলরূপে জাগ্রত থাকিবে।

সেজদাদার পর্ব্বে যে সমস্ত প্রধান প্রধান ভারতবাসী রাজনৈতিক চর্চা করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই আমাদের শ্রদ্ধাভাজন। কিন্তু একটা বিষয় তাঁহারা অজ্ঞাত ছিলেন। তাঁহাদের মনে এই দৃঢ় ধারণা ছিল যে, ইংরেজদের সহিত

মিলিত হইয়া তাঁহাদের সহিত একযোগে ও তাঁহাদের অভিপ্রায়ানুরূপে রাজ নৈতিক আলোচনা করা আমাদের কর্তব্য ইহার ফলে যখন ভারতবাসীগণ ইংরাজ ভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন, সেই সময় সেজদাদা এই সত্য প্রচার করিলেন যে "we are we and they are they" অর্থাৎ ভারতবাসিগণ ইংরাজ নহে ভারতবাসিগণ ইংরাজ হইতে স্বতন্ত্র এবং সেই ভাবেই আমাদের মাতৃভূমির সেব করিতে হইবে। সেই ভাবটী সেজদাদাই প্রথমে তাঁহার স্বদেশবাসিগণের হৃদয়ে পরিস্ফুট করিয়া দেন। আর একটি বিষয়ও তিনি নিজে আচরিয়া তাহাদের শিক্ষা দেন, সেটি এই ;—উচ্চপদস্থ ইংরজে রাজকর্ম্মচারিগণের সহিত সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা কহিবার সময় রাজকর্ম্মচারিগণের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আত্মসম্মান বজায় রাখিতে হইবে।

আর একটি কার্য্যও সেজদাদার দ্বারা সাধিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের স্বার্থ যে একই সূত্রে জড়িত ; একথা তিনি সর্ব্বপ্রথমে প্রচার করিয়াছিলেন। এবং সেইজন্য তিনি বাঙ্গালী হইয়াও গাইকোয়ারের রাজ্যচ্যুতির ব্যাপার লইয়া অমৃতবাজার পত্রিকায় তীব্র আন্দোলন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে যে প্রণালীতে রাজনীতির আন্দোলন চলিতেছে, তাহা সেজদাদারই নির্দিষ্ট। আমাদের জাতীয় মহাসমিতির প্রাণ প্রতিষ্ঠায় দেশের অনেকেই সহায়তা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এই মহাসমিতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যে উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহা সেজদাদাই মিষ্টার হিউমকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি ক্ষেত্রে তিনি যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ অনাথনাথ এই গ্রন্থে অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় হৃদয়গ্রাহীভাবে সেজদাদার জীবন-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে কোন কথাই অতিরঞ্জিত ভাবে লিখিত হয় নাই, যাহা প্রকৃত সত্য, তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছি এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সকল বিষয় আলোচনা করিয়া যেখানে যে ভ্রম প্রমাদ ছিল, তাহা সংশোধন এবং যে অসম্পূর্ণতা ছিল তাহা সম্পূর্ণ করিয়াছি।

সেজদাদার ধর্ম্মজীবন স্নেহাস্পদ গ্রন্থাকারের পক্ষে যতদূর সম্ভব, তাহা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। সেজদাদার শেষজীবনের অনেক নিগূঢ় জিনিষ সাধারণের নিকট অজ্ঞাত ; সে সকল কেবল আমিই অবগত আছি। সে সকল কথা প্রকাশ

করিলে জীবের বিশেষ উপকার হইতে পারিত ; কিন্তু এখন আমি অতি বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ ও শক্তিহীন। সুতরাং সে সকল কথা প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম লাভের জন্য সেজদাদার হৃদয়ের ব্যাকুলতা, শ্রীভগবানের নাম কীর্তনে তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু পতন, ভগবৎ প্রসঙ্গে তাঁহার অপার আনন্দ প্রভৃতি যাঁহারা লক্ষ্য করিতেন, তাঁহারা স্পন্দহীন হইয়া যাইতেন। যে দিন সেজদাদা শ্রীঅমিয়নিমাই চরিতের ষষ্ঠ খণ্ডের সর্ব্বশেষ ফর্ম্মার প্রুফ সংশোধন করিয়া অন্তর্দ্ধান হন, সে দিনের কথা আমার হৃদয়ে আজীবন অঙ্কিত থাকিবে। তিনি অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। আর আমি শূণ্য হৃদয়ে অশ্রুপাত করিবার জন্য পড়িয়া আছি। আমার দুর্ভাগ্য, তাই হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও, তাঁহার ন্যায় গুরুর জীবনকথা প্রচার করিতে পারিলাম না। যাহা হউক স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ অনাথনাথ তাঁহার জীবনী লিখিয়া কেবল আমার দুঃখ লাঘব করেন নাই, জনসাধারণের অশেষ উপকার করিয়াছেন। ইতি—

কলিকাতা
২৯শে ভাদ্র ১৩২৭

শ্রীমতিলাল ঘোষ

নিবেদন

ছাত্রাবস্থাতেই অমৃতবাজার পত্রিকা পাঠ করিয়া ইহার প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়াছিলাম। তাহার পর তাঁহার শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিত, লর্ড গৌরাঙ্গ ও শ্রীকালাচাঁদ—গীতা পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি ও শ্রদ্ধা শতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া, তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝিবার সুযোগ আমার ভাগ্যে কখনও হয় নাই। তাঁহার স্বর্গারোহনের পর সংবাদপত্রে তাঁহার জীবনের কার্য্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও দ্বারবঙ্গেশ্বর মিঃ গোখ্‌লে, মিঃ ব্লেয়ায়, শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রথিত নামা ব্যক্তিগণের বক্তৃতাপাঠ করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, শিশির-কুমার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সৈনিক ও ধর্ম্মনীতি ক্ষেত্রে প্রেমিক সন্ন্যাসীর ন্যায় কার্য্য করিয়া জগতে অক্ষয়কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এই অসাধারণ প্রতিভাশালী মহাত্মার জীবনচরিত প্রকাশিত হইলে তাহা পাঠ করিয়া ধন্য হইব আশা করিয়া-ছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই শিশিরকুমারের চরিত রচনার ভার গ্রহণ করিলেন না। ১৯১৬ খ্রীঃ অঃ মার্চ মাসের প্রথম ভাগে কলিকাতার একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র শিশিরকুমারের পঞ্চম বার্ষিক স্মৃতি সভার সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া লিখিয়াছিলেন "দুঃখের বিষয় এরূপ লোকের জীবনী নাই।" মন্তব্যটী পাঠ করিয়া প্রাণে বড়ই কষ্ট পাইয়াছিলাম এবং সংগে সংগে শিশির-কুমারের জীবনী লিখিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল। শেষে নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া, সাধারণের নিকট উপহাসাস্পদ হইবার আশঙ্কায় প্রাণের ইচ্ছা প্রাণেই চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কিন্তু বিদ্যুৎ প্রভার ন্যায় মধ্যে মধ্যে, শিশিরকুমারের চরিত রচনার ইচ্ছা আমার হৃদয় মধ্যে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। তখন আমি আমার পরম পূজ্যপাদ পিতৃব্যদেব, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত, পৃথ্বীরাজ ও শিবাজী মহাকাব্য প্রণেতা কবিভূষণ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"শিশির বাবুর জীবনী লিখিলে কেমন হয়," তিনি বলিলেন,—'খুব ভালই হয়, কারণ শিশির বাবুর জীবনে অনেক শিক্ষার জিনিষ রহিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আমি চেষ্টা করিলে কি লিখিতে পারিব?" তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন,—"কেন পারিবে না, চেষ্টা করিলে অবশ্যই পারিবে? তুমি

যদি শিশির বাবুর জীবনী লিখিতে ইচ্ছা কর, আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র, আমার ছাত্র শ্রীমান পীযুষকান্তিকে একখানি পত্র দিতেছি; তুমি পত্রখানি লইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে পার।" পূজ্যপাদ পিতৃব্যদেবের পত্রখানি লইয়া আমি শ্রীযুক্তবাবু পীযুষকান্তি ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। পীযুষবাবু পত্রখানি পাঠ করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"আজ কয়দিন হইতে বাবার একখানি জীবনী রচনা করাইবার ইচ্ছা হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে এবং কাহার দ্বারা সেই কার্য্য করাইব তাহাই ভাবিতেছিলাম। আমার বিশ্বাস, আপনি ভগবৎ প্রেরিত। যাহা হউক আমি উপাদান প্রদান করিয়া আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের জীবনী রচনায় আপনাকে যথাসাধ্য সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম।"

১৯১৭ খ্রীঃ অঃ শিশিরকুমারের ষষ্ঠ বার্ষিক স্মৃতিসভায় লোকমান্য স্বর্গীয় বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় সভাপতিরূপে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা আমি এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করিয়াছি। সেই বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন,—"I can call to mind many an interview that I had with him at the Patrika office, Some of which lasted for hours. I have distinct recollections of what he told me of his experiences as a journalist with tears in his eyes and sympathy in his words. I then requested him, I remember now, to put down those incidents at least to leave notes in writing, so that they might serve the future historion of the country or even the writer of his life." লোকমান্য তিলক মহোদয়ের বিশেষ অনুরোধে শিশিরকুমার তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের কতকগুলি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া যান। আমি সেই উপাদান অবলম্বনেই এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছি। মহাত্মা শিশিরকুমারের ভগ্নী, পুত্রকন্যাগণ ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতৃদ্বয় এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। শিশিরকুমারের অভিন্নহৃদয় সোদর এবং উপযুক্ত শিষ্য পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের নিকট আমি আমার গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। তিনি সর্ব্বদাই নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও পাণ্ডুলিপির স্থানে স্থানে ভ্রম সংশোধন ও বহু নূতন ঘটনা সংযোগ করিয়া দিয়া গ্রন্থের উৎকর্ষ সাধনার্থ

যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। এজন্য আমি তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। সাহিত্য ক্ষেত্রে আমার শিক্ষাগুরু পরম পূজ্যপাদ কবিভূষণ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু পিতৃব্য মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে সর্ব্বদাই উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন এবং তিনি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন। যদি আমার গ্রন্থে প্রশংসাযোগ্য কিছু থাকে, তবে তাহা প্রধানতঃ ইহাঁদিগেরই উপদেশের ও সাহায্যের ফল।

"ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রিকার কয়েক সংখ্যায় এই গ্রন্থের কতক অংশ প্রকাশিত হইয়া সহসা বন্ধ হইয়া যায়। সম্পাদক মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধানে জানিলাম, কয়েকটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক "ভারতবর্ষে" শিশিরকুমারের জীবনী প্রকাশিত হওয়া সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, শিশিরকুমারের রাজনৈতিক জীবন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পাঠ করা উচিত নহে এবং "ভারতবর্ষে" যদি জীবনী প্রকাশিত হইতে থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের বিনা অনুমতিতে মাসিক পত্রিকাখানি স্কুলের লাইব্রেরীর জন্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না। দেশের দুর্ভাগ্য, তাহা না হইলে যিনি আমাদিগকে দেশাত্মবোধে প্রলুব্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জীবন কথা ছাত্রগণের অপাঠ্য, এরূপ ধারণা আমাদের দেশের কোন কোন শিক্ষকের হৃদয়ে উদয় হইবে কেন? যাহা হউক 'মালঞ্চে" এবং "মানসী ও মর্ম্মবাণীতে" এই গ্রন্থের কতক অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল।

গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহের জন্য আমি পূজ্যপাদ স্বর্গীয় সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও পূজ্যপাদ রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় C. I. E. মহোদয়দ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তাঁহারা দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, শিশিরকুমারের জীবনী প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্য পঠনীয় হইলেও বর্ত্তমানে সাধারণ পাঠকগণের যেরূপ রুচি দেখিতে পাওয়া যায়, শিশিরকুমারের চরিতগ্রন্থ তাহাতে তাঁহাদের নিকট কতদূর আদরণীয় হইবে, তাহা চিন্তার বিষয়। তাঁহারা উভয়েই আমাকে গ্রন্থখানি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে লিখিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। মহাত্মা শিশিরকুমারের ন্যায় ঘটনাবহুল জীবন অতি বিরল; সুতরাং তাঁহার জীবনের বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইলে গ্রন্থখানি বহুখণ্ডে সম্পূর্ণ করিতে হয়। কিন্তু আমি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও রাজা বাহাদুরের উপদেশ অনুসারে সংক্ষেপে শিশিরকুমারের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি বর্ণনা

করিয়াছি। শিশিরকুমারের জীবনী পাঠের সঙ্গে পাঠক, ভারতবর্ষের বিগত পঞ্চাশ বৎসরের রাজনৈতিক ইতিহাস অবগত হইতে পারিবেন।

বর্ত্তমানে বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রে নাটক ও উপন্যাসের যে প্রবল বন্যা প্রবাহিত, তাহাতে এই চরিতগ্রন্থ ভাসিয়া যাইবে কিনা জানি না। কিন্তু এখনও অনেকে আমাদের দেশের স্বর্গগত মহৎ লোকদিগের জীবনী পাঠ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাঁহাদেরই ভরসায় আমি গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ভ্রম প্রমাদ থাকা অসম্ভব নহে। পাঠকগণ যদি এই গ্রন্থের মধ্যে কোনও ভ্রম কিম্বা অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করেন, তাহা আমাকে জানাইলে আমি কৃতজ্ঞ হইব এবং পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহা সংশোধনের চেষ্টা করিব। গ্রন্থখানি মুদ্রাকর প্রমাদ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই, সহৃদয় পাঠকগণের নিকট সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্তবাবু মতিলাল ঘোষ মহাশয় যদি শিশিরকুমারের জীবনী রচনা করিতেন, তাহা হইলে গ্রন্থখানি যে সর্বাঙ্গসুন্দর হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক আমি আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও শিশিরকুমারের চরিতগ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম ; এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে আমি শ্রম ও চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। তাহা কতদূর ফলপ্রসূ হইয়াছে, সহৃদয় পাঠকগণই তাহার বিচার করিবেন। ইতি

নিতাড়া
২৪-পরগণা,
আশ্বিন, ১৩২৭

শ্রীঅনাথ নাথ বসু

সূচীপত্র

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ।

"Such a man is rare to find. You have his life written; and from it you may know the story of his life and properly value the man who had made journalism what it is in India."

Bal Gangadhar Tilak
Presiding over
Shishir Kumar's
sixth death anniversary on the 29th
December 1917.

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

প্রথম অধ্যায়

বহু নির্ভীক ও তেজস্বী সন্তানের জন্মভূমি বলিয়া যশোহর দীর্ঘকাল হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মুসলমান শাসনকালের শেষাবস্থায় যিনি স্বীয় বাহুবলে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, যাঁহার কীর্তির ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, বঙ্গের সেই তেজস্বী ও নির্ভীক জমিদার বহু সৎ-কার্য্যের অনুষ্ঠাতা, রাজা সীতারাম রায় যশোহরে জন্মগ্রহণ করেন। যে তেজোদীপ্ত কবির কবিতা বঙ্গবাসীর কর্ণে দুন্দুভিনাদে এখনও প্রতিধ্বনিত হইতেছে, যশোহর সেই মধুসূদন দত্তের জন্মভূমি। ইঁহাদিগের উভয়ের ন্যায় যশোহর আরও একটী জেতস্বী পুত্ররত্ন প্রসব করিয়াছিলেন, সেই রত্নটি মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ। এদেশের অধিবাসিগণ যখন দেশাত্মবোধে অজ্ঞ ছিল, রাজনৈতিক চর্চ্চা কাহাকে বলে, তাহার কিছুই অবগত ছিল না, অত্যাচার উৎপীড়ন অপ্রতিবাদে সহ্য করাই পরম সাধনা বলিয়া মনে করিত, সেই সময় যশোহরের অন্তর্গত পলুয়া-মাগুরা নামক একখানি অতি নগণ্য পল্লীতে কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর, ও তেজস্বী সংবাদপত্র পরিচালক শিশিরকুমার জন্মগ্রহণ করেন।

শিশির কুমারের সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বে তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। যশোহরের অন্তর্গত কোটচাঁদপুরের নিকটবর্তী জয়দে নামক পল্লী শিশিরকুমারের পূর্বপুরুষদিগের আদি বাসস্থান ছিল। সে সময় ঘোষ পরিবারের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। শিশিরকুমারের বৃদ্ধ প্রপিতামহ রামরাম ঘোষ মহাশয় মজুমদারদিগের বাটীতে বিবাহ করিয়াছিলেন। শ্বশুরকুলের অত্যন্ত যত্নে ও আগ্রহে তিনি স্বীয় আদি

বাসস্থান জয়দে পরিত্যাগ করিয়া মাগুরায় আসিয়া বাস করেন। রামরাম হইতে ঘোষ পরিবারের একটী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—
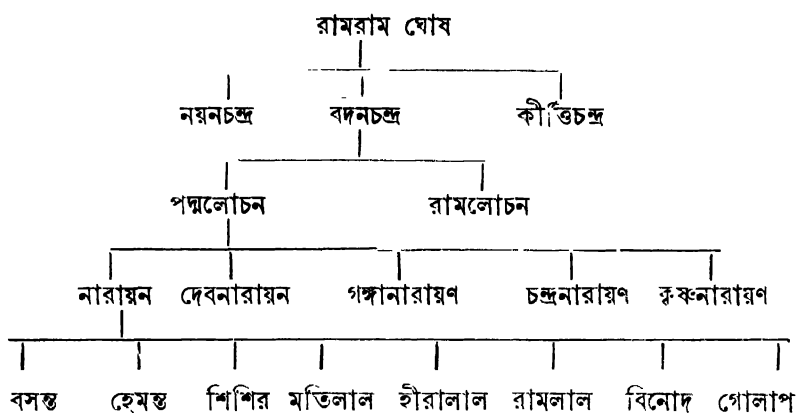
শিশিরকুমারের পিতামহ পদ্মলোচন হইতেই তাঁহাদিগের পারিবারিক শিষ্ঠ্যতা সম্যক্, পরিস্ফুট হয়। ষোড়শবর্ষ হইতেই পদ্মলোচনকে অবস্থার উন্নতির জন্য কঠোর জীবন-সংগ্রামে ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। যশোহর জেলার অন্তর্গত সালিখার মিত্র মহাশয়দিগের বাটীতে তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর তিনি কিছুকাল শ্বশুরালয়ে বাস করিয়াছিলেন। একদিন শ্বশুরবাড়ীর কাহারও সহিত কোনও বিষয়ে বাদানুবাদ হওয়ায়, তিনি আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া, সেই দিনই অষ্টমবর্ষবয়স্ক পুত্র হরিনারায়ণকে স্কন্ধে লইয়া সালিখা হইতে যশোহরের পথে অগ্রসর হন। পত্নী ও পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া পদ্মলোচনের হৃদয় উৎকণ্ঠিত ছিল। পিতা ও পুত্র বিশ্রাম করিবার জন্য একটী বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়াছিলেন। বালক হরিনারায়ণ দেখিলেন যে, তাঁহার পিতার নয়নদ্বয় হইতে কয়েক বিন্দু অশ্রু পতিত হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, তুমি কাঁদছ কেন ?" পদ্মলোচন চক্ষু মুছিয়া পুত্রকে বলিলেন, "বাবা, আমার মনে বড় কষ্ট ; তুই কি আমার দুঃখ দূর করিতে পারিবি ?" অষ্টমবর্ষীয় বালক হরিনারায়ণ

বলিলেন, "কেঁদো না বাবা, আমি তোমার দুঃখ দূর কর্‌বো"। পিতা ও পুত্রের এইরূপ কথোপকথন হইতেই তাঁহাদিগের বংশের উন্নতির বীজ উপ্ত হইয়াছিল ; পাঠক দেখিতে পাইবেন, পিতার আশীর্ব্বাদে ও চেষ্টায় হরিনারায়ণ যথার্থ আপনার উক্তি সফল করিয়াছিলেন। পুত্রের কথায় পিতা হৃদয়ে অসীম বল লাভ করিলেন। আর্থিক অবস্থা উন্নত না থাকিলেও পদ্মলোচনের মানসিক ভাব অতিশয় উচ্চ ছিল। কোনরূপ নীচ প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না ; প্রত্যুত পরোপকারিতা ও মহানুভবতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ তাঁহার চরিত্রকে মধুর ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল।

আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি, তখন আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলিত হয় নাই। ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তির সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। সে সময়ে ইংরাজী বাঙ্গালা ভাষা অপেক্ষা পার্‌সী ভাষার শিক্ষার প্রতি দেশবাসিগণের অধিকতর যত্ন ও আগ্রহ ছিল। বিচারালয়ে কিম্বা সরকারী কার্য্যালয় সমূহে কার্য্য করিতে হইলে কর্ম্মপ্রার্থিগণকেও পার্‌সী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইত। পদ্মলোচন প্রাণপণ যত্নে পুত্রদিগকে তৎকাল প্রচলিত শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিনারায়ণ ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন না বটে, কিন্তু আর্‌বী ও পার্‌সী ভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন। ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হরিনারায়ণ সঙ্গীত শাস্ত্রও আলোচনা করিয়াছিলেন ; তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন, এবং শেষে একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। পদ্মলোচন ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। পুস্তক-অধ্যয়নের সংগে সংগে পুত্রগণের হৃদয়ে যাহাতে ধর্ম্মভাব অঙ্কুরিত হয়, তৎপ্রতি তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল, এবং তাহারই পুত্র হরিনারায়ণ সনাতন হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ শ্রদ্ধাবান হইয়া-ছিলেন। সপ্তদশ বয়সে পাঠ সমাধা করিয়া হরিনারায়ণ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। সর্ব্ব প্রথমে তিনি যশোহর আদালতে নকলনবীশের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তৎকালীন জেলার জজ সাহেব হরিনারায়ণের

কার্য্যকুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সব্‌জজের সেরস্তাদারের পদে উন্নীত করিয়াছিলেন। কিন্তু হরিনারায়ণ দীর্ঘকাল এই কার্য্য করেন নাই। সেরেস্তাদারের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি আইন ব্যবসায়ী হইয়াছিলেন। বিদ্যা ও বুদ্ধির সাহায্যে তিনি শীঘ্রই যশোহরের একজন প্রধান উকিল হইয়াছিলেন। উকিল হওয়ার পর তিনি কিছুদিনের জন্য অস্থায়ী মুন্‌সেফ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আইন ব্যবসায়ে হরিনারায়ণ যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই উপার্জ্জন লব্ধ অর্থে বিষয়-সম্পত্তি ক্রয় ও মাগুরায় বাসভবন নির্ম্মিত হইয়াছিল। যশোহরের অন্যতম প্রধান উকিল হইয়াও হরিনারায়ণ অহঙ্কার ও বিলাসিতার অস্পৃশ্য ছিলেন; উপার্জ্জনের অধিকাংশই তিনি গরীবের-অভাব মোচনে ব্যয় করিতেন। তাঁহার মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। শিশিরকুমার তাঁহার "নরোত্তম চরিত" নামক গ্রন্থ পিতৃদেবের চরণে উৎসর্গ করিয়া লিখিয়াছেন,—"শিশুবেলায় লোকে আমাদিগকে বলিত, তোমার পিতা বাহ্য ও আভ্যন্তরিক সৌন্দর্যে অদ্বিতীয়। তিনি মহাপুরুষ, তোমরা তাঁহার উপযুক্ত পুত্র কেহ হইতে পারিবে না।' পিতা, তোমার উপযুক্ত পুত্র আমরা কিরূপে হইব? তোমার মত লোক শ্রীভগবান সর্ব্বদা সৃষ্টি করেন না; আমাদের দোষ কি? তোমার কাঞ্চনবরণ, সুবলিত অঙ্গ কুন্দনকৃত বদন, লাবণ্যময় গতি, মধুর হাস্য, কমল নয়ন যে দেখিত, সে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় চাহিয়া থাকিত। তোমার শক্তি কত ছিল, তা তখন আমাদের বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু লোকে বলিত তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান ভারতবর্ষে নাই। তবে তোমার হৃদয় কিরূপ ছিল তাহা কিছু কিছু চক্ষে দেখিয়াছি। অন্যের দুঃখ শুনিলে তোমার নয়ন হইতে ধারা বহিত। তুমি যখন পূজা করিতে, তখন তোমাকে যে দেখিত সেই ভক্তিরসে আর্দ্র হইত। সঙ্গীতজ্ঞ বহুতর লোকের গীত শুনিয়াই কিন্তু তোমার মুখে যে

সংগীত শুনিয়াছি, সেরূপ কোথাও শুনি নাই, শুনিবার আশাও নাই"।

নলডাঙ্গার নিকটবর্তী তেলেন নামক গ্রামের প্রসিদ্ধ বসুবংশে হরিনারায়ণ বিবাহ করেন। নবরঙ্গ কুলীন বলিয়া সমাজে বসুবংশের যথেষ্ট সমাদর ছিল। জয়চন্দ্র বসু মহাশয়ের কন্যা অমৃতময়ীর সহিত হরিনারায়ণের বিবাহ হয়। অমৃতময়ী বাস্তবিকই অমৃতময়ী ছিলেন। পল্লীর মধ্যে কাহারও কোন বিপদ ঘটিয়াছে শুনিলে তিনি স্বীয় সংসারের কাজ পরিত্যাগ করিয়া বিপন্নের সহায়তায় অগ্রসর হইতেন। অভাবগ্রস্ত নরনারীগণকে তিনি অন্নপূর্ণার ন্যায় মুক্তহস্তে অন্ন বিতরণ করিতেন। হরিনারায়ণের গ্রামবাসীগণ তাঁহাকে দেবীর ন্যায় ভক্তি করিত। স্বহস্তে আপনার সুবৃহৎ পরিবারের রন্ধনকার্য্যে ও প্রতিবাসিগণের নানা কাজে ব্যস্ত থাকিলেও; তিনি তাঁহার দৈনন্দিন পূজা-আহ্নিকে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ করিতেন না। যাঁহারা তাঁহার পূজাদি ব্যাপারে একাগ্রতা লক্ষ্য করিতেন, তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। পুত্র কন্যা যে জনক-জননীর গুণের অধিকারী হইয়া থাকে, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। হরিনারায়ণের ন্যায় জনক ও অমৃতময়ীর ন্যায় জননীর সন্তানগণ যে সংসারে প্রকৃত মানুষ বলিয়া পরিচিত হইবেন, তাহা অস্বাভাবিক নহে। বাল্যবিবাহ বহু দোষের আকর, বিশেষতঃ নারীর স্বাস্থ্যভঙ্গের মূল বলিয়া নিন্দিত হইয়া থাকে; কিন্তু পাঠক! শুনিলে বিস্মিত হইবেন যে, হরিনারায়ণের যখন বিবাহ হয়, তখন তাঁহার বয়স নয় বৎসর ও অমৃতময়ীর বয়স আড়াই বৎসর মাত্র। অমৃতময়ী বহু সন্তানের জননী হইয়াও, সুস্থ শরীরে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া, দ্বিসপ্ততিবর্ষ বয়সে পরলোকগমন করেন।

আমরা যাঁহার জীবন চরিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি হরিনারায়ণের তৃতীয় পুত্র। বাঙ্গালা ১২৪৭ সালে, ইংরাজী ১৮৪০ খৃঃ অঃ, আষাঢ় মাসে শিশিরকুমার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে সময় ভূমিষ্ঠ হন ঠিক সেই সময়, গ্রামের কতকগুলি স্ত্রীলোক, একটী

বিবাহ উপলক্ষে ; 'জলসইবার' জন্য শঙ্খ, বাদ্য ও উলুধ্বনি করিতে করিতে হরিনারায়ণের বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মগ্রহণের সময় চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল এবং নবদ্বীপ-বাসিগণের হরিসংকীর্ত্তনে ও মাঙ্গলিক বাদ্য দিঙ্মণ্ডল-পূর্ণ হইয়াছিল। হরিনারায়ণ সে কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার নবজাত পুত্রের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "ছেলে যদি বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে সে একজন অদ্বিতীয় পুরুষ হইবে সন্দেহ নাই।"

যাঁহারা কর্ম্মজীবনে আপন আপন প্রতিভাবলে সমাজে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছেন, বাল্যাবস্থাতেই তাঁহাদের চরিত্রে একটা না একটা বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইয়াছে। পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে শিশিরকুমার যেদিন গুরু মহাশয়ের নিকট বিদ্যারম্ভ করেন, সেই দিনই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। গুরু মহাশয় শুভদিন দেখিয়া শিশিরকুমারের হাতে খড়ি দেন। একখণ্ড খড়ির দ্বারা তিনি ক, খ, গ, ঘ, ইত্যাদি বর্ণমালা লিখিয়া দিলেন ; ছাত্র শিশিরকুমার সেই লেখা দেখিয়াই বর্ণলিখন শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছিলেন।* অনেকেরই নিকট ইহা হয়ত অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইবে, কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের কার্য্য অনেক সময় সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। শিশিরকুমার যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, তখন দেশে শিক্ষা বিস্তারের পথ একরকম রুদ্ধ ছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। গ্রামে বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা না থাকায় শিশির-কুমার তাঁহার অপর দুই ভ্রাতা বসন্তকুমার ও হেমন্তকুমারের সহিত যশোহরে পিতৃদেবের নিকট থাকিয়া জেলা স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন। তাঁহাদের কোন গৃহশিক্ষক ছিলেন না। বিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষায় তৃপ্ত হইতে না পারিয়া ভ্রাতৃত্রয় গৃহে নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। জ্যেষ্ঠ বসন্তকুমার অসাধারণ ধীসম্পন্ন ছিলেন। গৃহে

---

*বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধেও এইরূপ একটী গল্প প্রচলিত আছে। উভয়েরই পক্ষে ইহা যে সম্ভাব্য উত্তরকালে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

অধ্যয়ন করিয়া তিনি দর্শন, বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র এবং সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি দশ অঙ্কে দশ অঙ্কে মনে মনে গুণ করিতে পারিতেন। রসায়ন শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্য তিনি ফরাসী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। শেষে তিনি জন স্টুয়ার্ট মিলের গ্রন্থের টিপ্পনী ও নূতন পদ্ধতিতে একখানি ইংরাজী ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বসন্তকুমার বাটীতে অধ্যয়ন করিয়াই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হেমন্তকুমার মেডিকেল কলেজে পাঠ করিতেন। শিশিরকুমার হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্বে ছাত্রগণ যেমন ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষা দিতে পারে না, পূর্ব্বেও এই নিয়ম প্রচলিত ছিল। শিশিরকুমার সপ্তদশ বৎসরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎকালে প্রবেশিকা পরীক্ষার পর ছাত্রগণ বি. এ. পরীক্ষা দিতে পারিত। বাড়ীতে অধ্যয়ন করিয়া শিশিরকুমার বি. এ. পরীক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। পূর্ব্বে সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিশির-কুমার কিছুদিন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি একমুহূর্ত্তও বৃথা কার্য্যে অপব্যয় করিতেন না। কোনও পুস্তক পাঠ করিতে:আরম্ভ করিলে তাঁহার আর জ্ঞান থাকিত না। শুনা গিয়াছে, অনেক সময় পাঠ আরম্ভ করিয়া তিনি সমস্ত রাত্রিই অধ্যয়নে অতিবাহিত করিয়াছেন, পরদিন প্রাতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে তাঁহার চৈতন্য হইয়াছে। বিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালী একেবারেই তাঁহার মনোমত ছিল না। তিনি বলিতেন, যে শিক্ষায় মনুষ্যত্বের উন্মেষ হয় না, যে শিক্ষায় মানুষকে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তায় সহায়তা করে না, যে শিক্ষায় ছাত্রগণের হৃদয়ে জীবনী-শক্তি সঞ্চার করিতে পারে না, সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে।

জ্যেষ্ঠ সহোদর বসন্তকুমারের অসামান্য জ্ঞানে, গুণে ও

ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহোদর ও সহোদরাগণ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। বাল্যকাল হইতেই শিশিরকুমার জ্যৈষ্ঠ সহোদরের অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সম্মুখে আদর্শ স্বরূপ রাখিয়াই তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। যতদিন বসন্তকুমার জীবিত ছিলেন, তাঁহার সংগে পরামর্শ ও তাঁহার উপদেশ ব্যতীত শিশিরকুমার কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তিনি তাঁহার শ্রীঅমিয় নিমাই চরিতের দ্বিতীয় খণ্ড জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে উৎসর্গ করিয়া লিখিয়াছেন, "যেমন কাদা দিয়া পুতুল গড়ে, সেইরকম তিনি আমাকে গড়িয়াছিলেন।" বড়ই দুঃখের বিষয়, বসন্তকুমারের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, দুরারোগ্য শ্বাসকাসিতে অতি অল্প বয়সেই তাঁহার শরীর জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি জীবিত থাকিয়া শিশিরকুমারের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে পারিলে, এদেশের উন্নতির পথ আরও সুগম হইত। দেশের দুর্ভাগ্য, তাই মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে বসন্তকুমার ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রুগ্ন ও অল্পায়ু হইলেও বসন্তকুমার দেশের জন্য যাহা করিয়াছিলেন, পাঠক তাহা শিশিরকুমারের চরিত্র হইতে অবগত হইতে পারিবেন। যে শিশির কুমার ভবিষ্যৎ জীবনে কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীর বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, বাল্যকালে তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের পদ প্রান্তে উপবেশন করিয়া মানবজীবনের কর্ত্তব্য শিক্ষা করিয়াছিলেন।

শিশিরকুমারের বাল্যজীবনের কার্য্যাবলী নিবিষ্ট মনে পর্য্যালোচনা করিলে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতে হয়। নিরীহ প্রকৃতির বালককে পাঠক যদি "ভাল ছেলে" বলিতে চান, তাহা হইলে শিশিরকুমারের ন্যায় "মন্দ ছেলে" তাঁহার সময়ে তাঁহাদের দেশে ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। রৌদ্রের ভয়ে মানুষ যখন গৃহের বাহির হইতে সাহস করিত না, সেই সময় শিশিরকুমার মাঠে ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেন। গ্রামের মধ্যে যে সকল বৃক্ষ অতিশয় উচ্চ, কৃষকেরাও যাহাতে আরোহণ করিতে সাহস করিত না, শিশিরকুমার সেই সকল

বৃক্ষের শিরোদেশে বসিয়া থাকিতেন। অশ্বারোহণে তিনি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। সমবয়স্কদিগের সহিত অশ্বারোহণে বহির্গত হইবার সময় তিনি সর্ব্বাপেক্ষা দুরন্ত অশ্বটী আপনার জন্য নির্ব্বাচন করিতেন। একবার একটি দুর্দ্দান্ত অশ্বের পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গিয়া তিনি এরূপ সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, তাহাতে তাঁহার জীবন সংশয় হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে, সুচিকিৎসার ফলে তিনি আরোগ্য লাভ করেন। অস্ত্র সঞ্চালনে ও ব্যায়ামে তাঁহার সময়, যশোহরে তাঁহার সমকক্ষ লোক অতি অল্পই ছিল। সন্তরণে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। যশোহরে ভোলাপুকুর নামে একটি প্রশস্ত পুষ্করিণী আছে। সুপরিচিতনামা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় বাবু রামচরণ বসু যশোহর বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র ছিলেন। তিনি একদিন শিশিরকুমারকে বলিয়াছিলেন, "তুমি যদি মৃত্তিকা স্পর্শ না করিয়া পঞ্চাশবার ভোলা-পুকুর পারাপার হইতে পার, তাহা হইলে আমরা, সকল ছাত্র মিলিয়া তোমাকে একটী পদক পুরস্কার দিব।" শিশিরকুমারের নিকট কার্য্যটী অতি সামান্য বলিয়া মনে হইল। নির্দ্দিষ্ট দিবসে তিনি প্রাতে আট ঘটিকার সময় আরম্ভ করিয়া বেলা এগারটা পঁয়ত্রিশ মিনিটের মধ্যে মৃত্তিকা স্পর্শ না করিয়া পঞ্চাশবার ভোলাপুকুর পারাপার করেন।* বালকের অসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ও যশোহরের জনসাধারণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। ভয় কাহাকে বলে, শিশিরকুমার তাহা আদৌ জানিতেন না।

শিশিরকুমার দেখিতে কখনই স্থূলকায় ছিলেন না। শেষ বয়সে তাঁহাকে দেখিলে রুগ্ন ও দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু যৌবনে

---

*He was one of the best swimmers in the District and he made reputation in this respect by crossing and re-crossing fifty times without touching land, a big tank in the town of Jessore, called "Bhola Pukhar", having thus been in water for nearly four hours—Hindu Spiritual Magazine. January 1911—vol. v, No. 11, Page 392.

তাঁহার ক্ষীণ শরীরে তিনি অসাধারণ বল ধারণ করিতেন। কুস্তী সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি কৌশল অবগত ছিলেন, এবং সেই সকল কৌশল অবলম্বন করিয়া তিনি মল্লযুদ্ধের সময় তাঁহার অপেক্ষা বলবান ও বৃহৎকায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে অনায়াসে পরাজিত করিতে পারিতেন। তাঁহার অসমসাহসিকতা, মানসিক তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার তুই একটী উদাহরণ দিতেছি। শিশিরকুমার যখন যশোহরের স্কুলে পাঠ করিতেন। একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভীষণ ঝটিকা উত্থিত হইল, গাঢ় তিমির মেদিনীকে গ্রাস করিল। এমন সময়ে শিশিরকুমারের হৃদয়ে এক অত্যদ্ভূত বাসনা জাগিয়া উঠিল, তিনি হেমন্তকুমারকে বলিলেন, "মেজদাদা, ঝঞ্ঝাবাতের ভীষণতা ত কখনও পরীক্ষা করা হয় নাই ; আসুন না আজ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখি।" হেমন্তকুমার তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইলেন এবং উভয় সহোদর লাঠি ঘাড়ে করিয়া সূচীভেদ্য অন্ধকার ও ঝটিকার মধ্য দিয়া পলুয়া-মাগুরার দিকে ছুটিতে লাগিলেন। যশোহর ও মাগুরার মধ্যে ব্যবধান বারো মাইলের কম নহে। পথে জনমানব নাই, এইরূপ সময় হেমন্তকুমার ও শিশিরকুমার মাগুরার পথে ছুটিতেছেন। রাত্রি এগার ঘটিকার সময় তাঁহারা বাড়ীতে পৌঁছিলেন। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন ও পল্লীবাসিগণ স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

যশোহরের নিকটবর্ত্তী ঝিকরগাছা নামক স্থানে নীলকর সাহেব-দিগের একটি আড্ডা ছিল। উক্ত কুঠীর সাহেবের সহিত শিশির-কুমারের পিতা হরিনারায়ণের একবার একটী মোকদ্দমা হইয়াছিল। বিচারে হরিনারায়ণ জয়লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে নীলকর সাহেবদিগের কিরূপ প্রতাপ ছিল, এই জীবন-চরিতে পাঠক যথা-স্থানে তাহার কতকটা আভাস পাইবেন। মোকদ্দমায় পরাজিত হইয়া সাহেব তুঃখ, লজ্জা ও ঘৃণায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। প্রতি-হিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সাহেব হরিনারায়ণের বাটী লুণ্ঠন করিবেন, স্থির করিলেন। হরিনারায়ণ এই সংবাদে বিচলিত

হইয়া উঠিলেন। তিনি পুত্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা বাড়ীর মেয়েদের লইয়া অন্যত্র যাও, সাহেবের লোক বাড়ী লুণ্ঠন করিতে আসিলে অপমানের সীমা থাকিবে না।" পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া বালক শিশিরকুমার ক্রোধে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। বসন্ত ও হেমন্ত তাঁহার ভাব লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইলেন। শিশিরকুমার একটু সংযত হইয়া দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "বাবা দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে ততক্ষণ আমরা এ বাটী পরিত্যাগ করিয়া যাইব না। কাহার সাধ্য আমাদের বাড়ী লুণ্ঠন করে? সাহেবের ভয়ে আমরা যদি বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করি, তাহা হইলে লোকে আমাদিগকে কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা ও উপহাস করিবে। বাবা, আপনি বিন্দুমাত্র চিন্তিত হইবেন না। সাহেবের লাঠিয়ালগণ যদি আমাদের বাড়ী লুণ্ঠন করিতে আসে, তাহাদিগকে রীতিমত শিক্ষা না দিয়া ছাড়িব না।" শিশিরকুমারের তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা হরিনারায়ণের হৃদয়ে যুগপৎ সাহস ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। দাদা ও মেজদাদার সহিত শিশিরকুমার ছাদের উপর প্রচুর ইষ্টকখণ্ড সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি কয়েকজন লাঠিয়ালও সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। সাহেব সকল কথা অবগত হইয়া হরিনারায়ণের বাড়ী লুণ্ঠন করিতে সাহস করেন নাই।

বাল্য হইতেই শিশিরকুমার সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি পাখোয়াজ বাজাইতে শিখিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে, প্রসিদ্ধ ওস্তাদগণ যখন ধ্রুপদ আলাপ করিতেন, তাঁহাদের সহিত তিনি সুন্দর রূপে সঙ্গত করিতে পারিতেন। শিশির-কুমারের খুল্লতাত চন্দ্রনারায়ণ একজন প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গবাদক ছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি ওস্তাদ রাখিয়া সেতারও শিক্ষা করিয়াছিলেন। বৈঠকখানায় বসিয়া তিনি যখন সেতার ও পাখোয়াজ বাজাইতেন, শিশিরকুমার অন্তরালে থাকিয়া নিবিষ্ট মনে তাঁহার বাদ্য শ্রবণ

করিতেন। এইরূপে তিনি পাখোয়াজ ও সেতার বাজাইতে শিখিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি বাঁশী, বেহালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রও বাজাইতে পারিতেন। এই সকল শিক্ষার জন্য তাঁহাকে কোনও ওস্তাদের শরণাপন্ন হইতে হয় নাই। শিশিরকুমার ভগবদ্দত্ত শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে অল্প বয়সে সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করা বিচিত্র নহে। একদিন শিশির-কুমারের পিতৃদেব হরিনারায়ণ যশোহর হইতে বাড়ী গিয়াছেন ; সন্ধ্যার পর গ্রামের বহু ভদ্রলোক তাঁহার বৈঠকখানা গৃহে সমবেত হইয়াছেন, এমন সময় হরিনারায়ণ বলিলেন, "চন্দ্র, তুমি কেমন সেতার শিখেছ একটু শোনাও দেখি।" চন্দ্রনারায়ণ সেতার লইয়া একটি রাগিনী আলাপ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু এক স্থানে কেমন গোলমাল হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি দুই-তিনবার আলাপ করিয়াও আপনার ভ্রম সংশোধন করিতে পারিলেন না। বৈঠকখানা গৃহের বাহিরে থাকিয়া শিশিরকুমার ও বসন্তকুমার কাকার রাগিনী আলাপ শুনিতেছিলেন। শিশির বসন্তকে বলিলেন, "দাদা, ছোট কাকার একটা ভুল হচ্ছে ; ছোট কাকা সেটা ঠিক করে বাজাতে পারছেন না। আমি ঠিক করে রাগিনী আলাপ করিতে পারি।" বসন্তকুমারের বড় আনন্দ হইল, তিনি ধীরে ধীরে পিতার নিকটে গিয়া বলিলেন, "বাবা, শিশির বল্‌ছে, ছোট কাকার যে ভুল হচ্ছে, সে তা ঠিক করে বাজাতে পারে!" উপস্থিত সকলে শুনিয়া অবাক্ হইলেন। চন্দ্র-নারায়ণ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "শিশির লেখাপড়া ছেড়ে এখন বুঝি গান-বাজনা শিখ্‌ছে। ওর আর লেখাপড়া হবে না দেখ্‌ছি।" বৈঠকখানা গৃহে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেরই কেমন একটা কৌতূহল হইল। সকলের অভিপ্রায় অনুসারে ও হরিনারায়ণের আদেশে শিশিরকুমার সেতার লইয়া তাঁহার পিতৃব্য যে রাগিনী আলাপ করিতেছিলেন, তাহা অতি সুন্দরভাবে আলাপ করিলেন। চন্দ্রনারায়ণের যেখানে ভ্রম হইতেছিল, শিশির সেই স্থানটী বিশেষ

করিয়া তিন চার বার বাজাইলেন। উপস্থিত সকলে মুগ্ধ হইলেন। শিশিরকুমার সঙ্গীত শাস্ত্রে এতদূর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি স্বয়ং "অমৃত বেলোয়ার" নামে একটী রাগিনী সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সন্তানগণ এই রাগিনী অবগত আছেন। শিশিরকুমার "সঙ্গীত শাস্ত্র" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎকালে এই শ্রেণীর পুস্তক দেশে ছিল কি না, তাহা আমরা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না।

কলিকাতায় ঝামাপুকুরের প্রসিদ্ধ জমিদার রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয় ধ্রুপদ শুনিতে ভালবাসিতেন না। যৌবনে শিশিরকুমার সপরিবারে যখন কলিকাতায় অবস্থান করেন, সেই সময় রাজা একদিন তাঁহার সঙ্গীত শুনিবার জন্য তাঁহাকে আপনার বাটীতে আহ্বান করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার সহোদর মতিলালকে সঙ্গে লইয়া রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন। রাজা যে ধ্রুপদ শুনিতে ভালোবাসিতেন না, শিশিরকুমার তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। মতিলালের সহিত তিনি প্রথমেই ধ্রুপদ আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের গান শুনিয়া রাজা মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার নয়নে আনন্দাশ্রু উদ্গত হইল। এই সময় হইতেই রাজা ধ্রুপদ শুনিতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও বড় ধ্রুপদ-বিদ্বেষী ছিলেন ; কিন্তু তিনিও শিশিরকুমারের গান শুনিয়া স্বীয় মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

যে বিষয়েই শিশিরকুমার হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। একদিন তিনি বৃক্ষ হইতে একটী করবী পুষ্প চয়ন করিয়া তাহা আপনার সম্মুখে রাখিয়া অঙ্কন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই অঙ্কিত করবী পুষ্পটি দেখিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। শিশিরকুমারের স্বহস্তের অঙ্কিত কোনও চিত্র এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার অঙ্কিত

চিত্র দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, চর্চ্চা রাখিলে তিনি একজন সুনিপুণ চিত্রকর হইতে পারিতেন। শিশিরকুমারের শৈশবের আর একটী গুণ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পিতা হরিনারায়ণ ঘোষ মহাশয় আইন-ব্যবসায়ে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতেন। শিশিরকুমার ধনীর সন্তান হইয়াও বিলাসী কিম্বা ধনাভিমানী ছিলেন না। পরের জন্য সামান্য শ্রমজীবীর কার্য্য করিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। মাগুরায় অভয়চরণ গাঙ্গুলী নামক জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি ঘোষ পরিবারের অনুগত ও আশ্রিত ছিলেন। একবার তাঁহার একখানি বাসগৃহ নির্ম্মাণের সময় শিশিরকুমার স্বহস্তে ঘরের দেওয়াল হইতে আরম্ভ করিয়া চাল প্রস্তুত ও ছাওয়া পর্য্যন্ত শেষ করিয়াছিলেন। অনেকেরই নিকট এই কার্য্য অতিশয় সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে; কিন্তু সামান্য সামান্য কার্য্য হইতেই মানবের চরিত্র বিশ্লেষণ করিবার অধিকতর সুযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পাশ্চাত্য রীতি, নীতি ও শিক্ষা প্রচলের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে এক নূতন বাতাস প্রবাহিত হইয়াছিল। ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার বাসনা প্রবল বন্যার ন্যায় বঙ্গদেশকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল। এই সময়ে বহু ইংরেজী শিক্ষিত যুবক সনাতন হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শিশিরকুমারের পূর্ব্বপুরুষগণ শক্তি-উপাসক ছিলেন। হরিনারায়ণ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন; কিন্তু তাঁহার পুত্র বসন্ত, হেমন্ত ও শিশির পাশ্চাত্য শিক্ষা ও রীতি নীতির আলোক প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব-পুরুষগণের অবলম্বিত ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ প্রসার ও প্রতিপত্তি রক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু তখন ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করা নিন্দাজনক ও ব্রাহ্মধর্ম্মে দাক্ষিত হওয়া বিশেষ গৌরবজনক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। সে সময়ের অবস্থা বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। পুত্রগণের ধর্ম্মান্তর

গ্রহণে পিতা হরিনারায়ণ হৃদয়ে নিদারুণ বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন। ভ্রাতৃত্রয়ের ব্রাহ্মধর্ম্মে গ্রহণের ব্যাপার লইয়া তাঁহাদের দেশমধ্যে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। শেষে তাঁহারা নেতৃগণ কর্তৃক সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। পূর্বপুরুষগণ ধর্ম্মানুরাগ ও সৎকার্য্য দ্বারা বংশের যে গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, আজ তাহা পুত্রগণের ব্যবহারে লুপ্ত হইতে চলিল, এই চিন্তা হরিনারায়ণের হৃদয়কে শান্তিহীন করিয়া তুলিয়াছিল। একদিন তিনি বসন্ত, হেমন্ত ও শিশিরকুমারকে সংগে লইয়া দেবালয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক দেবমূর্ত্তির সম্মুখে প্রণাম করিতে আদেশ করিলে বসন্তকুমার নয়নজলে জনকের চরণযুগল ধৌত করিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "বাবা, আমাকে ক্ষমা করুন। যে ভাবে ভগবানকে পূজা করিলে আমরা হৃদয়ে আনন্দও প্রীতি প্রাপ্ত হই, আপনি কৃপা পূর্ব্বক আমাদিগকে সেইভাবেই তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে দিন। অনুগ্রহ করিয়া আপনি আপনার পুত্রগণের স্বাধীন ধর্ম্ম চিন্তায় হস্তক্ষেপ করিবেন না।" ভাবোন্মত্ত পুত্রকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া পিতা হরিনারায়ণ নীরবে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন। ইহার পর হইতে পিতা ও পুত্রগণের মধ্যে ধর্ম্মমত লইয়া আর কখনও আলোচনা হইত না।

শিশিরকুমার ও তাঁহার সহোদরগণ যখন ব্রাহ্মধর্ম্মালম্বী হন, সেই সময় দেশের অনেকেই ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সামাজিক তাড়নার আশঙ্কায় অন্তরে ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইলেও প্রকাশ্যভাবে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে সাহসী হন নাই। বসন্ত ও তাঁহার সহোদরগণ কিন্তু সামাজিক তাড়না উপেক্ষা করিয়া প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হইত, বসন্ত ও তাঁহার ভ্রাতারা তাহা করিতে কোন বাধা-বিঘ্ন গ্রাহ্য করিতেন না। বঙ্গদেশে চারিশ্রেণীর কায়স্থ আছেন, —দক্ষিণ রাঢ়ী, উত্তর রাঢ়ী, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র। বর্তমানে বহুল প্রচলন না হইলেও এই চারিশ্রেণীর মধ্যে ক্রমে বিবাহপ্রথা প্রচলিত

হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এই প্রসার প্রচলন ছিল না। শিশিরকুমারের তিনটি ভগিনীর মধ্যে দুইটির বিবাহ হরিনারায়ণের জীবদ্দশায় সম্পন্ন হইয়াছিল। শিশিরকুমার কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ দিয়াছিলেন। শিশির ও তাঁহার সহোদরগণ দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ। কিন্তু সমাজের তাড়নার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তাঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর সহিত সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। সমাজসংস্কারই শিশিরকুমারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। পাব্না জেলা নিবাসী হাইকোর্টের উকীল স্বর্গীয় বাবু কিশোরীলাল সরকার মহাশয়ের সহিত তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল। উত্তরকালে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে শিশিরকুমারে মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। যখন তিনি মহাপ্রভূ শ্রীচৈতন্যদেবের মধুর ধর্ম্মের রসাস্বাদন করিয়াছিলেন, সেই সময় ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মে অনুরাগী হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের জন্য শিশিরকুমার ও তাঁহার সহোদরগণ সমাজ-চ্যুত হইলেও তাঁহারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই, কারণ তাঁহাদের পারিবারিক শান্তি সামাজিক শাসনে হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। পল্লী-বাসিগণ তাঁহাদের সংশ্রবে না আসিলেও শিশিরকুমার স্বীয় ভ্রাতা-ভগিণীদের সহিত আনন্দে দিন যাপন করিতেন। সহোদর সহোদরা-গণের পরস্পরের প্রতি স্নেহ অতুলনীয়। কেহ কাহারও বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিতেন না। পারিবারিক উপাসনাকালে ভ্রাতাভগিণীগণ একত্র হইয়া কেহ গান করিতেন, কেহ বা বাজাইতেন। স্নেহময়ী জননী অমৃতময়ীকে মধ্যস্থলে বসাইয়া শিশরকুমার যখন সহোদরগণের সহিত স্বরচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী আলাপ করিতেন, সেই সময়ের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের পরিবার ও অনেকে এখনও আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করেন। সঙ্গীতটি এখনও ব্রাহ্ম সমাজে আদরের সহিত গীত হইয়া থাকে। সে সঙ্গীতটী এই—

"মা যার আনন্দময়ী তার কিবা নিরানন্দ।
তবে পাপী তাপী শোকী, মিছা তুমি কেন কান্দ॥

মাঝখানে জননী বসে,
সন্তানগণ চারিপাশে,
ভাসাইছেন প্রেমময়ী প্রেম-নীরে।
পাপ তাপ দূরে গেল,
আনন্দরস উথলিল,
বাহুতুলে মা মা বলে, নৃত্য কর সন্তানবৃন্দ।"

হরিনারায়ণের পুত্রকন্যাগণের সকলেরই প্রকৃতি অতি মধুর ও স্নেহপ্রবণ ছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে শিশিরকুমার সকলেরই অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। ভ্রাতাভগিণীদিগকে তিনি প্রকৃতই প্রাণাধিক ভালবাসিতেন। তাঁহাদিগের জন্য কোন ক্লেশ কিম্বা কোন অসুবিধা ভোগ করিতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। তাঁহার মধ্যম সহোদর হেমন্তকুমার কলিকাতায় থাকিয়া মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। শিশির-কুমার একদিন শুনিলেন যে, তাঁহার মেজদাদা বাড়ী আসিতেছেন, আনন্দে তাঁহার প্রাণ নৃত্য করিতে লাগিল। মেজদাদাকে কতদিন পরে দেখিবেন, তাঁহার সহিত প্রাণ ভরিয়া কথা কহিবেন, এই আনন্দে তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন। ক্রমে বেলা অবসান হইতে লাগিল, কিন্তু কই মেজদাদা ত আসিলেন না, শিশিরকুমার আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বসন্তকুমারকে ডাকিয়া বলিলেন, "দাদা, আজ মেজদাদার বাড়ীতে আসিবার কথা, কিন্তু কই, এখনও ত আসিলেন না।" বসন্তকুমার বলিলেন, "চল না, একটু এগিয়ে দেখি।" সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটী লণ্ঠন লইয়া বসন্ত শিশিরকুমারের সহিত কলিকাতার পথে অগ্রসর হইলেন। বেশভূষা করিতে হইলে বিলম্ব হইবে ; সে বিলম্ব যে সহোদরদ্বয়ের নিকট অসহ্য, তাহারা যে বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন, তাহা পরিবর্ত্তন না করিয়া, জুতা, জামা চাদর কিছুই না লইয়া চলিতে চলিতে চৌদ্দ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলেন। সমস্ত রাত্রি পথ অতিবাহিত করিয়া উভয়েই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা রসুলপুরের নিকটবর্ত্তী হইলেন। রজনীর

অন্ধকার তখনও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই, এমন সময় একটি বাঘ তাঁহাদের নিকট দিয়া চলিয়া গেল। বাঘ দেখিয়া দুই সহোদর পরস্পরকে বাহু দ্বারা আবদ্ধ করিলেন এবং ক্রমে রসুলপুরে তাঁহাদের ভগিণীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। এদিকে হেমন্তকুমার বিভিন্ন পথে বাড়ী আসিয়াছিলেন; বসন্ত ও শিশির তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। ভগিনীর গৃহে একদিন অবস্থান করিয়া বসন্ত ও শিশিরকুমার মাগুরায় ফিরিয়া আসিলেন, দেখিলেন হেমন্তকুমার আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। শিশিরের আনন্দের সীমা রহিল না। মেজদাদার সহিত কথার আর শেষ হয় না। বসন্তকুমারও তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন। সকলেরই পরম আনন্দে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল।

শিশিরকুমারের স্নেহপরায়ণতা সম্বন্ধে আর একটী গল্প বলিতেছি। একদিন শিশিরকুমারের এক ভগিণীর শ্বশুরালয়ে হইতে পিত্রালয়ে আসিবার কথা ছিল। শিশিরকুমার আহার করিতে দেখিলেন যে, বাইন মৎস্যের ব্যঞ্জন হইয়াছে। তাঁহার সেই ভগিনী বাইন মৎস্য বড় ভালবাসিতেন। শিশিরকুমারের মৎস্য ভক্ষণ করা হইল না; তিনি বলিলেন, "দামিনী আসছে, সে বাইন মাছ বড় ভালবাসে, তার জন্য রেখে দাও*।" যদিও ইহাতে বিস্ময়কর কিছুই নাই, কিন্তু মহৎ ঘটনা অপেক্ষা এইরূপ সাধারণ ঘটনা দ্বারাই লোকের প্রকৃতি বুঝিবার সুবিধা হয় বলিয়াই উহা উল্লেখ করিলাম।

---

*এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব কবিদিগের সখ্য প্রেমের একটী কবিতা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া কবি কোনও রাখাল বালকের মুখ এই কথা বলাইয়াছিলেন—

"সারা বন বুলে বুলে
বনফল এনেছি তুলে,
রেখেছি ধড়ার অঞ্চলে,
মেঠো বলে খাইনে।"

সমাজচ্যুত হইলেও শিশিরকুমার ও তাঁহার সহোদরগণ সমাজের কল্যাণ সাধনে বিরত ছিলেন না। বসন্তকুমারের পরামর্শ অনুসারে শিশরকুমার "ভ্রাতৃসমাজ" নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনটী প্রাণী লইয়া উক্ত সভা গঠিত হইয়াছিল। বসন্তকুমার প্রেসিডেণ্ট, হেমন্তকুমার সভ্য ও শিশিরকুমার সম্পাদক হইলেন। মতিলাল অল্পবয়স্ক হইলেও জ্যেষ্ঠ সহোদরগণের কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। যে স্বদেশপ্রেম শিশিরকুমারকে ভারতবাসীর নিকট বরেণ্য করিয়াছিল, তাহা প্রথম যৌবণেই তাঁহার চরিত্রে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া শিশিরকুমার "ভ্রাতৃ-সমাজ" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে যে তাহা সফলতা লাভ করিয়াছিল, পাঠক তাহা ক্রমশঃই অবগত হইবেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন পল্লীগ্রামে পাশ্চাত্য-শিক্ষার ক্ষীণ আলোকরশ্মি পতিত হইয়াছিল মাত্র। অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, ব্যাধিগ্রস্ত দরিদ্র পল্লীবাসিগণের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন, প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যের ইচ্ছা তখন দেশবাসিগণের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে নাই। যুবক হইলেও শিশিরকুমারের হৃদয় প্রশস্ত ছিল। দেশের উল্লিখিত অভাবগুলি মোচনের অভিপ্রায়ে তিনি জ্যেষ্ঠ বসন্তকুমারের পরামর্শ অনুসারে "ভ্রাতৃ-সমাজ" প্রতিষ্ঠা করিয়া কার্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মাগুরা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী পল্লীর মধ্যে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইলে, শিশির, দাদা ও মেজদাদার সহিত ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সহায়তার নিমিত্ত সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। ভ্রাতৃত্রয় পর্য্যায়ক্রমে কত রুগ্ন ব্যক্তির শয্যা পার্শ্বে উপবেশন করিয়া রজনী অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা সুকঠিন।

একদিন অপরাহ্নকালে শিশিরকুমার জ্যেষ্ঠাগ্রজ বসন্তকুমারের সহিত বাড়ী হইতে যশোহরাভিমুখে রওনা হন। সন্ধ্যার পর পল্লীগ্রামের রাস্তায় লোক চলাচল বড় দেখা যায় না। দুই সহোদর

অন্ধকার তখনও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই, এমন সময় একটি বাঘ তাঁহাদের নিকট দিয়া চলিয়া গেল। বাঘ দেখিয়া দুই সহোদর পরস্পরকে বাহু দ্বারা আবদ্ধ করিলেন এবং ক্রমে রসুলপুরে তাঁহাদের ভগিণীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। এদিকে হেমন্তকুমার বিভিন্ন পথে বাড়ী আসিয়াছিলেন; বসন্ত ও শিশির তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। ভগিনীর গৃহে একদিন অবস্থান করিয়া বসন্ত ও শিশিরকুমার মাগুরায় ফিরিয়া আসিলেন, দেখিলেন হেমন্তকুমার আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। শিশিরের আনন্দের সীমা রহিল না। মেজদাদার সহিত কথার আর শেষ হয় না। বসন্তকুমারও তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন। সকলেরই পরম আনন্দে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল।

শিশিরকুমারের স্নেহপরায়ণতা সম্বন্ধে আর একটী গল্প বলিতেছি। একদিন শিশিরকুমারের এক ভগিণীর শ্বশুরালয়ে হইতে পিত্রালয়ে আসিবার কথা ছিল। শিশিরকুমার আহার করিতে দেখিলেন যে, বাইন মৎস্যের ব্যঞ্জন হইয়াছে। তাঁহার সেই ভগিনী বাইন মৎস্য বড় ভালবাসিতেন। শিশিরকুমারের মৎস্য ভক্ষণ করা হইল না; তিনি বলিলেন, "দামিনী আসছে, সে বাইন মাছ বড় ভালবাসে, তার জন্য রেখে দাও*।" যদিও ইহাতে বিস্ময়কর কিছুই নাই, কিন্তু মহৎ ঘটনা অপেক্ষা এইরূপ সাধারণ ঘটনা দ্বারাই লোকের প্রকৃতি বুঝিবার সুবিধা হয় বলিয়াই উহা উল্লেখ করিলাম।

---

*এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব কবিদিগের সখ্য প্রেমের একটী কবিতা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া কবি কোনও রাখাল বালকের মুখে এই কথা বলাইয়াছিলেন—

"সারা বন বুলে বুলে
বনফল এনেছি তুলে,
রেখেছি ধড়ার অঞ্চলে,
মেঠো বলে খাইনে।"

সমাজচ্যুত হইলেও শিশিরকুমার ও তাঁহার সহোদরগণ সমাজের কল্যাণ সাধনে বিরত ছিলেন না। বসন্তকুমারের পরামর্শ অনুসারে শিশরকুমার "ভ্রাতৃসমাজ" নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনটী প্রাণী লইয়া উক্ত সভা গঠিত হইয়াছিল। বসন্তকুমার প্রেসিডেন্ট, হেমন্তকুমার সভ্য ও শিশিরকুমার সম্পাদক হইলেন। মতিলাল অল্পবয়স্ক হইলেও জ্যেষ্ঠ সহোদরগণের কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। যে স্বদেশপ্রেম শিশিরকুমারকে ভারতবাসীর নিকট বরেণ্য করিয়াছিল, তাহা প্রথম যৌবণেই তাঁহার চরিত্রে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া শিশিরকুমার "ভ্রাতৃ-সমাজ" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে যে তাহা সফলতা লাভ করিয়াছিল, পাঠক তাহা ক্রমশঃই অবগত হইবেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন পল্লীগ্রামে পাশ্চাত্য-শিক্ষার ক্ষীণ আলোকরশ্মি পতিত হইয়াছিল মাত্র। অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, ব্যাধিগ্রস্ত দরিদ্র পল্লীবাসিগণের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন, প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যের ইচ্ছা তখন দেশবাসিগণের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে নাই। যুবক হইলেও শিশিরকুমারের হৃদয় প্রশস্ত ছিল। দেশের উল্লিখিত অভাবগুলি মোচনের অভিপ্রায়ে তিনি জ্যেষ্ঠ বসন্তকুমারের পরামর্শ অনুসারে "ভ্রাতৃ-সমাজ" প্রতিষ্ঠা করিয়া কার্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মাগুরা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী পল্লীর মধ্যে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইলে, শিশির, দাদা ও মেজদাদার সহিত ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সহায়তার নিমিত্ত সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। ভ্রাতৃত্রয় পর্য্যায়ক্রমে কত রুগ্ন ব্যক্তির শয্যা পার্শ্বে উপবেশন করিয়া রজনী অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা সুকঠিন।

একদিন অপরাহ্নকালে শিশিরকুমার জ্যেষ্ঠাগ্রজ বসন্তকুমারের সহিত বাড়ী হইতে যশোহরাভিমুখে রওনা হন। সন্ধ্যার পর পল্লীগ্রামের রাস্তায় লোক চলাচল বড় দেখা যায় না। দুই সহোদর

নানা কথাবার্ত্তায় পথ অতিবাহিত করিতেছেন, এমন সময় কয়েকটী শৃগালের খ্যাক্-খ্যাক্ শব্দের সহিত একটী মনুষ্যের ক্ষীণ ও কাতর কণ্ঠস্বর শিশিরকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কৌতূহল বশতঃ শিশিরকুমার বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইলে শিয়ালগুলি পলায়ন করিল, কিন্তু সেখানে যে দৃশ্য তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল, তাহাতে তিনি চমকিয়া উঠিলেন। তিনি দাদাকে ডাকিলেন ; বসন্তকুমারও তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া লোকটী অতি ক্ষীণ ও কাতর কণ্ঠে জল প্রার্থনা করিল। শিশির ছুটিয়া গিয়া নিকটের একটী পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া তাহাকে পান করাইলেন। লোকটী একটু সুস্থ হইয়া বলিল, "আমি যশোরে মোকদ্দমা করতে যাচ্ছিলাম, রাস্তায় কলেরা হয়েছে একপাও চল্‌বার সামর্থ্য আমার নাই। বাবা, আমি যদি এখানে একলা পড়ে থাকি, তাহ'লে নিশ্চয়ই আমাকে শিয়ালে ছিঁড়ে খাবে।" শিশিরকুমারের প্রাণ কিরূপে স্থির থাকিবে? তিনি বলিলেন, "ভয় কি ? আমি তোমাকে যশোরে নিয়ে যাচ্চি।" বসন্ত বলিলেন, "কি ক'রে নিয়ে যাবে শিশির ?" স্থূলকায় না হইলেও শিশিরকুমারের শরীরে যথেষ্ট শক্তি ছিল। তাহার উপর, অসহায় বিপন্নের উপকার করিবার ইচ্ছা হৃদয়ে জাগরূক হওয়ায়, সঙ্গে সঙ্গে যেন তিনি শরীরে অমানুষিক বল লাভ করিলেন। শিশিরকুমার বলিলেন, "দাদা, আমি লোকটীকে ঘাড়ে করে নিয়ে যাচ্ছি, তুমি মাঝে মাঝে সাহায্য কোরো।" আর বিলম্ব না করিয়া শিশির বিসূচিকা-রোগগ্রস্ত পথিককে স্কন্ধে লইয়া যশোহরের পথে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সর্ব্ব শরীরে মল মূত্র লাগিয়া গেল, কিন্তু সেদিকে তাঁহার আদৌ দৃষ্টি নাই। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময়ে তাঁহারা যশোহরে উপস্থিত হইলেন। হরিনারায়ণ শিশিরের কার্য্য দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন ; পুত্রের মহাপ্রাণতা লক্ষ্য করিয়া তিনি হৃদয়ে নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করিলেন। রোগীর জন্য একটী স্বতন্ত্র কক্ষ নির্দিষ্ট এবং তাহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত হইল। শিশিরকুমার রোগীর

শয্যাপ্রান্তে উপবেশন করিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। রোগী রোগমুক্ত হইল। সেবা ব্যতীত ধর্ম্মলাভ হইতে পারে না, সেবা ভগবৎকৃপা-প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সত্যই বলিয়াছিলেন,—

"দাসেরে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে।"

সংক্রামক ব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তির শুশ্রূষা করিতে গিয়া অনেক সময় শুশ্রূষাকারীও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, শিশিরকুমার ও তাঁহার সহোদরগণ তাহা জানিয়াও বসন্ত ও কলেরা প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের সেবা করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। একবার গ্রামে গাঙ্গুলী-বাড়ীর একটি চাকরের কলেরা হয়, মনিব বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলে, চাকরটি অতি কষ্টে একটি বৃক্ষতলে গিয়া শয়ন করিল। সংবাদটি বসন্তকুমারের শ্রবণ গোচর হইলে তিনি সহোদরগণের সহিত সেই বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া রোগীর সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাদের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে চাকরটি বলিয়াছিল, "বাবা, আমি ত মরিবই, কিন্তু মৃত্যুর পর আমার দেহের যাহাতে যথাবিধি সৎকার হয়, তাহার একটা ব্যবস্থা করিও।" বসন্তকুমার সহোদরগণের সহিত সেই নীচ-জাতীয় ভৃত্যকে স্কন্ধে করিয়া শ্মশানে লইয়া গিয়া তাহার সৎকার করিলেন। তাঁহাদের এই কার্য্য লক্ষ্য করিয়া গ্রামবাসিগণ বিরক্ত হইলেও তাঁহারা কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। অগ্রজদিগের ন্যায় মতিলালও একবার তাঁহাদের বাড়ীর একটি চাকরের কলেরার সময় স্বহস্তে তাহার মলমূত্র পরিষ্কার ও তাহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। বসন্তকুমার ও তাঁহার সহোদরগণ মানবজীবনের কর্তব্য পালন করিতেন বলিয়াই যেন বিধাতার মঙ্গল হস্ত সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে বিপদের গ্রাস হইতে রক্ষা করিত। তাঁহাদের হৃদয়ে প্রতিহিংসা বৃত্তির স্থান ছিল না। যাঁহারা তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করিয়াছিলেন, যাঁহারা তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন

করিতে ত্রুটি করেন নাই, তাঁহাদিগের কাহারও বাটিতে কোনও বিপদ উপস্থিত হইলে ভ্রাতৃবৃন্দ প্রাণপণে তাঁহাদের সহায়তা করিতেন। মিত্রতা দ্বারা শত্রুকে পরাজয় করাই তাঁহাদের ধর্ম্ম ছিল। যাঁহারা অনেক দুঃখ কষ্ট দিয়াছেন, তাঁহাদের কোনও উপকার করিব না, এভাব শিশিরকুমারও তাঁহার সহোদরগণের মনে কখনও উদয় হইত না। বিশ্বজনীন প্রেম যে হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে, সেখানে প্রতিহিংসাবৃত্তির স্থান কিরূপে হইবে? নিত্যানন্দ মাধাই এর হস্তে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—

"ওরে মেরেছিস্ কল্‌সীর কানা,
তাই বলে কি প্রেম দিব না?"

শিক্ষাবিস্তার ব্যতীত দেশের প্রকৃত মঙ্গল ও উন্নতি হওয়া অসম্ভব, একথা যৌবনের প্রথম হইতেই শিশরকুমারের মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল। কোনও সদনুষ্ঠানের প্রবৃত্তি হৃদয়ে জাগরূক হইলে ভগবান নিশ্চয়ই অলক্ষ্যে উদ্যোগী পুরুষের সহায়তা করিয়া থাকেন। "ভ্রাতৃ-সমাজে"র অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে মাগুরা গ্রামে উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বালিকাবিদ্যালয়ের সংগে বয়ঃপ্রাপ্তা মহিলারাও যাহাতে শিক্ষা লাভ করিতে পারে, সেজন্য একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছিল। উদরান্নের জন্য সারাদিন পরিশ্রম করিবার পর, কৃষকমণ্ডলী যাহাতে কিঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাস করিতে পারে, সেজন্য বিভিন্ন পল্লীতে নৈশবিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বসন্ত, হেমন্ত ও শিশির এই সকল বিদ্যালয়ে প্রয়োজনমত বিনা পারিশ্রমিকে কার্য্য করিতেন। অসহায় পল্লীবাসিগণের চিকিৎসার জন্য তাঁহারা একটি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সমাগত রোগীদিগকে কেবল ঔষধ প্রদান করা হইত না, আবশ্যকমত তাহাদের থাকিবার স্থানও পথ্যাদিও দেওয়া হইত। মাগুরায় বাজার না থাকায় অধিবাসিগণকে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বসন্তকুমার সহোদরগণের সহায়তায় ক্রমে একটী

বাজার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই বাজারে গৃহস্থের নিত্য-ব্যবহার্য্য সমস্ত জিনিষই পাওয়া যাইত। মাছ, তরকারি হইতে জুতা, জামা, কাপড়, বাসন, সৌখিন দ্রব্য সমস্তই বিক্রয়ার্থ এই বাজারে প্রস্তুত থাকিত। স্নেহময়ী জননী অমৃতময়ীর নামানুসারে বসন্ত ও শিশির-কুমার বাজারটীর "অমৃত বাজার" নাম দিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে মাগুরা "অমৃত বাজার" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। শিশিরকুমার ও তাঁহার সহোদরগণের যত্ন ও চেষ্টায় গ্রামে একটি ডাকঘরও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

অমৃতবাজার শীঘ্রই একটি আদর্শ পল্লী হইয়া উঠিল। পল্লীর যুবক-দিগকে বিদ্যোৎসাহী করিবার জন্য শিশিরকুমার প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। তিনি জেলার তাৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিষ্টার মন্‌রোকে একবার স্বীয় গ্রাম পরিদর্শনের জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। যথাস্থানে আমরা এই মন্‌রোর পরিচয় প্রদান করিব, তিনটি যুবকের চেষ্টায় একটি পল্লীর অসম্ভব উন্নতি লক্ষ্য করিয়া সাহেব বিস্মিত হইয়াছিলেন। শিশির-কুমার যশোহরের পরিবর্ত্তে অমৃত বাজারটিকে জেলা করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মিষ্টার মন্‌রো প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, পল্লীখানি যশোহর হইতে সর্ব্বাংশেই উন্নত, কিন্তু শিশিরকুমারের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব নহে। যাহা হউক, তিনি সরকারী কার্য্য বিবরণীতে "ভ্রাতৃ-সমাজের" কার্য্যাবলীর যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। যুবকগণের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য তিনি উক্ত বিদ্যালয়গুলিতেও চিকিৎসালয়ে সরকার হইতে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শারীরিক ও মানসিক শক্তির সংমিশ্রণেই মানবের পূর্ণাঙ্গতা; সুতরাং বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে বালকগণ যাহাতে স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে শিশিরকুমার আমাদের দেশের বিলুপ্ত ব্যায়ামগুলি পুনঃ প্রবর্তনে যত্নবান হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে কোয়াদ (ড্রিল) শিক্ষারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালী জাতিকে শক্তিশালী করিবার জন্য তিনি নানাস্থানে ব্যায়ামগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যমাগ্রজের সহিত একবার কৃষ্ণনগরে গমন করিয়া, কি উপায়ে রুগ্ন বাঙ্গালীজাতি বলবীর্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করার জন্য কলেজ-গৃহে রামতনু লাহিড়ী ও উমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়দ্বয়ের নেতৃত্বাধীনে এক মহতী সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। তথা হইতে তাঁহারা কলিকাতায় আগমণ করেন, এবং তাঁহাদের চেষ্টা ও যত্নের ফলে নবগোপাল মিত্রের "জাতীয় মেলা"র প্রতিষ্ঠা হয়।

বসন্তকুমারের সকল দিকেই লক্ষ্য ছিল। দেশে যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে গালা ও তসর উৎপন্ন হয়, তিনি তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। জাতীয় শিল্প ও কৃষি শিক্ষার জন্য তিনি শিশির-কুমারের সহযোগে কৃষি ও শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন স্থান হইতে উচ্চশ্রেণীর কারিগর আনাইয়া তিনি গ্রামবাসিগণের কৃষি ও শিল্প শিক্ষার পথ সুগম করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু নানা কারণে বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছিল। বসন্তকুমারের শিল্পবিদ্যার পরিচায়ক একটি টেবিল এখনও অমৃত বাজার পত্রিকা অফিসে ব্যবহৃত হইতেছে।

গণিত ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে না পারিলে জগতে উন্নতি লাভ করা অসম্ভব, এই ধারণাটি শিশিরকুমার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠা অগ্রজের হৃদয়ে বাল্যকাল হইতে বদ্ধমূল হইয়াছিল। দুই সহোদর সাহিত্য চর্চ্চা অপেক্ষা বিজ্ঞান ও গণিত চর্চ্চায় অধিক সময় ব্যয় করিতেন। শিক্ষকের বিনা সাহায্যে শিশির বাটীতেই সূক্ষ্মমান ও সমাহার গণিত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ বসন্ত-কুমার দুই একটি নূতন তথ্যও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। জীবনের শেষভাগে শিশিরকুমার যখন বৈদ্যনাথ দেওঘরে অবস্থান করিতেন, সেই সময় আমাদের জনৈক আত্মীয় তাঁহার সহিত একদিন সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তখন মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনে

বি, এ ক্লাসে অধ্যয়ন করিতেন। শিশিরকুমার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি বি, এতে কোন্ কোন্ বিষয় লইয়াছ?" যখন শুনিলেন যে তিনি ইংরাজী, সংস্কৃত ও দর্শন লইয়াছেন, তখন শিশির-কুমার বলিয়াছিলেন, "তুমি গণিত লও নাই কেন? গণিত শিক্ষা না করিলে প্রকৃত শিক্ষালাভ হয় না। তুমি যাহা কিছু বলিবে, তাহা ভাল ইংরেজীতে বল কিম্বা মন্দ ইংরেজীতে বল, তাহা কেহই লক্ষ্য করিবে না; কিন্তু যাহা কিছু বলিবে, তাহা সারগর্ভ হওয়া আবশ্যক। এই সারগর্ভ কথা বলিতে হইলে গণিত শিক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন।" বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কোন কোন বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য শিশির ও বসন্ত সময়ে সময়ে গৃহে যন্ত্রাদিও নির্ম্মাণ করিয়া লইতেন। বসন্তকুমার স্বহস্তে একবার একটি বয়ন-যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে বয়নকার্য্য বড় সন্তোষজনক হইত না। অকৃতকার্য্য হইলেও, তাঁহার এই উদ্যমের জন্য তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

দেশের উন্নতির সংগে সংগে বসন্ত, হেমন্ত ও শিশিরের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি ছিল। নানা প্রলোভন ও পাপের আবাস-ভূমি এই সংসারে মানব যত দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিবে, ততই তাহাদিগকে দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে, এই ধারণা তাঁহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। বসন্তকুমার বলিতেন যে, যত শীঘ্র এ জগত হইতে চলিয়া যাওয়া যায় ততই মঙ্গল; কারণ তাহাতে পাপ ও প্রলোভনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারা যায়। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া শিশিরকুমারের পঞ্চম সহোদর হীরালাল আত্মহত্যা করিয়া-ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "জীবিত থাকিয়া দেশের কোনও কার্য্য করিতে পারিব না, অথচ প্রত্যহই পাপের পথে অগ্রসর হইব, ইহা অপেক্ষা সংসার হইতে শীঘ্রই অপসৃত হওয়া ভাল।" জীবনের মধ্যাহ্নে শিশিরকুমার কিন্তু এই মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন যে, ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত মানব দীর্ঘজীবন লাভ করিতে

পারে না। দীর্ঘায়ু না হইলে মানব প্রাণ ভরিয়া ভগবানের পূজা করিবার অবসর পায় না। হীরালালের মৃত্যুতে তাঁহার ভ্রাতা ও ভগিনীগণ অন্তরে সে কি ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভাষায় তাহা বর্ণনা করা যায় না। বিশেষতঃ জননী অমৃতময়ী ও সহোদর মতিলাল পাগলের ন্যায় হইয়াছিলেন। মৃত্যুর একঘণ্টা পূর্ব্বে হীরালাল মতিলালকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করেন, "এ সংসারে জীবের উপায় কি হইবে?" মতিলাল তাঁহাকে সাধ্যমত বুঝাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। জননী ও মতিলালের ভাব লক্ষ্য করিয়া শিশিরকুমার তাঁহাদের হৃদয়ের যন্ত্রণা প্রশমিত করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন। তিনিও বলিতেন, "হীরালাল ব্যতীত জীবন-ধারণ অসম্ভব। ইচ্ছামত যদি হীরালালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারি, তাহা হইলে আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিব।" শিশিরকুমার দিবা রাত্রই চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে মৃত্যু প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মানবজীবনকে শান্তিহীন করিয়া তুলে, তাহাকে জয় করা কি সাধ্যাতীত? শিশির-কুমার এই কথা হৃদয় মধ্যে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। শেষে যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, প্রেতাত্মাবাদ (spiritualism) আলোচনা দ্বারা মৃত্যুকে জয় করা যাইতে পারে, তখন তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। প্রেতাত্মবাদ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য শিশির আমেরিকা যাত্রা করিবেন কৃতসংকল্প হইয়া বাড়ী হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে আমেরিকায় গমন করিতে হয় নাই। কলিকাতায় তখন স্বনামধন্য পুরুষ প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় একজন আধ্যাত্মবাদী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। শিশিরকুমার তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক স্বীয় ভ্রাতা ও ভগিণীদের সহিত প্রেতাত্মবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। চক্র করিয়া বসিলে অধিকাংশ সময় হেমন্তকুমারের ও মতিবাবুর শরীরে মিডিয়মের প্রভাব লক্ষিত হইত।

প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের প্রেতাত্মবাদ প্রচারে বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। শিশিরকুমার ও তাঁহার সহোদরগণ এদেশে প্রেতাত্মবাদ প্রচারে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। শিশিরকুমার শেষ জীবনে হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন (Hindu Spiritual Magazine) নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। আমরা যথাস্থানে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

হৃদয়বান পুরুষেরাই একান্ত মনে দেশের মঙ্গল চিন্তা করিতে সমর্থ হন। শিশিরকুমারের হৃদয় অতি প্রশস্ত ছিল; তিনি কিরূপভাবে দেশের মঙ্গল চিন্তা করিতেন, তাহা তাঁহার প্রথম যৌবনের নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে পাঠকবর্গ সুন্দররূপে বুঝিতে পারিবেন। শিশিরকুমার একদিন দেখিলেন যে, একটী লোককে সর্প দংশন করিয়াছে। লোকটির আত্মীয় স্বজনগণ তাহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছে। সর্পদষ্ট ব্যক্তি স্বীয় জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া অন্তরে যে ভীষণ যন্ত্রনা অনুভব করিতেছিল তাহা তাহার বদনে প্রতিভাত হইয়াছে। বহু চেষ্টায় তাহার জীবন রক্ষা হইল না, আত্মীয় স্বজনগণের সম্মুখে তাহার জীবনদ্বীপ নির্ব্বাণ হইল; সঙ্গে সঙ্গে বিলাপধ্বনি আকাশ বিদীর্ণ করিল। এই শোচনীয় দৃশ্য দর্শন করিয়া শিশিরকুমারের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। সর্পদংশনে দেশের কত লোক প্রতিবৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অথচ তাহার কোনও প্রতিকার নাই, এই চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। কি উপায়ে সর্পদষ্ট ব্যক্তি মৃত্যু মুখে হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে, শিশির সেই চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন, মানবজাতিকে সৃজন করিয়া যিনি পালন করিতেছেন, তিনি কখন নিষ্ঠুর হইতে পারেন না, শিশিরকুমারের মনে বাল্য হইতে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল। যিনি যন্ত্রণার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি যে তাহার উপশমের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগবান যেদেশে বিষধর সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই দেশে সর্পাঘাতের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায়ও করিয়া রাখিয়াছেন,

শিশিরের মনে এ বিশ্বাস ছিল। তিনি একজন মালবৈদ্যকে মাসিক বেতন দিয়া নিজের বাড়ীতে রাখিয়া সর্পদংশনের চিকিংসা শিক্ষা করিয়াছিলেন। শেষে মধ্য বয়সে তিনি সর্পদংশন ও তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহার সেই গ্রন্থখানি ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। যে বিষয়েই শিশিরকুমার হস্তক্ষেপ করিতেন, তিনি তাহার চূড়ান্ত না করিয়া ছাড়িতেন না। গ্রন্থখানি লিখিবার সময় তিনি সর্প সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ই বিশেষ মনোযোগের সহিত আলোচনা করিতেন। বিভিন্ন জাতীয় সর্প ও তাহাদের প্রকৃতি লক্ষ্য করিবার জন্য তিনি একবার তাঁহার জীবন কিরূপ বিপদাপন্ন করিয়াছিলেন তাহা আমরা পাঠকবর্গকে অবগত করাইব।

১৮৭১ সালের ভীষণ বন্যার পর শিশিরকুমার বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত গোপালনগরের পুলিশ সাব্ইন্স্পেক্টর ও কয়েকজন মালবৈদ্যের সহিত চৈতালের জলাভূমিতে সর্প দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। শিশির কুমারের ইংরেজী গ্রন্থ হইতে আমরা চিত্রটীর বঙ্গানুবাদ লিপিবদ্ধ করিলাম। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায়, আমরা সেই চিত্রটী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত না করিয়া তাহার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিলাম।

"জলাভূমি অতিক্রম করিতে করিতে আমরা কতকগুলি খর্জ্জুর-বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইলাম। দূর হইতে যে দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলাম, তাহা আজীবন হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে। সঙ্গীয় মালবৈদ্যগণ সর্প ধরিবার জন্য নৌকাখানি খর্জ্জুর বৃক্ষগুলির অতি নিকটে লইয়া গেল।

অসংখ্য সর্প বৃক্ষগুলির ডালে আশ্রয় গ্রহণ করায় তাহাদের পত্র গুলি একরূপ অদৃশ্য হইয়াছিল। একজন মালবৈদ্য বৃক্ষের একটি ডাল ধরিয়া টানিবামাত্র সহস্র সহস্র সর্প জলে পতিত হইয়া আশ্রয় লইবার জন্য নৌকার চারিধারে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। মালবৈদ্যরা গাছের ডাল ধরিয়া যতই টানিতে লাগিল, নৌকাখানি ততই

খর্জ্জুরবৃক্ষের ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষের ডালগুলি হইতে সর্প নৌকায় আসিবার উপক্রম করিল। অসংখ্য সর্প যখন খর্জ্জুরবৃক্ষের ডাল এবং জল হইতে আমাদের নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিল, তখন আমাদের মনে যে কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, সকলেই তাহা অনুমান করিতে পারেন। সর্পগুলির অধিকাংশই কেউটে জাতীয়। মাছের ঝাঁকের ন্যায় অসংখ্য বিষধর আমাদের ক্ষুদ্র নৌকাখানির চারিদিকে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল, আর আমরা এক-একখণ্ড বংশদণ্ড লইয়া জলে আঘাত করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইতে লাগিলাম।*** আমরা শেষে একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইলাম। বৃক্ষটীকে যেন সর্পের চন্দ্রাতপ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বিভিন্ন জাতীয় ও বিভিন্ন বর্ণের সর্পে বৃক্ষের সে অতুলনীয় শোভা সম্পাদন করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। প্রকাণ্ড বটবৃক্ষটীর কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখায় বোধ হয় লক্ষাধিক সর্প আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।”

শিশিরকুমার পরদিনই জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, বিভাগের কমিশনার ও বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর, প্রত্যেকেরই নিকট এই মর্ম্মে এক একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট চৈতালের জলভূমিতে অতি অল্প ব্যয়ে লক্ষ লক্ষ সর্প বিনষ্ট করিতে পারেন ; এবং এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ তৎপর হওয়াও কর্ত্তব্য। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট তলব করিলেন ; ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব রিপোর্ট দাখিল করিলে গভর্ণমেণ্ট সর্প গুলিকে বিনষ্ট করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু এই সকল পত্র ও রিপোর্ট আদান প্রদানে কয়েক দিবস অতিবাহিত হইলে ; ইতিমধ্যে বন্যার জল কমিয়া যাওয়ায় সর্পগুলিও নির্ব্বিবাদে গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিল।

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

বসন্ত, হেমন্ত ও শিশিরকুমারের কার্য্যক্ষেত্রের সীমা এতদিন তাঁহাদের জন্মভূমি মাগুরা ও তৎপার্শ্ববর্তী পল্লীর মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্রও ক্রমশঃই প্রসারিত হইতে লাগিল। স্বার্থকে পদদলিত করিয়া যাঁহারা সমাজের মঙ্গলজনক কার্য্যে আপনাদিগকে নিয়োগ করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত জননায়ক বলিয়া দেশবাসীর আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হ'ন। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে যশোহরের নীলকরদিগের অত্যাচার যখন চরম সীমায় উপনীত হয়, তখন উৎপীড়িত প্রজাগণ যুবক শিশিরকুমারের প্ররোচনায় দলবদ্ধ হইয়া নীলের চাষ বন্ধ করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। বসন্ত ও হেমন্তকুমার শিশিরকুমারের সহিত মিলিত হইয়া প্রজাবর্গের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

দুর্দ্দান্ত নীলকরগণ নিরীহ প্রজাদিগের উপর কিরূপ অত্যাচার করিত, এখানে তাহার কতকটি আভাস প্রদত্ত হইল। নীলকর সাহেবগণ নীল উৎপাদনের জন্য সাধারণতঃ দুইটি প্রণালী অবলম্বন করিত। প্রথম—নিজ তত্ত্বাবধানে ভৃত্যাদিগের দ্বারা নিজের জমিতে, এবং দ্বিতীয়—দাদন দিয়া রাইয়তদিগের দ্বারা তাহাদিগের জমিতে নীল উৎপাদন করা হইত। রাইয়তরা নীলের চাষ করিবে বলিয়া, নীলকরগণ রাইয়তদিগকে অগ্রিম কিছু কিছু টাকা দিত, ইহাকে দাদন বলা হয়। এই দাদন গ্রহণের সময় কৃষকদিগকে নীলকর সাহেবদিগের নিকট এই মর্ম্মে একখানি অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া দিতে হইত যে, —আমি এত পরিমাণ জমিতে নীল উৎপাদনের জন্য এত টাকা অগ্রিম লইতেছি, দুরভিসন্ধি পূর্ব্বক যদি নীলের চাষ না করি, তাহা হইলে আপনার ক্ষতি হইবে, তাহা আমি ও আমার উত্তরাধিকারিগণ পূরণ করিতে বাধ্য থাকিব। অনেক স্থলে এক বৎসর হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত এই অঙ্গীকার পালনের নিয়ম থাকিত। কৃষকগণ প্রতি বিঘায়

দুই টাকা হিসাবে দাদন পাইত এবং তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা ভূমিই নীলকরগণ কর্ত্তৃক নীল উৎপাদনের জন্য নির্দ্ধারিত হইত। অঙ্গীকার-পত্রে যে পরিমাণ দাদনের টাকার উল্লেখ করা হইত, কৃষকগণ তাহা সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হইত না। যাহা পাইত, তাহার কতক অংশ নীলকুঠীর কর্ম্মচারিগণ গ্রাস করিত। সাধারণতঃ ধর্ম্মজ্ঞানহীন লোকেরাই নীলকর সাহেবদিগের অধীনে কার্য্য করিত। প্রভুর সন্তোষ বিধান ও স্বীয় স্বার্থ সাধনের জন্য তাহারা কোন গর্হিত কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইত না। প্রায়ই অঙ্গীকার-পত্রে লিখিত পরিমাণ নীল জমিতে উৎপন্ন হইত না, তাহার উপর কৃষকগণ সমুচিত মূল্য কখনই পাইত না ; সুতরাং দাদনের দায় হইতে তাহারা কখনও মুক্তি লাভ করিতে পারিত না। যে কৃষক একবার মাত্র দাদনরূপ জালে পতিত হইত, তাহার কষ্টের সীমা থাকিত না ; তিন চারি পুরুষ পর্য্যন্ত ঐ দাদন পরিশোধ হইত না (১)।

যাহারা নীলের চাষ করিতে অসম্মত হইত, তাহাদের জাতি, কুল, মান, ধন ও প্রাণ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। অত্যাচারের ভয়ে কৃষকগণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাদন লইতে বাধ্য হইত (২)। নদীয়া ও যশোহর জেলায় নীলকর দিগের অত্যাচারের মাত্রা অন্যান্য জেলা

---

(১) তৎকালীন লীগ্যাল রীমেম্ব্র্যান্সার মিষ্টার এফ. এল, বুফোর্ট (Mr. F. L. Beaufort) ইণ্ডিগো কমিশনের সমক্ষে বলিয়াছিলেন,—"In practice, I believe, that these contracts are supposed to descend from father to son, but of course such an idea would not be allowed in court. Practically I have no doubt the planter holds such inheritence of liability in terrorem over the ryot."

(২) লর্ড মেকলে তাঁহার ১৮৩৫ খৃঃ অব্দের মন্তব্যে লিখিয়াছেন,—"But it is said, these contracts are not freely made. Force and deception are employed. The peasant assents to disadvantageous terms for fear of bludgeon man, or is tricked into signing some paper which he does not understand."

অপেক্ষা অতিরিক্ত ছিল। নীল উৎপাদন উপলক্ষ্যে নরহত্যা, গোহত্যা, গৃহদাহ, সতীর সতীত্ব নাশ প্রভৃতি কত পাপকার্য্যই সে সম্পাদিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রতিকারের আশায় রাইয়তগণ বিচারালয়ে উপস্থিত হইত বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল প্রাপ্ত হইত না। কারণ, তদানীন্তন ইংরেজ রাজপুরুষেরা নীলকরদিগের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন ; এবং সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে ভয়ও করিতেন।*

১৮৫৮ খৃঃ অঃ শিশিরকুমারের প্ররোচনায় যশোহরের কৃষকগণ নীলচাষ বন্ধ করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে। তাহাদের একতা ও দৃঢ়তা লক্ষ্য করিয়া শিশিরকুমারের নয়নে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইয়াছিল। বসন্ত ও হেমন্ত এই সময়ে মাগুরায় ছিলেন। দাদাও মেজদাদাকে এই আনন্দের সংবাদ প্রদানের জন্য শিশির স্বয়ং যশোহর হইতে মাগুরায় গমন করিলেন। পথিমধ্যে বিশ্রাম নাই, শিশির দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "দাদা, বড় সুসংবাদ! এতদিনে কৃষকগণের চৈতন্য হইয়াছে। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, জীবন থাকিতে আর নীল বপন করিবে না।" শিশিরকুমারের মুখে সকল কথা অবগত হইয়া বসন্তকুমারের প্রাণ আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি

---

*ইণ্ডিগো কমিশনে সাক্ষ্য প্রদানের সময় সার্ এস্‌লি ইডেন বলিয়াছিলেন,—"There certainly was failure of justice, which in my opinion, may, to a great extent, be attributed to the strong bias, which, the governor and many of the officers of the Government hare always displayed in favour of these engaged in this particular cultivation. *** I consider that it has frequently been the case that the Government officials have sacrificed justice to favour the planters. I will go further and say that, as a young Assistant, I confess, I have favoured my own country men in several instances."

আবেগভরে শিশিরকে বক্ষে ধারণ করিলেন, কয়েক বিন্দু আনন্দাশ্রু তাঁহার নয়ন হইতে ঝরিয়া পড়িল।

অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক যুবক শিশিরকুমার এইরূপে জ্যেষ্ঠ ও মধ্যমাগ্রজের সহিত অশিক্ষিত কৃষকগণের নায়ক রূপে হৃদয়বিহীন নীলকর দিগের বিরুদ্ধে দণ্ডয়মান হইলেন। এই মহৎ কার্য্যে তাঁহাদের গ্রামের অনেকে নানারূপে তাঁহাদের সহায়তা করিয়াছিলেন।

কৃষকগণের দৃঢ়তা ও একতা লক্ষ্য করিয়া নীলকরদিগের রোষাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। নীলকর সাহেবদিগের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া তাহাদের কর্ম্মচারিগণ কৃষকদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইল। উৎপীড়নের মাত্রা যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কৃষকগণের একতার বন্ধন ততই দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে লাগিল। তাহারা প্রত্যেক বিষয়েই শিশিরকুমারের পরামর্শ মত কার্য্য করিত। যুবক শিশিরকুমার যশোহরের দলবদ্ধ কৃষকগণকে সঙ্গে লইয়া, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণপূর্ব্বক, নীলচাষের অনিষ্ঠকারিতা প্রদর্শন করিয়া সকলকেই নীলের চাষ বন্ধ করিতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। নীলকরদিগের অত্যাচারের হস্ত হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্যই যেন শিশিরকুমার ভগবান্ কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন, এই মনে করিয়া কৃষকগণ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। তাহারা তাঁহাকে সিদ্ধ পুরুষ মনে করিয়া "সিন্নিবাবু" নামে অভিহিত করিয়াছিল। শিশিরকুমারের কথায় তাহারা প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হইত না। যশোহর ব্যতীত নদীয়া, রাজসাহী, পাবনা প্রভৃতি জেলাতেও নীলকরদিগের প্রাদুর্ভাব ছিল। তথাকার উৎপীড়িত কৃষকমণ্ডলী শিশিরকুমারকে চক্ষে না দেখিলেও, তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত, এবং তাঁহারই প্রদর্শিত পন্থাবলম্বনে নীলকরদিগের অত্যাচারের হস্ত হইতে পরিত্রান লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। নীলকর সাহেবরা যখন ধর্ম্মজ্ঞানহীন, পশু প্রকৃতি কর্ম্মচারিগণের সহায়তায় লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া রাইয়তগণের

যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবার চেষ্টা করিত, রাইয়তগণ তখন প্রাণের মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বার্থরক্ষার জন্য লাঠিয়ালগণের সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইত। লাঠিয়ালগণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য কৃষকগণ এক অপূর্ব্ব কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিল। প্রত্যেক পল্লীর প্রান্তে তাহারা এক একটি করিয়া দুন্দুভি রাখিয়াছিল। যখন লাঠিয়ালগণ গ্রাম আক্রমণ করিবার উপক্রম করিত, কৃষকগণ তখন দুন্দুভি ধ্বনি দ্বারা পরবর্ত্তী গ্রামের রাইয়তগণকে বিপদসংবাদ জ্ঞাপন করিলে তাহারা আসিয়া দলবদ্ধ হইত। এইরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চারিখানি গ্রামের লোক একত্র হইয়া নীলকর সাহেবদিগের লাঠিয়ালগণের সহিত তুমুল সংগ্রামে ব্যাপৃত হইত।

অপমানিত নীলকরগণ আদালতে কৃষকগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ণ করিলে, কৃষকগণ সহাস্য বদনে কারাগারে গমন করিত। তাহারা ভাবিত যে, তাহাদের এই কারাবাসের ফলেই দেশ হইতে নীলকরদিগের অত্যাচার দূরীভূত হইবে। যশোহরের আইন ব্যবসায়িগণ নীলকরদিগের অত্যাচারের ভয়ে কৃষকগণের পক্ষাবলম্বন করিতে সাহাস করিতেন না। কলিকাতা হইতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্যগণ মধ্যে মধ্যে দুই একজন মোক্তার উৎপীড়িত কৃষকগণের পক্ষাবলম্বনের জন্য প্রেরণ করিয়া মহৎ উপকার করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার সর্ব্বদাই কৃষকগণের সহিত অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে সৎপরামর্শ প্রদান করিতেন। যাহাতে তাহারা কোনও আইন বিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত না হয়, তৎপ্রতি তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। এই সময়ে স্বনামধন্য স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়, হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রে জ্বলন্ত ভাষায় নীলকরদিগের অত্যাচারের প্রকৃত চিত্র অঙ্কিত করিয়া মাননীয় গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্ব্বক যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। শিশিরকুমারও এই সময় স্বীয় নাম অপ্রকাশ রাখিয়া উক্তপত্রে নীলকরদিগের অত্যাচার সম্বন্ধে কতকগুলি পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রগুলি M. L. L. স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া

প্রকাশিত হইত। শিশিরকুমারের আর একটি নাম—ছিল মন্মথলাল ঘোষ। তিনি পত্রগুলি লিখিয়া তাহার নিম্নে M. L. G. স্বাক্ষর করিতেন, কিন্তু মুদ্রাকর প্রমাদবশতঃ M. L. G. স্থলে M. L. L. প্রকাশিত হইত। হরিশ্চন্দ্র যুবক শিশিরকুমারের লিপিচাতুর্য্য লক্ষ্য করিয়া শতমুখে তাঁহারা প্রশংসা করিতেন ও সর্ব্বদা তাঁহাকে উৎসাহ দিতেন। শিশিরকুমারের কার্য্যকলাপ দেখিয়া নীলকরগণ বিস্মিত হইয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে গভর্ণমেণ্টের নিকট একজন দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কোনও উপায়ে যুবককে কারাগারে প্রেরণ করিতে পারিলে, কৃষকগণ হানবল হইয়া পড়িবে এই ভাবিয়া নীলকরকগণ তাঁহাকে আদালতে অভিযুক্ত করিবারও বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক যুবকের কথায় সে সহস্র সহস্র কৃষক এক মন, এক প্রাণ হইয়া নীলের চাষ বন্ধ করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে ; গভর্ণমেণ্ট তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। যখন প্রকাশ পাইল যে হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রে M. L. L. স্বাক্ষরিত পত্রগুলি শিশিরকুমারের লেখনী প্রসূত, তখন তাঁহার যশঃ সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। তাঁহার ন্যায় অল্প বয়স্ক যুবকের লেখনী হইতে যে এরূপ সারগর্ভ ও সদ্‌যুক্তিপূর্ণ লিপি নিঃসৃত হইয়াছে, ইহা গভর্ণমেণ্টও প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কলিকাতাবাসী অনেকে নীলকরদিগের অত্যাচারের জন্য কৃষকদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও দূর হইতে তাহাদের বিশেষ কোনও উপকার করিতে পারিতেন না। শিশিরকুমার কৃষকদিগের সহিত সর্ব্বদা একত্র অবস্থান করিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আলোচনা করিয়া সংবাদ পত্রে পত্র লিখিতেন বলিয়া, সেগুলি শিক্ষিত সমাজে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল। শিশিরকুমারকে দমন করিবার জন্য নীলকরগণ সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পাঠক এইখানেই বলিয়া

রাখি, হরিশ্চন্দ্র, শিশিরকুমার প্রভৃতি এদেশ বাসিগণের ন্যায় মিষ্টার লঙ্, সার এস্‌লি ইডেন প্রভৃতি কয়েকজন ইংরেজও কৃষকদিগের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কার্য্যের বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। লঙ্ সাহেব "হরকরা" পত্রে প্রায়ই নীলকরদিগের অত্যাচারের বিষয় আলোচনা করিতেন। ইনি কবিবর দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের "নীলদর্পণ" নাটক ইংরেজীতে অনুবাদ করাইয়াছিলেন। কবিবর মাইকেল মধুসূদন সেই অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। লঙ্ সাহেবকে ইহার জন্য শেষে বিচারালয়ে দণ্ডিত হইতে হইয়াছিল। মহাভারতের অনুবাদক, মহানুভব কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় অর্থ দণ্ডের সমস্ত টাকাই প্রদান করিয়াছিলেন। তৎকালে ইণ্ডিয়ান ফিল্ড নামক একখানি সংবাদপত্র ছিল ; ইহাতেও নীলকরদিগের অত্যাচারের কথা আলোচিত হইত।

১৮৫৮ হইতে ১৮৬০ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত প্রজা ও নীলকরগণের মধ্যে বিবাদ চলিয়াছিল। ইহাতে প্রজাগণ একরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছিল। নীলচাষ না করিলেও, তাহারা সর্ব্বদাই হাঙ্গামায় ব্যাপৃত থাকায় আপন আপন জমিতে অন্য কোন শস্য উৎপাদনের অবকাশ পাইত না। শান্তিপ্রিয় রাইয়তগণ বাধ্য হইয়াই নীলকরদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। বঙ্গদেশের তৎকালীন শাসনকর্ত্তা সার্ জন্ পিটার গ্র্যাণ্ট্ একদিন কালী গঙ্গা নদীতে ষ্টীমার যোগে গমন করিতেছিলেন। উৎপীড়িত কৃষকগণ তাহা জানিতে পারিয়া, প্রতীকারের আশায় আপনাদিগের দুরবস্থার কথা লাট বাহাদুরের নিকট নিবেদন করিবার জন্য নদীর উভয় তীরে সমবেত হইল। লাট বাহাদুর প্রথমে ষ্টীমার থামাইতে সম্মত হন নাই ; কিন্তু কুম্ভীরপূর্ণ নদীতে যখন সহস্র সহস্র কৃষক ঝম্প প্রদান করিতে লাগিল, তখন আর তিনি স্থির থাকিতে পারেন নাই ; তিনি ষ্টিমার থামাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সার জন পিটারের প্রাণ রাইয়তগণের দুরবস্থায় বিগলিত হইয়াছিল। তাঁহারই আদেশে নীল কার্য্যের প্রচলিত

প্রণালীর তত্ত্বানুসন্ধান জন্য একটি অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত হইয়াছিল। মিষ্টার ডব্‌লিউ, এস, সিটনকর, মিষ্টার আর টেম্পেল, মিষ্টার ডব্‌লিউ এস, ফারগুসন, রেভারেণ্ড জে, সেল ও বাবু চন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় এই সমিতির সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, সভ্যগণের মধ্যে অধিকাংশই নীলকার্য্যের প্রণালীর বহুবিধ দোষ প্রদর্শন করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট একটি মন্তব্যলিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই মন্তব্যলিপিতে তাঁহারা নীলকরদিগের অত্যাচারের প্রতীকারের কয়েকটি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। ছোট লাট বাহাদুর সার জন পিটার গ্রাণ্ট ও বড় লাট বাহাদুর লর্ড ক্যানিং সদস্যগণের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া ইংলণ্ডে একটি রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছিলেন। নীলকরগণের অত্যাচারের বিবরণ অবগত হইয়া পার্লামেণ্টের সদস্যগণ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। কৃষকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও যে নালের চাষ করিতে বাধ্য হইত, তাহাও তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।* যাহা হউক, এই সময় হইতেই নীলকরদিগের অত্যাচার কমিয়াছিল।

নীলকর ও কৃষকদিগের বিবাদের সময় শিশিরকুমারকে বিপদগ্রস্ত করিবার জন্য নীলকর সাহেবগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারে নাই, পাঠকবর্গ তাহা অবগত আছেন। শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে নীলকরগণ পুণঃ পুণঃ রিপোর্ট করায়, তাঁহার গতিবিধি ও কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিবার জন্য, গভর্ণমেণ্ট প্রসন্নচন্দ্র রায় নামক একজন পুলিশ ইনস্পেক্টরকে আদেশ করেন। প্রসন্নচন্দ্র একদিন শিশিরকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি ভাই, তোমার বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্টের নিকট একটি রিপোর্ট প্রেরণ করিব;

---

*পার্লামেণ্টের মেম্বার মিষ্টার জে, লেয়ার্ড (Mr. J. layard) বলিয়াছিলেন, —"He read their report from beginning to end and he must say had risen from its persual with a feeling of shame and indignation which he could find no words to express."

কিন্তু তাহাতে তোমার কোনও অনিষ্ট হইবে না।" কয়েক দিবস পরে তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট এই মর্ম্মে একটি রিপোর্ট প্রেরণ করিলেন যে, শিশিরকুমারই রাইয়তগণকে নীলের চাষ বন্ধ করিতে পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন। তখন মিষ্টার মলোনী (Mr. Moloney) যশোহরের ম্যাজিস্ট্রেট ও মিষ্টার স্কিনার (Mr. Skinner) তাঁহার সহযোগী ছিলেন। নীলকরদিগের বিশেষ অনুরোধে তাঁহারা শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আরম্ভ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের আদেশ প্রার্থনা করিলে, গভর্ণমেণ্ট এই উত্তর দিয়াছিলেন যে, শিশিরকুমারকে আইন অনুসারে অভিযুক্ত করিবার কোন কারণই দেখা যায় না। কারন, তিনি রাইয়তগণকে কোন আইন বিগর্হিত কার্য্য করিতে পরামর্শ প্রদান করেন নাই।

প্রাতঃস্মরণীয় দেব প্রকৃতি ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম পাঠক বর্গের নিকট অপরিচিত নহে। শিক্ষা-বিভাগে-কার্য্যকালে শিশিরকুমারের সহিত হঠাৎ তাঁহার একদিন সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ভূদেব বাবু স্বয়ং একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি শিশিরকুমারের সহিত আলাপ করিয়াই তাঁহার প্রতিভা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিশিরকুমারের ন্যায় ধীশক্তিসম্পন্ন যুবককে একজন পরিদর্শক নিযুক্ত করিতে পারিলে শিক্ষা বিভাগের অনেক উন্নতি হইতে পারে, এই চিন্তা ভূদেববাবুর হৃদয়ে উদয়

১৮৬১ খ্রীঃ অঃ সার চার্লস উড্ (ইনি পরে লর্ড হ্যালিফক্স নামে পরিচিত হন) বড়লাট বাহাদুরকে লিখিয়াছিলেন,—"I entirely concur with the commissioners, with L. G of Bengal, and with your lordship that the evidence taken before the commission including that of the planter himself is conclusive as to the fact that the cultivation was unprofitable to the ryot who was required to furnish the plant at a price which with the extra charge to which he was subjected did not reimburse him for the cost of production."

হইয়াছিল। কিন্তু শিশিরকুমারের নিকট তিনি তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করেন নাই। উভয়ের এই সাক্ষাতের কয়েক দিবস পরে, একদিন জনৈক পত্র বাহক শিশিরকুমারের নিকট একখানি পত্র লইয়া উপস্থিত হয়। পত্র উন্মোচন করিয়া শিশিরকুমার দেখিলেন যে, ভূদেববাবু তাঁহাকে মাসিক পচাঁত্তর টাকা বেতনে শিক্ষাবিভাগের একজন পরিদর্শক নিযুক্ত করিতে মনন করিয়া, তাঁহার অভিমত জানিতে চাহিয়াছেন। ভূদেববাবু শিশিরকুমারের ঠিকানা জানিতেন না। সেজন্য তিনি চুঁচুড়া হইতে লোক মারফত যশোহরে পত্র পাঠাইয়াছিলেন। পত্রবাহক অনেক অনুসন্ধান করিয়া শিশিরকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। বিনা চেষ্টায় যখন পচাঁত্তর টাকা বেতনের একটি চাকরী জুটিল, তখন তাহা ভগবানের প্রেরিত মনে করিয়া শিশিরকুমার চাকুরী গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর বসন্তকুমারও ঠিক এই সময়ে শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর মহোদয় কর্তৃক মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে বাঁকুড়া স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি দীর্ঘকাল এই কার্য্য করিতে সমর্থ হন নাই; এক বৎসরের মধ্যেই তিনি কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শিশিরকুমার যখন শিক্ষা-বিভাগে পরিদর্শকের কার্য্যে নিযুক্ত হন, তখন মিষ্টার জেনস্ মন্‌রো (Mr. James Munro) যশোহর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। তাঁহার সহযোগী ছিলেন মিষ্টার জেম্‌স ওকিনিলী। ইনি পরে মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় "আমার জীবন" নামক গ্রন্থে মিষ্টার মন্‌রো ও মিষ্টার ওকিনিলী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন— "যেমন ম্যাজিষ্ট্রেট্ তেমনই জইণ্ট—সোনায় সোহাগার যোগ, অনলের সহায় পবণ। ম্যাজিষ্ট্রেট্ যাঁহাকে ধরিতে বলেন, জইণ্ট তাঁহাকে খুন করেন। যুদ্ধরত গজকচ্ছপের পরাক্রম বিশ্বচরাচর সহিতে পারে নাই। এই সম্মিলিত গজকচ্ছপের শক্তি একটা জেলা কিরূপে

সহিবে ? এই যুগল রূপের একান্ত হরিহরের শাসনে ও অত্যাচারে যশোহর টলটলায়মান। ভদ্রলোক পর্য্যন্ত অস্থির।" কিন্তু এহেন সাহেবদ্বয়কে শিশিরকুমার মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার গুণে ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও জইণ্ট তাঁহার প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, অনেক সময় তাঁহারা শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে শিশিরকুমারের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ১৮৭৯ খৃঃ অঃ ভীষণ বাতাবর্ত্ত ও জল প্লাবণে দক্ষিণ-বঙ্গের নানা স্থানের ন্যায় যশোহরেরও বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল। কি উপায় অবলম্বন করিলে রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার হয়, বন্যা-প্রপীড়িত যশোহর বাসিগণের কষ্টের অবসান হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য মিষ্টার মন্‌রো সর্ব্বদাই শিশিরকুমারের সহিত পরামর্শ করিতেন। এই জল প্লাবনে কত লোক স্ত্রীপুত্রহীন গৃহশূণ্য হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত সংখ্যা নির্ণীত হয় নাই। গভর্ণমেণ্টের বেতনভোগী কর্ম্মচারিগণ যেভাবে কার্য্য করিতেন, শিশিরকুমার বিনা বেতনে তদপেক্ষা অধিক আগ্রহ ও যত্নের সহিত স্বীয় জেলার উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিতেন। এইজন্যই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও তাঁহার সহযোগী সকল বিষয়েই তাঁহার মতামত গ্রহণ করিতেন। পাছে মিষ্টার মন্‌রো ও মিষ্টার ওকিনিলীর কোনরূপ নিন্দা হয়, এই আশঙ্কায় শিশিরকুমার যখনই তাঁহাদের সহিত কোন কার্য্যে লিপ্ত হইতেন, তখনই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতেন; এবং কার্য্যটী যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। শিশিরকুমারের যত্নে বন্যা-প্রপীড়িত বহু নরনারী সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার সকল কার্য্যেই একটা বিশেষত্ব লক্ষিত হইত। এই ঝড়ের পর নবীনচন্দ্রের সহিত শিশিরকুমারের সাক্ষাৎ হইলে, নবীনচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ঝড়ের সময় আপনি কোথায় ছিলেন ?" প্রত্যুত্তরে শিশিরকুমার বলিয়াছিলেন, "মাঠে শুইয়া ছিলাম।" নবীনচন্দ্র শুনিয়া অবাক্। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই খেয়াল কেন হইল ?" শিশিরকুমার একটু হাসিয়া বলিলেন, "ঝড়ের বেগ (velccity) মাপ করিতেছিলাম।"

শিশিরকুমারের ন্যায় বুদ্ধিমান, বিবেচক ও কর্ম্মঠ যুবককে জেলার কোনও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত করিতে পারিলে সর্ব্বদাই তাঁহার পরামর্শ পাওয়া যাইতে পারে, এই ভাবিয়া মিষ্টার মন্‌রো তাঁহার জন্য একটি কার্য্য অন্বেষন করিতেছিলেন। হঠাৎ এই সময়ে ইন্‌কম্‌-ট্যাক্স বিভাগে দুইটি ডেপুটী কলেক্টরের পদ শূন্য হয়। মন্‌রো শিশিরকুমারের একটী ও তাঁহার মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমারকে অন্যটী গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলে, দুই সহোদর ইন্‌কম্‌ ট্যাক্স ডেপুটী কলেক্টরের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নিয়তির বিধান লঙ্ঘন করা মানবের অসাধ্য। সহোদর হীরালালের বিয়োগজনিত নিদারুণ যন্ত্রণা সম্পূর্ণ প্রশমিত হইতে না হইতে শিশিরকুমার ও তাঁহার ভ্রাতা-ভগিনীগণের হৃদয়াকাশ পুনরায় কাল-মেঘাবৃত হইয়াছিল। এই সময় তাঁহাদের জ্যেষ্ঠাগ্রজ বসন্তকুমার তাঁহাদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অমরধামে চলিয়া যান। বাল্যকাল হইতেই বসন্তকুমারের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না; তিনি দুরারোগ্য শ্বাসরোগে ভুগিতেছিলেন একথা পাঠকবর্গ অবগত আছেন। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি শিশিরকুমারের সহিত মনোনিবেশ পূর্ব্বক কথা কহিতে কহিতে কাসির সঙ্গে রক্তকাস ফেলিলেন। পাছে শিশিরকুমার দেখিতে পান, সেজন্য কাস ফেলিয়াই বসন্ত তাহা পদদ্বারা আবৃত করিলেন। শিশিরের মনে সন্দেহ হওয়ায়, তিনি দাদার পা ধরিয়া বলিলেন, "তুমি পা সরাও, আমি কাস দেখিব।" বসন্ত পা সরাইতে সম্মত হইলেন না। শিশিরকুমার সমস্তই বুঝিতে পারিলেন; তাঁহার শরীর কেন অবসন্ন হইয়া পড়িল বসন্তকুমার শিশিরকুমারকে তুলিয়া বলিলেন, "তুমি দেখ্‌বে কি? ও রক্ত।" শিশিরকুমারের চক্ষু ফাটিয়ে অশ্রু ছুটিতে লাগিল। যাঁহার পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া তিনি বাল্যে মানব-জীবনের কর্তব্য শিক্ষা করিয়াছেন, যাঁহার স্নেহ-প্রবণতায় সকল ভ্রাতা-ভগিনী মুগ্ধ ছিলেন, সেই স্নেহময় জ্যেষ্ঠাগ্রজ সকলকে

চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিবেন, এই চিন্তায় শিশিরকুমারের হৃদয় শান্তিহীন হইয়া উঠিল। যে ভীষণ যন্ত্রণা শিশিরকুমারেব অন্তস্তল দগ্ধ করিতেছিল, তাহা তাঁহার বদনে প্রতিভাত দেখিয়া বসন্তকুমার বলিয়াছিলেন, "আমি আগে আসিয়াছি, আগে যাবো। শিশির! আমার দেহের এত কষ্ট যে, আমার আর এজগৎ সহিতেছে না। আমাকে তুমি স্বচ্ছন্দে মনে অনুমতি কর। আমার নিজের কোন দুঃখ নাই, তবে আমি ভাবিয়া থাকি, আমার বিরহে তুমি বড় দুঃখ পাইবে।"* বসন্তকুমারের শরীর দিনদিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। মৃত্যুর দিন শিশিরকুমারের অঙ্কে মস্তক রক্ষা করিয়া শয়ন করিলেন, শিশিরের নয়ন-যুগল হইতে অবিরল অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। এমন সময় বসন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, "শিশির, ভাই, আমি চলিলাম। প্রকৃত মানুষ হইতে চেষ্টা কর। অকারণে মানসিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া আর আমার কষ্ট বৃদ্ধি করিও না, ভাই।" বসন্তকুমার নীরব হইলেন; সংগে সংগে ঘোষ পরিবারের মধ্যে করুণ-বিলাপ ধ্বনি উত্থিত হইল। বঙ্গগগণের একটী নক্ষত্র স্বীয় দীপ্তির পূর্ণ বিকাশের পূর্ব্বেই স্থানচ্যুত হইয়া পড়িল, এই জগতে, মানব-সমাজের অজ্ঞাতে, দূর অরণ্য মধ্যে কতশত দেবভোগ্য কুসুম নিভৃতে স্বীয় পরিমল বিতরণ করিয়া বৃন্তচ্যুত হইতেছে; আবার কতশত অর্দ্ধস্ফুট কলিকা সুগন্ধ বিলাইবার পূর্ব্বেই অকালে ঝরিয়া পড়িতেছে, কে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিবে? ভগবান বসন্তকুমারের হৃদয়ে যে সৎ প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া কর্ম্মভূমিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ উন্মেষ হইতে না হইতেই, দুরন্তকাল তাঁহাকে তাঁহার কর্ম্মজীবনের মধ্যাহ্নে হরণ করিয়া লইল। দেশের দুর্ভাগ্য, তাই বসন্তকুমার মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। দাদার লোকান্তর গমনে শিশিরকুমার যেন অকুল সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। যে জ্যেষ্ঠাগ্রজ দেশের ও সমাজের হিতকারিণী

---

* অমিয় নিমাই চরিত—২য় খণ্ড, উপসর্গ পত্র।

শক্তি তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে শিশিরকুমার কিয়ংকাল হীনবল হইয়া পড়িলেন। উত্তরকালে সংসারে বীরের ন্যায় কার্য্য করিলেও, প্রথম জীবনের সেই সাহসও সেই স্ফূর্ত্তি তিনি পুনঃপ্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার হৃদয়ে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনে নির্ব্বাপিত হয় নাই; রাবণের চিতার ন্যায় সে অগ্নি জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁহার অন্তস্তলে ধূমায়মান ছিল। শিশিরকুমার তাঁহার 'অমিয় নিমাই চরিতে'র দ্বিতীয় খণ্ড স্বর্গীয় জ্যোষ্ঠাগ্রজকে উৎসর্গ করিয়া লিখিয়াছিলেন,—"বহুদিন তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ হইয়াছে, কিন্তু সে বিরহ অগ্নি সমানই রহিয়াছে।" দাদাকে তিনি দেবতার অধিকভক্তি করিতেন। উক্ত উৎসর্গ পত্রেই তিনি লিখিয়াছেন,—"অদ্যাপি শ্রীভগবানের পূজা করিতে বসিয়া আমি প্রভুকে দেখিতে পাই না, সেস্থানে দাদাকে দেখি।" এরূপ ভ্রাতৃভক্তি জগতে দুর্লভ, অথবা কেবল রঘুরাজকুমারগণের জন্মভূমি ভারতবর্ষেই লক্ষিত হয়।

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে বসন্তকুমার সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কৃষিবিষয়ক একখানি পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা করেন। তিনি শিশিরকুমারকে আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে শিশির সর্ব্বপ্রথমে একটি মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনশত টাকা মাত্র সঙ্গে লইয়া তিনি এই উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিলেন। তিনশত টাকায় একটি প্রেস্ পাওয়া কতদূর সম্ভব, পাঠক তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। শিশিরকুমারকে কিন্তু উক্ত টাকার মধ্যেই প্রেস সংগ্রহ করিতে হইবে; সুতরাং তিনি কলিকাতার নানাস্থানে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বহু চেষ্টার পর একটি পুরাতন কাঠের প্রেস সংগৃহীত হইল। প্রেস চালাইতে হইলে প্রেস্ম্যান, কম্পোজিটর প্রভৃতি আবশ্যক; কিন্তু পল্লীগ্রামে এ সকল কার্য্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি তখন আদৌ পাওয়া যাইত না। শিশিরকুমার কলিকাতার একটি ছাপাখানায় প্রেস সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য শিক্ষা করিলেন এবং

প্রেসটি লইয়া স্বীয় গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কাকিনার বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্ররঞ্জন চৌধুরী বাহাদুরের পিতা স্বর্গীয় রাজা মহিমারঞ্জন চৌধুরী বাহাদুর সর্ব্বপ্রথমে প্রেস লইয়া গিয়াছিলেন তাঁহার পর শিশিরকুমার তাঁহাদের গ্রামে প্রেস লইয়া যান। তাঁহার গ্রামবাসিগণ দলে দলে ছাপাখানা দেখিতে আসিতে লাগিল। বসন্তকুমার এই প্রেস হইতে "অমৃত প্রবাহিনী" নামে একখানি পক্ষিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কৃষি সম্বন্ধীয় বিষয় আলোচিত হইত। নানা কারণে পত্রিকাখানির অস্তিত্ব অল্প দিনের মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়াছিল।

জ্যেষ্ঠ সহোদর বসন্তকুমারের মৃত্যুর পর প্রথম শোকাবেগ কিয়ং পরিমাণে প্রশমিত হইলে, শিশিরকুমারের হৃদয়ে পুনরায় সংবাদপত্র প্রকাশের ইচ্ছা জাগিয়া উঠিল। তিনি ও তাঁহার মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমার ইন্‌কম্‌ট্যাক্স ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিতে করিতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্টের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া তাঁহারা দেশের বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার অবকাশ পাইতেছেন না। উভয় সহোদর কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাদিগের গ্রামে একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করিবেন স্থির করিয়া, মিষ্টার মন্‌রো ও মিষ্টার ওকিনিলীর নিকট আপনাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। দেশের অভাব অভিযোগের সংগে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যেরও নানা সমালোচনা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, অনেক সময় রাজকর্ম্মচারিগণের দুর্ব্ব্যবহারের কথাও গভর্ণমেণ্টের গোচর করিবার জন্য সংবাদপত্রে তীব্র ভাবে আলোচিত হইয়া থাকে, এই সকল কথা জানিয়াও মিঃ মন্‌রো শিশিরকুমারের উদ্যম ও সদনুষ্ঠানে কোনও রূপ বাধা প্রদান করেন নাই। তিনি ও তাঁহার সহযোগী সংবাদ পরিচালনে শিশিরকুমারকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। আমরা এইখানেই বলিয়া রাখি, সংবাদপত্র পরিচালনের জন্য হেমন্তকুমার ও শিশিরকুমার ইন্‌কম্‌ট্যাক্স ডেপুটী কালেক্টরের

কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। চাকুরীগত প্রাণ বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য স্বার্থত্যাগের কার্য্য বলিতে হইবে।

পুরাতন প্রেসটা ঠিক করিয়া লইয়া ১৮৬৮ খ্রীঃ অঃ মার্চ মাস হইতে শিশিরকুমার একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বীয় গ্রামের নামানুসারে পত্রিকাখানির নাম হইল "অমৃত বাজার পত্রিকা।" হেমন্তকুমার সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু, যশোহর জিলাস্কুলের তৎকালীন দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র ও শিশিরকুমারের কনিষ্ঠ ভগিনী পতি বাবু কিশোরী-লাল সরকার পত্রিকার লেখক নির্বাচিত হইলেন। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক হইলেও মতিলাল ইহাদের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। কিশোরীবাবু কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বিচক্ষণ উকিল ছিলেন। যাঁহাদের যত্নে ও পরিশ্রমে অমৃতবাজার পত্রিকা আজ এতদূর উন্নত, কিশোরীলাল তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। শিশিরকুমার লেখক শ্রেণার অন্তর্ভুক্ত হইলেন না। কিন্তু পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তিনি যে প্রস্তাবনাটি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা তৎকালিক সুধীমণ্ডলী পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন! শিশিরকুমার ইংরেজীই লিখিতে পারেন, কিন্তু তিনি যে সুন্দর রূপে বাঙ্গালা লিখিতে পারেন, তাহা কেহ জানিতেন না। পত্রিকার বাৎসরিক মুল্য পাঁচ টাকা ও ডাক মাশুল তিন টাকা নির্দ্ধারিত হইল। যশোহর লোক মারফৎ কাগজ বিলি হইত, সুতরাং সেখানকার গ্রাহকগণকে ডাক মাশুলের তিন টাকা দিতে হইত না। আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি, বর্ত্তমানের তুলনায় তখন ছাপাখানার কার্য্য পরিচালনা যে কিরূপ দুঃসাধ্য ছিল, পাঠক তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। শিশির কুমারের জন্মভূমি অমৃতবাজার (পলুয়া-মাগুরা) হইতে কলিকাতা প্রায় সাতাত্তর মাইল দূরে অবস্থিত। তখন কলিকাতায় আসিবার পথও সুগম ছিল না। প্রেস সম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্য কলিকাতা হইতে সরবরাহ করিতে হইত। মধ্যে মধ্যে অসুবিধায় পতিত হইতেন

বলিয়া শিশিরকুমার স্বয়ং গৃহে ছাপার কালি প্রস্তুত করিয়া লইতেন। যশোহরে সকল সময় কাগজ পাওয়া যাইত না। কাগজের অভাব দূর করিবার নিমিত্ত তিনি স্বীয় গ্রামে পত্রিকার জন্য কাগজ প্রস্তুত করিতে মনন করিয়াছিলেন। তৎকালে পাণ্ডুয়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের মুসলমানগণ কাগজ প্রস্তুত করিতে জানিত। শিশিরকুমার তাহাদের নিকট হইতে কাগজ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিয়া পত্রিকার জন্য স্বহস্তে কাগজেও প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কাগজ ভাল হয় নাই।

এক সময় আমেরিকার কোন এক পল্লীর একটি ছাপাখানা হইতে "s" অক্ষরটি অপহৃত হইয়াছিল। এই চুরির সংবাদটি স্থানীয় সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল—

"We are thorry to thay, that our compothing room wath entered latht night by thome unknown thcoundrel, Who thtole every 'eth' in the ethtablithment, and thucceeded in making hith ethcape undetected. The motive of the mithcreant doubtleth wath revenge for thome thuppothed inthult."

"s" অক্ষরটির স্থলে "th" দিয়া প্রেসের কর্ত্তৃপক্ষগণ সংবাদটি প্রকাশ করিয়াছিলেন, পাঠকবর্গ তাহা বুঝিতে পারিলেন। শিশির কুমারের যদি কখনও কোন অক্ষরের অভাব হইত, তাহা হইলে তিনি কিরূপে সেই অভাব পূরণ করিতেন, আমরা তাহাও পাঠকবর্গকে অবগত করাইব। একবার একটি লোক প্রেসে কতকগুলি দাখিলা ছাপিতে দিয়াছিল। দাখিলার একস্থানে ।৶৹ আনা ছাপিতে হইবে, কিন্তু প্রেসের অক্ষরের সারের ভিতর ৶৹ এই অক্ষরটির অভাব দেখা গেল। শিশির এক অদ্ভুত উপায়ে দাখিলা ছাপা শেষ করিলেন। ৶৹ স্থলে "হ" এই অক্ষরটী বিপরীতভাবে বসাইয়া তাহার পৃষ্ঠে ইংরাজী পূর্ণচ্ছেদের চিহ্ন দিয়া ।৶৹ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। যখনই দেখা

যাইত যে, কোনও একটি অক্ষরের অভাব পড়িতেছে, তখনই তিনি লিখিত প্রবন্ধের যে অংশে সেই অক্ষরটি অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই অংশটি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন করিয়া লিখিয়া দিতেন। মধ্যে মধ্যে তিনি অন্য স্বাক্ষর স্বহস্তে কাটিয়া ছাঁটিয়া প্রয়োজনীয় অক্ষর প্রস্তুত করিয়াও লইলেন।

এইরূপে অমৃত বাজার পত্রিকা প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইহার জন্য শিশিরকুমারকে সকল কার্য্যই পরিদর্শন করিতে হইত। প্রেস্‌ম্যান অনুপস্থিত, শিশির তাহার কার্য্য চালাইয়া লইলেন, কম্পোজিটর অনুপস্থিত, শিশির তাহার কার্য্যে বসিয়া গেলেন। শিশির যেদিন কম্পোজিটরের কার্য্যে বসিতেন, সেদিন তিনি একই সময়ে কম্পোজিটর ও সম্পাদকের কার্য্য করিতেন। তিনি স্বতন্ত্র কাগজে পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ না লিখিয়া, মনে মনে প্রবন্ধ রচনা করিতে মুদ্রাক্ষর সাজাইবার যন্ত্রে অক্ষর বিন্যাস করিয়া যাইতেন। ইহাতে তাঁহার বড় ভুল হইত না। এরূপ ক্ষমতা কয়জনের মধ্যে লক্ষিত হয়, পাঠকগণই তাহার বিচার করিবেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিষ্টার মন্‌রো ও তাঁহার সহযোগী মিষ্টার ওকিনিলী সর্ব্বদাই শিশিরকুমারকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। গভর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপনগুলি পত্রিকায় প্রকাশ করিতে করিতে দিয়া মিষ্টার মন্‌রো শিশিরকুমারকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, মিষ্টার ওকিনিলী দশ কফি পত্রিকার গ্রাহক হইয়াছিলেন। চট্টগ্রামের তাৎকালিক ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিষ্টার জেড্ডেস্ (Mr. Geddes) একবার মন্‌রোর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যশোহরে আগমন করিয়াছিলেন। একদিন মন্‌রো, জেড্ডেস্ ও ওকিনিলী কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, এমন সময় শিশিরকুমার সেখানে উপস্থিত হইলেন। মন্‌রো শিশিরকুমারকে জেড্ডেসের সংগে পরিচিত করিয়া দিয়া বলিলেন, "জেড্ডস্, তোমাকে অমৃতবাজার পত্রিকার গ্রাহক হইতে হইবে" মিষ্টার জেড্ডেস্ সম্মত হইয়া স্বীয় জেলায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক পত্রিকার চাঁদা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে

অর্থাভাব বশতঃ পত্রিকার কার্য্য একবার বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু নলডাঙ্গার সহৃদয় রাজা ইন্দুভূষণ দেবরায় একশত টাকা সাহায্য দান করিয়া অমৃতবাজার পত্রিকাকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। রাজার এই সাহায্য পাইয়া শিশিরকুমার যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার আর্থিক অস্বচ্ছলতাও দূর হইতে লাগিল। বঙ্গদেশে এই সময় ইংলিশম্যান, হিন্দু প্যাট্রিয়ট, ইণ্ডিয়ান মিরর ও সোমপ্রকাশ এই চারিখানি সংবাদ পত্রেরই বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। প্রথমোক্ত পত্রিকাখানি ইংরাজদিগের ও শেষোক্ত তিনখানি বাঙ্গালীদিগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। বর্তমান সময়ে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার লাভ করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসমুদ্র হিমাচল আন্দোলন চলিতেছে, কিন্তু তখন এ চিন্তা তাৎকালিক রাজনীতিজ্ঞদিগের হৃদয়ে উদিত হয় নাই। বিধাতার অলক্ষণীয় বিধানে আমরা বিদেশীয় রাজার অধীন ; সুতরাং আমাদের শুভাশুভ সমস্তই রাজার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে, এই ভাবিয়া দেশবাসিগণ নীরব থাকিতেন। কোন কারণে রাজকর্মচারিগণের হস্তে নির্য্যাতন ভোগ করিলে তাহা সহ্য করা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। পূর্ব্বোক্ত সংবাদপত্রগুলি যে প্রণালীতে পরিচালিত হইত, শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকা পরিচালনে সে প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। কথা প্রসঙ্গে একদিন শিশিরকুমার বলিয়াছিলেন, "We are we and they are they." অর্থাৎ আমরা আমাদিগের সুখ স্বর্গের কথা ভাবিয়া থাকি, তাহারা তাহাদিগের সুখ স্বার্থের কথা ভাবিয়া থাকে। আমরা, অর্থাৎ ভারতবাসীরা, স্বদেশের মঙ্গল সাধনের জন্য যাহা করিতে চাই, বিদেশীয়গণের পক্ষে তাহা করা কখনও সম্ভব নয়, এই কথা সর্ব্বদাই শিশিরকুমারের হৃদয়ে জাগরূক হইত। অমৃতবাজার পত্রিকার যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই শিশির-কুমারের উক্ত চিন্তার আভাষ সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইত। পূর্ব্বেই

বলিয়াছি যে, মিষ্টার মন্‌রো ও মিষ্টার ওকিনিলী প্রথমে শিশিরকুমারকে নানা উপায়ে সাহায্য করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে তাঁহারা পত্রিকা পরিচালনের অভিনব পন্থা লক্ষ্য করিয়া বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন। সাহেবদিগের পক্ষে বিরক্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু শিশিরকুমারের স্বদেশবাসিগণও তাঁহার সহিত একমত হইতে পারেন নাই। ইংরাজরাজ যাহা দিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ অনুগ্রহ করিয়াই দিতেছেন, তাহাতে যে আমাদের বিধাতৃ-দত্ত অধিকার আছে, ইহা শিশির-কুমারের সমকালবর্ত্তিগণ ধারণা করিতে পারিতেন না। সেইজন্য স্বদেশ-প্রেমিক সাধু রামতনু লাহিড়ীর ন্যায় ব্যক্তিগণও অমৃতবাজার পত্রিকাকে রাজদ্রোহ প্রচার বলিয়া মনে করিতেন। দেশের দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞগণ অমৃতবাজার পত্রিকা পাঠ করিয়া হৃদয়ে পরম আনন্দ অনুভব করিতেন এবং শতমুখে সম্পাদকের প্রশংসা করিতেন; কিন্তু স্থূলদর্শী, দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তিগণ তাহা পাঠপূর্বক, প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণে অশক্ত হইয়া, পত্রিকার সম্পাদককে একজন অবিনীত, অজ্ঞ গ্রাম্য ব্যক্তি বলিয়া ঘৃণা ও উপহাস করিতেন।

জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার মন্‌রো ও তাঁহার সহযোগী মিষ্টার ওকিনিলী এবং শিশিরকুমার এতদিন যে সখ্যতা-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা এই সময়ে ছিন্ন হইয়াছিল। মন্‌রো ও ওকিনিলীর ন্যায় অন্তরঙ্গ সুহৃদগণ যে তাঁহার বিপক্ষ আচরণ করিবেন, একথা শিশিকুমার স্বপ্নে ভাবিতে পারেন নাই। অতি অল্প সময়ের মধ্যে অমৃতবাজার পত্রিকা দেশের মধ্যে একখানি অতি উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিল। পত্রিকা পাঠ করিবার জন্য দেশের সকল সম্প্রদায়ই উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতেন। গভর্ণমেণ্ট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অমৃতবাজার পত্রিকার প্রবন্ধগুলি পাঠ করিতেন এবং ইংরাজ সম্প্রদায় মধ্যে পত্রিকা ও শিশিরকুমারের কথা লইয়া আন্দোলন চলিত। তাঁহাদিগের মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, শিশির ও তাঁহার সহোদরগণ ভারতবর্ষে একটি ভীষণ বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত

করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। পত্রিকার ধ্বংসসাধনের জন্য উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারিগণ সুযোগের সন্ধান করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই সে সুযোগ উপস্থিত হইল।

পত্রিকার সপ্তদশ সংখ্যায় যশোহর জেলার কোন মহকুমার জনৈক য়ুরোপীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ কর্তৃক একটি স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতাহানি সম্বন্ধে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। মহকুমা ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নাম কিন্তু প্রকাশ করা হয় নাই। জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিষ্টার ওকিনিলীর হেড্ক্লার্ক বাবু রাজকৃষ্ণমিত্র, ডেপুটীর উক্ত কাহিনীটি অতি তীব্রভাষায়, বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া অমৃত-বাজার পত্রিকার অষ্টাদশ সংখ্যায় প্রকাশ করেন। পত্রিকা পাঠ করিয়া মিষ্টার মন্‌রো প্রবন্ধের লেখককে, তাহা জানিবার জন্য গোপনে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। "ভারতবর্ষ ভারতবাসিগণের জন্য," যে সংবাদপত্র এই মন্ত্র প্রচার করিয়া থাকে,তাহার ধ্বংস সাধনের জন্য জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্, বিভাগীয় কমিশনার প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারিগণ যে সুযোগের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, এইবার তাঁহারা তাহা প্রাপ্ত হইলেন। পত্রিকায় য়ুরোপীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের নাম অপ্রকাশ থাকিলেও ঝিনাইদহের সব্‌ডিবিসনাল অফিসার রাইট সাহেবের দ্বারা মিষ্টার মন্‌রো অমৃতবাজার পত্রিকার পরিচালকগণের বিরুদ্ধে আদালতে এক মোকদ্দমা রুজু করাইলেন। প্রকৃত লেখক কে, তাহা স্থির করিতে না পারায়, শিশিরকুমারের সহিত তাঁহার পরিবারস্থ সকলেই আসামী করা হইয়াছিল। শেষে মতিলাল ও তাঁহার একজন খুল্লতাতকে মুক্তি দিয়া সাক্ষী শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এই মোকদ্দমার ব্যাপার লইয়া দেশের মধ্যে একটা মহা আন্দোলন হইয়াছিল। শিশিরকুমারই অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য মতিলাল ও তাঁহার খুল্লতাতের সহিত যশোহরের বহু উকিল, মোক্তার, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, মুনসেফ ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে সাক্ষী মানা হইয়াছিল। পত্রিকার প্রিণ্টার চন্দ্রনাথ রায় ও বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্রকেও

আসামী করা হইয়াছিল। রাজকৃষ্ণবাবু নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার কয়েকজন বন্ধুর নিকট অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, য়ুরোপীয় ডেপুটীর বিরুদ্ধে পত্রিকায় যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা তাঁহারই লেখনী প্রসূত। এ সংবাদ ক্রমশঃই রাষ্ট্র হইয়া পড়িল; শেষে গভর্ণমেণ্ট জানিতে পারিয়া রাজকৃষ্ণকে আসামী শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন এবং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য মানিয়াছিলেন। মোকদ্দমা রুজুর পর, হেমন্তকুমার কলিকাতায় আসিয়া উকিলদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া, তাঁহাদের মোকদ্দমার বিচারভার যশোহরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিষ্টার ওকিলিনীর হস্ত হইতে অন্য কোনও এক বিচারপতির হস্তে প্রদান করিবার প্রার্থনা করিয়া হাইকোর্টে এক আবেদন করিয়াছিলেন।

মোকদ্দমাটী যেন শিশিরকুমার ও গভর্ণমেণ্টের মধ্যেই হইতেছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিষ্টার মন্‌রো তাঁহার সহযোগী মিষ্টার ওকিনিলীর উপর বিচারভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ওকিনিলী একদিন শিশিরকুমারকে বলিয়াছিলেন, শিশির, এবারে তোমাকে নিশ্চয়ই জেলে দিচ্ছি।" হাসিতে হাসিতে শিশিরকুমার উত্তর করিলেন, "দেখা যাবে; কিছুতেই পার্‌বেন না।" ওকিনিলী একদিন জেল পরিদর্শনে গমন করিয়া জেলারকে বলিয়াছিলেন, "শিশিরকুমার ঘোষ শীঘ্রই জেলে আস্‌ছেন, তাঁর জন্যে যেন একটা ঘর ঠিক ক'রে রাখা হয়।" কোন কোন কর্ম্মচারী খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া মধ্যে মধ্যে যে অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টেরই দুর্নাম হইয়া থাকে। শিশিরকুমারকে যেরূপেই হউক কারাগারে প্রেরণ করিতে হইবে, এই স্থির করিয়া বাদী পক্ষ হইতে বিশেষ তদ্বির করা হইয়াছিল। যাঁহাদের উদ্যোগে এই মোকদ্দমার সৃষ্টি, তাঁহারাই যখন বিচারভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন শিশিরকুমারের কারাবাস অনিবার্য্য ভাবিয়া যশোহরবাসিগণ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। শিশিরকুমারের সহিত

ওকিনিলীর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল ; সেজন্য তিনি মতিলালকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। বিচারের সময় একদিন ওকিনিলী মতিলালকে বলিয়াছিলেন, "তুই রাজকৃষ্ণের নাম কর না, তাহ'লেই তোরা সব খালাস পারি।" কিন্তু মতিলাল অচল, অটল। হেমন্তকুমার হাইকোর্টে যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তাঁহাদের বিচারভার দায়রা-জজের উপর অর্পিত হইয়াছিল। ওকিনিলী আসামীগণকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া শাস্তি দিবেন স্থির করিয়াছেন, এমন সময় হাইকোর্টের আদেশ তারযোগে তাঁহার হস্তগত হয়। হাইকোর্টের আদেশ পাঠ করিয়া রাগে ওকিনিলী কাঁপিতে লাগিলেন এবং শেষে বলিয়া উঠিলেন, "এ দেখিতেছি হেমন্তর কাজ। আচ্ছা, দেখি কে আসামীদের রক্ষা করে।"

দায়রা-জজ মিষ্টার লফোর্ডের উপর বিচার-ভার অর্পণ করা হইল বটে, কিন্তু তিনিও শিশিরকুমারের প্রতি সদয় ছিলেন না ; কারণ তাঁহার সম্বন্ধেও অমৃতবাজার পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে তীব্র মন্তব্য প্রকাশিত হইত। এই সময় তিনি বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন ; তাঁহার স্থলে মিষ্টার লাউইস্ (Mr Lowis) দায়রা জজ নিযুক্ত হন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে মোকদ্দমার বিচার করিতে বসিয়া তিনি শিশিরকুমারকে বলিলেন, "বাদীপক্ষ আজ প্রস্তুত নহে, সেজন্য মোকদ্দমা অন্য একদিন হইবে।" শিশিরকুমার সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। বিদায়ের পর লফোর্ড কার্য্যে যোগদান করিয়া বিচার করিবেন, বাদীপক্ষের এইরূপ ইচ্ছা ছিল। কয়েকমাস মোকদ্দমা স্থগিত রহিল। মিষ্টার লফোর্ড বিদায় হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মোকদ্দমা আরম্ভ করেন। শিশিরকুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধু, গভর্ণমেণ্টের উকিলবাবু দক্ষিণাপ্রসাদ বসু তাঁহার বিপক্ষে এবং সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার বাবু মনোমোহন ঘোষ তাঁহার পক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্যারিষ্টার হওয়ার পর মনোমোহনের এই সর্ব্বপ্রথম মোকদ্দমা। এরূপ কঠিন মোকদ্দমায় জড়িত হইলেও শিশিরকুমারের বিন্দুমাত্র বিচলিত

হন নাই। অমৃতবাজার পত্রিকা প্রচারিত হইবার কয়েক দিবস পরেই তাঁহার সহধর্ম্মিনী একটি পুত্র সন্তান রাখিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ভগবানের লীলা হৃদয়ঙ্গম করা মানবের সাধ্যাতীত। শিশিরকুমারের সান্ত্বনা-স্থল সেই মাতৃহীন শিশুটিকেও ভগবান কয়েকদিন পরে শিশিরকুমারের হৃদয় অন্ধকার করিয়া কাড়িয়া লইয়াছিলেন। শিশিরকুমার স্বাধীন ; সংসারের চিন্তা তাঁহার হৃদয় হইতে একরূপ দূর হইয়াছিল। মোকদ্দমার জন্য তাঁহার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবর্গ ও দেশবাসিগণ চিন্তিত হইলেও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। বাল্যকাল হইতেই ভগবানে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়াই, শিশির আপনাকে নির্দ্দোষ জানিয়া, মোকদ্দমায় জয়লাভ করিবেন বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি এক হাজার টাকার জামিনে খালাস ছিলেন। যথাসময়ে আদালতে উপস্থিত না হইলে জামিনের টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে এবং ওয়ারেণ্ট বাহির হইবে, এসকল কথা জানিয়াও শিশির আদালতে উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধে বিশেষ ব্যস্ত হইতেন না। মোকদ্দমার সময় একদিন আদালতে যাইবার কথা ভুলিয়া গিয়া, তিনি একটি সঙ্গীত রচনা করিয়া, তাহাতে সুর সংযোগ পূর্ব্বক আলাপ করিতেছিলেন। শিশির বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে গুন্-গুন্ স্বরে গান করিতেছেন, আর গানের এক এক পদ খড়ি দ্বারা দেওয়ালে লিখিতেছেন। ভাগ্যক্রমে আদালতে রওনা হইবার পূর্ব্বেই গানটী শেষ হইয়াছিল ; নচেৎ সেদিন হয়ত তাঁহার আদালতে যাওয়া ঘটিত না এবং সঙ্গে সঙ্গে জামিনের টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়া তাঁহার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইত। গানটী আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

“আমি জেনেছি পিতা, আমি তোমারি সন্তান।
আমি, জেনে শুনে বসে আছি আপন মনের কুতূহলে॥
আর, কে আমারে পায়, সংসারেরি দায়,
সব দূর করেছি।

এখন, চরণ সেবি, তোমার গুণ গাই, কেবল সাধ মনে।
যদি, কেশেতে ধর, মারিবে মার,
আমার তাহে ক্ষতি কি,
ও বাপ্ জেনো আমার কাছে তোমার প্রহার মিঠে লাগে,
যদি, ক্রোধ করি চাও, আমার নাহি হয় ভয়,
আমি তোমারি সন্তান,
তোমার, রাগে রাঙ্গা চক্ষু তলে বহে দেখি প্রেমসাগর।
মায়ে সন্তানে মারে, সন্তান কান্দে ফুকারে।
আর যায় কোলের ভিতরে।
ও বাপ্, এবে মার, পরে দিবে, শত চুম্ব বদনে ॥"

মিষ্টার মন্‌রো ইতিমধ্যে কৃষ্ণনগরে বদ্‌লি হইয়াছিলেন। তিনি শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য যশোহরে আগমন করিয়া, আদালতে একখানি পত্র দাখিল করেন। পত্রখানি শিশিরকুমার তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন। শিশিরকুমার যে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক, সেই পত্র হইতেই তাহা প্রমাণ করিবার জন্য মিষ্টার মন্‌রো যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। নীলকর সাহেব ও অন্যান্য বহু সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল ; কিন্তু শিশির যে পত্রিকার সম্পাদক, তাহা সপ্রমাণ হইল না। গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মতিলালকে সাক্ষী মানা হইয়াছিল, পাঠক তাহা অবগত আছেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স বিংশ বর্ষের অধিক নহে। তিনি ইংরাজীতে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। তাঁহাকে ধমক দিয়া, শেষে রাগাইয়া দিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রকৃত কথা বাহির করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল ; কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। এই মোকদ্দমার পূর্ব্বে ছাপাখানার ঘোষণা (declaration) দেওয়া হয় নাই বলিয়া শিশিরকুমার প্রভৃতিকে একবার অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। সেই মোকদ্দমার সময় মতিলাল বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার খুল্লতাত চন্দ্রনারায়ণ ছাপাখানার মালিক। এই মোকদ্দমার সময় জজ সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "অমৃতবাজার পত্রিকার মালিক কে ?"

মতি। "ইহার কেহ মালিক নাই, ইহা সাধারণের কাগজ।"

জজ সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তুমি পূর্ব্বে এক মোকদ্দমায়, নিম্ন আদালতে বলিয়াছে যে, চন্দ্রনারায়ণ মালিক; এখন বলিতেছ কেহই মালিক নহে। তোমার কোন্ কথা সত্য? আমি তোমাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত করিব।"

মতি। "মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে আপনি অভিযুক্ত করিতে পারেন; কিন্তু আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছি, আপনি কিরূপে জানিলেন?"

জজ। "তুমি নিম্ন আদালতে এক কথা বলিয়াছ, এখানে আর এক কথা বলিতেছ। তোমার কোন্ কথাটা সত্য?"

মতি। "আমার দুই কথাই সত্য।"

জজ সাহেব বড়ই রাগ করিয়া বলিলেন, "কি রকম?"

মতি। "চন্দ্রনারায়ণ ছাপাখানার মালিক। ছাপাখানা ও সংবাদপত্র যে দুইটি পৃথক জিনিস, একথা আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন কেন?" মতিলালের জবাব শুনিয়া জজ সাহেব অপ্রতিভ হইয়া নীরব হইলেন। তিনি পুনরায় মতিলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক কে?"

মতিলাল। অমৃতবাজার পত্রিকা মাত্র কয়েক মাস হইল প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং কে যে তাহার সম্পাদক হইবেন, তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই।"

জজ। "যদি তাহাই হইবে, তবে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, উকিল, শিক্ষক প্রভৃতি স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণ শিশিরকুমারকে সম্পাদক বলিয়া মনে করেন কেন?"

মতিলাল। "তিনি একজন সুলেখক বলিয়াই বোধ হয় সাধারণে তাঁহাকে পত্রিকার সম্পাদক বলিয়া মনে করেন।"

শিশিরকুমার সুলেখক,—কথাটা জজ সাহেবের ভাল লাগিল না। তিনি বিরক্তির সহিত বলিলেন, "তুমি কি বলিতে চাও যে শিশির-কুমারের ন্যায় লেখক এদেশে আর নাই?"

জজ সাহেবের ভাব দেখিয়া মতিলাল হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তাঁহার ন্যায় লেখক এদেশে আর নাই, একথা আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। তবে আমার বোধ হয় যে, শিশিরবাবু অনেক মোটা মাহিয়ানার সিবিলিয়ান অপেক্ষা ভাল লিখিতে পারেন।"

নির্ভীক যুবক মতিলালের এই উত্তর শুনিয়া আদালতে উপস্থিত সাহেব ও ভদ্রলোকগণ স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। ক্রোধে বিচারপতির মুখখানি রক্তিমবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। তিনি ক্রোধ সম্বরণ করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রবন্ধটী কে লিখিয়াছিল?"

মতিলাল। "তা আমি জানি না।"

জজ। "তুমি নিশ্চয়ই জান। তুমি স্মরণ করিয়া দেখ।"

মতিলাল। "কি স্মরণ করিব?"

জজ। "তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিলাম, পাঁচ মিনিটের মধ্যে তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিবে।"

জজ সাহেব ঘড়ি খুলিয়া বসিয়া রহিলেন। মতিলাল নীরব। পাঁচ মিনিট অন্তে জজ সাহেব মতিলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে লিখিয়াছে বল।"

মতিলাল। "আমি জানি না।"

জজ সাহেব রাগে টেবিল চাপড়াইয়া বলিলেন, "তুমি নিশ্চয়ই জান। তোমাকে বলিতেই হইবে।"

মতিলাল মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনার মনস্তুষ্টির জন্য আমি ত কিছু নূতন সৃষ্টি করিতে পারি না।"

অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন শিশির ও তাহার সহোদরগণের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না, বিচারপতি তখন বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিলেন। ব্যারিষ্টার মনোমোহন, মতিলালের সাক্ষ্য-প্রদানে চতুরতা ও নির্ভীকতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার করমর্দ্দন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,—"এ মতির জুড়ি পাওয়া ভার।" যাঁহাদিগের একান্ত যত্নে ও উদ্যোগে এই মোকদ্দমার

সৃষ্টি হইয়াছিল, তাঁহারা পূর্ণকাম হইতে না পারিয়া বড়ই মনঃক্ষুন্ন হইয়াছিলেন। পত্রিকার প্রিন্টার ও রাজকৃষ্ণবাবু বিনাশ্রমে যথাক্রমে ছয়মাস ও এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণবাবু যে স্বীয় নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই বিপদজালে জড়িত হইয়াছিলেন, পাঠক তাহা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন।

রাজকৃষ্ণবাবু য়ুরোপীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে প্রবন্ধটি লিখিয়া যখন অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসে প্রেরণ করেন, শিশিরকুমার তখন যশোহরেই ছিলেন। আসামীশ্রেণীভুক্ত হইলে, রাজকৃষ্ণবাবু ভীত হইয়া, শিশিরকুমারকে তাঁহার স্বাক্ষরিত সেই প্রবন্ধটির পাণ্ডুলিপি প্রত্যর্পণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, শিশিরকুমার হয়ত স্বীয় নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য সেই পাণ্ডুলিপি আদালতে দাখিল করিবেন। কিন্তু শিশিরকুমারের হৃদয়ে এরূপ নীচতার স্থান ছিল না। রাজকৃষ্ণ-বাবু যদি অহঙ্কার করিয়া সকলের নিকট প্রবন্ধ লেখক বলিয়া আপনার পরিচয় না দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কোন বিপদ হইত না। শিশিরকুমার সেই প্রবন্ধের দায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধেই গ্রহণ করিতেন। প্রবন্ধটি মতিলালের নিকট ছিল। তিনি শিশিরকুমারের নির্দ্দেশ মত তাহা লোক মারফত মাগুরা হইতে যশোহরে প্রেরণ করেন। শিশিরকুমার বাড়ীতে না থাকায়, তাঁহার খুল্লতাত চন্দ্রনারায়ণের হস্তে প্রবন্ধটী পতিত হয়। চন্দ্রনারায়ণ মোকদ্দমার দায় হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য প্রবন্ধটী ওকিনিলীকে দিবার উপক্রম করেন। শিশিরকুমার তাহা জানিতে পারিয়া, খুল্লতাত মহাশয়ের নিকট হইতে জোর করিয়া প্রবন্ধটি কাড়িয়া লইয়া, রাজকৃষ্ণবাবুকে প্রদান করেন। আট মাসকাল মোকদ্দমা চলিয়াছিল। মোকদ্দমা হইতে অব্যাহিত পাইলেও শিশির ও তাঁহার সহোদরগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ঋণ-জালে জড়িত হইয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণবাবু কারাবাসের সময় জেলে বসিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

মুক্তি লাভের পর তিনি কলিকাতায় একজন প্রতিষ্ঠাবান্ হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসক হইয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

শিশিরকুমারের মোকদ্দমায় জয়লাভের সংবাদ ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচারিত হইল। তাঁহার মুক্তিলাভে দেশবাসীগণের আনন্দের সীমা রহিল না। শিশিরকুমার এই মোকদ্দমায় একরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু এই মোকদ্দমার পর হইতেই পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁহার আর্থিক অস্বচ্ছলতা কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইয়াছিল। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রবন্ধগুলির মধ্যে যে বিশেষত্ব লক্ষিত হইত, তাহা তাৎকালিন অন্য কোন সংবাদ পত্রে দেখা যাইত না। স্বদেশ-প্রেমিক সম্পাদকের হৃদয়ে যে স্বদেশ সেবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিত, পত্রিকার প্রত্যেক পংক্তিতে তাহার অভিব্যক্তি লক্ষিত হইত। ভারতবর্ষ যে আমাদের দেশ, জননী জন্মভূমির প্রতি যে আমাদের একটা কর্ত্তব্য আছে, অত্যাচার, উৎপীড়ন নীরবে সহ্য না করিয়া প্রতিবিধানের চেষ্টা করা যে স্বদেশ-হিতৈষীর কর্ত্তব্য, শিশিরকুমারই সর্ব্বপ্রথমে ইহা দেশবাসীকে বুঝাইয়া ছিলেন। প্রকৃত রাজনীতিক আন্দোলন যাহাকে বলে, শিশিরকুমার যে তাহার একজন প্রধান প্রবর্ত্তক ছিলেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অমৃতবাজার পত্রিকায় গবর্ণমেণ্টের কোনও অন্যায় কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিতে তিনি বিন্দুমাত্র ভীত হইতেন না। কর্ম্মচারিগণের অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া শিশিরকুমার স্বীয় পত্রিকায় এরূপ বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ লিখিতেন যে, যাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তাহা লিখিত হইত, তাঁহারাও তাহা পাঠ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। এইরূপে অমৃতবাজার পত্রিকার প্রভাব ও প্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

পাঠক, এই সময় যশোহরের নৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল ; এবং শিশিরকুমারকে কিরূপ সংসর্গে অবস্থান করিয়া স্বীয় জীবন

গঠন করিতে হইয়াছিল, আমরা তৎসম্বন্ধে এখানে দুই একটী কথা উল্লেখ করিব। ইংরাজী শিক্ষার ফলে দেশে তখন মদিরা সেবন প্রথা এতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে যাঁহারা সুরাপান করিতেন না, ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদিগকে অশিক্ষিত বা অভদ্র বলিয়া ঘৃণা করিতেন। শিশিরকুমার এই অভদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অশেষ গুণের অধিকারী হইলেও তিনি মদিরা স্পর্শ করিতেন না বলিয়া, যশোহরের ইংরেজীনবীশগণ—বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, মুনসেফ প্রভৃতি-তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে অনিচ্ছুক ছিলেন। শিশিরকুমার ইহাতে বড়ই দুঃখিত ছিলেন। এই সময়ে কবিবর নবীনচন্দ্র যশোহরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। আমরা তাঁহার "আমার-জীবন" নামক আত্ম কাহিনী হইতে একটী ঘটনা উদ্ধৃত করিলাম ; পাঠক তাহা হইতে যশোহরের নৈতিক অবস্থার কথা বুঝিতে পারিবেন। "একদিন ওভারসিয়ার দাদার বাড়ী নিমন্ত্রণ। নৃত্যগীতের তরঙ্গে আমোদ উথলিয়া পড়িতেছে। এমন সময় আর একজন পূর্ত্তবিভাগীয় প্রভু—এ ডিপার্টমেণ্টের রত্নাকর—চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—'বাবা! নাড়ী বসিয়া গিয়াছে।' নৃত্যগীত থামিয়া গেল। সকলেই দেখিলাম যে তিনি নাড়ী ধরিয়া বসিয়া আছেন, আর কাঁদিয়া বলিতেছেন, তাঁহার স্ত্রী পুত্রের কী উপায় হইবে। বলাবহুল্য যে তিনি সুরা-সুন্দরীর কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার ডিপার্টমেণ্টের নামই D. P W.—Department of Prostitute and Wine. কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও আমরা তাঁহাকে বুঝাইতে পারিলাম না যে, তাঁহার নাড়ী সুরা প্রবাহে সতেজ চলিতেছে ; তাহাতে তাঁহার মস্তিকের যদিও কিঞ্চিৎ বিপ্লব ঘটাইতেছে, তাঁহার পরিবারবর্গের অনাথ হইবার আশঙ্কা নাই। তিনি যতক্ষণ সজ্ঞান ছিলেন, ততক্ষণ এক একবার—'বাবা! নাড়ী বসিয়া গিয়াছে'—বলিয়া থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া

উঠিতেছিলেন। আহার করিতে অনেক রাত্রি হইল। আমি গুভারসিয়ার দাদার কাছে শুইয়া রহিলাম। ইনস্পেক্টার দাদাও আমাদের সঙ্গে শুইলেন। অতি প্রত্যুষে কপাটে আঘাত শুনিয়া আমি উঠিয়া কপাট খুলিয়া দেখি গামছা পরিহিত ইনস্পেক্টর দাদা! ঠিক যেন মড়া পোড়াইয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, রাত্রিশেষে কিঞ্চিৎ শৈতাধিক্য অনুভব করিয়া জাগ্রত হইয়া দেখিলেন যে, তিনি মাতৃগর্ভ হইতে যেরূপ বস্ত্রহীন ভাবে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ঠিক সেই অবস্থায় একটী বড়ই অস্থানে পড়িয়া আছেন। বহু অন্বেষণে একখানি গামছা মাত্র পাইয়া অশ্লীলতা-নিবারণী সভার হস্ত হইতে কোনও রূপে অব্যহতি লাভ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। নিদ্রিত বন্ধু-মণ্ডলী জাগ্রত হইয়া তাঁহার সেই মূর্ত্তি দেখিলেন, আর একটা হাসির তুফান ছুটিল। আমাদের পার্শ্বস্থ শয্যা হইতে তাঁহার সেই অপ্রীতিকর স্থানে কিরূপে যে নৈশ অভিযান ঘটিয়াছিল, তাহা এখনও পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। সম্ভবত ইহাও এক প্রকার যোগের ফল—মস্তিকের সহিত মদিরার যোগ। সেই D. P. W. মহাশয় বলিলেন—'আমার নাড়ী উড়িয়া গিয়াছিল।' তুমি বাবা! সশরীর উড়িয়া গিয়াছিলে। আমার নাড়ী-হরণ; আর তোমার বস্ত্র হরণ।" এইরূপ সংসর্গে অবস্থান করিয়াও শিশিরকুমার আপনাকে নির্দ্দোষ রাখিতে পারিয়া ছিলেন। কেবল যশোহরে নহে, সমগ্র বঙ্গদেশে তখন ইংরাজী শিক্ষার ফলে বাঙ্গালী যুবকগণের কিরূপ ভীষণ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা পাঠকবর্গেকে অবগত করাইবার জন্য পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ মহাশয়ের মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।—"স্বাধীনতা অর্থে স্বেচ্ছাচার ও সংস্কার অর্থে সমূলোৎপাটন, এই তাঁহারা বুঝিয়া লইলেন। পুরাণোক্ত তেত্রিশ কোটী দেবতার উচ্ছেদ করিতে যাইয়া তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দিহান হইলেন

এবং হিন্দু সমাজে সহমরণ প্রথার ন্যায় কুসংস্কার ছিল বলিয়া, সমাজ প্রচলিত যে কেনো প্রথাই তাঁহারা কুসংস্কারমূলক বলিয়া বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। সুরাপান, গোমাংস ভক্ষন, এবং যবনান্ন গ্রহন প্রভৃতি কার্য্য তাঁহারা সমাজ-সংস্কারের পরাকাষ্ঠা বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। ইহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও এই অদ্ভুত সংস্কার জন্মিল যে, পৃথিবীতে যখন 'গোখাদক' জাতিরাই অপর সকল জাতিকে পরাজিত করিয়া আসিতেছে, তখন বাঙ্গালীরাও 'গোখাদক' না হইলে তাহাদিগের উন্নতির আশা নাই। এই অদ্ভুত সংস্কার কার্যে পরিণত করিতেও তাঁহারা ত্রুটি করিতেন না। সকলে দলবদ্ধ হইয়া গোমাংস ভক্ষনপূর্ব্বক, কখন কখন প্রতিবাসী-দিগের গৃহে ভুক্তাবশেষ নিক্ষেপ করিতেন, এবং যে সকল আচার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে সমাজ-নিষিদ্ধ, তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া আপনাদিগের উচ্ছৃঙ্খলতার (তাঁহাদিগের মতে নৈতিক বলের) পরিচয় দিতেন।"

শিশিরকুমারের গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া নবীনচন্দ্র তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। নবীনচন্দ্র তাঁহার আত্মকাহিনীতে লিখিয়াছেন, "যশোহরে লিখিত আমার খণ্ড কবিতায় ও পলাশীর যুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য যে নিঃশ্বাস ও মাতৃভূমির জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন আছে, তাহা কথঞ্চিৎ শিশিরকুমারের সংসর্গের ও শিক্ষার ফল। তিনি ও তাঁহার পত্রিকাই প্রথম এই দেশে স্বদেশভক্তির পথ-প্রদর্শক।" যশোহরের ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট্, মুন্সেফ ও শিক্ষকগণের সখ্য লাভের জন্য শিশিরকুমার এই নবীনচন্দ্রের শরণাপন্ন হন। শিশিরকুমার একদিন নবীনচন্দ্রকে বলেন, "আমার শরীর এই, মদ খাইলে আমি মরিয়া যাইব। তাই খাই না। আচ্ছা এরূপ কোনও মদ আছে যাহা খাইলে ভাল, নেশা হয় না, বুক জ্বালা করে না?" তিনি যখন শুনিলেন যে "রোজ লিকার" সুমিষ্ট ও নেশাহীন, তখন তিনি তাহাই এক বোতল আনাইলেন এবং একদিন নবীনচন্দ্রের

বাসায় বসিয়া একটু মুখে দিয়া বলিলেন, "নবীন, চল যাওয়া যাক্।" তাঁহারা উভয়ে স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে সেখানে বেশ একটী আড্ডা জমিয়াছে। শিশিরকুমার সকলকে বলিলেন, "নবীনকে জিজ্ঞাসা কর, আমি এখনই তাহার বাসায় মদ্ খাইয়া আসিতেছি। বল, তোমরা আর আমাকে ঘৃণা করিবেন না।" বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়—ছাত্রগণের চরিত্র গঠন যাঁহার প্রধান কার্য্য—"ব্রাভো শিশির" বলিয়া খুব একটা বাহবা দিলেন। তখন শিশিরকুমার ব্যতীত সমবেত সভ্য মণ্ডলী সুরা সুন্দরীর সেবায় উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। শিশিরকুমার স্বীয় সুমধুর সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করিলেন।

বিপদ চিরদিনই বিপদের অনুসরণ করিয়া থাকে। মানহানির মোকদ্দমার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া শিশিরকুমার পুনরায় এক নূতন বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। শিশিরকুমারকে যেরূপেই হউক দমন করিতে হইবে, তাঁহার পরিচালিত অমৃতবাজার পত্রিকা বিনষ্ট করিতে হইবে,—ইহাই তদানীন্তন রাজপুরুষগণের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। প্রথম মোকদ্দমায় ব্যর্থ মনোরথ হইয়া তাঁহারা শিশির কুমারের বিরুদ্ধে এক অভিনব অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন। মিষ্টার জে, ওয়েষ্টল্যাণ্ড এই সময়ে যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। পুনঃ পুনঃ তলব করা সত্বেও শিশিরকুমার মানহানির মোকদ্দমার সময় রাজ-কৃষ্ণের মিত্রের লিখিত প্রবন্ধটী আদালতে দাখিল না করিয়া সাক্ষ্য গোপন করায় তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হয়। মতিলালকে এ মোকদ্দমায়ও সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল। তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও বিশেষভাবে জেরা ও শেষে ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। শিশিরকুমার এবারও মুক্তিলাভ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভগিনীপতি কিশোরীবাবু ও কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ উকীলবাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার এই মোকদ্দমা পরিচালন করিয়াছিলেন।

স্বীয় গ্রামে স্বাস্থ্য ভাল না থাকায়, শিশিরকুমারকে ইহার পর বাধ্য হইয়া সপরিবারে কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমানের ন্যায় তখনও যশোহর ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি ছিল। পরিবারবর্গ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইতেছেন দেখিয়া শিশিরকুমারের ১৮৭১ খৃঃ অব্দের শেষভাগে (সেপ্টেম্বর কিম্বা অক্টোবর মাসে) সপরিবারে কলিকাতায় আগমণ করেন। যে জন্মভূমি অমৃতবাজারকে তিনি বহু যত্নে ও পরিশ্রমে একখানি আদর্শ পল্লী করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিবার সময় শিশির কুমারের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কলিকাতায় আসিবার সময় পত্রিকার ঋণ পরিশোধ জন্য ছাপাখানার যাবতীয় সাম্রঞ্জাম যশোহরের একজন ভদ্রলোককে বিক্রয় করা হইয়াছিল। শিশিরকুমার রিক্ত হস্ত, সুতরাং সুদ দিবার অঙ্গীকারে তাঁহাকে জনৈক মহাজনের নিকট হইতে একশত টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। মতিলাল খুলনার অন্তর্গত পীলজঙ্গের উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য্য করিয়া বেতন হইতে যে দুইশত টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা তিনি সেজদাদার হস্তে অর্পণ করিলেন। মাত্র তিনশত টাকা সঙ্গে লইয়া শিশিরকুমার বৃহৎ পরিবারসহ কলিকাতায় আগমন করিয়া বউবাজারে ৫২ নং হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

— ——

তৃতীয় অধ্যায়

কলিকাতায় আগমনের পর শিশিরকুমারকে অমৃতবাজার পত্রিকার কার্য্য কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। পত্রিকার গ্রাহকগণকে জ্ঞাপন করা হয় যে, পত্রিকার স্বত্বাধিকারিগণ কলিকাতায় আসিয়াছেন; নানা কারণে কিছুদিনের জন্য কাগজ বন্ধ থাকিবে; এবং পরে পত্রিকাখানি নূতন ভাবে পুনঃ প্রকাশিত হইবে। গ্রাহকগণই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষক; পত্রিকার গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের দেয় চাঁদা প্রেরণ করিয়া পত্রিকার জীবন-রক্ষায় সহায়তা কবিলে স্বত্বাধিকারিগণ তাঁহাদের নিকট আজীবন কৃতজ্ঞ থাকিবেন, একথাও জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। অমৃতবাজার পত্রিকা দেশের যে মহদুপকার করিতেছিল, তাহা স্মরণ করিয়া গ্রাহকগণ পত্রিকা বন্ধ থাকিলেও আপনাদের দেয় চাঁদা সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিতে লাগিলেন। শিশিরকুমার গ্রাহকগণের এই সাহায্যের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেন।

কলিকাতায় আসিয়া শিশিরকুমার ভালই করিয়াছিলেন। যশোহরে থাকিলে তাঁহাকে যে নিশ্চয়ই কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইত, পাঠক নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে তাহা বুঝিতে পারিবেন। কলিকাতায় আগমনের পর একটী মোকদ্দমার সাক্ষ্য প্রদানের জন্য শিশিরকুমারকে একবার যশোহরে যাইতে হইয়াছিল। তদানীন্তন অন্যতম ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাবু রাসবিহারী বসুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে, রাসবিহারীবাবু বলিয়া ছিলেন, "শিশির, যত শীঘ্র পার তুমি কলিকাতায় ফিরিয়া যাও।"

শিশির—"কেন?"

রাস—"এখানে অধিক দিন থাকিলে তোমাকে বিপদে পড়িতে হইবে।"

শিশির—"কি বিপদ?"

রাস—"আমি আর জইণ্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট্ সেদিন একত্র বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম। তিনি হঠাৎ আমাকে বলিলেন,—'শুনিতেছি শিশির ঘোষ কলিকাতা হইতে যশোহরে আসিয়াছে। এখনই তাহার নামে একখানা পরোয়ানা বাহির করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করা হউ'ক।"

শিশির—"আমার অপরাধ কি?"

রাস—"আমি তাঁহাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, প্রথমে পরোয়ানা বাহির করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করা হউক, পরে যাহা হয় করা হইবে?"

শিশিরকুমার শুনিয়া অবাক্। তিনি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। মিষ্টার স্মিথ্ তখন যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। তিনি তাঁহার সহযোগীর কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন তিনি নিষেধ না করিলে, জইণ্ট সাহেব যে শিশিরকুমারকে গ্রেপ্তার করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মিষ্টার স্মিথ্ পরে বিভাগীয় কমিশনারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

মানহানির মোকদ্দমার ব্যাপার লইয়া শিশিরকুমার অনেকেরই নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। কলিকাতায় আগমনের পর, তিনি সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুর-বংশের মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন এবং ঝামাপুকুরের রাজা দিগম্বর মিত্র প্রভৃতির সহিত ঘনিষ্টরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের জমিদার সম্প্রদায় মধ্যে তৎকালে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন বিদ্যা, বুদ্ধি ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার জন্য বিশেষরূপে সমাদৃত ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যাবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। যতীন্দ্রমোহন সাহিত্যানুরাগী ও গুণগ্রাহী পুরুষ ছিলেন; বহু দুঃস্থ সাহিত্যসেবী তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। শিশিরকুমারের সহিত আলাপ করিয়া মহারাজা বাহাদুর তাঁহার প্রতিভা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। উভয়ে সাক্ষাৎ হইলে

রাজনৈতিক বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন। মহারাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা সৌরীন্দ্রমোহন অসাধারণ সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। সঙ্গীত-শাস্ত্রে শিশিরকুমারের ব্যুৎপত্তি লক্ষ্য করিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। উভয়ে সাক্ষাৎ হইলে সঙ্গীত-শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। ইহাঁদিগের দুইজনের ন্যায় রাজা দিগম্বর মিত্রও শিশির-কুমারের গুণে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকেআপনার পরিবারভুক্ত বলিয়া মনে করিলেন।

কলিকাতায় আসিয়াই শিশিরকুমার একটী নূতন প্রেস ক্রয় করিবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন; কিন্তু অর্থাভাববশতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন, রাজা সৌরীন্দ্রমোহন, রাজা দিগম্বর প্রভৃতি জমিদারগণের সহিত ঘনিষ্টরূপে পরিচিত হইয়াও, শিশিরকুমার একদিনের জন্যও তাঁহাদের নিকট আপনার অভাবের কথা প্রকাশ করেন নাই। একটী নূতন প্রেস ক্রয় করিতে ছয়শত টাকা আবশ্যক। শিশিরকুমার, এই টাকার জন্য যদি উক্ত তিন জনের মধ্যে কাহাকেও বলিতেন, তাহা হইলে প্রেস ক্রয় করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত না। কিন্তু পাছে তাঁহারা মনে করেন যে, শিশিরকুমার অর্থের প্রত্যাশায় তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহাদের নিকট টাকাকড়ি সম্বন্ধে কোন কথাই উত্থাপন করিতেন না। যাহা হউক, প্রেস ক্রয় করিবার টাকা অভাবনায় উপায়ে শিশিরকুমারের হস্তগত হইয়াছিল। তিনি প্রায়ই রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। একদিন তিনি রাজার নিকট উপস্থিত হইলে, রাজা তাহাকে বলিলেন,—"শিশির, তুমি যে আসিতেছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম।"

শিশির—"কিরূপে?"

রাজা—"তোমার পদধ্বনি শুনিয়া।"

শিশিরকুমার উপবেশন করিলেন। উভয়ের মধ্যে নানা কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। রাজা বলিলেন, "শিশির, আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে

রাজা দিগম্বর মিত্র বাহাদুর।

পাইতেছি যে তুমি ভবিষ্যতে একজন মহৎ লোক হইবে।” রাজার এই কথাগুলি শুনিয়া শিশিরকুমার আপনার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়াছিলেন। রাজা দিগম্বর তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন, “শিশির, একটি লোকের নিকট কিছু টাকা পাইতাম; লোকটি টাকাগুলি কাল পরিশোধ করিয়া গিয়াছে। এই টাকাগুলি কিরূপে খাটান যায় বল দেখি?” শিশিরকুমার কি উত্তর দিবেন স্থির করিতে না পারিয়া নীরব রহিলেন। রাজার সহিত নানা কথাবার্ত্তার পর তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। পর দিবস ঘটনাক্রমে তাঁহার জনৈক আত্মীয় তাঁহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি একজন জমিদারের অধীনে কার্য্য করিতেন। জমিদার মহাশয়ের কিছু টাকা কর্জ্জ করা আবশ্যক, সেই জন্য তিনি উক্ত কর্ম্মচারীকে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। কথা প্রসঙ্গে জমিদারের কর্ম্মচারীটী শিশিরকুমারের নিকট তাঁহার মনিব মহাশয়ের ঋণ গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন। পূর্ব্বদিন রাজার সহিত শিশিরকুমারের যে কথা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া তিনি তাঁহার আত্মীয়টীকে আশা প্রদান করেন। জমিদারের কর্ম্মচারীটী শিশিরকুমারের নিকট টাকা ধার করিবার চেষ্টায় আসেন নাই, কলিকাতায় তাঁহার বাসায় আশ্রয় লইবার জন্য আসিয়াছিলেন। শিশিরকুমার তাঁহাকে সংগে লইয়া রাজা দিগম্বর মিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা প্রকাশ করেন। রাজা ঋণদানে সম্মত হইলেন। যথারীতি দলিলাদি সম্পাদিত হইলে, রাজা ষাট হাজার টাকা ধার দিলেন এবং তাঁহার চেষ্টায় শিশিরকুমার দালালিস্বরূপ জমিদারের নিকট হইতে আটশত টাকা পাইলেন। এই টাকার মধ্যে ছয় শত টাকা দিয়া শিশিরকুমার একটী নূতন প্রেস ক্রয় করিলেন। জন্মভূমির কার্য্য করিবার ইচ্ছা শিশিকুমারের হৃদয়ে বলবতী দেখিয়া ভগবান যেন অলক্ষ্যে তাঁহার হস্তে উক্ত অর্থ প্রদান করিলেন।

কলিকাতায় আগমনের কয়েক মাস পরে (১৮৭২ খৃঃ অঃ

ফেব্রুয়ারী মাসে) শিশিরকুমারের যত্নে ও চেষ্টায় অমৃতবাজার পত্রিকা নূতন সৌষ্ঠবে পুনঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই সময় কলিকাতা নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট্ নিবাসী জমিদার ও সুনিপুন চিত্র শিল্পী স্বর্গীয় গিরিন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ও শিশিরকুমারকে পত্রিকা প্রচারে নানারূপ সহায়তা করিয়াছিলেন। কলিকাতার একজন প্রেসম্যান দ্বারা নূতন প্রেসটী ঠিক করিয়া লইয়া, শিশিরকুমার তাঁহারই শিক্ষিত কম্পোজিটর প্রভৃতি অন্যান্য লোক যশোহর হইতে আনাইয়াছিলেন। এই সময়ে ইন্‌কম্‌ট্যাক্সের কথা লইয়া দেশে একটা মহা আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছিল। এই ট্যাক্স যাহাতে প্রচলিত না হয়, তাহার জন্য তৎকালীন সংবাদ পত্রগুলি ঘোর আন্দোলন করিতেছিলেন। কিন্তু শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় গভর্ণমেণ্টর পক্ষ সমর্থন করিয়া, ইন্‌কাম্‌ট্যাক্স দ্বারা দেশের বিশেষ কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই, ইহাই প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। ইংরজেদিগকে কোন ট্যাক্স দিতে হয় না, ইন্‌কম্‌ট্যাক্স প্রচলিত হইলে লাটসাহেব হইতে সাধারণ ইংরেজ কর্ম্মচারীকে পর্য্যন্ত, এবং দেশের ধনবানদিগকে তাহা দিতে হইবে, সুতরাং সাধারণ জন-সম্প্রদায়ের তাহাতে কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই, শিশিরকুমার স্বীয় পত্রিকায় এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইংরেজ সম্প্রদায় প্রস্তাবিত ট্যাক্সের বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন করিতে লাগিলেন। এদেশীয়গণও যাহাতে তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন, তাহার জন্য তাঁহারা নানা কৌশল অবলম্বন করিতেন। তখন আমাদের দেশের রাজনীতিগণ কিরূপে ইংরেজদিগের কথায় আপন আপন মত গঠন করিতেন, তাহা দেখাইবার জন্য শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেন। জনৈক চাপকান পরিহিত বাঙ্গালা বাবুর নাকে দড়ি দিয়া জনৈক ইংরাজ টানিয়া লইয়া যাইতেছে, এই চিত্রটী শিশিরকুমার ১৮৭৫ খৃঃ অঃ ১০ই এপ্রিল তারিখে পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন,—

Saheb—Babu, you understand politics ?

Babu—Very much, Sir.

S—You know the country well ?

B—Thoroughly, Sir. My great-grand-father came from the country, and my aunt is married to a villager of a great experience.

S—Of course you have an independent opinion of your own ?

B—I am particularly strong and tenacious in that respect, Sir.

S—What is the most oppressive of all Taxes.

B—That, sir, is a question, sir, which sir, I, Sir (scratches his head).

S—I dare say, you would name the Income Tax.

B—Assuredly, Sir. I was going to name that hateful tax when you interrupted me, sir.

S—Is not this tax very much hated in the muffcsil ?

B—They hate ! They—Sir, language fails me to express their feelings, Sir. My aunt has heard from her husband some of the doings of the Income Tax Assessors.

S—The Assessors are not to be blamed, poor fellows. It is the unnatural, inequitable, and—

B—Beg your pardon, Sir. I was going to say the same thing. My aunt has heard that the assessors are good, very excellent, jolly fellows, but the tax—the tax—what were you going to say, Sir ?

S—The inquisitorial nature of the tax makes the Assessors unpopular.

B—Yes Sir, I strongly believe a belief which is not

to be shaken—that the Assessors inspite of their jolliness are very inquisitive Sir.

S—The tax is simply detested.

B—Yes Sir, also absolutcly detested by those who pay it.

S—Not only by those who pay it—

B—Yes sir, it is much more hated by those who do not pay it, Sir, than bv those who pay it, Sir. I am absolutely certain of that, sir.

S--It is demoralising in its effect.

B—Who with a pair of noses in his head can doubt that ? I am qute sure that if a proper statistics could be taken, it would undoubtedly prove that since the introduction of this demoralising tax, thefts have increased in the land, Sir, cylones have become more frequent, sir, epidemic fevers universsl sir, floods more violent Sir, cattle plagues more virulent sir, and—and—sir—sir—

S—You must then cry down the Income Tax.

B. I was going to propose the same thing to you, sir.

S—You can talk loud.

B—I am a Calcutta Babu sir.

S—Then we will join you for your sake and cry down the hateful tax.

B—Many thanks, sir. I am particularly thankful sir, that I have been able at least to convince you, sir, that, the Income Tax sir, is a hateful impost, sir. I very much understand politics, sir.

পার্লামেণ্টে ইন্‌কাম্‌ট্যাক্সের কথা উঠিলে, তাৎকালীন ভারত-সচিব বলিয়াছিলেন যে, অমৃতবাজার পত্রিকার ন্যায় প্রভাবশালা

সংবাদপত্র যখন ট্যাক্সের সমর্থন করিয়াছেন, তখন এই ট্যাক্সের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি শুনিবার প্রয়োজন নাই!

অমৃতবাজার পত্রিকা নিয়মমত প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই সময়ে রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয় শিশিরকুমারের বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন। পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, শিশিরকুমার তাঁহার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য গ্রহণ কিম্বা তাহার প্রত্যাশাও করেন নাই। একদিন তিনি রাজাকে বলেন যে, তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া পত্রিকার জন্য কয়েকজন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন, তাহা হইলে বড়ই উপকার হয়। শিশিরকুমারের কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন,—"এ আর বেশী কথা কি? আচ্ছা, আমি পত্রিকার কতকগুলি গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।" যেমন কথা তেমনই কাজ। রাজা তৎক্ষণাৎ এক খণ্ড কাগজ লইয়া তাহাতে টালারবাবু পরাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; শোভাবাজারের মহারাজা কমলাকৃষ্ণ বাহাদুর, হাইকোর্টের বিচারপতি বাবু দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি তাঁহার প্রায় পঞ্চাশজন বন্ধুর নাম লিখিয়া প্রত্যেককে অমৃতবাজার পত্রিকার গ্রাহক হইবার জন্য অনুরোধ-পত্র লিখিলেন। শিশিরকুমার এক খানি অমৃতবাজার পত্রিকার সহিত পত্রগুলি ডাকযোগে যথাস্থানে প্রেরণ করিলেন। কেবল মহারাজা কমলাকৃষ্ণ বাহাদুর ও বাবু দ্বারকানাথ মিত্রের সহিত শিশিরকুমার স্বয়ং সামান্য সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। টালার পরাণবাবু ব্যতীত সকলে পত্রিকার গ্রাহক হইয়াছিলেন। শিশিরকুমার ইন্‌কম্‌ট্যাক্সের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার ন্যায় দেশদ্রোহীর পত্রিকার গ্রাহক হওয়া পরাণবাবু সঙ্গত বলিয়া মনে করেন নাই। জজ দ্বারকানাথ শিশিরকুমারকে বলিয়া দিলেন,—"আমি আপনার পত্রিকার গ্রাহক হইলাম বটে; কিন্তু আপনার লেখার ভিতর এমন একটা তীব্র ভাব লক্ষিত হয়, যাহা হয়ত, সময়ে ভারতবর্ষে সাধারণ লোকদিগের মধ্যে অসন্তোষ ও শেষে অশান্তি উৎপাদন করিবে।"

প্রত্যুত্তরে শিশিরকুমার বলিয়াছিলেন—"ভারতবাসীকে তাহাদিগের দুরবস্থার কথা বুঝাইয়া তাহাদের হৃদয়ে স্বদেশ-সেবার প্রবৃত্তি জাগাইয়া দিবার জন্যই অমৃতবাজার পত্রিকার সৃষ্টি। ভারতবাসী স্বদেশের দুরবস্থার কথা সম্যক্ অবগত নহে বলিয়াই, আপনাদের উন্নতি সাধনে বড়ই উদাসীন। তাহাদের ঔদাসীন্য দূর করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে একটু উত্তেজনা সঞ্চার করিয়া দেওয়া আবশ্যক।"

অমৃতবাজার পত্রিকার দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। আমরা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, কলিকাতায় আসিবার পরে পত্রিকার কতক অংশ ইংরাজী ও কতক অংশ বাঙ্গলাতে লিখিত হইত। পত্রিকার সরস ও সদ্‌যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিরবার জন্য জনসাধারণ যে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, অন্য কোন সংবাদ-পত্র পাঠে তাঁহাদের সে আগ্রহ লক্ষিত হইত না। গভর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে হইলে, তাহা এরূপভাবে লিখিত হইত যে, পাঠকবর্গের সহিত গভর্ণমেণ্টও তাহা পাঠ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। স্যার জর্জ্জ ক্যাম্বেল যখন বাঙ্গলার ছোট-লাটবাহাদুরের মস্‌নদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, শিশিরকুমারের অমৃতবাজার পত্রিকা সেই সময় দেশের জন্য কি করিয়াছিলে, আমরা এক্ষণে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। স্যার জর্জ্জ প্রজাপুঞ্জের প্রতি যে পরিমাণ প্রীতি ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন, জমিদারগণ তাহা তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইতেন না। ছোট লাট বাহাদুরের সহানুভূতি পাইয়া হিন্দু ও মুসলমান প্রজাগণ জমিদারদিগের উপর বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল। পাবনা জেলায় একবার প্রজাগণ জমিদারগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্থাপন করিয়াছিল। এই বিদ্রোহের ফলে ঈশানচন্দ্র রায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণ লক্ষাধিক লোক লইয়া ইংরেজাধীনে, কিন্তু জমিদারের শাসনের বাহিরে,,একটী স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ

করিয়াছিলেন। মিষ্টার নলেন তখন পাবনার ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। ছোটলাট স্যার জর্জ্জ ক্যাম্বেল ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ নলেনের ব্যবহার সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল। মতিলাল এ সম্বন্ধে একটী সুন্দব প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। শিশিরকুমার সেই প্রবন্ধটী পাঠ কবিয়া মতিলালকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। যে কোন বিষয়ই হউক না কেন, শিশিরকুমার সংবাদপত্রে আন্দোলন করিবার পূর্ব্বে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া দেখিতেন। তিনি কোন বিষয় লইয়া হুজুগ করিতে ভালবাসিতেন না। প্রকৃত অনুসন্ধান না করিয়া তিনি কোন বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিতেন না। স্যার জর্জ্জ ক্যাম্বেলের শাসনকালে বিহারে একবাব দুর্ভিক্ষ হইয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রে মহা আন্দোলন হইয়াছিল। লর্ড নর্থব্রুক তখন ভারতের বড়লাটের পদে বিবাজমান ছিলেন। দুর্ভিক্ষের সংবাদে তিনি বড়ই বিচলিত হইয়াছিলেন। অন্নাভাবে যাহাতে একজন লোকও মৃত্যুমুখে পতিত না হয়, তিনি তাহাব বন্দোবস্ত করিবার জন্য ছোটলাট বাহাদুরকে আদেশ করেন। স্যার জর্জ্জ সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন; কিন্তু শিশিরকুমার এই দুর্ভিক্ষের ব্যাপারটী পত্রিকায় বিভিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। অনুপযুক্ত কালে গভর্ণমেণ্ট প্রচুর অর্থব্যয় করিতেছেন, কিছু প্রকৃত দুর্ভিক্ষের সময় হয়ত অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সাহায্যেব অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, শিশিরকুমার ইহাই আশঙ্কা করিয়াছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকার পক্ষ হইতে শিশিরকুমারের মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমার বিহারে পল্লীতে পল্লীতে পরিভ্রমন করিয়া তত্রাত্য অধিবাসিগণেব অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আসিয়া বলিয়াছেন যে, বিহারে প্রকৃত দুর্ভিক্ষ হয় নাই, তবে দেশবাসিগণ চিরকাল যে দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করিয়া আসিতেছে, এবারেও তাহারা তাহার হস্ত হইতে অব্যহতি লাভ করিতে পারে নাই। শিশিরকুমার ইহা তাঁহাব

পত্রিকায় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকার পূর্ব্বে, ভারতবাসী পরিচালিত কোনও সংবাদপত্র মফস্বলের প্রকৃত অবস্থায় অনুসন্ধানের জন্য যে কখন কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন, একথা শুনিতে পাওয়া যায় না। অমৃতবাজার পত্রিকার কথা গভর্ণমেণ্ট সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই। তথা কথিত দুর্ভিক্ষের প্রতিকারকল্পে গভর্ণমেণ্ট প্রায় ছয় কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই টাকার অধিকাংশই বিহার প্রবাসী ইংরাজদিগের উদরসাৎ হইয়াছিল। যে সময়ে সাহায্য না করিলে বিশেষ কোন ক্ষতির আশঙ্কা ছিল না, গভর্ণমেণ্ট সেই সময়ে কতকগুলি অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন ; কিন্তু দক্ষিণ ভারতে যখন সত্য সত্যই দুর্ভিক্ষ ভীষণ মূর্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তখন সাহায্যাভাবে কত লক্ষ লোক যে অনশনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। দূরদর্শী শিশিরকুমারের পরামর্শ-মত কার্য্য করিলে, গভর্ণমেণ্ট হয়ত দক্ষিন ভারতের লক্ষ লক্ষ প্রকৃত দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যাক্তির জীবন রক্ষা করিতে পারিতেন।

স্যার জর্জ্জ ক্যাম্বেল যে সকল বিধি প্রচলন কিম্বা প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার কোন কোনটী বড়লাট বাহাদুর কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য ও কোন কোনটী পরবর্ত্তী ছোটলাট বাহাদুর স্যার রিচার্ড টেম্পল কর্ত্তৃক রহিত হইয়াছিল। কিন্তু স্যার জর্জ্জের কৃত সবডেপুটি ও কাননগুর পদগুলি আর পরিবর্ত্তিত হয় নাই। সবডেপুটি পদের সৃষ্টির ব্যাপার লইয়া অমৃতবাজার পত্রিকার "স্যার জর্জ্জ ক্যাম্বেলের আদর্শ ডেপুটি" শীর্ষক একটি সচিত্র ক্ষুদ্র বিদ্রূপাত্মক কবিতা বাহির হইয়াছিল। অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া হিন্দু পেট্রিয়ট চিত্রটি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কবিতাটি এই—

"সেলামে মজবুত অশ্বারোহনেতে।
লাঙ্গুল স্থানে চেন কম্পাস কাণেতে॥

তিন হাত সাত ইঞ্চি দুই আঙ্গুল দু'পাটি।
আমাদের হুজুরের মনমত ডেপুটি ॥"

চিত্রটি প্রকাশিত হইলে দেশমধ্যে একটা মহা উত্তেজনা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ইংরেজ সম্প্রদায় মধ্যে অনেকেই উক্ত চিত্রটির জন্য অমৃতবাজার পত্রিকা ক্রয় করিয়াছিলেন। স্যার জর্জ্জ ক্যাম্বেল হিন্দুদিগের প্রতিজ্ঞা করিবার জন্য এক অতি অদ্ভুত বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কোন হিন্দুকে শপথ করিতে হইলে, গরুর লেজ ধরিতে হইবে, ছোটলাট বাহাদুর যখন এই ব্যবস্থা করেন, তখন শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি বিদ্রূপাত্মক চিত্র প্রকাশ করেন।

পাঠক! আমরা এইখানে বলিয়া রাখি, ১৮৭৪ খৃঃ অঃ ২রা এপ্রিল হইতে অমৃতবাজার পত্রিকা ২নং আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গলি হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৭৪ খৃঃ অঃ ৩০শে এপ্রিল তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় রংপুরের তাৎকালীন জজ মিষ্টার লেবিনের বিরুদ্ধে দুইটি এফিডেবিট প্রকাশিত হইয়াছিল। জজ সাহেব বাঙ্গালা জানিতেন না; আইনেও তাঁহার জ্ঞান অতি অল্প; এজন্য তাঁহার সেরেস্তাদারই মোকদ্দমার রায় লিখিয়া দিতেন। জজ কোর্টের কয়েকজন উকিল এই সংবাদ শিশিরকুমারকে জানাইয়া তাঁহার পত্রিকায় আন্দোলন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমরা একটি এফিডেবিট হইতে অংশবিশেষ নিম্নোউদ্ধৃত করিলাম—

"We, Hiralal Mitiar, Rahaman, Ramkamal Roy, Koylashchandra Sen, Mahimchandra Mazumdar, Krishna Chandra Sircar, Gopal Chandra Chakrabutty, Shyama Mohan Chakrabutty, Mahesh Chandra Sircar, Pyarilal Roy, Prosannanath Chowdhury, Kalidas Moitra, pleaders practising at the judge, and Subjudge's court at Rungpore do solemnly declare and affirm as follows :—

(i) "That we know and believe that the present judge A. Levin does not understand the current language of the court, has no adequte knowledge of the law and regulati‹ ns inforce and is regardless of the duties of his high and responsible post.',

(ii) "That we know that the sherristadar of the court Womachurn Sen sits with the judge in the ijlas, takes down notes of the arguments address to the caurt by the pleaders, dictates to the gudge in open court the orders that have to be passed in the ordinary course of the judge's offiicial duties and that the said Sherristadar does write out the judge ments decreeing or dismissing cases which the judge after words merely capies out and passes of his as own.

(iii) "That we do believe that the said Sherristadar Womachurn Sen is the real judge and the judge is a mere puppet in his hands and that the Sherristadar takes bribes and disposes of cases in favour of the highest bidder.

"Sd. Above named 12 pleaders. Solemnly affirmed before me this 21st day of April 1874.

"O. C. Roy"
"Sub-Judge and commissioner to
administer oaths and affirmations."

বাঙ্গালীর সংবাদপত্রে ইংরেজ জজের বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা প্রকাশিত হইলে, ইংরেজ রাজপুরুষগণের মধ্যে একটা মহা উত্তেজনা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক ও রংপুরের উকিলগণকে অভিযুক্ত করিবার জন্য তাঁহার গভর্ণমেণ্টকে উত্তেজিত করিতে ক্রুটি করেন নাই। শিশিরকুমারের তীব্র আন্দোলনের ফলে সংবাদটার সত্যাসত্যতার অনুসন্ধান

করিবার জন্য তাৎকালীন মাননীয় বিচাপতি সার লুই জ্যাক্‌সন্‌ রংপুরে গমণ করিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে সকল কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সার লুই জ্যাক্‌সন জানিতে পরিলেন যে, জজ লেবিনের বিরুদ্ধে অমৃতবাজার পত্রিকায় যে অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। ইহার ফলে বাঙ্গালী সেরেস্তাদারকে তৎক্ষণাৎ কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছিল; কিন্তু তিনি যাহার আদেশ মত কার্য্য করিতেন' সেই য়ুরোপীয় জজ সাহেবকে তাঁহার সহিত কর্ম্মচ্যুত না করিয়া তাঁহার কৈফিয়ৎ তলব করা হইয়াছিল। কৈফিয়ৎ দিবার জন্য মিষ্টার লেবিন বিদায় গ্রহণ করেন; কিন্তু তাঁহার কৈফিয়ৎ দ্বিবার কিছুই ছিল না। তাঁহাকে শেষ গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া কর্ম্ম হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। এই সময়েই দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অভিযুক্ত ও এসিস্‌টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন। মিষ্টার লেবিন, সাহেব, সুরেন্দ্রবাবু বাঙ্গালী। সুরেন্দ্রনাথবাবুর মোকদ্দমার ব্যাপার লইয়া শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকার যথেষ্ট আন্দোলন করিয়াছিলেন; কিন্তু সে সমস্তই নিষ্ফল হইয়াছিল। লেবিনের ও সুরেন্দ্রবাবুর বিচারপদ্ধতি লক্ষ্য করিয়া শিশিরকুমার বড় দুঃখে লিখিয়াছিলেন,—"লিবিন সাহেব কর্ম্ম হইতে অপসৃত হইয়াছেন। পাঠকবর্গ জানেন যে, লিবিন সাহেব রংপুরের জজ ছিলেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে সেখানকার উকিলরা হাইকোর্টে অভিযোগ করেন। এরূপ অভিযোগ কোন বাঙ্গালীরহাকিমের বিরুদ্ধে হইলে তাঁহার শুধু চাকরী যাইত না, তাঁহাকে নানারূপে অবমানিত হইতে হইত। গভর্ণমেণ্ট সুরেন্দ্রবাবুকে যদি শুধু কর্ম্ম হইতে অপসৃত করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি বিস্তর অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন; কিন্তু সামান্য কয়েদীর ন্যায় তাঁহার বিচার হইল; তাঁহার দোষগুণ গভর্ণমেণ্ট নানারূপে দেশ-বিদেশে রাষ্ট্র করিলেন এবং ইংরেজী সংবাদপত্রেরা তাহা লইয়া নানা গালি গালাজ দিলেন।"

শিশিরকুমারের লেখনা কিন্তু সুরেন্দ্রনাথবাবুকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই।

বর্তমানে আমাদের দেশে সাধারণ লোকদিগের উচ্চ শিক্ষার পথ যে পরিমাণে মুক্ত হইয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল, তাহাও লর্ড মেয়ো ও স্যার জর্জ্জ ক্যাম্বেলের শাসনকালে রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। এই উদ্যমটি মিষ্টার ষ্ট্রাচির মস্তিষ্ক হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল। ইনি বড়লাট বাহাদুরের কাউন্সিলের একজন সদস্য ছিলেন। লর্ড মেয়ো ঘাতক-হস্তে নিহত হইলে ইনি কয়েকদিনের জন্য বড় লাটের কার্য্য করিয়াছিলেন। ষ্ট্রাচির প্রস্তাব যাহাতে কার্য্যে পরিণত না হয়, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশানের পক্ষ হইতে বাবু কৃষ্ণদাস পাল তৎসম্বন্ধে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া দেশবাসীকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। রামতনু লাহিড়ী মহাশয় ইংরাজদিগের একজন অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। ইংরাজরা যে কোনও অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। তিনি তাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় মনে করিতেন। কিন্তু মিষ্টার ষ্ট্রাচি যখন উচ্চশিক্ষার পথরুদ্ধ করিবার প্রস্তাব করেন, দেশের যে দুর্দ্দশা হইবে, তাহা স্মরণ করিয়া লাহিড়ী মহাশয় অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। ইংরাজ জাতির প্রতি তাঁহার যে বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল, তাহা যেন এই সময় একটু হ্রাস হইয়া পড়িয়াছিল। ষ্ট্রাচির প্রস্তাবের প্রতিবাদের জন্য কলিকাতায় এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার ন্যায় অমৃতবাজার পত্রিকাও উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন করিয়াছিলেন। শিশির-কুমারের মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমার মফঃস্বলে বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত অন্যায় বিধানের বিরুদ্ধে যুব সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। শিশিরকুমারও অমৃতবাজার পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণ দেশের জন্য কিরূপ

আকুল হইত, পাঠকবর্গকে তাহা অবগত করাইবার জন্য আমরা ১২৭৯ সালের ৭ই বৈশাখের অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে "উচ্চতরশিক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধের শেষ অংশটুকু উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

"হয়ত উচ্চশিক্ষা উঠিয়া গেলে আমরা উচ্চ রাজ কার্য্যের অনুরোধে ইংলণ্ডে গমন করিব, অথবা হয়ত ইহা দ্বারা দেশীয় লোকের অন্তর্নিহিত উৎসাহ ও বীর্য্যের উদ্দীপনা হইবে এবং আমরা নিজ ব্যায়ে দেশে উচ্চ-শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় সকল সংস্থাপন করিব। কিন্তু ইংলণ্ড আমাদের না, উহা ইংরাজদিগের। যদি আমাদিগকে পুনর্ব্বার অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন করা তাঁহাদের অভিপ্রায় হইয়া থাকে, যদি আমাদিগকে তাঁহারা চিরদিনের নিমিত্ত তাঁহাদের পদানত করিয়া রাখিতে প্রকৃত অভিলাষ করিয়া থাকেন, তবে ইংলণ্ডই বা আমরা কেমন করিয়া যাইব। যাঁহারা ইচ্ছা করিয়া আমাদিগকে উচ্চশিক্ষার ফলভোগ হইতে বঞ্চিত করিতে পারিলেন, তাঁহারা কি আমাদের ইংলণ্ড গমণের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিতে পারিবেন না? এ দেশেই বা আমরা কাহার বলে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিব? আমাদের ধন কোথায়? ইংরাজেরা যে আমাদিগকে নির্ধন করিয়া তুলিয়াছেন। আবার আর দুই চরিটি ট্যাক্স বসিলেই আমাদের হা অন্ন, হা অন্ন, করিয়া বেড়াইতে হইবে। আমরা আর একবার ভাবি যে উচ্চশিক্ষা যদিচ অন্তর্হিত হয়, উচ্চ রাজকার্য্য হইতে যদিচ আমরা বিচ্যুত হই, কিন্তু ফলশস্য প্রসবিনী ভারতভূমিকে কেহই অনুর্ব্বর করিতে পারিবে না। আমরা কৃষক হইব এবং এবং দেখি সে পথে অগ্রসর হইতে কে আমাদিগের প্রতিবন্ধক হয়। কিন্তু সত্যসত্যই কি আমাদের দেশে এই দুর্গতি হইবে? বাঙ্গালীর অসাধারণ বুদ্ধিশক্তির পরিমাণ কি এরূপ হইবে? আমাদের সকল আশা ভরসার পরিতৃপ্তি কি ধান্যের ক্ষেত্রে পরিসমাপ্ত হইবে! আমরা কি বঙ্গদেশীয় যুবকগণের বিদ্যা-বুদ্ধি বিকশিত মুখশ্রী আর দেখিব না? আমরা কি বিদ্যার

আলোচনায় বিপুল সুখের আস্বাদনে পাইব না? হা জগদীশ্বর! কি অপরাধ করিয়াছি যে আমাদের শেষে এইরূপ দুর্গতি হইবে।

"গভর্ণমেণ্ট উচ্চশিক্ষা উঠান, আমরা কি আর করিব? কিন্তু একবার তাঁহাদিগকে আমাদের দেখান কর্ত্তব্য আমরা উহা কত ভালবাসি, উহা আমাদের কত যতনের ধন। আমরা যদি চারি কোটি লোক একস্বরে চীৎকার করি, তাহা হইলে সে রবে ক্যাম্বেল সাহেব কর্ণপাত না করুন, বিদ্যারসাস্বাদী ইংরাজ জাতি কখনই বধির থাকিবেন না।"

সৌভাগ্য ক্রমে লর্ড নর্থব্রুক্ ভারতের বড়লাট ও স্যার রিচার্ড টেম্পল বঙ্গের ছোট লাট হইয়া আসিলেন। তাঁহাদেরই অনুগ্রহে এবং অমৃতবাজার পত্রিকা ও হিন্দু প্যাট্রিয়টের সমবেত যত্নে ও চেষ্টায় মিষ্টার স্টাচির প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

স্যার জর্জ্জ ক্যাম্বেলের পল্লী মিউনিসিপাল বিলের (Village Municipal Bill) প্রস্তাব উত্থিত হইলে শিশিরকুমার তাঁহার মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমারের সহিত মফঃস্বলে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া উক্ত বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার বলিতেন যে, পল্লীবাসিগণকে রাজনীতি শিখাইতে না পারিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হওয়া অসম্ভব। এই মহাসত্য আমাদিগের দেশের তথাকথিত রাজনীতি ব্যবসায়িগণ আজও বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা মনে করেন, কয়েকটি নগর লইয়াই বঙ্গদেশ। কিন্তু বঙ্গ দেশ যে কামার কুমারের, জোলে জোলার চাষা, লাঙ্গলিয়ার আবাস স্থান, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। শিশির কুমার ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ এ সম্বন্ধে লোকমতের প্রথম শিক্ষক ছিলেন। পল্লীগ্রামে যখনই কোন বিষয়ের আন্দোলন করা আবশ্যক হইত, হেমন্তকুমারই অগ্রণী হইয়া তাহার ভার গ্রহণ করিতেন। রোড সেস দ্বারা গভর্ণমেণ্ট রাস্তা ঘাট ইত্যাদি অনেকটা ভার দেশবাসীর উপর নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং মফঃস্বলে মিউনিসিপ্যালিটি প্রবর্ত্তিত হইলে গভর্ণমেণ্ট শিক্ষা, চিকিৎসা ও পুলিশের ব্যয় ভার দেশবাসীর উপর দিবেন, শিশিরকুমার ও

ও তাঁহার মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমার মফঃস্বলবাসিগণকে ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। লর্ড মেয়োর পর লর্ড নর্থব্রক্ যখন ভারতে বড় লাটের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তিনি প্রস্তাবিত পল্লী মিউনিসিপ্যাল বিলের অপকারিতা উপলব্ধি করিয়া তাহা বিধিবদ্ধ করিবার আদেশ প্রদান করেন নাই। বঙ্গের ছোট লাট বাহাদুর সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল এইজন্য পদত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি গুণবান্ পুরুষ হইলেও বঙ্গবাসীর হৃদয় অধিকার করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার শাসন পদ্ধতি লক্ষ্য করিয়া শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় বহুবিদ্রুপাত্মক কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত Political Geometry শীর্ষক প্রবন্ধটিই ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

POLITICAL GEOMETRY

CHAPTER I—DEF.

1. A political point is that which is visible to the Government but invisible to the people.

2. A line of policy is length without breadth of views.

3. A political figure is that which is enclosed in one side by ambition and another by hypocricy.

4. A political circle is a plane figure contained by one line of policy and is such that a certain point within this figure keeps the circumference firm and united.

5. And this point is called interest.

6. A political triangle is a wedge which is usually gently introduced at the beginning of any new impost.

7. Parallel lines are lines of policy which though they never meet always tend to the same direction.

CHAPTER II—postulates.

I. Let it be granted that any tax may be imposed upon any section or class of people without their permission.

2. Let it be granted that any measure may be introduced or withdrawn at the pleasure of the Government.

3. Let it be granted that any promise may be made or broken provided there be a nominal pretext at hand.

4. Let it be granted that a deficit may be shown where there is a surplus.

CHAPTER III—Axioms.

1. Might is always right.

2, England governs India for the good of the latter.

3. Things which have a black cover have also a black interior.

4. Things which have a white cover have a white interior.

5. Black can never be white, neither white black.

6. The promise or opinion of one individual is equal to the promise or opinion of the whole nation.

PROP. I—Problem.

Given a permanently settled revenue on land to draw a roadcess from it.

From the southernmost point of Bengal to the

northern most point describes the condition of the Zamindars. Promise 19 guns to Maharaja of Burdwan (post 3) and impose (post 1) an income tax. Take this point from which draw the cess and produce it to the ryots. For one Zamindar, the Raja of Burdwan, promised to pay the income tax and it is therefore binding on all Zamindars, (Ax. 6.). Then because as the roadcess is drawn from a point where the income tax intersects the permanent settlement, are therefore parallel and the roadcess is therefore drawn etc. etc. Q. E. F.

Obs. Latterly stifel attempted to prove this proposition by axiom Ist only.

Exercise on prof—I.

Given Road cess to find the educational cess, the Medical cess and other cesses.

প্রবন্ধটি বিদ্রূপাত্মক হইলেও, পাঠক, ইহা হইতে শিশিরকুমারের গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ক্রমশঃই অমৃতবাজার পত্রিকার প্রসার ও প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ইংরাজ সম্প্রদায় মধ্যে পত্রিকা এক অতি অদ্ভুত ভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহারা মনে করিতেন যে, ভারতবর্ষে বোধ হয় আবার একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে। বেনারসে মিষ্টার আয়রণ সাইড যখন জজ ছিলেন, তখন তিনি একবার চক্ষুপাড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। নানা চিকিৎসায় যখন কোনও ফল হইল না, তখন তিনি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র মহাশয়কে ডাকিয়াছিলেন। ডাক্তার মৈত্রের চিকিৎসা নৈপুণ্যে মিষ্টার আয়রন সাইড আরোগ্য লাভ করেন। এই চিকিৎসার সময় জজ সাহেব একদিন বলিয়াছিলেন, "ডাক্তার মৈত্র, আপনি কি অমৃত বাজার পত্রিকা ও

তাহার পরিচালক শিশিরকুমার ঘোষও তাঁহার সহোদরগণকে জানেন, শুনতে পাই তাহারা নাকি এক নূতন সম্প্রদায় গঠন করিয়া ভারত-বর্ষকে স্বাধীন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন ?"

আর একবার দ্বার ভাঙ্গায় একটী বাঁধ্ কাটা লইয়া মহাগণ্ড-গোল উপস্থিত হয়। নীলকরগণ বাঁধটী কাটিয়া দিবার চেষ্টা করিলে রহিতগণ তাহাকে আপত্তি করিয়াছিল। বাঁধ কাটিয়া জল বাহির করিয়া দিলে নীলকরদিগের নীলচাষের সুবিধা হইত বটে, কিন্তু তাহাতে রাইতগণের ধান চাষের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। বাঁধ কাটা লইয়া শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় রাইয়তগণ গভর্ণ-মেণ্টের নিকট বাঁধ রক্ষার সম্বন্ধে আবেদন করিলে, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, জনৈক পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর নীলকরগণ যাহাতে বাঁধ কাটিয়া দিয়া জল বাহির করিয়া না দেয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে আদেশ করিলেন। পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর বাঁধের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, নীলকরদিগের বড় সাহেব বহুসংখ্যক লোক লইয়া বাঁধ কাটিবার উপক্রম করিয়াছেন। তিনি সাহেবকে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন—"বল পূর্ব্বক বাঁধ কাটিলে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করিব।" বাঙালী ইন্‌স্‌পেক্‌টরের মুখে এই কথা শুনিয়া সাহেব ক্রোধে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। "কি ? একজন বাঙ্গালী ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেবকে গ্রেপ্তার করিবে ?"—অতি কর্কশস্বরে কথাগুলি বলিয়া সাহেব কোদাল লইয়া, স্বহস্তে বাঁধ কাটিতে আরম্ভ করিলেন। ইন্‌স্পেক্টর ও জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশের বলে তৎক্ষনাৎ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিলেন। অপমানে সাহেবের ক্রোধ দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু বিপদের আশঙ্কায় তিনি আর কোন কথা না বলিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। শেষে তিনি ইন্‌স্পেক্টরকে বলিয়াছেন,—"তুমি নিশ্চয়ই অমৃতবাজার পত্রিকার সম্প্রদায়ভুক্ত, তাহা না হইলে বাঙ্গালী হইয়া তুমি সাহেবকে গ্রেপ্তার করিতে কখনও সাহসী হইতে না। আমি

বাঙ্গালীর এরূপ স্পর্দ্ধা আর কখনও দেখি নাই।" ইন্‌স্পেক্টরটী অমৃতবাজার পত্রিকার একজন গ্রাহক ছিলেন বটে। এই সকল ঘটনা সামান্য হইলেও পত্রিকা সম্বন্ধে ইংরাজ সম্প্রদায়ের মনোগতভাব ব্যক্ত করে।

আমরা এইবার ইণ্ডিয়ান লীগ গঠনের কথা আলোচনা করিব। শিশিরকুমার কলিকাতায় আসার পর, ক্রমশঃ ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান-এসোসিয়শনের প্রধান প্রধান সদস্যগণেব সহিত পরিচিত হইলেন। উক্ত এসোসিয়েশণের কার্য্যপ্রণালী সম্যকরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া শিশিবকুমার বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইহা দ্বারা জন-সাধারণের প্রকৃত মঙ্গলজনক কার্য্যের আশা অতি অল্প। তিনি সভ্যগণের নিকট একটী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। এসো-সিয়েশনের সদস্যগণকে বাৎসরিক পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিতে হইত, সুতরাং সাধারণ লোকদিগের পক্ষে সভ্য হওয়ার সম্ভবনা ছিল না। যাহাদিগকে বাদ দিলে দেশের কোনও কাজ হওয়া সম্ভব নহে, শিশিরকুমার সেই মধ্য শ্রেণীর লোকদিগকে সভ্য হইবার সুযোগ প্রদানের জন্য বাৎসরিক চাঁদা পঞ্চাশ টাকা হইতে পাঁচ টাকা করিবার জন্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের সভ্যগণের নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। মহারাজা স্যাব যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা দিগম্বর মিত্র তাঁহার এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়াছিলেন; কিন্তু বাবু কৃষ্ণদাস পাল, অর্থাভাবে সমিতির অস্তিত্ব বিলোপের আশঙ্কায়, প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারেন নাই। ধনীসম্প্রদায় অনেক সময় দেশের কার্যে অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সাধারণ জনসম্প্রদায় যে আন্তরিকতা ও একাগ্রতার সহিত দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে বড় লক্ষিত হয না; শিশিরকুমার ইহা কৃষ্ণদাসকে বুঝাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার আরও বলিয়া-ছিলেন,—এসোসিয়েশনের চাঁদা পাঁচ টাকা নির্দ্ধারিত হইলে,

তিনি পঞ্চ সহস্র সভ্য সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার যুক্তিতর্ক শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণদাস বলিয়াছিলেন যে, সাধারণ লোক-দিগকে ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনকে প্রবেশাধিকার প্রদান করিলে অরাজকতার সৃষ্টি ও সেই সঙ্গে দেশের শান্তি চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইবে।

কর্ম্মী শিশিরকুমারের হৃদয়ে দেশের কার্য্য করিবার জন্য যে প্রবল ইচ্ছা একবার জাগিয়া উঠিত, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলে তিনি প্রাণে শান্তি পাইতেন না, সুতরাং হতাশ না হইয়া শিশিরকুমার একটী স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের সদস্যগণের সম্মতি গ্রহণ করিয়া তিনি সাধারণ জনসম্প্রদায় লইয়া একটি স্বতন্ত্র সমিতি গঠন করিবেন স্থির করিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে অমৃতবাজার পত্রিকার অফিসগৃহে একটী সভার অধিবেশন হয়। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি হাইকোর্টের বহু গণ্যমাণ্য উকিল এবং মফঃস্বল হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভায় স্থির হয় যে, দেশের প্রকৃত কার্য্য করিতে হইলে সাধারণ লোকদিগের সাহায্য গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক, সুতরাং প্রত্যেক জেলার সাধারণ লোকদিগকে লইয়া এক একটি সমিতি গঠন করিতে হইবে এবং এই সকল সমিতির কার্য্য পরিচালনার জন্য কলিকাতায় একটি কেন্দ্র সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কলিকাতায় একটি সভার অধিবেশন হইবে স্থির হইয়াছিল। প্রস্তাবিত সভায় কাহাকে সভাপতি করিবেন, শিশিরকুমার তাহা পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। সভাপতির কার্য্য অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ, যাঁহার প্রাণ স্বদেশের মঙ্গলের জন্য ব্যাকুল, যাঁহার কথায় দেশবাসীগণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে, এইরূপ একজন লোককেই সভাপতি মনোনয়ন করা কর্ত্তব্য। শিশিরকুমার এই জন্য বিদ্যাসাগর

মহাশয়কে সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এ কার্য্যের জন্য তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি কেহই ছিলেন না। অমৃতবাজার পত্রিকার অফিস গৃহের সভার অধিবেশনে যে সকল সভ্য উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা শিশিরকুমারের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তাঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া প্রস্তাবিত সভার সভাপতির পদগ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় অস্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, দেশবাসীর উপর তাঁহার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই, সুতরাং তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া কার্য্য করিতে পারিবেন না। তিনি বড় দুঃখেই এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিনেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রত্যাখ্যানে শিশিরকুমার ক্ষুণ্ণ হইলেন, কিন্তু ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। এই সময়ে তিনি জ্যেষ্ঠগ্রজ বসন্তকুমারের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিলেন। তিনি জাবিত থাকিলে শিশিরকুমারকে সহায়তা করিবার লোকের অভাব হইত না। যাহা হউক, তিনি মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমারের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সর্ব্বপ্রথমেই জেলা সমিতি গঠন করা স্থির করিয়া শিশিরকুমার মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে এবং হেমন্তকুমার ঢাকা অঞ্চলে গমন করিলেন। উভয় সহোদর বিভিন্ন জেলায় পরিভ্রমণ করিয়া জেলা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। জেলার অধিবাসিগণও তাঁহাদিগকে এই সমিতি গঠন কার্য্যে উৎসাহ প্রদান ও সহায়তা করিতে লাগিলেন। বড়লাট বাহাদুর লর্ড মেয়ো যেদিন ঘাতক হস্তে নিহত হইয়াছিলেন, সেই অশুভ দিনে ঢাকা জেলা সমিতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। সমিতি গঠন কার্য্যে শিশিরকুমারকে বহরমপুরে একটু কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সময় বহরমপুরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। স্থানীয় সাধারণ জনসম্প্রদায় শিশিকুমারকে সাহায্য করিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে বিপরীত ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সহানুভূতি

লাভের আশায় শিশিরকুমার প্রথিতনামা সাহিত্যিক স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। অক্ষয়বাবু শিশিরকুমারকে সঙ্গে লইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট অনুরোধ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, গুরু সাজিয়া বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে উপদেশ প্রদান করা শিশিরের কর্ত্তব্য নহে। জেলা সমিতি প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে জমিদার সম্প্রদায়কে দমন করা আবশ্যক। রাজকর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কখন প্রকাশ্য-ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন নাই। কিন্তু সাহিত্যের ন্যায় রাজনীতি সম্বন্ধেও তাঁহার কতগুলি দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার ছিল। সহজে তিনি তাহা ত্যাগ করিবার পাত্র ছিলেন না। যাহা হউক, তাঁহাকে শেষে শিশিরকুমারের নিকট পরাভূত হইতে হইয়াছিল। শিশিরকুমার ছাড়িবার লোকছিলেন না, তিনি নানা যুক্তিদ্বারা বঙ্কিমচন্দ্রের সহানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। বহরমপুরে সমিতি স্থাপনে শেষে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে বিশেষ সহায়তাই করিয়াছিলেন। হেমন্তকুমারেরও শিশিরকুমারের বিভিন্ন জেলায় পরিভ্রমণের ফলে মফঃস্বলবাসিগণ স্বদেশ সেবায় আপনাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

মফঃস্বলে আপনাদের কার্য্য সমাধা করিয়া হেমন্তকুমার ও শিশির-কুমার ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে কলিকাতার কেন্দ্র সমিতি প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে লাগিলেন। শিশিরকুমার দেশকাল বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে স্বয়ং অন্তরালে থাকিয়া এবং যাঁহার উপর শিক্ষিত সমাজের ভক্তি ও বিশ্বাস আছে, এরূপ ব্যক্তিকে অগ্রণী করিয়া কার্য্য করিলেই ফল লাভের অধিক সম্ভাবনা। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠার পর সুপ্রতিষ্ঠ আনন্দ-মোহন বসু মহাশয় ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ড গমন করিয়াছিলেন। তিনি এই সময় কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি স্বদেশীয় ও বিদেশীয়দিগের নিকট

যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার তাঁহার নিকট স্বীয় উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করিলেন। আনন্দমোহনেরও হৃদয় সাধারণ লোক-দিগের রাজনীতি চর্চ্চার সুবিধার জন্য একটি সমিতি গঠনের ইচ্ছা জাগিয়াছিল। তিনি শিশিরকুমারের প্রস্তাবে আনন্দের সহিত সম্মতি প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন ; "শিশিরবাবু, সর্ব্বপ্রথমে দেশবাসিগণের মধ্যে জ্ঞানের আলোক বিতরণ করিতে হইবে। কলিকাতার প্রত্যেক অংশে সভা করিয়া সাধারণ লোকদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করুন, পরে সমিতি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইবে"। শিশিরকুমারের কিন্তু ঠিক বিপরীত মত ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন যে, প্রথমে সমিতি গঠন না হইলে শিক্ষা বিস্তারের সুবিধা হইবে না ; সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার সভ্যগণের সহায়তায় সহজেই সাধারণ লোকদিগের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যাইবে। আনন্দমোহন এ প্রস্তাব সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। শিশিরকুমার তাঁহার পরামর্শ মত কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে সভা আহ্বান করিয়া বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যেখানে সভা হইত, প্রথমে সেখানকার লোকের খুবই উৎসাহ দেখা যাইত, কিন্তু সভার দুই দিন পরে সে উৎসাহ থাকিত না। প্রত্যেক পল্লীতেই এইরূপ হইতে লাগিল। ছয় মাস কাল অতিবাহিত হইলে শিশিরকুমার যখন দেখিলেন যে প্রকৃতই কোন কার্য্য হইতেছে না, তখন তিনি প্রথমে কেন্দ্র সমিতি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যে আনন্দমোহনকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন , কিন্তু আনন্দমোহন তাঁহার পূর্ব মতেরই পোষকতা করিলেন। আনন্দমোহনের তখন দেশে বেশ সুনাম বাহির হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার সহিত মতদ্বৈধ হইলেও শিশিরকুমার তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তখন কিছু করিতে সাহস করিলেন না।

শিশিরকুমার আনন্দমোহনের উপদেশমত আরও কিছু দিন কার্য্য করিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন যে কোনও ফলই হইতেছে না, তখন তিনি স্বীয় সংকল্প সাধনে ব্যস্ত হইয়া এক নতুন উপায় অবলম্বন

করিলেন। আনন্দমোহনের অজ্ঞাতে তিনি কলিকাতায় কেন্দ্রসমিতি প্রতিষ্ঠা করিবেন স্থির করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, সমিতি গঠনকার্য্য শেষ করিয়া আনন্দমোহনের নিকট তাহা ব্যক্ত করিলে তিনি নিশ্চয়ই সমিতির কার্য্যে যোগদান করিবেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যাশানাল রঙ্গমঞ্চে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। বাবু শম্ভূচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শম্ভূচন্দ্র কিছুকাল হিন্দুপেট্রিয়টের সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন। 'সমাচার হিন্দুস্থানী' মুখার্জ্জিস ম্যাগাজিন', রেইসও রাইরট' প্রভৃতি প্রত্রিকাও তিনি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়াছিলেন। আমেরিকার একটী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ডাক্তার উপাধি পাইয়াছিলেন। শম্ভুচন্দ্রের গুণে আকৃষ্ট হইয়া ত্রিপুরাধিপতি তাঁহাকে আপনার মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন! সভায় সমাগত সভামণ্ডলীর সম্মতি অনুসারে সাধারণ লোকদিগের জন্য একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল, ইহার নাম হইল "ইণ্ডিয়ান লীগ" ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন জমিদারদিগের ও ইণ্ডিয়ান লীগ সাধারণ জনসম্প্রদায়ের রাজনীতি চর্চ্চার কেন্দ্রস্থল হইল। লালবাজারের পুরাতন পুলিশ কোর্টের ঠিক দক্ষিণে যে পুরাতন বাড়ীতে বেরিনি কোংর ঔষধের দোকান ছিল, ইণ্ডিয়ান লীগের আফিস প্রথমে সেই বাড়ীতেই হয়। শেষে অফিস সেখান হইতে চিৎপুর রোডে বর্ত্তমানে আলবার্ট টেম্পল অব্ সায়েন্সে যে বাড়ীতে আছে, সেই বাড়ীতে আনা হইয়াছিল। বাবু শম্ভূচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান্ লীগের সভাপতি, হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিলবাবু কালীমোহন দাস সম্পাদক, বউবাজারের বাবু যোগেশচন্দ্র দত্ত সহযোগী ও শিশিরকুমার সহকারী সম্পাদক মনোনীত হইলেন। বলা বাহুল্য, পদগুলি অবৈতনিক। কলিকাতা ও মফঃস্বলের বহু সভ্রান্ত ব্যক্তিকে লইয়া একটী কার্য্য পরিচালন সমিতি গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু শিশিরকুমার যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা

হইল না। আনন্দমোহন ইণ্ডিয়ান্ লীগ প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাইয়া উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার সহচরগণও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। ক্রমে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ আরম্ভ হইল, যে মহৎ উদ্দেশ্যে ইণ্ডিয়ান লীগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া শিশিরকুমারের বিপক্ষদল তাহা ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিলেন না; কিন্তু তাঁহারা শিশিরকুমারকে লীগ হইতে তাড়াইবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন। তাঁহারা একটী সভা আহ্বান করিয়া স্থির করিলেন যে, লীগের সহকারী সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের উপর তাঁহাদের বিশ্বাস না থাকায় তাঁহারা শিশিরকুমারকে লীগের সহকারী সম্পাদকের পদত্যাগ করিতে অনুরোধ করিবেন। শিশিরকুমার তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা না করিলে তাঁহার লীগের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবেন। লীগের সভাপতিকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। শুনিবামাত্রই শিশিরকুমার সহকারী সম্পাদকের পদ পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইলেন, কিন্তু তাঁহার অনুরক্ত সহচরগণ কিছুতেই তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে দিলেন না। যাঁহার চেষ্টা ও পরিশ্রমে ও ইণ্ডিয়ান্ লীগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যিনি লীগের প্রাণস্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, বিনাকারণে তাঁহাকেই সমিতি হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা হইতেছে দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। শিশিরকুমার যখন লীগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সদস্যগণের বিশেষ অনুরোধে লীগের সহকারী সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করিলেন না, তখন আনন্দমোহন ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ লীগের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার ইহাতে মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইয়াছিলেন।

যে স্বায়ত্তশাসন লাভের আশায় আজকাল আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী আন্দোলন চলিতেছে, তাহা সর্ব্বপ্রথমে শিশিরকুমারের এবং তাঁহার ন্যায় দুই একজন চিন্তাশীল ব্যক্তির হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল। শিশিরকুমার ইণ্ডিয়ান লীগের ভিতর দিয়া স্বায়ত্তশাসন লাভের চেষ্টায় আন্দোলন করিয়া, ইণ্ডিয়ান লীগকে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর

প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসংকল্প হন। স্যার স্টুয়ার্ট হগের নাম অনেকেই অবগত আছেন। কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল মার্কেট ইঁহারই নামানুসারে হগ্ সাহেবের বাজার নামে পরিচিত। স্যার স্টুয়ার্ট হগ্ কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান এবং কলিকাতার পুলিশ কমিশনার ছিলেন। ইনি একজন জবরদস্ত কর্মচারী ছিলেন। স্বীয় ব্যবহারে হগ্ সাহেব কি এদেশীয়, কি ইউরোপীয় সকলেরই চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছিলেন। শিশিরকুমার কলিকাতাবাসিগণকে স্যার স্টুয়ার্টের অত্যাচারের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন। রাজকর্ম্মচারিগণেরও স্বার্থান্বেষিগণের একচেটিয়া আধিপত্যের হস্ত হইতে করদাতৃগণ যাহাতে অব্যাহতিলাভ করিতে পারেন, সেই চেষ্টায় শিশিরকুমার কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীতে নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত করিবার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। এই সময় স্যার রিচার্ড টেম্পল (Sir Richard Temple) বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়া এক নূতন বিধি প্রণয়নে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। স্বীয় সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে শিশিরকুমার ইণ্ডিয়ান লীগের পক্ষ হইতে একটী সভা আহ্বান করিবেন স্থির করিয়া সভাপতি শম্ভুচন্দ্রের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিলেও শম্ভুচন্দ্র নির্ব্বাচন প্রথার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া শিশিরকুমারকে শেষে সভার অধিবেশনের প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করিতে বলিয়াছিলেন। এই স্বায়ত্তশাসন লাভের চেষ্টায়ও শিশিরকুমারকে তাঁহার বিপক্ষ সম্প্রদায় বাধা প্রদান করিয়াছিলেন।

সভার অধিবেশন হইবে স্থির হইল বটে, কিন্তু কাহাকে সভাপতি মনোনীত করা হইবে, তাহা লইয়া বড়ই গণ্ডগোল চলিতে লাগিল। শম্ভুচন্দ্র কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী বাবু হীরালাল শীলকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন ;

কিন্তু হীরালাল বাবু তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। কাহাকে সভাপতি করা হইবে, ইহা লইয়া মহাগণ্ডগোল চলিতে লাগিল। শেষে লীগেরঅন্যতম সদস্য বাবু প্রাণ নাথ দত্ত ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউজ পত্রিকার তাৎকালিন সম্পাদক মিষ্টার জে, উইলসনের (Mr. J. Wilson) নাম উল্লেখ করিলেন। শম্ভুচন্দ্র কোন বিশেষ কারণে উইলসনের উপরই বড় প্রসন্ন ছিলেন না; তিনি তাঁহার নির্ব্বাচনে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। কিন্তু তাঁহার এই আপত্তি সত্ত্বেও শিশির-কুমার অন্যান্য সদস্যগণের অভিপ্রায় অনুসারে মিষ্টার উইলসনকেই প্রস্তাবিত সভার সভাপতি মনোনীত করিলেন। এই হইতে শম্ভুচন্দ্রও শিশিরকুমারের মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। ১৯৭৫ খৃঃ অঃ ২৩ অক্টোবর তারিখে বিডন ষ্ট্রীটের রঙ্গমঞ্চে এক সভার অধিবেশন হয়। ডাফ কলেজের অধ্যাপক বাগ্মীবর কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হাইকোর্টের উকিল বাবু অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কালীচরণের বক্তৃতায় সভায় তড়িৎ প্রবাহ ছুটিয়াছিল। কালীচরণ অতি ধীর, স্থির শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য লক্ষ্য করিয়া অনেক ইংরাজও মুগ্ধ হইতেন। অধ্যাপনা করিয়াই তিনি আনন্দ অনুভব করিতেন; রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগদান করিবার তাঁহার বড় আগ্রহ ছিল না। কিন্তু শিশিরকুমার তাঁহাকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে টানিয়া লইয়াছিলেন। কালীচরণ শিশিরকুমারকে তাঁহার রাজনৈতিক গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন। তিনি যাহাতে সভায় যোগদান না করেন, তাহারও বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টা সফলতা করিতে পারে নাই। এই সভার অধিবেশনের পর শিশির-কুমায়ের বহু চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফল ইণ্ডিয়ান লীগ দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল।

এই সভা সম্বন্ধে ২৫শে অক্টোবর তারিখের ইংলিশম্যান পত্রিকা লিখিয়াছিলেন—

"The monster gathering of the middle classes of the Native Community at the Beadon Street Pavilion on Saturday last is a sign of the times, the significance of which would be difficult to overrate. The meeting shows two things at least. It shows that a strong desire to be heard arising more'or less out of the dissatisfaction with the existing order the of things in this city, animates what in all civilized communities is the most important section of the public ; and it shows that the section of the public in question are not contented to have the care of their interest in the hands of a self seeking plutocracy. The meeting of Saturday is, in fact, the first marked sign of the awakening of the people on this side of India to political life. We have received several letters from natives, calling in question both the representative character of the meeting and the motives of those who called it. To our thinking, the manner and character of the attendance afford a sufficient answer to these insinuations."

ভাবার্থ—গত শনিবার বিডন ষ্ট্রীটের সভামণ্ডপে এদেশীয় মধ্যশ্রেণীর লোকদিগের যে বিশাল সম্মেলন হইয়াছিল, তাহা হইতে ছুইটি বিষয় বুঝিতে পারা যায়। প্রথম এই যে, বর্তমানে কলিকাতায় যে অবস্থা আছে, তাহাতে সাধারণ জনসম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা নাই, এবং দ্বিতীয় এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের মঙ্গলকর কার্য্যের ভার স্বার্থান্বেষী ধনাসম্প্রদায়ের হস্তে অর্পণ করিতে সম্মত নহেন। গত শনিবারের সভা এদেশীয় জনসাধণের রাজনৈতিক

অভ্যুত্থানের উদ্বোধন স্বরূপ। এদেশের অনেকে সভা আহ্বানকারী-গণের প্রতিনিধিত্বে ও তাঁহাদের উদ্দেশ্যে সন্দিহান হইয়া আমাদিগকে প্রতিবাদ পত্র পাঠাইয়াছেন। কিন্তু সভার জনতা লক্ষ্য করিলে তাঁহারা তাঁহদের সন্দেহ অমূলক বিনা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন।

উক্ত সভার অধিবেশনের সময় বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর স্যার রিচার্ড টেম্পল কলিকাতায় ছিলেন না; তিনি তখন পরিদর্শন কার্য্যে মফঃস্বলে ছিলেন। এই সময় অমৃতবাজার পত্রিকা ও হিন্দু পেট্রিয়টের মধ্যে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষিত হইত। ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ অমৃতবাজার পত্রিকার মধ্যে রাজদ্রোহিতার গন্ধ আঘ্রাণ করিতেন। স্যার রিচার্ড ও শিশিরকুমারকে প্রথমে রাজদ্রোহী বলিয়া মনে করিতেন; কিন্তু এই মফঃস্বল পরিভ্রমণের সময় তাঁহার সে ধারণা দূর হইয়াছিল। মফঃস্বলের অধিকাংশ লোকই যে অমৃতবাজার পত্রিকার পক্ষপাতী এবং ইহার সম্পাদক শিশিরকুমারের ভক্ত, ইহা স্যার রিচার্ড লক্ষ্য করিয়াছিলেন। যাঁহাকে দেশের জনসাধারণ ভালবাসে ও ভক্তি শ্রদ্ধা করে, সেই শিশিরকুমারকে ছোটলাল বাহাদুর একবার দেখিতে ইচ্ছা করেন। স্যার রিচার্ড মিউনিসিপ্যালিটীর সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যখন শুনিলেন যে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমারের উদ্যোগেই নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলনের জন্য ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে, তখন শিশিরকুমারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। স্যার রিচার্ড একদিন তাঁহার কয়েকজন বন্ধুকে লইয়া রোটাস্ নান স্টিমারে নদীবক্ষে প্রমোদ যাত্রা উপলক্ষে শিশিরকুমারকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মিরর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। লাটসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া শিশিরকুমার আদৌ পছন্দ করিতেন না। তিনি প্রথমে নিমন্ত্রণে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু যখন তাঁহার

অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, লাটবাহাদুর যখন তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তখন নিমন্ত্রণ রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, তখন শিশিরকুমার লাটবাহাদুরের প্রমোদ-যাত্রায় যোগদান করিলেন। ষ্টীমারে গিয়া একদিকে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, স্যার রিচার্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। লাটসাহেব নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয়গণের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। শিশিরকুমারকে তিনি পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই।তিনি মিরর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "—অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ কি আসিয়াছেন ?"

নরেন্দ্র—"হ্যাঁ, তিনি আসিয়াছেন ।"

স্যার রিচার্ড—"আমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার সহিত আমার পরিচয় নাই। আমি তাঁহার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা করি।"

নরেন্দ্র—"আমি তাঁহাকে আপনার নিকট আনিতেছি।"

নরেন্দ্রনাথ শশব্যস্তে শিশিরকুমারের নিকট গিয়া বলিলেন,— "বেশ, তুমি এদিকে চুপ করিয়া বসিয়া আছ, আর লাটসাহেব তোমার সহিত আলাপ করিবার জন্য তোমাকে খুঁজিতেছেন। চল, চল, শীঘ্র চল।" শিশিরকুমার একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন ; নরেন্দ্রনাথ তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া স্যার রিচার্ডের নিকট লইয়া গেলেন। যথারীতি অভিবাদনান্তর লাটসাহেব ও শিশিরকুমারের মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। স্যার রিচার্ড বলিলেন,— "শিশিরবাবু, আমি আপনার নাম শুনিয়াছি, কিন্তু আপনার সহিত আমার পরিচয় ছিল না। আপনিত কই কখনও আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন না।"

শিশির—"আমি অতি নগণ্য ব্যাক্তি। আমার ন্যায় সামান্য ব্যাক্তি লাটবাহাদুরের সহিত সাক্ষাতের যোগ্য নয় ; সেইজন্যই আমি আপনার নিকট আসি না।

স্যার রিচার্ড—"আপনি যে সামান্য ব্যক্তি নহেন, তাহা আমি মফঃস্বল পরিদর্শনের সময় জানিতে পারিয়াছি। মফঃস্বলের সাধারণ জনসম্প্রদায় বিশেষ আগ্রহ ও যত্ন সহকারে আপনার পত্রিকা পাঠ করে। এবং তাহারা আপনাকে অতিশয় ভক্তির চক্ষে দর্শন করে। আপনার সহিত আলাপ হওয়ায় আমি বিশেষ সুখী হইলাম।"

শিশির—"সেটা আমার পক্ষে যথেষ্ট সৌভাগ্যের কথা।"

স্যার রিচার্ড—"আচ্ছা শিশিরবাবু, আমার শাসনকালে আপনার দেশের কি কোন ক্ষতি হইয়াছে? প্রজাসাধারণ সুখে স্বাচ্ছন্দে বাস করিতেছে ত?"

শিশিরকুমার উত্তর করিলেন,—"যতদিন দশ আইন, (Rent law) প্রচলিত থাকিবে, ততদিন প্রজা ও জমিদারদিগের মধ্যে সদ্ভাব থাকিতে পারে না। কাজেই দেশবাসীগণ সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারিবে না।"

স্যার রিচার্ড—"দেশবাসীকে সুখী করিতে হইলে আপনার বিবেচনায় কি করা আবশ্যক?"

শিশির—"আপনারা যদি দেশবাসীগণের মধ্যে সুখ, শান্তি ও সন্তোষ প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে প্রথমে দশ আইন উঠাইয়া দিন। ইহা ব্যতীত অবিলম্বে স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করা কর্ত্তব্য।" শিশিরকুমারের উত্তর শুনিয়া স্যার রিচার্ড একটু বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি পুনরায় বলিলেন, "মিউনিসিপ্যালিটীতে নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলনের জন্য আপনি মহা আন্দোলন করিতেছেন দেখতে পাই। কিন্তু আপনারা কি বাস্তবিকই ইহার উপযুক্ত।"

শিশিরকুমার বিনয়পূর্ণ দৃঢ় স্বরে উত্তর করিলেন, "আমরা যে সম্পূর্ণ উপযুক্ত, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

এইরূপ কথোপকথন হইতে স্যার রিচার্ড টেম্পল শিশিরকুমারের সরলতা, দৃঢ়তা ও আন্তরিক স্বদেশ সেবার আকাঙ্খা ও অসাধারন

প্রতিভা লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। জলবিহার হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তিনি শিশিরকুমারকে বলিয়াছিলেন, "শিশিরবাবু, আপনি বেলভিডিয়ারে একদিন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, আপনার সহিত আমার অনেক কথা আছে।"

স্যার রিচার্ড টেম্পল যে একজন হৃদয়বান্ ইংরাজ ছিলেন, শিশিরকুমার তাঁহার সহিত কথা কহিয়াই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শিশিরকুমার পরদিন বেলভিডিয়ারে স্যার রিচার্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করেন। যেভাবে তিনি যশোহরে মন্‌রো সাহেব ও ওকিনিলী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, লাটবাহাদুরের সহিতও সেইভাবে দেখা করিবেন মনে করিয়াছিলেন। মন্‌রো ও ওকিনিলীর নিকট কার্ড পাঠাইবার ও প্রয়োজন হইত না; লাটসাহেবের নিকট কার্ড পাঠাইলেই যথেষ্ট হইবে, এই মনে করিয়া শিশিরকুমার আপনার একখানি কার্ড আৰ্দ্দালির নিকট দিয়া লাটসাহেবকে দিতে বলিলেন। আৰ্দ্দালি নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পারিল না। লাটসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে পূর্ব্বাহ্ণে যে পত্র লিখিয়া সময় স্থির করিয়া লইতে হয়, শিশিরকুমার তাহা ভাবেন নাই, আৰ্দ্দালি লাটসাহেবের নিকট কার্ড লইয়া গেল না দেখিয়া শিশিরকুমার বড়ই বিরক্ত হইলেন। তিনি চলিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় স্যার রিচার্ড হঠাৎ কোনও কার্য উপলক্ষে কক্ষের বাহিরে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র শিশিরকুমার তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন, "আপনি আসিতে বলিয়াছিলেন বলিয়াই আমি আসিয়াছি। আমি প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিতেছি। আপনার আৰ্দ্দালি বড় অশিষ্ট; পুনঃ পুনঃ বলা সত্ত্বেও সে আমার কার্ডখানি আপনার নিকট লইয়া গেল না।" কথাগুলি শুনিয়া ছোট লাটবাহাদুর বুঝিলেন যে, শিশিরকুমার মনে মনে বড়ই চটিয়া গিয়াছেন। শিশিরকুমারকে তিনি মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া বলিলেন,—"আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে

হইলে পূর্ব্বাহ্নে পত্রদ্বারা সময় স্থির করিয়া লইতে হয়। সকলেই যদি ইচ্ছামত আমার সহিত করিতে আগমন করেন এবং আমিও যদি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করি, তাহা হইলে এই প্রকাণ্ড বঙ্গদেশ শাসন করিবার সময় আমার কোথায় থাকে?" যাহা হউক, শিশিরকুমারকে সংগে লইয়া স্যার রিচার্ড উদ্যান ভ্রমণে বাহির হইলেন লাটবাহাদুর বড়ই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য প্রিয় ছিলেন। কিছুক্ষণ উদ্যান ভ্রমণে অতিবাহিত করিয়া উভয়ে শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

স্যার রিচার্ড বলিলেন,—"শিশিরবাবু, আমার যাহা কিছু উন্নতি, তাহা এই বঙ্গদেশ হইতেই হইয়াছে। আমার ইচ্ছা যে, এমন একটা কিছু করিয়া যাই, যাহাতে বঙ্গদেশে আমার নামটা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে।"

শিশির,—"আপনি কি করিতে চান?"

স্যার রিচার্ড—"নির্ব্বাচন প্রথার জন্য আপনি যে মহতী সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহার অধিবেশনের পর হইতে আমি সে সম্বন্ধে নানা অনুসন্ধান করিতেছি। আমার দুইটি ইচ্ছা আছে। প্রথম আপনাদিগকে নির্ব্বাচন প্রথা প্রদান; দ্বিতীয়—একটি শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। কিন্তু আমি যদি নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলন করি, তাহা হইলে ইউরোপীয় সম্প্রদায় ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্যগণ আমার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন করিবেন। আপনি যে অধিকার লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, তাহা প্রদান করিতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু আমি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কোন কোন সভ্যের সহিত কথা কহিয়া জানিয়াছি, তাঁহারা নির্ব্বাচন প্রথা চাহেন না।"

শিশির—"নির্ব্বাচন প্রথা চাহেন না। তাঁহাদের যুক্তি কি?"

স্যার রিচার্ড—তাঁহারা বলেন যে কলিকাতায় বিভিন্ন জাতীয় লোক বাস করে। নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত হইলে, কমিশনার

নির্ব্বাচনের সময়ে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিদ্বেষভাব জাগিয়া উঠিবে।”

স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ যে তাঁহার দেশবাসিগণের আপত্তি হইবে, শিশিরকুমার এ কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যগণ তাঁহার কোনও কার্য্যে সহায়তা করিবেন না, তিনি ইহাই জানিতেন। কিন্তু তাঁহারা শিক্ষিত হইয়া দেশের উন্নতির পথে অন্তরায় হইতেছেন, ইহা দেখিয়া শিশিরকুমার প্রাণে মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইয়াছিলেন। যাহা হউক শিশিরকুমার প্রাণস্পর্শী ভাষায় সার রিচার্ডকে বলিয়াছিলেন,—“আপনি যখন নির্ব্বাচন প্রথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, তখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ও ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের আন্দোলনের আশঙ্কায় আপনার পশ্চাদপদ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। আপনি আমাদিগকে স্বায়ত্তশাসনের এই অধিকারটুকু প্রদান করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যান ; আমরা সমগ্র দেশবাসী আপনার নিকট আজীবন কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিব।” শিশিরকুমারের কথাগুলি স্যার রিচার্ডের অন্তঃস্থল স্পর্শ করিয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া ছোট লাটবাহাতুর বলিলেন,—শিশিরবাবু, আমি সমস্ত দায়িত্বই স্বীয়স্কন্ধে গ্রহণ করিলাম, কিন্তু সাধারণ জনসম্প্রদায় যাহাতে আমাদের সহিত যোগদান করে, আপনি তাহার চেষ্টা করিবেন।” প্রত্যুত্তরে শিশিরকুমার বলিলেন—“প্রাণপণ চেষ্টা করিব। আর আশাকরি, বাবুহীরালাল শীলের সহায়তায় আমি কৃতকার্য্যও হইব।”

এইখানেই সেদিনের কথাবার্ত্তা শেষ হইল। ছোট লাটবাহাতুরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শিশিরকুমার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সময়েই উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। লাটবাহাতুরের সহিত কিরূপ আদব কায়দায় কথা কহিতে হয়, শিশিরকুমার তাহাতে অভ্যস্ত ছিলেন না। জ্যেষ্ঠাগ্রজ বসন্তকুমার

ও মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমারের সহিত তিনি যেভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন, সেই ভাবেই লাটসাহেবের সহিত কথা কহিয়াছিলেন। তাঁহার সরলতায় স্যার রিচার্ড সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ইহার পর হইতে শিশিরকুমার প্রায়ই ছোট লাটবাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। স্যার রিচার্ড ক্রমে শিশিরকুমারের এতদূর গুণপক্ষপাতী হইয়াছিলেন যে, অনেক সময় তিনি তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। এজন্য সময় সময় তিনি শিশিরকুমারের বাটীতে পর্য্যন্ত যাইতেন।* বলা আবশ্যক যে লাট দরবারে এইরূপ প্রতিপত্তির জন্য শিশির-কুমারের প্রতিদ্বন্দ্বিগণের অন্তর্দ্দাহ হইত।

বঙ্গের ছোট লাটবাহাদুরের নিকট কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলনের আশাপ্রাপ্ত হইয়া শিশিরকুমার তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের নিকট এই শুভ সংবাদ প্রদান করিলেন। সংবাদটী ক্রমশঃ তাঁহার বিপক্ষ দলের শ্রবণগোচর হইলে তাহারা শিশির-কুমারকে উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন যে' বাঙ্গালা সম্পাদককে স্যার রিচার্ড মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছেন। যাহা হইবার নহে, তাহা শিশির-কুমারের ন্যায় নগন্য ব্যক্তির চেষ্টায় কিরূপে হইবে? কিন্তু যখন প্রকাশ পাইল যে, স্যার রিচার্ড মিউনিসিপ্যালিটী সংস্কারের জন্য যে নূতন বিধি প্রণয়ন করিতেছেন, তাহাতে নির্ব্বাচন প্রথা Elective System) সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তখন ইউরোপীয় সম্প্রদায় ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যগণ বিস্মিত হইলেন। এসোসিয়েশনের অধিকাংশ সভ্যই মিউনিসিপ্যালিটীর

*কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি, স্বর্গীয় বাবু সারদাচরণ মিত্র শিশিরকুমারের পঞ্চম বার্ষিক স্মৃতি সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—"I Saw Sir Richard Temple at the humble Cottage of Shisir Kumar discussing with him questions relating to the Principal Constitution and it was in Shisir Kumar's Cottage that the embryo of the Municipal Constitiution of Calcutta was hatched."

কমিশনার ছিলেন; সুতরাং মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্য পরিচালনে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিশনের যে ক্ষমতা ছিল, তাহা লোপ পাইবার আশঙ্কায় বাবু কৃষ্ণদাস পাল, ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র প্রমুখ প্রতিভাশালী সদস্যগণ প্রস্তাবিত নির্ব্বাচন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট করদাতাদিগকে দুইএর তিন অংশ নির্ব্বাচনের ক্ষমতা প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্যগণ বলিতে লাগিলেন যে, আংশিক অধিকার প্রদান করিলে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই, এরূপ ক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্ট করদাতাদিকে কমিশনার নির্ব্বাচনের হয় সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করুন, নচেৎ আদৌ ক্ষমতা প্রদানের আবশ্যকতা নাই। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, এইরূপ অসম্ভব দাবি করিলে গভর্ণমেণ্ট নির্ব্বাচন প্রথা আদৌ পরিবর্ত্তন করিবেন না এবং তাহাতে তাঁহাদের মনস্কামনাও পূর্ণ হইবে। নির্ব্বাচন প্রথা যে মনোনয়ন প্রথা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহা এক্ষণে সর্ব্ববাদ সম্মত হইয়াছে। সুতরাং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যাগণের ব্যবহারে পাঠকের বিস্ময় হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। কোনও একটী নূতন প্রথার বা অনুষ্ঠানের সংগেই তাহার প্রতিবাদিগণের আবির্ভাব হয়। ইংলণ্ডে রেলওয়ে প্রবর্ত্তণের এমন কি গোল আলু ব্যবহারের সময়েও তুমুল আন্দোলন ও প্রতিবাদ হইয়াছিল। তাহার উপর স্বার্থে আঘাত পড়িলে উত্তেজিত হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নয়। যাহা হউক, আত্মপ্রধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় যাঁহারা স্বায়ত্তশাসনের প্রথম বীজ ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, ভগবান্ তাঁহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান লীগ্ নির্ব্বাচন প্রথার পক্ষে ও ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বিপক্ষে। উভয় সভার মধ্যে মতভেদের কারণ কি, তাহা পাঠকবর্গকে অবগত করাইবার জন্য আমরা ১৮৭৬ খৃঃ অঃ ১৭ই ফেব্রুয়ারির অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী উদ্ধৃত করিলাম।

"***লীগের প্রার্থনা অনুসারে ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি সম্বন্ধে একটী আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে ব্যবস্থা হইয়াছে যে কলিকাতার জাষ্টিশদিগের সংখ্যা ৭২ জন হইবে ; ইহার একভাগ গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করিবেন এবং দুইভাগ করদাতারা নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু এই আইনে কতকগুলি ধারা সন্নিবেশিত হইয়াছেন যাহাতে কোন কোন বিষয়ে জষ্টিশগণের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা অনেকটা সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি ক্ষমতা স্বহস্তে রাখিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট যদি ইচ্ছা করেন তবে এই ক্ষমতাবলে জাষ্টিশদিগের স্বাধীনতা অনায়াসে হরণ কি অকর্ম্মণ্য করিতে পারেন। এই আইনটি লইয়া ইণ্ডিয়ান লীগ ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সংগ্রাম। লীগের সভ্যেরা বলেন যে গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাবিত আইন দ্বারা যত কঠোর শাসনই প্রবর্তন করুন, কিন্তু ইহাতে করদাতৃদিগকে যে জাষ্টিশ নিয়োগ ও বিয়োগ করার ভার অর্পন করিতেছেন তাহার কোন ভুল নাই। সুতরাং আমরা ইহার দ্বারা মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যের কতক ভার প্রাপ্ত হইতেছি আমরা এখন যাহা প্রাপ্ত হইতেছি তাহা লইয়া সন্তুষ্ট হই। পরে অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি প্রাপ্ত হইবার যত্ন করিব। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যেরা বলেন যে, ইহা লইয়া আমরা কি করিব, যদি আমাদিগের হস্তে মিউনিসিপ্যালিটীর ভার অর্পণ করা হয়, তবে সম্পূর্ণরূপে দেওয়া হউক, আমরা অর্দ্ধ ক্ষমতা চাহি না। লীগের সভ্যেরা বলেন যে, কোনদেশে একেবারে সম্পূর্ণ কোন স্বত্ব প্রজারা গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রাপ্ত হয় নাই, ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন জাষ্টিশেরা গভর্ণমেণ্টের ভৃত্য, এখন গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে যাহাকে তাহাকে কমিশনার নিযুক্ত কি উহা হইতে বিচ্যুত করিতে পারেন। এই আইন প্রচলিত হইলে জাষ্টিশেরা করদাতৃদিগের ভৃত্য হইবেন। এখন গভর্ণমেণ্ট স্বকার্য্য সাধন উদ্দেশ্যে যতই ইচ্ছা জাষ্টিশ নিযুক্ত করিতে পারেন, এই

জাষ্টিশেরা গভর্ণমেণ্টের ভৃত্য এবং গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছামত কার্য্য করা স্বভাবত তাঁহাদেরই ইচ্ছা। তাঁহারা করদাতৃদিগের স্বার্থ অপেক্ষা গভর্ণমেণ্টের স্বার্থের দিকে অধিক দৃষ্টি করেন। এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে করদাতারা তাঁহাদের বিধাতা হইবেন, সুতরাং তাঁহারা করদাতৃগণের হিতাহিত চিন্তা করিবেন। করদাতারা আবার এরূপ ব্যক্তিকেই জাষ্টিশ পদে নিযুক্ত করিবেন, যিনি তাঁহাদের হিতাহিত দেখিবেন। যদি কোন জাষ্টিশ করদাতৃদিগের স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া গভর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করেন, করদাতারা তাঁহাকে ইচ্ছা পূর্ব্বক দূর করিয়া দিতে পারিবেন। সুতরাং এখন যেরূপ জাষ্টিশেরা স্বকার্য্য সাধনে উদাস দেখান এখন যেরূপ করদাতৃদিগের প্রতিনিধি হইয়া তাহাদের স্বার্থ বিস্মৃত হন, তখন আর কেহ পারিবেন না। তখন রবার্টস্ সাহেব কি তৎতুল্য কোন ব্যক্তি ভাইস্‌চেয়ারম্যান পদের আকাঙ্ক্ষী হইলে তিনি অনায়াসে তাহা পাইবেন। তখন বাবু কৃষ্ণ দাস পাল আর হগ্ সাহেবকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত কলিকাতার বাটীর ট্যাক্স বৃদ্ধি করিবারে প্রস্তাবে মত দিতে কেহ সাহস করিবে না অথবা গতবার যখন ভাইস্‌চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন তখন যেরূপ নানা ছলনা করিয়া মিউনিসিপ্যাল সভায় অনেক সভ্য অনুপস্থিত হন, তাহা করা আর কাহারও সাধ্য হইবে না। তখন করদাতারা প্রতি জাষ্টিশের কার্য্য মনোযোগপূর্ব্বক পরীক্ষা করিবেন এবং প্রতি জাষ্টিশ পদচ্যুত হইবার ভয়ে করদাতৃদিগকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিবেন। যদি করদাতারা ও জাষ্টিশেরা মিউনিসিপ্যাল কার্য্যের উন্নতির প্রতি এইরূপ মনোযোগ দেন, তাহা হইলে অচিরাৎ যে বিস্তর মঙ্গল হইবে তাহার কোন ভুল নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যেরা বলেন, যখন গভর্ণমেণ্টের হস্তে এরূপ ক্ষমতা থাকিতেছে যে তাঁহারা ইচ্ছা করলে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবেন তখন জাষ্টিশদিগের দ্বারা কি মঙ্গল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? তাঁহারা বলেন যে হয় জাষ্টিশদিগকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা হউক, নচেৎ

আমরা নাম দেখান ইলেক্‌টীবসিষ্টেম চাহি না। লীগের সভ্যেরা বলেন যে, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর উপর গভর্ণমেণ্টের চিরকাল অসীম ক্ষমতা রহিয়াছে, সুতরাং এখন তাঁহারা যে আইন করিয়াছেন তাহাতে আমাদের আর অধিক অনিষ্ট কি হইবে যে আমরা তাহার প্রতিবাদ করিব। গভর্ণমেণ্ট এখন ইচ্ছা করিলে কর বৃদ্ধি করিতে পারেন, এখন ইচ্ছা করিলেই ব্যয় করিতে পারেন। গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেন, আর টনিয়ার সাহেব ৩৫০০০ টাকা পুরস্কার পাইলেন। গভর্ণমেণ্ট রবার্টস্ সাহেবকে ভাইস্‌চেয়ারম্যান হইতে দিবেন না সংকল্প করিলেন, কেহ তাঁহাকে ভাইসচেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করিতে পারিলেন না। সেদিন ডাক্তার পেইনকে মাসে ২০০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করা হইল। গভর্ণমেণ্ট এরূপ শত শত স্থানে স্বেচ্ছাচারিতা দেখান এবং যখন এরূপ স্বেচ্ছাচার করেন, তখন কেহ উহা নিবারণ করিতে পারেন না। সেখানে প্রস্তাবিত আইন দ্বারা গভর্ণমেণ্ট যত ক্ষমতাই নিজ হস্তে গ্রহণ করুন, তাঁহাদের এখন যে ক্ষমতা আছে, তাহা অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা কিছুই নাই যাহা ইহা কর্ত্তৃক তাঁহাদের হস্তে অর্পিত হইতে পারে। তবে প্রস্তাবিত আইন দ্বারা গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে একটী গুরুতর স্বত্ব পরিত্যাগ করিতেছেন। এখন গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে যত ইচ্ছা তত জাষ্টিশ নিযুক্ত করিতে পারেন। গভর্ণমেণ্ট যদি ইচ্ছা করেন, তবে করদাতৃ-দিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী স্বাধীন জাষ্টিশ দিগকে দূর করিয়া তাঁহাদিগের স্থানে নিজের অনুগত লোকদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন। প্রস্তাবিত আইন প্রচলিত হইলে গভর্ণমেণ্ট ২৪ জন জাষ্টিশের অধিক নিযুক্ত করিতে পারিবেন না, অপর ৪৮ জন করদাতারা নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং যদি এই ৪৮ জন জাষ্টিশ করদাতৃদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হন, তাঁহারা যদি নিস্বার্থভাবে কলিকাতাবাসীদিগের হিতকামনা করেন, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট যতই স্বেচ্ছাচারী হউন, পরিণামে করদাতৃদিগের জয় হইবে। লীগ এই সমুদয় কারণে প্রস্তাবিত

আইনের পক্ষ অবলম্বন করিতেছেন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মতে এটী অন্যায় হইতেছে। লীগ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যদিগকে দয়া ধর্মের দোহাই দিয়া বলিতেছেন যে, যাহাতে দেশের লোকের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়, যাহাতে কলিকাতার করদাতৃদিগের পরিণামে মঙ্গল হয়, তাঁহারা যেন তাঁহারা বিরোধী না হন। লীগের পক্ষে কলিকাতার করদাতারা, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষে কলিকাতার জাষ্টিশ সাহেবেরা। করদাতারা দেখিতেছেন যে, এই আইন জারি হইলে তাঁহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে, তাঁহারা দেখিতেছেন যে, ইহা হইলে অকর্মণ্য স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতক জাষ্টিশেরা আর তাঁহাদের সর্ব্বনাশ করিতে পারিবেন না। তাঁহাদের যাহার উপর সম্পূর্ণ আস্থা আছে এরূপ লোককে তাঁহারা কমিশনার পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। অপর পক্ষের ভয় করিতেছেন যে করদাতার হস্তে জাষ্টিশ নিয়োগের ভার অর্পিত হইলে তাহাদের পদে স্থায়ী হইবে না। ইংরাজরা ভয় করিতেছে যে তাহা হইতে তাঁহারা এতকাল কলিকাতায় করদাতৃদিগের অর্থ লইয়া যেরূপে সুখে স্বচ্ছন্দে ছিলেন, পাছে তাহার প্রতিবন্ধক ঘটে। লীগ ও এসোসিয়েশনের ইহাই লইয়া তুমুল সংগ্রাম। একদিনে এক সময় দুই সভা তাঁহাদের নিজ নিজ মত সমর্থন করিবার নিমিত্ত করদাতৃদিগকে আহ্বান করেন। লীগ একাকা উদ্যোগ করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নিজে, সাহেবরা, সংবাদ পত্রের সম্পাদকরা সকলে একত্রিত হইয়া উদ্যোগ করেন। লীগ বিজ্ঞাপন দ্বারা, হ্যাণ্ডবিলের দ্বারা এবং প্ল্যাকাডের দ্বারা করদাতৃদিগকে আহ্বান করেন এবং ৪।৫ শত লোককে নিমন্ত্রণ করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যেরা কলিকাতার বাটী বাটী গিয়া ধন্না দেন, এসোসিয়েশনের যে সভ্যেরা কখন কোন স্থানে গমন করেন নাই তাঁহারাও বাটী বাটী ভ্রমণ করেন। অন্যন দশ হাজার নিমন্ত্রণ পত্র ইহারা বিলি করেন। ইঁহাদের দলস্থ সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা আর একটী কাজ করেন। যাহাতে লীগের

আহূত সভাতে লোক না যায় ইহারা এরূপ যত্ন করেন। মিরর প্রথমে লীগের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে চাহেন না। তিনি লীগের বিজ্ঞাপন প্রকাশ না করিয়া, এই বিজ্ঞাপন সংবাদ, সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া, অপর পক্ষকে বলিয়া দেন। তাঁহারা এই সংবাদ শুনিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। আবার তাহার পরে মিরর লেখেন যে লীগের সভ্যেরা ঈর্ষাপরবশ হইয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসো-সিয়েশনের দেখাদেখি আর একটী সভা আহূত করিতেছেন। মিরর তাহার পর বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। কিন্তু লীগের সভ্যেরা তাঁহাকে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে বলেন যে টাউনহলে সভা হইবে, তিনি বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করেন যে ন্যাশানাল থিয়েটারে সভা হইবে। ষ্টেট্‌সম্যান কলিকাতাবাসী লোককে মাথার দিব্য দিয়া নিষেধ করেন যে কেহ লীগের সভায় না যায়, আবার বিজ্ঞাপনে লিখেন যে থিয়েটারে সভা হইবে। লীগের বিপক্ষে এইরূপে নানা ব্যক্তি দণ্ডায়মান হন। দুই স্থানে নির্দ্ধারিত সময়ে সভা আরম্ভ হয়। এসো-সিয়েশন গৃহে দুই শত কি আড়াই শত লোক উপস্থিত হন। লীগের সভায় দুই হাজার লোকের অধিক আগমন করেন। লীগ গভর্ণমেণ্টকে আবেদন করিতেছেন যে, তাঁহাদিগকে তাঁহারা যে কমিশনার নিযুক্তের ভার দিতেছেন, তাঁহার নিমিত্ত তাঁহারা কৃতজ্ঞ হইলেন, তবে আইনে যে সমুদয় অনিষ্টকর বাধা আছে তাহা উঠাইয়া দিলে ভাল হয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বলিতেছেন যে, এখন যে আকারে ইলেক্‌টিব্‌ প্রণালী গভর্ণমেণ্ট দিতেছেন ইহা অপেক্ষা কলিকাতায় যে প্রণালীতে মিউনিসিপ্যাল কার্য্য হইতেছে তাহা মঙ্গলদায়ক, অতএব হয় সম্পূর্ণ ভার করদাতাদিগকে দেওয়া হউক, নচেৎ তাঁহারা কিছুই চান না। লীগের সভ্যেরা বলিতেছেন গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া যাহা দিতেছেন তাহা তাঁহারা কেন পরিত্যাগ করেন? এখন আটআনা প্রাপ্ত হইলে আবার আট আনা পাওয়া সহজ হইবে। একেবারে ষোল আনা চাহিলে কখনই পাওয়া যাইবে না। অপরন্তু

পক্ষেরা বলেন যে, ষোল না দিলে আমরা কিছুই লইব না। আমরা অন্নাভাবে মরিব সেও ভাল, তবু ষোল আনার কম গ্রহণ করিব না।। অথবা ইহাদের বিবাদের মূল এই। উভয়ই স্বীকার পাইতেছেন যে ইলেকটিব্ প্রণালী ভাল। লীগ বলিতেছেন যে ইলেক্‌টিব প্রণালী প্রদান করিয়া গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে বাধিত করিয়াছেন, তবে এই পাণ্ডুলিপির মধ্যে যে অনিষ্টকর অংশগুলি আছে তাহা পরিত্যাগ করিলে আমরা আরও কৃতার্থ হইব। এসোসিয়েশন বলিতেছেন যে, যদি অনিষ্টকর অংশগুলি পরিত্যক্ত না হয়, তাহা হইলে আমরা এরূপ ইলেক্‌টিব্ প্রণালী চাহি না। লীগ যেরূপ প্রার্থনা করিতেছেন, তাহাতে লেফ্‌টনাণ্ট গভর্ণর উপস্থিত আইনের উত্তম অংশ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ অনিষ্টকর অংশ করদাতাদিগকে প্রদান করিতে পারেন না ; কিন্তু এসোসিয়েশনের যেরূপ প্রার্থনা তাহাতে ইলেক্‌টিব প্রণালা না দিয়া গভর্ণমেণ্ট কেবল অনিষ্টকর অংশগুলি প্রদান করিতে পারেন।”

উক্ত প্রবন্ধে উল্লিখিত লীগের ও এসোসিয়েশনের সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। স্যার রিচার্ড টেম্পল যখন দেখিলেন যে নির্ব্বাচন প্রথার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে, তখন তিনি একদিন শিশিরকুমারকে ডাকিয়া বলেন,—“শিশিরবাবু, করদাতা-দিগের মধ্যে অধিকাংশই যে নির্ব্বাচন প্রথার পক্ষপাতী, একটী সভা আহ্বান করিয়া আপনি অবিলম্বে তাহা প্রমাণ করুন। নচেৎ নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত হওয়া অসম্ভব হইবে।” ছোট লাট বাহাদুরের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া শিশিরকুমার লীগের পক্ষ হইতে ১৮৭৬ খৃঃ অঃ ১২ই ফেব্রুয়ারি, শনিবার, টাউনহলে এক সভার বন্দোবস্ত করেন। এই সভায় রেভারেণ্ড কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং ডাক্তার স্যার রাসবিহারী ঘোষ, বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি হাই-কোর্টের উকিলগণ বক্তৃতা করেন। রাসবিহারী বাবুর বক্তৃতায়

*উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়ে*শনের গৃহে উক্ত *দিবস* বিরুদ্ধবাদীদিগের একটী সভা হইয়াছিল, তাহা উক্ত প্রবন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজা রমানাথ ঠাকুর বাহাদুর এই সভার সভাপতি ছিলেন। সার রিচার্ড স্থির করিয়াছিলেন যে, নির্ব্বাচন-প্রথার বিরুদ্ধবাদীদিগের সংখ্যা অপেক্ষা সমর্থনকারীর সংখ্যা যদি অধিক হয়, হইলে তিনি নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলনের আরও কোনও আপত্তি গ্রাহ্য করিবেন না। উভয় সভায় কিরূপ জনসমাগম হয়, তাহা দেখিবার জন্য তিনি অশ্বপৃষ্ঠে গুপ্তভাবে বহির্গত হইয়াছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বাড়ীর সন্মুখে একটু বেড়াইয়া তিনি শেষে টাউনহলের সম্মুখে উপস্থিত হন। উভয় স্থানের সভার জনতা লক্ষ্য করিয়া সার রিচার্ড নির্ব্বাচন প্রথা সম্বন্ধে স্বীয় কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। তিনি ভারতবর্ষের তদানীন্তন বড়লাট বাহাদুর লর্ড নর্থব্রুককে লিখিয়াছিলেন যে, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীতে নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত হওয়া উচিত। এই প্রস্তাবের সমর্থনে ও তাহার বিরুদ্ধে যে দুইটী সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে কিরূপ লোক সমাগম হইয়াছিল, তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। বিরুদ্ধবাদীদিগের সংখ্যা অতি অল্প, ছোটলাট বাহাদুর আরও লিখিয়াছিলেন যে, যে অধিকার লাভের জন্য জনসাধারণ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে, তাহা প্রদান করা গভর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যগণ যখন বুঝিতে পারিলেন যে, স্যার রিচার্ড টেম্পল্ কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীতে নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলনে স্থির সংকল্প হইয়াছেন, তখন তাঁহারা এসোসিয়শনের পক্ষ হইতে ছোটলাট বাহাদুরের নিকট কয়েকজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে মনস্থ করেন। ছোটলাট বাহাদুরের নিকট তাঁহারা তাঁহাদের অভিপ্রায় জানাইয়া তাঁহার সম্মতি প্রার্থনা করিলে স্যার রিচার্ড এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিগণের বক্তব্য শ্রবণে সম্মত হইলেন। এসোসিয়েশন

হইতে ষাটজন সভ্য নির্দিষ্ট দিনে বেল্‌ভিডিয়ারে ছোটলাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। প্রতিনিধির সংখ্যা দেখিয়া স্যার রিচার্ড অবাক্ হইয়াছিলেন। এইরূপ অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি আসিবেন, তিনি তাহা জানিতেন না, কিম্বা আশা করেন নাই ; সুতরাং সকলের বসিবার আসনেরও কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই প্রতিনিধি-গণের বসিবার আসন দিতে না পারায় ছোটলাট বাহাদুর দাঁড়াইয়া তাঁহাদের বক্তব্য শ্রবণ করেন। সভ্যগণ তাঁহাকে অপ্রতিভ করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া আপনারাই অপ্রতিভ হইয়াছিলেন। মিউনিসি-প্যালিটীর কমিশনার নির্ব্বাচনে করদাতাগণকে আংশিক অধিকারের পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা হউক, এবং তাহা যদি গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অসুবিধা হয়, তবে নির্ব্বাচন-প্রথার আদৌ আবশ্যক নাই, ইহাই প্রতিনিধিগণের বক্তব্য। বক্তব্য শ্রবণ করিয়া স্যার রিচার্ড টেম্পল মহোদয় যে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্যগণের অন্তস্থল বিদ্ধ করিয়াছিল। তাঁহাদের অভিপ্রায় তিনি পূর্ব্বাপরই অবগত ছিলেন। প্রত্যুত্তরে তিনি বলিয়া-ছিলেন যে, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভে যাঁহারা আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অন্তরে যে কোন একটা দুরভিসন্ধি নিহত রহিয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রতিনিধিসঙ্ঘ লজ্জায় অবনত মস্তক হইয়া রহিলেন। পর দিবস তাঁহারা লাট সাহেবের ব্যবহার ও তাব্র মন্তব্য লইয়া মহা আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। ইণ্ডিয়ান্ লীগের পক্ষ হইতেও ১৮৭৬ খৃঃ অঃ ২৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে ৩৮ জন প্রতিনিধি ছোটলাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছিলেন লীগ হইতে কতজন প্রতিনিধি যাইবেন, তাহা স্যার রিচার্ডকে পূর্ব্বে জানান হইয়াছিল ; সুতরাং লাট সাহেব তাঁহাদের বসিবার আসনের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন, লীগের প্রতিনিধিগণ এই প্রার্থনা করেন যে, গভর্ণমেণ্ট মিউনিসিপ্যালিটীতে কমিশনার নির্ব্বাচনের এক চতুর্থাংশ ক্ষমতা আপনাদিগের হস্তে রাখিয়া

অবশিষ্টাংশ করদাতাদিগের হস্তে অর্পণ করুন। তাঁহাদের এই প্রস্তাব যে সঙ্গত নহে, স্যার রিচার্ড তাহা তাঁহাদিগকে মিষ্টবাক্যে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

স্যার রিচার্ড টেম্পলের মিউনিসিপ্যাল বিল যখন ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হয়, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্যগণ কাউন্সেল দ্বারা উহার প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিয়া ছোট লাট বাহাদুরের সম্মতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে মিষ্টার ইংরাম প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজের আইনের অধ্যাপক ছিলেন। বিখ্যাত ওয়াবি কেসের সময় ইনি মিষ্টার এনেষ্টির সহযোগী ছিলেন। শেষে লাট সাহেবের সম্মতি ক্রমে চেম্বার অব্ কমার্স হইতে মিষ্টার জেনিংস, মিউনিসিপ্যালিটী হইতে মিষ্টার ব্রানস্‌ন এবং ইণ্ডিয়ান লীগের পক্ষ হইতে বাবু কালীমোহন দাস, ডাক্তার সার রাসবিহারী ঘোষ ও শিশিরকুমার প্রতিনিধি রূপে ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে ৪ঠা মার্চ্চ শনিবার ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচন-প্রথা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। ছোট লাট বাহাদুরের অনুপস্থিতিতে তদানীন্তন এড্‌ভোকেট্ জেনারেল (Advocate General) মিষ্টার পল্ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও প্রতিনিধিগণ ব্যতীত কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকও সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী বাবু যদুনাথ মল্লিকও ছিলেন। তিনি শিশিরকুমারকে সভাগৃহের এককোণে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "শিশিরবাবু, জানিনা স্যার রিচার্ড আপনাকে কোন্ মন্ত্রবলে বশীভূত করিয়াছেন!"

শিশিরকুমার হাসিয়া বলিলেন, "স্যার রিচার্ড আমাকে মন্ত্রবলে বশীভূত করিয়াছেন, এ কথা না বলিয়া আমিই তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছি বলুন না কেন?"

যদুবাবু,—"যাহা হউক, আপনি যে দেশের একটা কি গুরুতর

সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা এখনও বুঝিতে পারিতেছেন না।"

শিশির,—"স্বায়ত্ত শাসন লাভের অধিকারে যে আপনারা প্রতিবাদ করিবেন একথা আমি কখনও মনে স্থান দিতে পারি নাই। গভর্ণমেন্ট ও আমাদের নিকট হইতে কোনও অধিকার কাড়িয়া লইতেছেন না ; বরং আমরা একটী নূতন অধিকার লাভ করিতেছি। এরূপ ক্ষেত্রে আপনারা প্রতিবাদ করিতেছেন কেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

যদুবাবু,—"আমাদিগকে এই নূতন অধিকার প্রদানের ইচ্ছা দেখিয়া মনে হয় যে, ভিতরে গভর্ণমেণ্টের কোন দুরভিসন্ধি আছে।"

শিশির,—"কি দুরভিসন্ধি ?"

যদুবাবু,—"এখানে, এ সময়ে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা সুবিধা হইবে না, কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন যে, গভর্ণমেণ্টের ভিতরে ভিতরে একটা মতলব আছে।"

শিশিরকুমার দেখিলেন যে যদুবাবুর সহিত তর্ক করা বৃথা ; তিনি নিরস্ত হইলেন।

যথাসময়ে সভার অধিবেশনে প্রতিনিধিগণ আপন আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। নির্ব্বাচন প্রথার যে কত দোষ দেখান হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইণ্ডিয়ান্ লীগের প্রতিনিধিগণের মধ্যে বাবু কালীমোহন দাস সিনিয়র ছিলেন। তিনি নির্ব্বাচন প্রথার সমর্থনে বক্তৃতা করিতে উঠিয়া তাহার বিরুদ্ধে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ডাক্তার রাসবিহারী ও শিশিরকুমার শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা কালীমোহন বাবুকে সতর্ক হইবার জন্য ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। ডাক্তার ঘোষ ক্রোধে সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কালী মোহন বাবু যে দুরভিসন্ধি বশতঃ এইরূপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি তাঁহার বিপক্ষ সম্প্রদায়ের বক্তৃতা শুনিয়া স্বীয় বক্তব্য বিস্মৃত হইয়া তাঁহাদের মতের

পোষকতা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে শিশির কুমার দণ্ডায়মান হইলেন। শিশিরকুমারের সংগে একটী প্রকাণ্ড কাগজের বাণ্ডিল ছিল, তিনি সেই বাণ্ডিলটি টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন, "আমি বেশী কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। তবে সভাপতি মহাশয়কে একবার এই বাণ্ডিলটী দেখিতে অনুরোধ করি। ইহাতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার করদাতার স্বাক্ষর আছে, এবং তাহারা সকলেই নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলনের পক্ষপাতী। এরূপ অবস্থায় গভর্ণমেণ্ট যথা কর্ত্তব্য স্থির করুন।" সভাপতি মিষ্টার পল তখন বলিলেন যে, যে অধিকার লাভের জন্য পঞ্চাশ হাজার করদাতা আগ্রহ প্রকাশ করিতে-ছেন, তাহা মাত্র কয়েকজনের প্রতিবাদে, তাহাদিগকে প্রদান করিতে গভর্ণমেণ্ট অসম্মত হইতে পারেন না। গভর্ণমেণ্ট করদাতাদিগের প্রার্থনা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন। ইহার পর ২৫শে মার্চ্চ, শনিবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিউনিসিপ্যাল বিল পাশ হইয়া গেল।

শিশিরকুমারের বিপক্ষদল যখন দেখিলেন যে, তাঁহাদের আশা কিছুতেই পূর্ণ হইল না, শিশিরকুমার জয় লাভ করিলেন, তখন তাঁহারা মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। স্যার রিচার্ডের প্রস্তাবিত নূতন বিধি বিধিবদ্ধ হইলে তাহা যাহাতে কার্য্যকরী না হয় তাহারও বিশেষ চেষ্টা হইয়া-ছিল। বিপক্ষদলের ব্যবহারে শিশিরকুমার মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইয়া-ছিলেন। ইণ্ডিয়ান্ লীগের সভাগৃহে, কার্য্যপরিচালক সমিতির এক অধিবেশনে স্থির হইল যে, ১নং ওয়ার্ড হইতে শিশিরকুমার কমিশনার পদ প্রার্থী হইবেন এবং অন্যান্য ওয়ার্ড হইতেও যাহাতে বিশিষ্ট ভদ্র-লোকগণ কমিশনার পদপ্রার্থী হন, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। শিশিরকুমার পদপ্রার্থী হইলে কলিকাতা শোভাবাজারের সুপ্রসিদ্ধ রাজবংশের মহারাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। কলিকাতায় তখন মহারাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও মহারাজা স্যার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর বাহাদুর উভয়েই সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ কমলকৃষ্ণ

শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন সকল সময় বিশেষভাবে দেশের কার্য্যে যোগদান করিতে না পারিলেও, স্বদেশ সেবার আকাঙ্ক্ষা সর্বদাই তাঁহার হৃদয়ে বলবতী থাকিত। শিশিরকুমার কমলকৃষ্ণের এবং কৃষ্ণদাস যতীন্দ্রমোহনের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হন। কলিকাতায় আগমনের পর রাজা দিগম্বরের চেষ্টায় শিশিরকুমার কিরূপে মহারাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, পূর্ব্বে তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। কমলকৃষ্ণ একদিন শিশিরকুমারকে বলিলেন, "শিশির, মধ্যে মধ্যে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।" যে দিন এই কথা হইল, শিশিরকুমার ঠিক তার পরদিন হইতে মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া দিলেন। পরে একদিন সভায় উভয়ের সাক্ষাৎ হয় ; মহারাজ সভাপতি, শিশিরকুমার বক্তা। সভার কার্য্য শেষ হইলে মহারাজা বলিলেন, "শিশির, কই তোমাকে তো আর দেখিতে পাই না। আমি মধ্যে মধ্যে যে তোমাকে দেখা করিতে বলিয়াছিলাম।" শিশিরকুমার প্রত্যুত্তরে পরিহাস পূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজা দেখা করিতে বলিয়াছিলেন বলিয়াই দেখা করা বন্ধ করিয়াছি। যিনি আমাকে কৃপা করিতে ইচ্ছা করেন, আমি তাঁহার নিকট বড় কম যাই।" মহারাজা বাহাদুর উত্তর শুনিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, শিশিরকুমারের সহিত বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। যাহা হউক, পরদিবস শিশির কুমার মহারাজা বাহাদুরের বাটীতে উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "আমি দরিদ্র ; রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতীর্ণ ; এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণে যদি মনে করে যে শিশিরকুমার ঘোষ অর্থ সাহায্যের প্রত্যাশায় ধনী লোক দিগের নিকট গমনাগমন করে, তাহাতে আমার একটু দুর্নাম হইতে পারে। গতকল্য সভাস্থলে আপনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলায় আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলাম।" এই সময় হইতেই উভয়ের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। শিশিরকুমার ১নং ওয়ার্ড হইতে যাহাতে কমিশনার নির্ব্বাচিত হইতে পারেন, মহারাজা বাহাদুর তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।
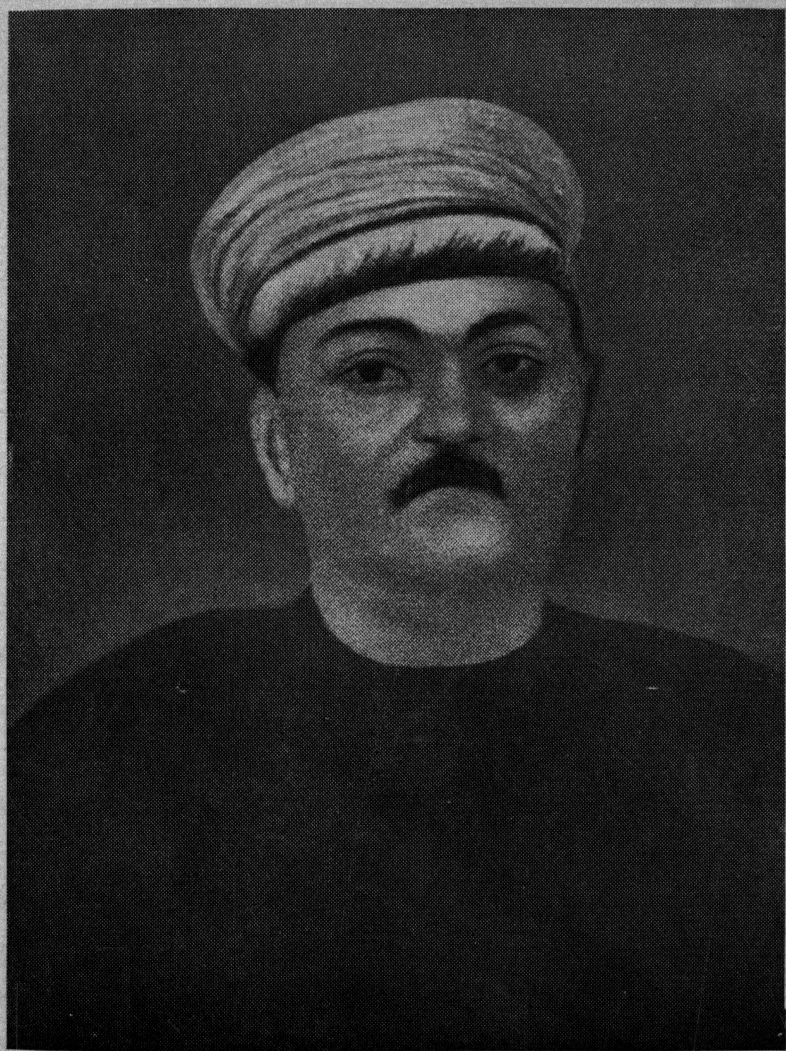
মহারাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীতে যাহাতে কোনও ভদ্রলোক কমিশনার পদপ্রার্থী না হয়, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্যগণ তাহার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কমিশনার হইয়াছিল। শিশিরকুমার ১নং ওয়ার্ড হইতে কমিশনার পদপ্রার্থী হইলে বাগবাজারের বাবু নন্দলাল বসু ও বাবু গোপাল লাল মিত্র তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান হন। শিশিরকুমারের বিপক্ষ দল তাঁহাকে একজন অশিক্ষিত ও নগন্য ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে নানা নিন্দাবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও তিনি স্যার রিচার্ড টেম্পলের অনুগ্রহে কলিকাতা মিউনিসি-প্যালিটীতে নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলনে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী না হইলেও তাঁহার পরিচালিত অমৃত-বাজার পত্রিকা সাধারণের আদরের জিনিস হইয়াছে, অনেকের নিকট ইহাই শিশিরকুমারের মহা অপরাধ ছিল। শিশিরকুমার বিলাসিতার বিরোধী ছিলেন। ছিন্ন পাদুকা ও সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তিনি সভাসমিতিতে যোগদান করিতে বিন্দুমাত্র লজ্জিত হইতেন না। তিনি অতিশয় তাম্বুলভক্ত ছিলেন; পানের ভগ্ন ডিবাটী তাঁহার সংগে সংগেই থাকিত। শিশিরকুমারের অন্য দোষ না পাইয়া তাঁহার বিপক্ষ দল তাঁহার বেশভূষার কথা লইয়া নানারূপ বিদ্রূপ করিতেন। শিশিরকুমারের দেহের বর্ণ উজ্জ্বল গৌর ছিল না; ইহাও তাঁহার অপরাধের মধ্যে পরিগণিত হইত। যুক্তরাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের নাম অনেকেরই নিকট পরিচিত। তিনি দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন না এবং বেশভূষার পরিপাট্যের দিকেও তাঁহার বিন্দুমাত্র লক্ষ্য ছিল না। একবার তিনি ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবার চেষ্টায় ভোট সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত এক স্থানে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সেই স্থানের একটী লোক বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "সমগ্র যুক্তরাজ্যে কি

ইহার অপেক্ষা আর যোগ্যতর ব্যক্তি নাই ?" কিন্তু এই আব্রাহাম লিঙ্কনই নিঃস্বার্থ স্বদেশ সেবার জন্য তাঁহার দেশবাসীর নিকট বরেণ্য হইয়াছিলেন ও আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ হইতে পারিয়াছিলেন। শিশিরকুমারের দেহের বর্ণ গৌর না হইলে কি হয়, তাঁহার সরলতা, চরিত্রের মধুরতাও আন্তরিক স্বদেশ প্রেম যে তাঁহাকে গুণগ্রাহীগণের নিকট বরেণ্য করিয়াছিল। শিশিরকুমার যাহাতে কমিশনার নির্ব্বাচত হইতে না পারেন, তাহার জন্য তাঁহার বিপক্ষ দল প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের চেষ্টা শেষে সফলও হইয়াছিল। মহারাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের চেষ্টায় শিশিরকুমার ১নং ওয়ার্ড হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। নির্ব্বাচনের দিন তাঁহার বিপক্ষ দল যখন বুঝিতে পারিল যে শিশিরকুমারকে পরাজিত করা অসম্ভব, তখন তাঁহারা এক আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, শিশিরকুমার পঞ্চাশ টাকা ট্যাক্স দেন না, সুতরাং তিনি কমিশনার পদপ্রার্থী হইবার যোগ্য নহেন। শিশিরকুমার তাঁহার ভাড়াটিয়া বাটীর জন্য পঞ্চাশ টাকা ট্যাক্স দিতেন, কিন্তু উক্ত টাকা তিনি তাঁহার বাটীর মালিকের মারফত দিতেন। শিশিরকুমার রসিদাদি বিচারক স্যার স্টুয়ার্ট হগের নিকট দাখিল করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। তিনি স্যার ষ্টুয়ার্টের চক্ষুঃশূল ছিলেন, এরূপস্থলে বিচার ফল যাহা হইয়াছিল তাহা পাঠকবর্গ সহজেই অনুভব করিতে পারেন। শিশিরকুমার কমিশনার হইবার যোগ্য নহেন, এই সংবাদ যখন প্রকাশ হইল, তখন তাঁহার বিপক্ষ দল তাঁহার সহিত যে যে অভদ্রজনোচিত ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিতে প্রবৃত্তি হয় না। শিশিরকুমারের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কতকগুলি লোক দলবদ্ধ হইয়া, পতাকা-হস্তে বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে শিশিরকুমারের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হন। শিশিরকুমারের উচ্চাভিলাষকে উপহাস করিয়া তাঁহাদের

মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার বাটীর সম্মুখস্থল বৃক্ষে আরোহন করিয়া পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। এই দলের অন্যতম নেতা বাবু গোপাল লাল মিত্র উত্তরকালে নির্ব্বাচিত কমিশনারগণের সহায়তায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস্ চেয়ারম্যানের পদলাভ করিয়াছিলেন। শেষে তিনি শিশিরকুমারের একজন অনুরক্ত ভক্ত হইয়াছিলেন। নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত না হইলে গোপালবাবুর ভাইস্ চেয়ারম্যান পদলাভ ঘটিত কিনা সন্দেহ। এই নির্বাচন প্রথা প্রচলনের জন্য কলিকাতাবাসিগণ আজীবন স্যার রিচার্ড টেম্পল ও শিশিরকুমারের নিকট ঋণী থাকিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

শিশিরকুমারের আন্তরিক অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক যত্নে ইণ্ডিয়ান্ লীগের দ্বারা কিরূপে এলবার্ট টেম্পল অব সায়েন্স (Albert Temple of Science) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল আমরা এক্ষণে তাহা বিবৃত করিব। ১৮৭৫ খৃঃ অঃ স্বর্গগত সম্রাট সপ্তম এড্ওয়ার্ড যখন যুবরাজরূপে ভারতবর্ষ পরিদর্শনে আগমন করেন, তখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিশনের সভ্যগণ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। মহারাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও তেওতার রাজা শ্যামশঙ্কর রায় বাহাদুর শিশিরকুমারকে বলেন যে, ইণ্ডিয়ান্ লীগেরও পক্ষ হইতে যুবরাজের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। ইণ্ডিয়ান্ লীগের সভাপতি শম্ভুচন্দ্র প্রস্তাব করেন যে লর্ড ক্যানিংএর পত্নীর নামানুসারে যেরূপ লেডি ক্যানিং মিষ্টান্ন হইয়াছে, সেইরূপ কলিকাতার ময়রাদিগের দ্বারা এক প্রকার উৎকৃষ্ট সন্দেশ প্রস্তুত করাইয়া তাহার নাম এর্লবার্ট সন্দেশ দেওয়া হউক। আমাদিগের দেশের নেতৃপদলোলুপ ব্যক্তি-গণ অনেক সময় কিরূপ শিশুজনোচিত প্রস্তাব করেন, ইহা তাহার একটী দৃষ্টান্ত। শিশিরকুমার শম্ভুচন্দ্রের প্রস্তাব শুনিয়া হাস্যসংবরণ করিতে পারেন নাই। স্যার রিচার্ড টেম্পল, কলিকাতায় একটী শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা, শিশিরকুমারের নিকট প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। যুবরাজের সম্মানার্থ আতসবাজি পোড়াইয়া অনর্থক অর্থব্যয় করা অপেক্ষা তাঁহার ভারত ভ্রমণ চিরস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে শিশিরকুমার দেশে একটী শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবেন মনে করিলেন। তিনি তাঁহার এই অভিপ্রায়ে মহারাজা বাহাদুর কমলকৃষ্ণ ও রাজা শ্যাম শঙ্করের নিকট জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন। শিশিরকুমারের উদ্দেশ্যে যে অতি মহৎ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। কিন্তু

এরূপ বৃহৎ ব্যাপার কার্য্যে পরিণত করা ইণ্ডিয়ান লীগের পক্ষে সম্ভব কিনা, মহারাজা বাহাদুর ও রাজা বাহাদুর তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। একটী শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে লক্ষাধিক টাকার প্রয়োজন, কিন্তু লীগের পক্ষে এত অর্থ সংগ্রহ করা তাঁহাদের নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে লাগিল। শিশিরকুমারের নিকট কিছুই অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইত না। তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্রজেন্দ্রকুমার রায়ের নিকট শুনিয়াছিলেন, বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর যদি একটু ইঙ্গিত করেন, তাহা হইলে ময়মনসিং-এর জমিদারবাবু হরিশ্চন্দ্র রায় দেশে শিক্ষা বিস্তারকল্পে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিতে পারেন। ব্রজেন্দ্রকুমারের নিবাস ঢাকার অন্তর্গত বলিয়াটী গ্রামে। তাঁহার বৈষয়িক অবস্থান ভাল ছিল। যৌবনে কলিকাতায় আসিয়া তিনি প্রথমে ঘোর বিলাসী হইাছিলেন, কিন্তু শেষে শিশিরকুমারের সংস্পর্শে আসিয়া একজন প্রকৃত স্বদেশসেবক হইয়া উঠিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি একজন ধার্ম্মিক পুরুষ হইয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্রকুমার সাধারণতঃ দিগুবাবু নামেই পরিচিত। প্রস্তাবিত শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব-প্রথমে দিগুবাবুই পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হন।

শিশিরকুমারের মধ্যমাগ্রজ এই সময় বাবু ধনপত্ সিং-এর দেওয়ান বাবু কেদার নাথ সিংহের নিকট জানিতে পারেন যে, ধনপত্ ও তাঁহার সহোদর লছমীপত্ প্রত্যেকে বহরমপুর কলেজের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিবেন, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার ম্যাকেঞ্জির নিকট এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য শিশিরকুমার বাবু হরিশ্চন্দ্র, বাবু ধনপত্ ও বাবু লছমীপতের নিকট হইতে দেড়লক্ষটাকা হস্তগত করিবেন স্থির করিলেন। ছোট লাট বাহাদুর স্যার রিচার্ড টেম্পলের শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা আছে জানিয়া শিশির তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিবেন স্থির করিলেন। যুবরাজের কলিকাতায় আসিবার ঠিক পূর্ব্বদিন রাত্রি

নয় ঘটিকার সময়, শিশিরকুমার বেল্‌ভিডিয়ারে স্যার রিচার্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিলেন। তিনি আপনার কার্ড উপরে পাঠাইয়া দিলেন; সাধারণের ন্যায় শিশিরকুমারকে ছোট লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পূর্ব্বাহ্নে পত্র লিখিয়া সময় নিরূপণ করিতে হইত না। তিনি যখনই ইচ্ছা তখনই লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন। রাত্রি নয় ঘটিকার সমর দারুণ শীতে, শিশিরকুমার দেখা করিতে আসিয়াছেন জানিয়া স্যার রিচার্ড ভাবিলেন, নিশ্চয়ই বিশেষ কোন কার্য্য আছে, সাক্ষাৎ হইলে উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করা হইল :—

শিশির—"যুবরাজ আগামীকাল আসিবেন; আপনি সম্ভবতঃ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য অতি প্রত্যূষেই ডায়মণ্ডহারবার যাইবেন।"

স্যার রিচার্ড,—"হ্যাঁ, আমি অতি প্রত্যূষেই রওনা হইব।"

শিশির,—"যুবরাজ কলিকাতায় পদার্পণ করিলে আপনার সহিত আর সাক্ষাতের সুযোগ হইবে না, সেইজন্য এত রাত্রিতে আপনার নিকট আসিতে বাধ্য হইয়াছি।"

স্যার রিচার্ড,—"কি প্রয়োজন বলুন।"

শিশির—"যুবরাজের এই ভারত ভ্রমণ ব্যাপারটী আমারা চির-স্মরণীয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।"

স্যার রিচার্ড,—"কি উপায়ে?"

শিশির,—"আমাদের দেশে কোন শিল্প বিদ্যালয় নাই, তাহা আপনি জানেন। আপনার মনেও এদেশে একটি শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা আছে। আমরা দেশের এই অভাবটি দূর করিবার ইচ্ছা করিয়াছি।"

স্যার রিচার্ড—"প্রস্তাবটি খুবই ভাল, কিন্তু তাহাতে যে অনেক টাকার প্রয়োজন হইবে।'

শিশির,—"আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া একটু সাহায্য করেন, তাহা হইলে অতি সহজেই অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে।"

স্যার রিচার্ড,—"আমাকে কি করিতে হইবে বলুন।"

শিশির,—"প্রসিদ্ধ ধনী লছমীপত্‌ ও তাঁহার সহোদর ধনপত্‌ এবং ময়মনসিং-এর জমিদার বাবু হরিশ্চন্দ্র রায়, ইঁহারা প্রত্যেকের দেশের জনহিতকর কার্য্যের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে সম্মত আছেন। আপনি যদি তাঁহাদের একটু ধন্যবাদ প্রদান করেন, তাহা হইলে উক্ত টাকা পাওয়া খুবই সহজ হইবে।"

স্যার রিচার্ড,—"এ আর বেশি কথা কি—এই দানের জন্য নিশ্চয়ই আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিব।"

শিশির—"আপনাকে আর একটী কার্য্য করিতে হইবে।"

সার রিচার্ড—"কি বলুন।"

শিশির—"আপনাকে বলিতে হইবে যে, উক্ত অর্থ শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য দান করিলে দেশের একটি বহুদিনের অভাব মোচন হইবে এবং দেশের যথেষ্ট উপকার হইবে।"

স্যার রিচার্ড একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তাহাতে আমার কোনও আপত্তি নাই। দাতাগণ যদি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে আপনার কথামত অনুরোধ করিতে পারি।"

শিশির,—"আপনি ত কাল অতি প্রত্যুষেই ডায়মণ্ডহারবারে গমন করিবেন। আপনার সহিত তাহা হইলে তাঁহারা সাক্ষাৎ করিবেন কখন? এখন রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকা। আপনি যদি হরিশ্চন্দ্র, ধনপত্‌ ও লছমীপত্‌কে আগামী কল্য প্রাতে ছয় ঘটিকার পূর্ব্বে আপনার সহিত এখানে সাক্ষাৎ করিবার জন্য পত্র লেখেন, তাহা হইলে আমি সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে পারি। তাঁহারা সকলেই কলিকাতায় আছেন।" শিশিরকুমারের অনুরোধ শুনিয়া স্যার রিচার্ড হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "শিশিরবাবু, আপনার সকল কার্য্যই অদ্ভুত দেখিতেছি। যে সকল ভদ্র লোকের সহিত আমার পরিচয় নাই, তাঁহাদিগকে পত্র লেখা কি আমার পক্ষে

সঙ্গত ?" কিন্তু শিশিরকুমারের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করা কঠিন। তাঁহার নিকট স্যার রিচার্ডের কোনও যুক্তিতর্ক টিকিল না। রাত্রি দশটা বাজিল, শিশিরকুমার কিছুতেই ছোট লাট বাহাদুরকে ছাড়িলেন না। স্যার রিচার্ড বাধ্য হইয়া হরিশ্চন্দ্র, ধনপত্ ও লছমীপত্‌কে পর দিবস প্রাতে ছয় ঘটিকার সময় তাঁহার সহিত বেল্‌ভিডিয়ারে সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়া এক একখানি পত্র লিখিলেন। শিশিরকুমার আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা না করিয়া পত্র তিনখানি লইয়া হরিশ্চন্দ্র, লছমীপত্ ও ধনপতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন, এই আনন্দে সেই রাত্রিতে তাঁহাদের নিদ্রা হইল না, সাজসজ্জার আয়োজনেই রজনী অতিবাহিত হইল। রাত্রি চার ঘটিকার পর শিশিরকুমার সকলকে লইয়া বেল্‌ভিডিয়ার অভিমুখে রওনা হইলেন। তখনও প্রভাত হয় নাই, এমন সময় শিশিরকুমার হরিশ্চন্দ্র, ধনপত ও লছমীপত্‌কে সংঙ্গে লইয়া বেল্‌ভিডিয়ারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা পৌঁছিবামাত্র একজন আরদালি তাঁহাদিগকে লইয়া লাট বাহাদুরের শয়ন কক্ষের সম্মুখের বারান্দায় বসিবার আসন প্রদান করিল। দ্বার উন্মোচন করিয়া স্যার রিচার্ড চক্ষু মুছিতে মুছিতে শয়ন-কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন। যথারীতি অভিবাদনান্তর সকলে আপন আপন আসন গ্রহণ করিলেন। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক তিনটীর মধ্যে কেহই ইংরাজী জানিতেন না এবং ছোট লাট বাহাদুর ও বাঙ্গালা কিংবা হিন্দী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে যে সকল কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল, শিশিরকুমার অনুবাদ করিয়া তাহা পরস্পরকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। স্যার রিচার্ড বলিলেন,—"আপনাদের দেশে শিল্প বিদ্যালয় নাই। যুবরাজের ভারত-ভ্রমণ চিরস্মরণীয় করিবার জন্য যদি আপনারা একটী শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, তাহা হইলে যুবরাজের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের সংগে দেশের একটী মহৎ উপকার হইবে। আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, আপনারা দেশের জনহিতকর

কার্য্যে অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত। আপনারা শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যদি সেই অর্থ প্রদান করেন, আমি বিশেষ আনন্দিত হইব।"

অনুবাদকরূপে শিশিরকুমার লাটসাহেবর কথাগুলি হরিশ্চন্দ্র, ধনপত ও লছমীপত্‌কে বুঝাইয়া দিলের। হরিশ্চন্দ্র পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দান করিতে প্রস্তুত হইলেন। ধনপত্‌ প্রথমে একটু আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি বহরমপুর কলেজের জন্য অর্থ সাহায্য করিবেন বলিয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জানাইয়াছেন, এখন যদি তিনি তাঁহার সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন। শিশিরকুমার হাসিয়া ধনপত্‌কে বুঝাইয়া বলিলেন, "জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছোটখাট বাহাদুরের একজন অধীন কর্ম্মচারী মাত্র। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের মনস্তুষ্টির জন্য আপনি বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুরের অনুরোধ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। ধনপত্‌ শেষে চল্লিশ হাজার টাকা দান করিতে সম্মত হইলেন। শিশিরকুমারের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। এইরূপে অর্থ সম্বন্ধে সফলকাম হইয়া শিশিরকুমার শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও দাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিবার জন্য একটী সভা আহ্বান করিলেন এবং স্যার রিচার্ডকে সেই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। যুবরাজের কলিকাতায় অবস্থান কালে তাঁহাকে ব্যস্ত থাকিতে হইবে, ইহা জানিয়াও ছোট লাট বাহাদুর শিশির কুমারের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন। ছোট লাট বাহাদুরের সভাপতিত্বে ১৮৭৫ খ্রীঃ অঃ ১৫শে ডিসেম্বর তারিখে ন্যাশানাল রঙ্গমঞ্চে এক মহতী সভার অধিবেশন হইবে, এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। স্যার রিচার্ডের অভিপ্রায় অনুসারে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসো-সিয়েশনের সদস্য গণকে সভায় যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সভার দিন ছোট লাট বাহাদুর স্বীয় শরীর রক্ষকগণের সহিত বেল্‌ভিডিয়ার হইতে ধর্ম্মতলা পর্য্যন্ত অশ্বপৃষ্ঠে আগমন করেন।

সেখানে শিশিরকুমার দিগুবাবুর গাড়ী লইয়া তাঁহার জন্যে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া স্যার রিচার্ড সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। শিশিরকুমার নিকটে থাকিলে ছোট লাট বাহাদুর তাঁহারই সহিত কথাবার্ত্তা কহিবেন, তাহাতে লীগের অন্যান্য সদস্যগণের তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ হইবে না, এই ভাবিয়া শিশিরকুমার অদৃশ্য হইলেন। স্যার রিচার্ড কিন্তু তাঁহার সন্ধান করিতে লাগিলেন ; শেষে তিনি তাঁহাকে ডাকাইয়া আপনার পার্শ্বে উপবেশন করিতে বলিলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে ছোটলাট বাহাদুর ইণ্ডিয়ান লীগের সদস্যগণকে তাঁহাদের সাধু চেষ্টার ও হরিশ্চন্দ্র, ধনপত্‌ ও লছমীপত্‌, দিগুবাবু প্রভৃতি দাতৃবর্গকে তাঁহাদের দানের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। বিদ্যালয়ের নাম হইল এলবার্ট টেম্পল অব সায়েন্স (Albert Temple of Science) স্যার রিচার্ড বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গভর্ণমেণ্ট হইতে বাৎসরিক ৮০০০, টাকা সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমরা এইখানেই বলিয়া রাখি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্যগণ আপনাদিগকে উপেক্ষিত ভাবিয়া এই সভায় যোগদান করেন নাই।

ইণ্ডিয়ান লীগের কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ার সংগে সগে ইহার সভাপতি পরিবর্তনের আবশ্যকতা উপলব্ধি হইতে লাগিল। শিশিরকুমার লীগের অন্যান্য সদস্যের সহিত পরামর্শ করিয়া রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লীগের সভাপতি মনোনীত করিবেন স্থির করিলেন। কৃষ্ণমোহনের তখন শিক্ষিত সমাজে বিপুল প্রতিপত্তি ছিল। স্বীয় অধ্যবসায় বলে তিনি সংস্কৃত, আরবী পার্শি, হিব্রু, উর্দ্দু, হিন্দী, বাঙ্গালা, ইংরাজী, লাটিন, গ্রীক, উড়িয়া, তামিল, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষক ও সদস্যরূপে তিনি নব্যসম্প্রদায়ের গুরুস্থানীয় ছিলেন। শিশিরকুমার একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লীগের

সভাপতির পদগ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে কৃষ্ণমোহন বলিয়াছিলেন, "আগামী বারে লীগের যে সাধারণ অধিবেশন হইবে, আমি তাহাতে উপস্থিত থাকিব। লীগের কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমি আমার অভিমত প্রকাশ করিব।" কৃষ্ণমোহনের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শিশিরকুমার ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, কবিবর হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি হাইকোর্টের উকীলদিগের নিকট গমন করিয়া বলিলেন,—"আগামী অধিবেশনে কৃষ্ণমোহন আমাদের লীগের কার্য্য দেখিতে আসিবেন বলিয়াছেন, সকলেই উক্ত অধিবেশনে অবশ্য অবশ্য উপস্থিত থাকিতে হইবে।" সভার অধিবেশনের দিনে কৃষ্ণমোহন লীগের সভ্যগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া লীগের সভাপতির পদগ্রহণ করিলেন। কিন্তু শিশিরকুমার যে আশায় তাঁহাকে লীগের মধ্যে টানিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না। শিশিরকুমার জন্মাবধি আশা, উৎসাহ ও তেজস্বিতায় পূর্ণ ছিলেন। দেশের কার্য্য করিবার জন্য নির্য্যাতন বা উৎপীড়ন তাঁহার নিকট উপেক্ষিত হইত। রাজকর্ম্মচারীদিগের অসন্তোষ ভাজন হইবেন, এই ভয়ে তিনি কর্তব্য কর্ম্ম হইতে বিচলিত হইতে পারিতেন না। কিন্তু কৃষ্ণমোহনের প্রকৃতি অন্যরূপ ছিল। বয়োগুণে তাঁহার তেজস্বিতা হ্রাস পাইয়াছিল এবং সকল বিষয়েই তিনি রাজপুরুষদিগের মুখাপেক্ষা করিতেন। ইণ্ডিয়ান লীগের পক্ষ হইতে গভর্ণমেণ্টের কোনও কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা হইলে কৃষ্ণমোহন সভ্যগণকে প্রতিবাদে নিরস্ত করিতেন। লছমীপত্ সিং এলবার্ট টেম্পল্ অব্ সায়েন্সর জন্য স্বায় প্রতিশ্রুতি চাঁদা চল্লিশ হাজার টাকা দান করিলে কৃষ্ণমোহন এত অর্থ লীগের হস্তে রাখা কর্ত্তব্য নয় স্থির করিয়া শিশিরকুমারের অজ্ঞাতে তাহা শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টরের নিকট প্রেরণ করেন। কৃষ্ণমোহনের এই ব্যবহারে শিশিরকুমার মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইয়াছিলেন। শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টর মিষ্টার উড্রোর এলবার্ট টেম্পল অব্ সায়েন্সর প্রতি বিশেষ

সহানুভূতি ছিল। আন্তরিক ইচ্ছা না থাকিলেও তিনি বাধ্য হইয়া উক্ত টাকা লইয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান লীগের সভাপতি কৃষ্ণমোহনের কাণ্ড দেখিয়া ধনপত্ তাঁহাকে প্রতিশ্রুত চল্লিশ হাজার টাকা দান করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি কিন্তু উক্ত টাকার বার্ষিক সুদ ১৫০০, দেড় হাজার টাকা প্রতি বৎসরের দান করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। শেষে তিনি হরিশ্চন্দ্রের প্রতিশ্রুত পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা আদায় করিয়া আপনার নিকট রাখিলেন। কৃষ্ণমোহন জানিতে পারিয়া এই টাকাও গভর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিবার জন্য শিশিরকুমারকে অনুরোধ কয়িয়াছিলেন, কিন্তু শিশিরকুমার তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। ধনপত্ সুদের ১৫০০৲ পনের শত টাকা মাত্র এক বৎসর দিয়াদিলেন। এই সময় স্যার রিচার্ড টেম্পলের কার্য্য দক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বোম্বাই-এর গভর্ণরের পদে উন্নীত করিয়াছিলেন, তাঁহার স্থলে স্যার এস্‌লি ইডেন্ বাঙ্গালীর ছোটলাটের পদে নিযুক্ত হন।

স্যার রিচার্ড টেম্পল শিশিরকুমারকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন বলিয়া তাঁহার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী মিষ্টার সি, ই, ব্যাকল্যাণ্ড প্রথমে বড়ই বিরক্ত হইতেন। কিন্তু শিশিরকুমার ব্যাকল্যাণ্ডের সহিত কোনরূপ অসদ্ব্যবহার না করিয়া কিরূপে তাহাকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন, আমরা এক্ষণে তাহা উল্লেখ করিব। শিশিরকুমার ইচ্ছামত লাটবাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বেল্‌ভিডিয়ারে গমন করিতেন। লাটবাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে পূর্ব্বে সময় ঠিক করিয়া লইতে হয়, ইহাই সাধারন নিয়ম; কিন্তু শিশিরকুমারের প্রতি এ নিয়ম প্রযোজ্য ছিল না। রাত্রি নয় ঘটিকার সময় তিনি বেল্‌ভিডিয়ারে উপস্থিত হইলে স্যার-রিচার্ড তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেন। শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে লাটসাহেব শিশিরকুমারের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, ইহা

মিষ্টার ব্যাক্‌ল্যাণ্ডের নিকট অসহ্য বোধ হইত। অন্তরে বিদ্বেষভাব থাকিলেও ব্যাক্‌ল্যাণ্ড বাহিরে তাহা প্রকাশ করিতেন না। একদিন শিশিরকুমার স্যার রিচার্ডের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় চীফ্ সেক্রেটারী কতকগুলি কার্য্য লইয়া ছোটলাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বেল্‌ভিডিয়ারে উপস্থিত হন। ছোটলাট বাহাদুরের নিকট সংবাদ পাঠান হইলে তিনি চীফ্ সেক্রেটারীকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন। একঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইলে শিশিরকুমারের প্রস্থানের পর চীফ্ সেক্রেটারী লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রাইভেট্ সেক্রেটারী মিষ্টার ব্যাক্‌ল্যাণ্ড এই সকল কারণে শিশিরকুমারের উপর বড়ই বিরক্ত ছিলেন। একদিন তিনি আর তাঁহার ক্রোধ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। শিশির-কুমারে বেল্‌ভিডিয়ারে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, "আপনি কি পূর্বাহ্নে লাট বাহাদুরকে পত্র লিখিয়া আপনার আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া সময় নিরূপণ করিয়াছেন ?"

শিশির—"না।"

ব্যাক্—"আপনি কি এ নিয়ম অবগত নহেন ? আপনি যখনই ইচ্ছা সাক্ষাৎ করিতে আসেন দেখিতে পাই। আপনি কি আপনাকে ছোটলাট বাহাদুরের পরিবারভুক্ত বলিয়া মনে করেন ?"

শিশির—"আজ আমি বিশেষ প্রয়োজনে আসিয়াছি। আমার সহিত সাক্ষাৎ করা না করা লাট বাহাদুরের ইচ্ছাধীন। যাহা হউক আমি ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইব ; আপনি আজ অনুগ্রহ করিয়া আমার কার্ডখানি উপরে পাঠাইয়া দিন।

সেদিন মিষ্টার ব্যাক্‌ল্যাণ্ড বিশেষ কিছু না বলিয়া কার্ডখানি লাট সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কার্ড পাইবামাত্র স্যার রিচার্ড শিশিরকুমারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কথাবার্ত্তা শেষ হইলে শিশিরকুমার যখন বিদায় গ্রহণ করেন, তখন তিনি ছোটলাট বাহাদুরকে বলিলেন, "আপনার প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর কথায়

বুঝিলাম যে, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবার পূর্ব্বে পত্র দ্বারা সময় নিরূপণ না করায় আপনাকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।" শিশিরকুমারের কথা শুনিয়া স্যার রিচার্ড বিরক্তির সহিত বলিলেন, "আমার সুবিধা অসুবিধার কথা বিচার করিবার মিষ্টার ব্যাক্‌ল্যাণ্ডের কোনও প্রয়োজন নাই। আপনি স্বীয় স্বার্থ সাধনের অভিপ্রায়ে না আসিয়া আমাকে যে শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে সহায়তা করিতে আগমন করেন, আমার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী বোধ হয় তাহা অবগত নহেন। আপনি সাক্ষাৎ করিতে আসিলে আমার কোনও অসুবিধা হয় না, তবে অসময়ে আসিলে আপনাকে একটু অপেক্ষা করিতে হয়, এবং তাহাতে একটু কষ্টভোগও করিতে হয়। যাহা হউক, আপনি আমার সহিত যেমন সাক্ষাৎ করিতে আসেন, সেইরূপই আসিবেন। আশাকরি আপনি মিষ্টার ব্যাকল্যাণ্ডের কথায় দুঃখিত হইবেন না।" শিশিরকুমার বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে শিশিরকুমার আর একদিন স্যার রিচার্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বেল্‌ভিডিয়ারে উপস্থিত হইলে মিষ্টার ব্যাক্‌ল্যাণ্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি আপনি পত্র লিখিয়া সময় স্থির করিয়া আসিয়াছেন?"

শিশির—"না।"

শিশিরকুমারের উত্তর শুনিয়া প্রাইভেট্ সেক্রেটারী সাহেব ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি ধারন করিলেন। তাঁহার ভাব লক্ষ্য করিয়া শিশিরকুমার বিনীত ভাবে বলিলেন, "বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত দেখা করিতে আসি না। আর লাট সাহেবও আমাকে বলিয়াছেন যে, আসিবার পূর্ব্বে সময় স্থির করিবার প্রয়োজন নাই।" কথাগুলি শুনিয়া মিষ্টার ব্যাক্‌ল্যাণ্ড আরও ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রূঢ়স্বরে বলিলেন, "আপনি কি তাঁহার কোনও সেক্রেটারী যে ইচ্ছামত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন? লাট বাহাদুর নিতান্ত ভাল মানুষ, তাই তিনি লজ্জায় কোনও কথা বলিতে পারেন না।

আপনি যেদিনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, সেদিন তাঁহার আর কোন কাজই হইবে না। নিষ্কর্ম্মা লোকেরা যাহাতে তাঁহার মূল্যবান সময় নষ্ট করিতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আমার কর্ত্তব্য। আপনাকে আমি কিছুতেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিব না।" কথাগুলি শুনিয়া শিশিরকুমার মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। তিনি সেক্রেটারী সাহেবকে উত্তেজিত না করিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন, "কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী-সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয় আলোচনার জন্য, স্যার রিচার্ডের অনুরোধ মতো আমি আজ আসিয়াছি। তিনি স্বয়ং আমাকে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেও যে আমাকে পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ দিয়া সময় স্থির করিতে হইবে, তাহা আমি জানিতাম না। ভবিষ্যতে আমি আর কখনও নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিব না। আজ যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার কার্ডখানি উপরে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে বাধিত হইব।" মিষ্টার ব্যাক্‌ল্যাণ্ড কোনও কথা না বলিয়া একটু চিন্তা করিয়া কার্ডখানি লাট সাহেবের নিকট পাঠাইলেন। স্যার রিচার্ড কার্ডখানি পাইবামাত্রই শিশিকুমারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দুইদিন বাধা প্রাপ্ত হইয়া শিশিরকুমার উপরে যাইবার সময় চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, তিনি প্রায়ই সাক্ষাৎ করিতে আসেন বলিয়া ছোটলাট বাহাদুর কি তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছেন? মিষ্টার ব্যাক্‌ল্যাণ্ড কি তাঁহারই আদেশমত তাঁহার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিতেছেন। শিশিরকুমার সকল কথা স্যার রিচার্ডকে বলিবেন স্থির করিলেন। লাট বাহাদুরের নিকট উপস্থিত হইয়াই তিনি বলিলেন, "আপনি আমাকে সুবিধামত আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদেশ করিয়াছেন বলিয়াই আমি আপনার নিকট আসি। আসিবার পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া সময় স্থির করি না বলিয়া আপনার বোধহয় বড়ই অসুবিধে হয়। আমার আগমনে যদি বিরক্ত হন কিম্বা অপমানবোধ করেন, তাহা হইলে আমাকে

তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিলে আমি সাবধান হইতে পারি।" মিষ্টার ব্যাক্‌ল্যাণ্ডের সহিত তাঁহার দুইদিন যেরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তিনি তাহা যথাযথ বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারী কথার ভাবে অনুমান হয় যে, তিনি যেন আপনারই অভিপ্রায়ে, আমাকে অপমানিত করিবার জন্য আমার প্রতি রূঢ়ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকেন।" শিশিরকুমারের কথাগুলি শ্রবণ করিয়া স্যার রিচার্ড একটু হাসিয়া বলিলেন, "শিশিরবাবু, মিষ্টার ব্যাক্‌ল্যাণ্ড আপনার সহিত যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি বাস্তবিকই দুঃখিত। আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন বলিয়া আমি যে বিরক্ত হইব, ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। আমার কার্য্যে সহায়তা ও আমাকে সৎপরামর্শ দান করিবার জন্যই আপনি আগমন করেন, এজন্য আমি আপনার নিকট চিরবাধিত। যাঁহারা স্বার্থসাধনের অভিপ্রায়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তাঁহাদিগকেই পূর্ব্বে পত্র লিখিয়া সময় ঠিক করিয়া লইতে হয়। আপনি এতদিন আমার নিকট আসিতেছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত একদিনও আপনার নিজের কোনও কথা বলেন নাই। আপনি পুনর্ব্বার যখন সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, মিষ্টার ব্যাক্‌ল্যাণ্ড কোনরূপ আপত্তি করিলে আপনি তাঁহাকে বলিবেন যে স্যার রিচার্ড টেম্পল বলিয়াছেন যে তিনি তাঁহার সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা করিবেন এবং তিনি মিষ্টার ব্যাক্‌ল্যাণ্ডের বিনা সাহায্যে আপনাকে রক্ষা করিতে সক্ষম।" শিশিরকুমার যথারীতি অভিবাদনান্তর প্রস্থান করিলেন। বঙ্গের শাসন কর্ত্তার উপর তাঁহার যেরূপ প্রভাব ছিল, তাহাতে তিনি ইচ্ছা করিলে মিষ্টার ব্যাক্‌ল্যাণ্ডেকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। ভালবাসা দ্বারাই তিনি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন পশুশালা (Zoological Gardens) প্রতিষ্ঠিত হইলে মিষ্টার ব্যাক্‌ল্যাণ্ড তাহার সম্পাদক মনোনীত হইয়াছিলেন। শিশিরকুমার ধনপতের নিকট হইতে

পশুশালার উন্নতিকল্পে ছয় হাজার টাকা আদায় করিয়া ব্যাক্‌ল্যাণ্ডের হস্তে অর্পন করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে শিশিরকুমার ও মিষ্টার ব্যাক্‌ল্যাণ্ডের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল।

কার্য্যদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ গভর্ণমেণ্ট স্যার রিচার্ড টেম্পলকে বাঙ্গালার ছোটলাট বাহাদুরের পদ হইতে বোম্বাই-এর শাসনকর্ত্তার পদে উন্নীত করিয়াছিলেন, পাঠকবর্গ তাহা অবগত আছেন। নূতন কার্য্যে যোগদান করিবার জন্য স্যার রিচার্ডকে শীঘ্রই কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল; সেইজন্য সময়ের সঙ্কীর্ণতা নিবন্ধন বঙ্গবাসিগণ তাঁহার সুশাসনের নিমিত্ত ধন্যবাদ প্রদান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার অবসর পান নাই। শিশিরকুমারের সহিত স্যার রিচার্ডের কিরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহা পাঠকবর্গ সম্যক্ অবগত আছেন। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট বাহাদুরকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিবার জন্য শিশিরকুমার, বাগ্মীবর বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় (দিগুবাবু) বোম্বাই যাইবেন স্থির হইল। বোম্বাইএ সান্ধ্যমিলন ও অভিনন্দন পত্র প্রদান উপলক্ষে প্রায় চৌদ্দ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই টাকার অধিকাংশই দিগুবাবু এবং কতক মহারাণী স্বর্ণময়ী প্রদান করিয়াছিলেন।

শিশিরকুমার, কালীচরণ ও দিগুবাবুর সহিত বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে, সার রিচার্ড পুণায় অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার লাট বাহাদুরের জন্য বোম্বাইয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তত্রত্য বহু সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তির সহিত তাঁহাদের পরিচয় হইয়াছিল। ইঁহাদিগের মধ্যে বেহ্রামজী মালাবারী অন্যতম ছিলেন। উত্তরকালে ইনি এক জন সমাজ সংস্কারক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ইংরাজী ভাষায় ইঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। অধ্যাপক মোক্ষমূলরের হিবার্টলেক্‌চার্স ইনি ভারতীয় বহু ভাষায় অনূদিত করাইয়াছিলেন। শিশিরকুমার প্রভৃতি যেদিনই বোম্বাইয়ে পদার্পণ

করেন, মালাবারী সেইদিনই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলাপ করেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহাদের সহিত অবস্থান করিতেন। মালাবারী তখন ছাত্রাবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন মাত্র। আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি, তখনো বোম্বাইএ স্যার মঙ্গলদাস নাথুভাই বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। শিশিরকুমার একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, লাটবাহাতুরের অভ্যর্থনার নিমিত্ত, এক দিনের জন্য, তাঁহার বাংলোখানি ছাড়িয়া দিবার অনুরোধ করিলে স্যার মঙ্গলদাস সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন যে, লাট বাহাতুর এদেশীয় কোন সান্ধ্যসম্মিলনে যোগদান করিবেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হয় না। বোম্বাইবাসিগণ সে সময় লাট বাহাতুরকে সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা কোন উচ্চতর জীব বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাকে ভারতীয় কোন সান্ধ্যসম্মিলনে উপস্থিত করা তাঁহারা অসম্ভব বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু শিশিরকুমার নিশ্চিন্ত ছিলেন। এই সময় কালীচরণ একটী সামাজিক বিষয় লইয়া এক বক্তৃতা প্রদান করেন; তাঁহার বাগ্মিতা উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

শিশিরকুমারের সহিত স্যার মঙ্গলদাসের ক্রমশঃই ঘনিষ্ঠতা হইতে লাগিল। এই সময় আমাদের দেশের কোন কোন নেতা ভারতবাসীগণের সিবিল সার্ভিস্ পরীক্ষায় প্রবেশাধিকারের বিষয় লইয়া ঘোরতর আন্দোলন করিতেছিলেন। গভর্ণমেণ্ট যাহাতে বয়স বৃদ্ধি করিয়া দেন, তাঁহারা তাহারই চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু অমৃতবাজার পত্রিকায় শিশিরকুমার, সিবিল সার্ভিস্ পরীক্ষা যাহাতে ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতবর্ষেও প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার জন্য আন্দোলন করিতে আরম্ভ করেন। স্যার মঙ্গলদাস একদিন কথা প্রসঙ্গে শিশিরকুমারকে বলিয়াছিলেন যে, গভর্ণমেণ্ট যে পদগুলি ইউরোপীয়দিগের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, আন্দোলন করিলেই যে ভারতবাসিগণ তাহা সহজে প্রাপ্ত হইবে, তাহা মনে হয় না।

ভারতবাসিগণকে নিম্ন বিভাগের ২০০্ হইতে ৩০০্ টাকার পদগুলি প্রদান করিবেন বলিয়া গভর্ণমেণ্ট অঙ্গীকার করিয়াছেন, কিন্তু সেই অঙ্গীকার যে পদে পদে ভগ্ন হইতেছে; তাহার কোনও প্রতীকারের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। গভর্ণমেণ্ট যাহা ইংরাজদিগের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যে আমরা তাহা পাইব, তাহা মনে হয় না; গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে যাহা দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহাতেও যে আমরা বঞ্চিত হইতেছি, সেই বিষয়ের আন্দোলন করাই যে সর্ব্ব প্রথমে কর্ত্তব্য। স্যার মঙ্গলদাসের পরামর্শমত শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় এ সম্বন্ধে তীব্র আন্দোলন করিয়াছিলেন এবং দেশের নেতৃবৃন্দকেও সেই পথ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

কয়েকদিন বোম্বাইয়ে অবস্থান করিয়া শিশিরকুমার পুণায় লাট বাহাদুর সার রিচার্ড টেম্পলের নিকট গমন করিলেন। দুই একদিন পরে কালীচরণ ও ব্রজেন্দ্রকুমারও পুণায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই মহামতি র‍্যানাডের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার একদিন প্রাতে লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। আলিপুরে বেল্‌ভিডিয়ারে স্যার রিচার্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যে তাঁহাকে কোনরূপ কষ্টভোগ করিকে হইত না; কিন্তু পুণায় তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত, সুতরাং প্রথম দিন লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহাকে বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। শিশিরকুমার একজন আর্দ্দালিকে ডাকিয়া লাট সাহেবের নিকট তাঁহার কার্ডখানি পাঠাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু আর্দ্দালি কার্ড লইয়া যাইতে অস্বীকার করিয়া বলিয়াছিল, "সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে পূর্ব্বাহ্নে পত্র লিখিয়া সময় স্থির করিয়া লইতে হয়, তাহা কি আপনি জানেন না?" শিশিরকুমারের কার্ড প্রাপ্ত হইলেই লাট সাহেব যে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, আর্দ্দালি তাহা জানিত না। যাহা হউক,

শিশিরকুমার আৰ্দ্দালিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লাট সাহেব কোথায় ?" প্রত্যুত্তরে আৰ্দ্দালি অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিলেন, "ঐ বাগানে বেড়াইতেছেন।" সার রিচার্ডকে দেখিতে পাইয়া, ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া শিশিকুমার, উদ্যানের যে স্থানে লাট বাহাদুর বেড়াইতে-ছিলেন, সেই দিকে দ্রুত পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একজন অপরিচিত ব্যক্তি লাট ভবনের নিয়ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক বাগানের ভিতর প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া তাঁহাকে বাধা প্রদান করিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে রক্ষিগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। শিশির-কুমারের সেদিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ নাই ; তিনি ক্রমশঃই স্যার রিচার্ডের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শিশিরকুমারকে নিষেধ করিলেও রক্ষিগণ, তাঁহার পথ রুদ্ধ করিতে সাহস করে নাই। একজন অপরিচিত ব্যক্তির সহিত লাটভবনের কয়েকজন রক্ষী গোলমাল করিতেছে দেখিয়া, কারণ অনুসন্ধান জন্য, স্যার রিচার্ড ধীরে ধীরে শিশিরকুমারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে পরস্পর পরস্পরের সন্মুখীন হইলেন। শিশিরকুমার বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না ?" স্যার রিচার্ড শিশিরকুমারকে দেখিয়া মহা আনন্দে তাঁহাকে যথারীতি অভ্যর্থনা করিলেন। আৰ্দ্দালি ও রক্ষিগণ শিশিরকুমারকে একজন মহারাজা কিম্বা তদপেক্ষা কোন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি মনে করিয়া আপন কার্য্যে প্রস্থান করিল।

উদ্যানে ভ্রমন করিতে করিতে শিশিরকুমারের সহিত লাট বাহাদুর সার রিচার্ড টেম্পলের সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। অনেক দিনের পর শিশিরকুমারের সহিত সাক্ষাৎ, লাট বাহাদুরের কথার আর শেষ নাই। খানসামা আসিয়া সংবাদ দিল যে আহার প্রস্তুত ; কিন্তু সেকথায় সার রিচার্ড কর্ণপাত করিলেন না, তিনি শিশিরকুমারের সহিত বঙ্গদেশের কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে খানসামা পুনরায় সংবাদ দিল যে,

আহার্য্য ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে এবং মহিলাগণ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। শিশিরকুমারকে পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া স্যার রিচার্ড আহার করিতে চলিয়া গেলেন। প্রথম দিবসের এই সাক্ষাতের সময় শিশিরকুমার তাঁহার বোম্বাই আগমনের কারণ প্রকাশ করেন নাই। লাট বাহাদুরের কথামত তিনি তাঁহার সহিত আর একদিন সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছিলেন। এবারে তিনি পূর্ব্বাহ্ণে পত্র লিখিয়া সময় স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল আমরা নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম ঃ—

শিশির—"আপনি বঙ্গদেশের যে উপকার করিয়াছেন, তাহার জন্য বঙ্গবাসাগণ আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু আপনার বঙ্গদেশ ত্যাগের পূর্ব্বে, সময়ের অল্পতা নিবন্ধন, তাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবসর প্রাপ্ত হন নাই। আমি, বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় বঙ্গবাসীগণের পক্ষ হইতে আপনাকে অভিনন্দন করিবার জন্য কলিকাতা হইতে এখানে আগমন করিয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের অভিনন্দন পত্র গ্রহণ করিলে আমরা বাধিত হইব।"

স্যার রিচার্ড—"বেশ, আমার কোন আপত্তি নাই। আগামী-কল্যই ব্যবস্থা করুন।"

শিশির—"আগামী কল্য অসম্ভব।"

স্যার রিচার্ড—"কেন ?"

শিশির—আমরা আপনার সম্মনার্থে একটি সান্ধ্যসম্মিলনের ব্যবস্থা করিব এবং তাহাতে এদেশীয় ও ইউরোপীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিব ইচ্ছা করিয়াছি। সেই সান্ধ্যসম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য আপনাকে একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া বোম্বাইয়ে যাইতে হইবে।"

স্যার রিচার্ড—"শিশিরবাবু, আপনাকে তাহা হইলে মাসাধিককাল অপেক্ষা করিতে হইবে।"

শিশির—"কেন ?"

স্যার রিচার্ড—"আমি বোম্বাইয়ের দক্ষিণ অংশটী পরিদর্শনের বহির্গত হইব, স্থির হইয়া গিয়াছে। কোন তারিখে, কোন স্থানে যাইব, তাহাও স্থির করিয়া দিয়াছি। পরিদর্শন হইতে ফিরিয়া আসিয়া আপনাদের অভিনন্দন পত্র গ্রহণ ও সান্ধ্য-সম্মিলনে যোগদান করিব।"

শিশির—"পরিদর্শনে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে আমাদের এই সামান্য কার্য্যটী শেষ করিয়া যাইলে বড়ই অনুগৃহীত হইব।"

স্যার রিচার্ড একটু হাসিয়া বলিলেন, "শিশিরবাবু, সেটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি যে সকল স্থানে গমন করিব স্থির হইয়াছে, তত্রত্য অধিবাসীগণ আমার অভ্যর্থনার আয়োজন করিতেছেন। এখন যদি আমি দিন পরিবর্ত্তন করি, তাঁহারা বড়ই দুঃখিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। এরূপ অবস্থায় আমার পরিদর্শনের দিন পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হইতে পারে না।" শিশিরকুমার লাট বাহাদুরকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফলের আশা দেখিতে পাইলেন না। শেষে তিনি বলিলেন, "যদি এক মাসকাল আমাকে এখানে অপেক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে আমার কষ্টের ও ক্ষতির সীমা থাকিবে না।"

স্যার রিচার্ড—"আপনার ক্ষতি হইবে ?"

শিশির—"বিশেষ ক্ষতি হইবে।"

স্যার রিচার্ড—"আপনার যদি বিশেষ ক্ষতি হয়, তাহা হইলে ত বড়ই চিন্তার কথা হইল।" কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, "শিশিরবাবু, আপনার ক্ষতি করিব না। আমি আমার পরিদর্শনের দিন পরিবর্ত্তন করিলাম।" স্যার রিচার্ড তৎক্ষণাৎ প্রাইভেট্ সেক্রেটারীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার মফঃস্বল পরিদর্শন উপস্থিত বন্ধ রহিল, অবিলম্বে এই সংবাদ প্রচার করিয়া দিন।" লাট বাহাদুরের আদেশ শীঘ্রই প্রতিপালিত হইল।

তিন চারিদিনের মধ্যেই সকল কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। শিশিরকুমার অবিলম্বে কালীচরণ ও ব্রজেন্দ্রকুমারকে লইয়া পুণা হইতে বোম্বাইয়ে আগমন করিলেন এবং স্যার মঙ্গলদাস নাথুভাই-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সান্ধ্য-সম্মিলনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সম্মিলনের দিন প্রাতে নিমন্ত্রণ পত্র ছাপা হইয়া শিশিরকুমারের হস্তগত হইল। যাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে, তাঁহাদিগের নাম লাট বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট হইতে সংগ্রহ করা হইল। সন্ধ্যার সময় সম্মিলন; এরূপ অল্প সময়ের মধ্যে নিমন্ত্রণ-পত্রগুলি বিলি করা হইবে, শিশিরকুমার তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে তিনি পুলিশ কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। শিশিরকুমার লাট বাহাদুরের একজন বিশিষ্ট বন্ধু জানিয়া পুলিশ কমিশনার আগ্রহ সহকারে নিমন্ত্রণ পত্র বিতরণের ভার গ্রহণ করিলেন। অশ্বারোহী কনেষ্টবলদিগের দ্বারা তিনি অতি অল্প সময়ে মধ্যেই পত্রগুলি যথাযথ ঠিকানায় বিলি করিয়াছেন। নির্দিষ্ট সময়ে সার মঙ্গলদাস নাথুভাইএর উদ্যানে, লাটবাহাদুর স্যার রিচার্ড টেম্পল, পুণা হইতে আগমন করিয়া, সান্ধ্য-সম্মিলনে যোগদান করিলেন। সম্মিলনের ও অভিনন্দন পত্র প্রদানের অধিকাংশ ব্যয় ব্রজেন্দ্রকুমার বহন করিয়াছিলেন; এজন্য অভিনন্দন পত্রখানি তাঁহারই পাঠ করিবার কথা ছিল; কিন্তু তিনি শিশিরকুমারকে পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। শিশিরকুমার অভিনন্দন পত্র পাঠ করিয়া তাহা একটী মূল্যবান আধারে রাখিয়া লাট বাহাদুরের হস্তে প্রদান করিলেন। শিশিরকুমারের সহিত লাট বাহাদুর যেরূপ ব্যবহার করিয়া-ছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া বোম্বাইবাসিগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। বোম্বাই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা যে একজন বাঙ্গালীর অনুরোধে তাঁহার মফঃস্বল পরিদর্শনের সকল ব্যবস্থা পরিবর্তন করিয়া সান্ধ্য-সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য পুণা হইতে বোম্বাইয়ে আগমন করিবেন, বোম্বাইবাসিগণ ইহা প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। পুণায়

অবস্থানকালে, তত্রত্য-অধিবাসিগণের অনুরোধে, কালীচরণ বঙ্গদেশে নীলকরদিগের আচার সম্বন্ধে একদিন একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

স্যার রিচার্ড টেম্পলের পর স্যার এস্‌লি ইডেন্ বাঙ্গালার ছোটলাট বাহাদুরের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময় লর্ড নর্থব্রুক্ ভারতের বড়লাট ছিলেন। নীলকরদিগের অত্যাচারে যখন কৃষকগণ জর্জ্জরিত হইতেছিল তখন স্যার এস্‌লি তাহাদিগের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি যখন বর্ম্মার চিফ্ কমিশনারের পদ হইতে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইলেন, তখন বঙ্গবাসিগণ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা তাঁহাকে সাদরে অর্ভ্যথনা করিয়াছিলেন। জগতে কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক, সকলেই প্রলোভনের দাস, ইহাই স্যার এস্‌লির বিশ্বাস ছিল। তিনি গভর্ণমেণ্টকেও প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার পদপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে, তিনি পাব্‌লিক ওয়ার্কস্ সেস্ জমিদারদিগের স্কন্ধে চাপাইবেন, এরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। ছোট লাট বাহাদুরের মস্‌নদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্যার এস্‌লি অতি সহজেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্যগণকে হস্তগত করিয়া ছিলেন। মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর ও বাবু কৃষ্ণদাস পাল তৎকালে এসোসিয়েশনের জীবনস্বরূপ ছিলেন। তাঁহাদেরই অভিপ্রায় অনুসারে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের কার্য্য পরিচালিত হইত। স্যার এস্‌লি এই ক্ষমতাশালী সভ্যদ্বয়কে কিয়ৎ পরিমাণে স্বীয় আয়ত্তে আনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেই তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। অমৃতবাজার পত্রিকার নির্ভীকতা, তেজস্বিতা ও লিপিচাতুর্য্য লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহার সম্পাদক শিশিরকুমারকেও বশীভূত করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহনের ন্যায় শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ শ্রেণীর লোক যখন বশীভূত হইয়াছেন, তখন শিশিরকুমারের ন্যায় সামান্য

ব্যক্তি যে অনায়াসেই তাঁহার ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হইবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। শিশিরকুমার মাত্র দুইবার স্যার এস্‌লির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রথম সাক্ষাতে কেবল এল্‌বার্ট টেম্পল্‌ অব্‌ সায়েন্স সম্বন্ধে দুই একটী কথা হইয়াছিল, দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের সময় উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

স্যার এস্‌লি,—"শিশিরবাবু, আপনাকে আমি আমার একজন বিশেষ বন্ধু বলিয়া মনে করি। বাঙ্গালীরা যে, আমার অতি প্রিয় তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। আপনি আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আপনার পত্রিকায় কেন যে মধ্যে মধ্যে কুৎসাপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। লর্ড নর্থব্রুক্‌ আপনার কতকগুলি প্রবন্ধ আমাকে দেখাইয়াছিলেন, সেগুলি পাঠ করিয়া আমি লজ্জায় অবনত মস্তক হইতে বাধ্য হইয়াছিলাম।"

শিশির।—"আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন; আপনি আমার প্রবন্ধের মধ্যে একটীও কুৎসাপূর্ণ বাক্য দেখাইতে পারেন কি? আমার পত্রিকায় যদি কুৎসাপূর্ণ বা রাজদ্রোহ সূচক কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট যে আমাকে আইন অনুসারে অভিযুক্ত করিতেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি যে কখনও কোনও অসঙ্গত বা আইন বিরুদ্ধ কথা আমার পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করি নাই, গভর্ণমেণ্টের নীরবতাই তাহার প্রমাণ।"

স্যার এস্‌লি।—"গভর্ণমেণ্টের সদাশয়তাই আপনাকে প্রশ্রয় দান করিয়াছে।"

শিশির।—"আমার পত্রিকার প্রবন্ধগুলি অশ্লীলভাষী ও আপনাদের কুৎসায় পরিপূর্ণ, আপনি কি তাহা দেখাইতে পারেন?"

স্যার এস্‌লি।—"আপনি কি বলিতে চান যে, আমি যাহা বলিতেছি তাহা সত্য নহে? আপনি অতিশয় 'চালাক', তাই স্পষ্টভাবে আমাদিগকে দস্যু, তস্কর, প্রবঞ্চক ইত্যাদি বলেন না।

কিন্তু আপনার যাহা উদ্দেশ্য, তাহা আপনার প্রবন্ধ পাঠে সহজেই বুঝিতে পারা যায়।"

শিশিরকুমারের সহিত কথার সময় স্যার এস্‌লি বিন্দুমাত্র ক্রোধের ভাব প্রকাশ করেন নাই, তিনি যেন রহস্যচ্ছলেই কথা বলিতেছিলেন। শিশিরকুমারও বিশেষ সতর্কতার সহিত তাঁহার কথার প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।

স্যার এস্‌লি ইডেন্ পুনরায় বলিলেন,—"আমি বাঙ্গালী জাতির সহিত অতি ঘনিষ্টভাবে মিশিয়াছি, তাহা আপনি অবগত আছেন। তাহাদের সকল অভাব অভিযোগের কথাই আমি অবগত আছি। বড় লাট বাহাতুরকে আমি বলিয়াছি যে, অমৃতবাজার পত্রিকার প্রবন্ধগুলি অন্তঃসারহীন, সুতরাং তাহাতে আস্থা স্থাপন করা উচিত নহে।"

শিশির।—অন্তঃসারহীন প্রবন্ধগুলি লইয়া গভর্ণমেণ্টের কি এরূপ আলোচনা করা কর্তব্য।"

স্যার এস্‌লি—"শিশিরবাবু এই বিশাল ভারতভূমি যে একখানি সামান্য পল্লী নহে, পত্রিকার প্রবন্ধ লিখিবার সময় একথাটী স্মরণ রাখিবেন। ভারতবর্ষের ন্যায় বিস্তৃত সাম্রাজ্যের শুভাশুভের কথা সংবাদ পত্রে আলোচনা করিতে হইলে বিশেষ বিবেচনা ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন, একথা বিস্মৃত হইবেন না। কিরূপভাবে সংবাদপত্রে আন্দোলন করিলে দেশের কল্যান সাধিত হয়, তাহা আপনি সম্যক অবগত নহেন, ইহাই আমার বিশ্বাস। প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তাহা আমাকে একবার দেখাইবেন, আমি সংশোধন করিয়া দিব। আবশ্যক হইলে আমি স্বয়ং ও আপনার পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখিয়া দিব।"

ছোট লাট বাহাতুর কি উদ্দেশ্যে কথা বলিতেছিলেন, শিশিরকুমার তাহা বুঝিতে পারিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনি বোধ হয় আমার সহিত উপহাস করিতেছেন। অমৃতবাজার পত্রিকার জন্য আপনি

কষ্ট করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া দিবেন, এ কথা আমি মনে স্থান দিতে পারিতেছি না।"

স্যার এস্‌লি।—"শিশিরবাবু, আমি আপনার সহিত উপহাস করিতেছি না; আমি সত্য কথাই বলিতেছি। আমি প্রায়ই হিন্দু প্যাট্রিয়ট্ পত্রিকায় লিখিয়া থাকি, কিন্তু এ কথা কেহই অবগত নহেন। আপনার কোনও আপত্তি না থাকিলে আমি আনন্দের সহিত পত্রিকা পরিচালনের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত আছি। তাহাতে আপনার লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই, কারণ তাহা হইলে আমি এবং আপনি প্রকৃতপক্ষে বঙ্গদেশ শাসন করিব।"

শিশিরকুমার একটু হাসিয়া বলিলেন,—"তাহা হইলে কৃষ্ণদাসের কি গতি হইবে?"

স্যার এস্‌লি।—"তিনিও অবশ্য আমাদের সহিত থাকিবেন।"

বঙ্গদেশের শাসন কর্ত্তা কি উদ্দেশ্যে অমৃতবাজার পত্রিকার কার্য্য পরিচালনের ভার গ্রহণ করিবার জন্য উদ্বিগ্ন শিশিরকুমারের ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তির তাহা বুঝিতে বড় বিলম্ব হয় নাই। যে হিন্দু প্যাট্রিয়ট্ পত্রিকা পাঠ পরিবার জন্য এক সময় জনসাধারণ উন্মুখ হইয়া থাকিত, তাহা যে কি জন্য ক্রমশঃই দেশবাসীর বিশ্বাস হারাইয়াছে, শিশিরকুমার এক্ষণে তাহা বুঝিতে পারিলেন। প্যাট্রিয়টের ন্যায় অমৃতবাজার পত্রিকাখানিও হস্তগত করাই স্যার এস্‌লির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, এবং সেই জন্যই তিনি শিশিরকুমারকে বঙ্গদেশ শাসনের অধিকার প্রদানের প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন। শেষ জীবনের ন্যায় এসময় শিশিরকুমারের অবস্থা উন্নত ছিল না। ইচ্ছা করিলে তিনি স্যার এস্‌লির অনুগ্রহে এই সময় স্বীয় অবস্থার বিশেষ উন্নতি করিতে পারিতেন। উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া নীচতার পরিচয় প্রদান করা শিশিরকুমারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি প্রলোভনের অতীত ছিলেন। লাটসাহেবের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া শিশিরকুমার স্বীয় কর্ত্তব্য জ্ঞান বিসর্জ্জন দেওয়া নীচতার পরিচায়ক বলিয়া মনেও

করিয়াছিলেন। রাজকর্ম্মচারী কর্তৃক পরিচালিত হইয়াই হিন্দুপ্যাট্রিয়ট্ স্বাধীনতা হারাইয়াছে, অমৃতবাজার পত্রিকাও যদি সেই পথ অবলম্বন করে, তাহা হইলে দেশের অভাব অভিযোগের কথা আর গভর্ণমেণ্টের গোচর হইবে না, শিশিরকুমার এই কথা স্মরণ করিয়াই স্যার এস্‌লির প্রস্তাবে সম্মতি দান করিতে পারেন নাই। তিনি বিনীতভাবে ছোটলাট বাহাদুরকে বলিয়াছিলেন, "অমৃতবাজার পত্রিকা বাগবাজার হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে; বেল্‌ভিডিয়ার হইতে পত্রিকার কার্য পরিচালন করা কি আপনার পক্ষে সম্ভব হইবে?"

অমৃতবাজার পত্রিকার আদর্শে তাৎকালিন অন্যান্য বাঙ্গালা সংবাদপত্র গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের সমালোচনা করিত। আদর্শকে খর্ব্ব করাই স্যার এস্‌লির উদ্দেশ্য ছিল, সেই জন্যেই তিনি শিশিরকুমারকে মিষ্ট বাক্যে সন্তুষ্ট ও প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া অমৃতবাজার পত্রিকখানি হস্তগত করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছিলেন। শিশিরকুমারকে তিনি বলিলেন, "বেল্‌ভিডিয়ারের দরজা আপনার জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিবে। আপনি প্রত্যহই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন। বিষয় নির্ব্বাচনের সম্পূর্ণভার আপনার থাকিবে; আর নির্ব্বাচিত বিষয়টী কিরূপভাবে লিখিত হইবে, তাহা স্থির করিয়া দিবার স্বাধীনতা আমার থাকিবে। সংবাদপত্রে কিরূপভাবে আন্দোলন করিলে দেশের মঙ্গল হইতে পারে, তাহা জানিবার সুযোগ আপনার কখনও হয় নাই। আমি বহুকাল হইতেই শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আছি এবং বঙ্গদেশের ন্যায় বিস্তৃত রাজ্যের শাসনভার আমার উপর ন্যস্ত, এরূপ ক্ষেত্রে আমি আপনাকে সং পরামর্শ দিতে পারিব বলিয়া আশা করি।"

স্যার এস্‌লি ইডেন্ হাসিতে হাসিতে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, কিন্তু শিশিরকুমার তাঁহার এই হাসির গূঢ় অর্থ ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে অমৃতবাজার পত্রিকা দেশবাসীর আদরের জিনিস,

যে পত্রিকা পাঠ করিবার জন্য জনসাধারণ সর্ব্বদাই উৎসুক, সেই পত্রিকা পরিচালনের ভার প্রলোভনের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, বঙ্গের শাসনকর্তার হস্তে প্রদান করিতে তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। স্যার এস্‌লির কর্তৃত্বাধীনে সংবাদপত্রখানি পরিচালিত হইলে শিশির-কুমারের আর্থিক সুবিধা হইত বটে, কিন্তু অর্থের জন্য স্বদেশসেবীর সবৃত্তি হৃদয় হইতে বলপূর্ব্বক অন্তর্হিত করা তিনি নীচতা ও স্বদেশ-দ্রোহিতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতেন। শিশিরকুমার বড়ই বিভ্রাটে পড়িলেন। ছোটলাট বাহাদুরের সম্মুখে তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা কতদূর বিপজ্জনক তাহা সহজেই অনুমেয়। যাহা হউক তিনি বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনার সদাশয়তা ও মহানুভবতা ভারতবিদিত। আমিও আপনার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু আপনার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা কতদূর সম্ভব, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে প্রত্যেকবার পত্র লিখিয়া সময় স্থির করিয়া লইতে হইবে। আমাকে প্রত্যহই আপনার নিকট একবার করিয়া আসিতে হইবে; কখনও কখনও দুইবারও সাক্ষাতের প্রয়োজন হইতে পারে। তাহাতে আপনার কার্য্যের যে যথেষ্ট ক্ষতি হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আপনি গোপনে পত্রিকার কার্য্য পরিচালন করেন, ইহা যদি কোনও রূপে প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আপনার সুনামে কলঙ্ক অর্পিত হইতে পারে। আপনি বাঙ্গালী জাতির সুহৃদ্, আপনার যশোরবি যাহাতে নিষ্প্রভ হয়, সেরূপ কার্য্য করা আমি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করি না। যেরূপভাবে পত্রিকার কার্য্য চলিতেছে, সেইরূপভাবেই চলুক, তবে আমি মধ্যে মধ্যে আপনার পরামর্শ গ্রহণ করিব, ইহা স্বীকার করিতেছি।"

স্যার এস্‌লি উত্তর করিলেন—"শিশিরবাবু, আপনার যুক্তিগুলি সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। বেল্‌ভিডিয়ারে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আপনাকে পূর্ব্বে কোনও পত্রাদি লিখিবার আবশ্যক

হইবে না। আমি আমার প্রাইভেট্ সেক্রেটারীকে বলিয়া রাখিব যে, আপনি আসিবামাত্রই যেন তিনি আপনাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দেন। আর আমার সুনাম ও দুর্নামের জন্য আমিই দায়ী রহিলাম।”

জন্মভূমির অকৃত্রিম সেবক নির্ভীক হৃদয় শিশিরকুমার কিন্তু অটল। স্যার এস্‌লির হস্তে অমৃতবাজার পত্রিকার কার্য্য পরিচালনের ভার অর্পণ করিয়া তিনি দেশদ্রোহী হইতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। শিশিরকুমারের সহিত প্রথমে স্যার এস্‌লি হাসিতে হাসিতে কথা কহিতেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল, তখন ক্রোধে তাঁহার গণ্ডদ্বয় আরক্ত হইল। তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বিরক্তির সহিত শিশিরকুমারকে বলিলেন, “আপনি কোন সাহসে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।”

স্যার এস্‌লির রুদ্রমূর্ত্তি শিশিরকুমারের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিতে পারিল না। তিনি বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন, “সমগ্র ভারতবর্ষে অন্ততঃ একজনও ন্যায়নিষ্ঠ সম্পাদক থাকিবে, ইহা কি লাট বাহাদুরের অভিপ্রেত নহে ?”

যে শিশিরকুমারকে স্যার এস্‌লি ইডেন সামান্য পল্লীবাসী মাত্র মনে করিয়া প্রলোভনে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার তেজস্বিতা, নির্ভীকতা ও স্বদেশ সেবার আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। শিশিরকুমারের প্রত্যুত্তরে ছোটলাট বাহাদুর আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিলেন। তিনি অতিশয় কর্কশস্বরে বলিলেন, “শিশিরবাবু, আপনি স্মরণ রাখিবেন, আমি ছয় মাসের মধ্যে আপনাকে কলিকাতা হইতে বিতাড়িত করিব।’ স্যার এস্‌লি মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার এই ভীতি প্রদর্শন শিশিরকুমারের দৃঢ়তা ভঙ্গ করিবে, শিশিরকুমার তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন। কিন্তু তাঁহার আশাপূর্ণ হইল না। শিশিরকুমার উত্তর করিলেন “আপনি

বঙ্গদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা, আপনি সবই করিতে পারেন। আমাকে কলিকাতা হইতে তাড়াইয়া দিলে যে আমি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইব, তাহা আপনি মনেও করিবেন না। আমি আমার গ্রামে ফিরিয়া গিয়া জমিচাষ করিয়া, জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিব।"

স্যার এস্‌লি ক্রোধে আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; তাঁহার শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। শিশিরকুমারও উত্তেজিতভাবে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। শেষে তিনি লাট বাহাদুরকে বলিলেন, "এখন আমি আপনারই গৃহমধ্যে, আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। কিন্তু বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার নিকট আমি এরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করি নাই। যাহা হউক, এই আপনার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ।" কথাগুলি বলিয়া শিশিরকুমার আর বিলম্ব না করিয়া, কক্ষত্যাগ করিলেন। এই সময় হইতেই শিশিরকুমার স্যার এস্‌লি ইডেনের চক্ষুঃশূল হইয়াছিলেন। শিশিরকুমারের যত্নে ও চেষ্টায় এল্‌বার্ট টেম্পল অব্‌ সায়েন্স প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করা স্যার এস্‌লির প্রধান কর্ত্তব্য হইল। স্যার রিচার্ড টেম্পল শিল্প বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে গভর্ণমেণ্ট হইতে বাৎসরিক আট হাজার টাকা সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, স্যার এস্‌লি তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। শিশিরকুমারের চেষ্টায় কলিকাতা মিউনিসি-প্যালিটিতে নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, সুতরাং তাহা রহিত করা, স্যার এস্‌লির অন্যতম কর্ত্তব্য হইল। শিশিরকুমারকে ব্যক্তিগত ভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে তিনি সঙ্কল্প করিলেন। মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর একদিন শিশিরকুমারকে বলেন, "শিশিরবাবু, আপনি একটু সাবধান হইবেন, নচেৎ আপনার পত্রিকার পরিণাম বড়ই শোচনীয় হইবে।" শিশিরবাবু প্রত্যুত্তরে বলিলেন, পত্রিকা পরিচালনে যে আমি কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকি, তাহা মনে হয় না। যাহাতে আমার কোন বিপদ না হয়, তৎপ্রতি আমি সাধ্যমত লক্ষ্য করিয়া থাকি।" এই কথোপকথনে শিশিরকুমার

বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার পত্রিকার ধ্বংস সাধনের আয়োজন হইতেছে। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই মার্চ্চ তারিখে কলিকাতার কয়েকখানি সংবাদ পত্রে এই মর্ম্মে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, দেশীয় ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রগুলির সংযম সাধন উদ্দেশ্যে অদ্য কাউন্সিলে একটি বিল পাশ করা হইবে। সংবাদটি পাঠ করিয়া শিশিরকুমার প্রস্তাবিত বিলের উদ্দেশ্য সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকার বিনাশ সাধনার্থ স্যার এস্‌লি যে নূতন বিধি প্রণয়ন করিবেন, ইহা শিশিরকুমার মনে কবিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় তখন শিশিরকুমারের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। প্রস্তাবিত বিধি সম্বন্ধে কি স্থির হয়, তাহা জানিবার জন্য তিনি ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। লর্ড লিটন তখন আমাদের বড়লাটের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সুলেখক ও সুবক্তা ছিলেন; কোন কোন কার্য্যে তিনি সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু শাসন কর্ত্তার উপযুক্ত গুণ তাঁহার অতি অল্পই ছিল। তিনি অনেক সময় তাঁহার অধীন কর্ম্মচারিগণের কথায় চালিত হইতেন। স্যার এস্‌লি তাঁহাকে বুঝাইযাছিলেন যে, কাবুল যুদ্ধের ব্যাপার লইয়া এদেশীয় সংবাদ পত্রগুলি ইংরাজ গভর্ণ-মেন্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে পারে, অতএব পত্রিকার জন্য দেশীয় সংবাদ পত্রগুলির, অতএব পত্রিকার জন্য দেশীয় সংবাদ পত্রগুলির মুখবন্ধ করা নিতান্ত প্রয়োজন। বড়লাট বাহাদুর সম্মতি প্রদান করিলে পাছে কোনওরূপ প্রতিবাদ হয়, এই আশঙ্কায় বিলটি এক অধিবেশনেই বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল। ইংরাজী ভাষায় লিখিত সংবাদ পত্রগুলি এই আইনের গণ্ডীব বহির্ভূত ছিল। অমৃতবাজার পত্রিকার কতক অংশ ইংরাজীতে এবং কতক অংশ বাঙ্গালায় লিখিত হইত। পত্রিকার বিনাশ সাধন জন্যই যে স্যার এস্‌লি এই নূতন বিধি প্রণয়নে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, তাহা আইনের বিধান হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। আইনটি কেবল বাঙ্গলা সংবাদপত্রগুলির

উপর প্রযোজ্য নহে, ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রগুলির উপরও প্রয়োগ করার বিধান ছিল।

ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে বিল সম্বন্ধে কি স্থির হয়, তাহা জানিবার জন্য শিশিরকুমার উদ্বিগ্নচিত্তে অমৃতবাজার পত্রিকার অফিস গৃহে অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় মতিবাবু শশব্যস্তে সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "সর্বনাশ হইয়া গেল, এদেশের মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইতে চলিল।" শিশিরকুমার সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "সার এস্‌লি পত্রিকার ধ্বংস সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, কিন্তু পত্রিকাকে যেরূপেই হউক বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। এবার হইতে আমরা পত্রিকা ইংরাজীতেই প্রকাশ করিব।" তাঁহার কথা তাঁহার ভ্রাতৃগণের নিকট বেদবাক্য ছিল। এস্‌লি ইডেনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য শিশির ও তাঁহার সহোদরগণ বদ্ধ পরিকর হইলেন। বর্ত্তমানের তুলনায় তখন ইংরাজীতে সংবাদপত্র পরিচালন করা যে কিরূপ কষ্টকর ছিল, তাহা পাঠকবর্গ সহজেই অনুমান করিতে পারেন। চারি পাঁচদিন টাইপ, প্রেসের সারঞ্জাম ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে অতিবাহিত হইল। অমৃতবাজার পত্রিকা তখন সাপ্তাহিক ছিল এবং প্রতি বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হইত। প্রকৃতপক্ষে একদিনের মধ্যেই দ্বিভাষী অমৃতবাজার পত্রিকা ইংরজীতে পরিণত হইয়াছিল। আইন বিধিবদ্ধ হইবার পরবর্ত্তী বৃহস্পতিবারে, ২১শে মার্চ্চ তারিখে, যথা সময়ে অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হইল। সার এস্‌লি পত্রিকা খুলিয়া দেখিলেন যে তাহা আর দ্বিভাষী নহে, আদ্যোপান্ত ইংরাজীতে লিখিত। পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমারের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া ছোটলাট বাহাদুর আশ্চার্য্যান্বিত হইলেন এবং শিশিরকুমারকে তিনি ভাল করিয়া চিনিতে পারিলেন। স্যার এস্‌লি ইডেন্‌কে তাঁহার কোন কোন এ দেশীয় বন্ধু বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন যে শিশিরকুমারের ইংরাজীতে জ্ঞান অতাব সংকীর্ণ, সুতরাং ইংরাজীতে সংবাদপত্র পরিচালনা করা তাঁহার

পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। এরূপ অবস্থায় তাঁহার পত্রিকার অস্তিত্ব যে শীঘ্রই বিলুপ্ত হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সুপণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইংরাজী অমৃতবাজার পত্রিকা পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যে পত্রিকার সম্পাদক এরূপ সুন্দর ইংরাজী লিখিতে পারেন, সে পত্রিকার উন্নতি অনিবার্য্য। ইংরাজী অমৃত-বাজার পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার সংগে সংগে তাহার গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অমৃতবাজার পত্রিকার বিনাশ সাধন জন্য যে অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা তাহার কোনওরূপ ক্ষতি না করিয়া বরং উপকার করিয়াছিল। স্যার এস্‌লি নূতন আইন বিধিবদ্ধ না করিলে অমৃতবাজার পত্রিকা হয়ত দ্বিভাষীই থাকিত। আইন বিধিবদ্ধ হইলে শ্রীযুক্ত মতিবাবু ঢাকায় গমন করেন। সেখানে তাঁহারই উদ্যোগে উক্ত আইনের প্রতিবাদ জন্য এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ, বাবু আনন্দচন্দ্র রায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ঢাকার সভার পর কলিকাতায়ও সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ইংলণ্ডে পার্লামেণ্ট মহাসভায়ও ইহা লইরা আলোচনা হইয়াছিল এবং মহামতি গ্লাড্‌ষ্টোন ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কতকগুলি ক্ষীণ বিত্ত ও দুর্বল সংবাদপত্র ধ্বংসের পর, ভারতের অকৃত্রিম সুহৃদ লর্ড রিপন এই মুদ্র যন্ত্রের স্বাধীনতা হরণকারী আইন উঠাইয়া দিয়াছিলেন।

যশোহরে অমৃতবাজার পত্রিকা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই স্থানীয় রাজপুরুষদিগের চক্ষুশূল হইয়াছিল। মিষ্টার ওয়েষ্টল্যাণ্ড যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি যশোহরের একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তাঁহার সেই গ্রন্থের ১৯৭ পৃষ্ঠায় তিনি অমৃতবাজার পত্রিকা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"It appears once a week and is conspicuous only for its scurrilous tone and its disregard of truth."—অর্থাৎ পত্রিকাখানি সাপ্তাহিক; ইহা অশ্লীলভাষী ও সত্যাপলাপী বলিয়া পরিচিত। বেঙ্গলী তখন

সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল এবং ইহার সম্পাদক ছিলেন বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ। গিরিশবাবু বেঙ্গলীতে মিষ্টার ওয়েষ্টল্যাণ্ডের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, ঐতিহাসিকদিগের নিরপেক্ষতার প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য, কিন্তু মিষ্টার ওয়েষ্টল্যাণ্ডের নিকট তাহা উচিত বলিয়া মনে হয় নাই। যশোহরের ইতিহাসে তিনি অতি নগন্য ঘটনারও উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ঘোষ বাবুদের ঐকান্তিক যত্নে যে মাগুরায় দাতব্য চিকিৎসালয়, ইংরাজী বিদ্যালয়, নৈশবিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা তিনি তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই কেন, তাহা বুঝিতে পারা গেল না।

পঞ্চম অধ্যায়

পূর্ব্বে আমাদের দেশে রাজনীতি চর্চ্চার বিশেষ অভাব ছিল। এদেশের শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে গভর্ণমেন্ট ও এঙ্‌লো ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি যাহা বুঝাইতেন, সাধারণ লোক তাহাই বুঝিত। কেবল সাধারণ লোক নহে, যে তুই চারিজন ব্যক্তি রাজনীতি আলোচনা করিতেন, তাঁহারাও সেইরূপ বুঝিতেন। গভর্ণমেণ্ট পক্ষের কথার সংঙ্গে প্রজাপক্ষেরও যে তুই চারিটী কথা বলিবার আছে, তাহা প্রায় কাহারও মনে উদিত হইত না। শিশিরকুমার তাঁহার অমৃতবাজার পত্রিকার ভিতর দিয়া, কিরূপে এইভাব পরিবর্ত্তন করিয়া দেশবাসীর হৃদয়ে নূতন ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন, এক্ষণে সে সম্বন্ধ আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

লর্ড কর্ণওয়ালিস্ বাহাতুর বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রচলন করিয়া প্রজা ও জমিদারদিগের মধ্যে যে স্থায়ী সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, পাঠকবর্গ তাহা অবগত আছেন ; সুতরাং এখানে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এঙ্‌লো ইণ্ডিয়ান সংবাদ-পত্রগুলি যখন বঙ্গদেশের জমিদার সম্প্রদায়ের উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপ সাধনের জন্য আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের কোনও কোনও নেতা সেই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। জমিদারদিগের অত্যাচারে প্রজাবর্গ দিন দিন অন্তঃসারহীন হইয়া পড়িতেছে, এঙ্‌লো ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি যখন এই সুর ধরিল, আমাদের পূর্ব্বোক্ত নেতৃগণও সেই সুরে সুর মিশাইয়া দিলেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রেরও যে জমিদার সম্প্রদায়ের উপর সদ্ভাব ছিল না, আমরা পূর্ব্বেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি। এঙ্‌লো ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি আন্দোলন আরম্ভ করিলে শিশিরকুমার তাঁহার অমৃতবাজার পত্রিকায় তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া দেশবাসিগণের নিকট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের

উপকারিতা সপ্রমাণ করিতে আরম্ভ করেন। আমাদের দেশের নেতাদিগের মধ্যে প্রথমে যাঁহারা এঙ্‌লো ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলির সহিত যোগদান করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধবাদী হন, তাঁহারা শেষে অমৃতবাজার পত্রিকা পাঠ করিয়া আপন আপন মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রিন্স দ্বারকনাথ ঠাকুর যখন ইংলাণ্ড হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেই সময় জর্জ্জ টম্‌সন্‌ নামক জনৈক সদাশয় ইংরাজ তাঁহার সহিত আগমন করিয়াছিলেন। ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্যোগী। এই টম্‌সনের প্ররোচনায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে বাবু কৃষ্ণদাস পাল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থন করিয়াছিলেন। একবার কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে মিষ্টার হিউম চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে দুই একটি কথা উত্থাপন করিলে শ্রীযুক্তবাবু মতিলাল ঘোষ তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের নায়কগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রথমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধবাদী থাকিলেও, শেষে অমৃতবাজার পত্রিকা পাঠ করিয়া তাঁহারা আপন আপন ভ্রম উপলব্ধি করিয়া তাহা সংশোধন করিয়াছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিধান অনুসারে যে ভূমির কর একবার নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে, গভর্ণমেণ্ট তাহার উপর আর কোন নূতন কর ধার্য্য করিতে পারেন না। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সর্ত অক্ষুন্ন রাখিতে পারেন নাই। পথকর (রোড্‌সেস) ধার্য করিয়া গভর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সর্তভঙ্গ করিয়াছিলেন। পথকর ধার্য্য করিবার প্রস্তাব হইলে শিশিরকুমার তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হইতে প্রথমে প্রতিবাদ হইয়াছিল। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যখন বলিলেন যে, জমিদারবর্গ প্রজাদিগের নিকট হইতে উক্ত কর আদায় করিতে পারিবেন তখন আর কোন আপত্তি থাকিল না। গভর্ণমেণ্ট যে কেবল প্রজাগণের নিকট হইতে নহে, জমিদারগণ হইতেও কর আদায়

করিবেন, ইহা না বুঝিয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যগণ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। দূরদর্শী শিশিরকুমার পথকরের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল।

ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের সময় দেশীয় রাজন্যবর্গ গভর্ণমেণ্টকে নানা উপায়ে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং গভর্ণমেণ্টও সেজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্যদোষে এই রাজন্যবর্গের মধ্যে কেহ কেহ কালে গভর্ণমেণ্টের কোনও কোনও ইংরাজ কর্মচারীর কুদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিলেন। কোন কোন এঙ্‌লো ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র তাঁহাদিগকে চরিত্রহীন ও প্রজাপীড়ক বলিয়া বর্ণনা করিয়া তাঁহাদিগের হস্ত হইতে রাজ্য পরিচালন ক্ষমতা কাড়িয়া লইবার জন্য পরামর্শ প্রদান করিতেন। কোন কোন ভারতীয় সংবাদপত্র ভালমন্দ বিচার না করিয়াই এঙ্‌লো ইণ্ডিয়ান সংবাদ-পত্রগুলির সহিত যোগদান করিতেন। দেশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক রাজ্য শাসিত হইলে দেশের যে কি পরিমাণ মঙ্গল হইতে পারে, তাহা গভর্ণমেণ্ট বুঝিলেও এদেশের কোন কোন রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা বুঝিতে পারিতেন না। শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় রাজন্য-বর্গের অনুকূলে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। রাজ্যের কোনও প্রজা রাজার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিয়া যদি পত্রিকায় আন্দোলন করিবার জন্য শিশিরকুমারকে অনুরোধ করিত, তিনি তাহাকে বলিতেন, "তুমি তোমার রাজার নিকট ফিরিয়া যাও। তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিজের দুঃখের কথা তাঁহাকে জানাইলে রাজা নিশ্চয়ই তোমার দুঃখ মোচন করিবেন।" শিশিরকুমার বলিতেন যে, এদেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে কেহ কেহ যদি প্রজার উপর কোন অন্যায় অত্যাচার করেন, তাহা হইলে যাহাতে সেই অত্যাচার নির্ধারিত হয়, তাহারই চেষ্টা করা উচিত, কিন্তু রাজার নিকট হইতে রাজ্যশাসনের ক্ষমতা কাড়িয়া লইবার জন্য আন্দোলন করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। এক

সময় হোলকর ও ত্রিপুরা এই দুই রাজপরিবার মধ্যে পারিবারিক বিবাদের সূচনা হওয়ায়, একখানি এদেশীয় সংবাদপত্র রাজ্য দুইটীকে গভর্ণমেণ্ট যাহাতে নিজ অধিকারে গ্রহণ করেন, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। সদাশয় গভর্ণমেণ্ট কিন্তু ভারতীয় রাজন্যবৃন্দের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন নাই।

ভারতের স্বাধীন রাজন্যবর্গই ভারতের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য-স্বরূপ। তাহারাই ভারতের জাতীয় জীবন গঠনের প্রধান অবলম্বন; এইজন্য শিশিরকুমার তাঁহাদের বড়ই অনুরক্ত ছিলেন। এই সকল রাজার বিরুদ্ধে, গভর্ণমেণ্টের নিকট কেহ কোনও অভিযোগ উত্থাপন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে শিশিরকুমার বলিতেন যে, ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট স্বাধীন রাজাদিগের কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন না। রাজ্যের কোনও প্রজার যদি কোন দুঃখ কষ্টের কারণ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই প্রজার নিজের রাজার নিকট প্রতীকার প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য, শিশিরকুমার বলিতেন যে, ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের কোনও অন্যায় প্রতিকারের চেষ্টায় ফরাসী গভর্ণমেণ্টের নিকট গমন যেমন অসঙ্গত, সেইরূপ স্বীয় রাজ্যের কোনও অন্যায়ের প্রতিকারের চেষ্টায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট গমন করা অযুক্তিযুক্ত। মলহররাও যখন বরোদার গাইকোয়ারের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, কর্ণেল ফেয়ার তখন বরোদার রেসিডেণ্ট সাহেব বরোদাধিপতির উপর বড় সদয় ছিলেন না। মলহররাও পানীয় দ্রব্যের সহিত হীরকচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া কর্ণেল ফেরারের প্রাণনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া অভিযুক্ত হন। অভিযোগের বিচার জন্য তিনজন দেশীয় রাজা ও তিনজন ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী লইয়া একটী কমিশন গঠিত হইয়াছিল। বিচারে মলহররাও যদিও দোষী বলিয়া প্রমাণ হইলেন না, তথাপি তাঁহাকে রাজ্য শাসনের অনুপযুক্ত বলিয়া বরোদার সিংহাসন হইতে অপসৃত করা হইল। মলহররাও এর বংশের অন্য একজনকে গাইকোয়ার নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা তখন দ্বিভাষী ছিল। পত্রিকার ইংরাজী অংশটী বাড়াইয়া দিয়া শিশিরকুমার একটী overland Edition বাহির করিয়া, দক্ষিণ ভারতের সর্ব্বত্র, তাহা প্রচুর পরিমাণে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মাদ্রাজ, বোম্বাই, ত্রিবাঙ্কুর, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানের অধিবাসিগণ অমৃতবাজার পত্রিকার মধ্যে একটা বিশেষত্ব ও নূতন ভাব লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। পত্রিকা পাঠ করিবার জন্য তাঁহারা উৎসুক হইয়া থাকিতেন। বরোদার ব্যাপার লইয়া দেশমধ্যে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল; সর্ব্বত্রই মলহররাওয়ের প্রতি অবিচারের কথা আলোচিত হইত। বরোদার ব্যাপার লইয়া শিশিরকুমার পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে ভারতবাসী বিভিন্ন জাতির স্বার্থ যে একই সূত্রে জড়িত, ইহাই প্রমাণ করা শিশিরকুমারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। গভর্ণমেণ্টের ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইলে শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় ইংরাজী ও বাঙ্গালায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আমরা ইংরাজী উদ্ধৃত না করিয়া, পাঠকগণের সুবিধার জন্য ১২৮২ খৃঃ অঃ ১৭ই বৈশাখের অমৃতবাজার পত্রিকার বাঙ্গালা অংশ হইতে একটী প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিলাম।

"মলহর রাওয়ের রাজ্যচ্যুতি।"

"প্রবল ঝটিকা হইয়া গেলে সংসার যেমন স্তম্ভিত হয়, মলহর রাওয়ের রাজ্যচ্যুতিতে ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সেইরূপ স্তম্ভিত হইয়াছে। তৃষিত চাতক বারিভরে অনবরত মেঘের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে বারি প্রত্যাশা করিতেছিল, জলধর বারিবর্ষণ না করিয়া তাহাকে বজ্রাঘাত করিয়াছেন। ভারতবর্ষ

বাসীরা স্বপ্নেও এরূপ আশঙ্কা করিয়াছিল না যে, লর্ড নর্থব্রুকের মুখ হইতে এরূপ নিদারুণ বাক্য নিসৃত হইবে। দুর্ব্বল ব্যক্তিকে অপেক্ষাকৃত প্রবল ব্যক্তির বল দ্বারা শাসন করা রাজনীতির নূতন নিয়ম নহে। যতদিন রাজার সৃষ্টি হইয়াছে, যতদিন রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, ততদিন এই নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। সেদিন এই নিয়ম অনুসারে ফ্রান্স নররক্তে প্লাবিত হয়, ফ্রান্স সম্রাট রাজ্যচ্যুত হন এবং ফ্রান্সের পতন হয়, এই নিয়মানুসারে প্রতাপান্বিত ইংলণ্ড অকারণে সে দিন আমেরিকা ও রুষিয়ার নিকট অবনত হইলেন। লর্ডমেও যদি মলহর রাওকে রাজ্যচ্যুত করিতেন, মলহররাও কেন, এদেশের সমুদয় স্বাধীন রাজ্যগুলি ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করিতেন, তাহা হইলে আমরা তাহাতে যত অন্যায়ই দেখিতাম, মনকে ইহাই বলিয়া সান্ত্বনা দিতাম, যে জগতের রীতিই এই। লর্ড ড্যালহাউসী অযোধ্যার নবাবকে যে অন্যায় পূর্ব্বক রাজ্যচ্যুত করেন, তাহাতে লোকে ইহাই বলিয়া মনকে প্রবোধ দেয় যে তাঁহার ন্যায় গভর্ণর জেনারেল দ্বারা এরূপ অন্যায় কার্য্য সম্পাদিত হওয়া অপেক্ষা না হওয়াই আশ্চর্য্য। কিন্তু নর্থব্রুক, যিনি আমাদের নিরপেক্ষতার উদাহরণ স্থল, যিনি আমাদের সন্তপ্ত হৃদয়ে শীতল বারি সিঞ্চন করিতে ভারতবর্ষে অবতরণ করেন, তিনি মল্লহররাওকে রাজ্যচ্যুত করিলেন। যে লর্ড নর্থব্রুক্ আমাদের সকল আশার প্রস্রবণ, যাহার মুখ দেখিয়া, অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমরা অনেক কষ্ট বিস্মৃত হইয়াছি, তিনি মলহররাওকে রাজ্যচ্যুত করিলেন। যখন আমাদের এই কথা স্মরণ হইতেছে আমরা চারিদিক শূন্য দেখিতেছি। আমরা স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলাম না যে লর্ড নর্থব্রুক দ্বারা এরূপ কার্য্য হইবে যাহাতে ভারতবর্ষবাসীরা সন্তাপ সাগরে ভাসিবে। কিসে লর্ড নর্থব্রুককে এরূপ নিদারুণ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইল তাহা আমরা এখনও বুঝিতে পারি নাই। কিসে তাঁহার মন এরূপ পরিবর্তিত হইল যে তিনি কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না? তিনি আমাদিগকে শান্তি, সন্তোষ প্রদান করিতে

ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হন এবং গাইকোয়াড়কে রাজ্যচ্যুত করিলে যে ভারতবাসীদিগের অবস্থা মর্ম্মান্তিক হইবে তাহা তিনি জানেন, কিন্তু তাহা তিনি কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি জানেন গাইকোয়াড়কে রাজ্যচ্যুত করিলে ন্যায্য বিচার হইবে না, তিনি যে প্রতিজ্ঞা দ্বারা আপনাকে আবদ্ধ করেন, তাহার বিপরীত কার্য্য করা হইবে। তিনি জানেন যে, তাঁহার এই কার্য্য দ্বারা ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজাদিগের মধ্যে আতঙ্কের উদয় হইবে, স্বাধীন রাজারা আপনাদিগের মান মর্য্যাদা, পদগৌরব, নিজেদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইবেন। তিনি যে অপরাধে গাইকোয়াড়কে রাজবিচারে উপস্থিত করেন, তাহা হইতে তিনি নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, শুধু কমিশনারগণ তাঁহাকে নিষ্কৃতি দেন নাই, ইংলণ্ডবাসীরা তাঁহাকে এই অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছেন, ষ্টেট সেক্রেটারী তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিয়াছেন। এ দেশে যাঁহারা তাঁহার শত্রুপক্ষীয় তাঁহারা ও আর স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিতেছেন না যে তিনি অপরাধী, এবং গভর্ণমেণ্টও এরূপ বলিতে পারিতেছেন না যে তিনি অপরাধী, তথাপি লর্ড নর্থব্রুক্ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন। মলহর রাওয়ের আর এক অপরাধ যে, তাঁহার রাজ্যে অবিচার হয়। কিন্তু যে রাজার বিপদে প্রজারা আহার নিদ্রাত্যাগ করিয়াছে, যে রাজাকে সিংহাসনে পুনঃ স্থাপনের নিমিত্ত প্রজাবর্গ গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিতেছে, যাহারা সুসভ্য ইংরাজ শাসনাধীন হওয়া অপেক্ষা তাঁহার অধীনে অবস্থিতি করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর মনে করে,—যে রাজার প্রতি প্রজার এরূপ অনুরাগ তাঁহার রাজ্যে অবিচারও অরাজক হইতেছে বলা সম্পূর্ণ অন্যায়। কিন্তু লর্ড নর্থব্রুক্ ইহাও গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না। তবে কি প্রথম অবধি লর্ড নর্থব্রুকের উদ্দেশ্য ছিল যে মলহররাও দোষী হউন, নির্দ্দোষ হউন, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবেন? তিনি মলহররাওকে বন্দী করার সময় প্রতিজ্ঞা করেন যে, বিচারে নিষ্কৃতি পাইলে মলহররাও পুনরায় সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন। তিনি ইতি পূর্ব্বে

প্রতিজ্ঞা করেন যে ২০ মাসের মধ্যে যদি গাইকোয়াড় রাজ্যে সুবিচার স্থাপন না করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার প্রতি গুরুতর আজ্ঞা হইবে; কিন্তু এই ২০ মাসের মধ্যে তাঁহার কোন ভয় নাই। এ সমুদয় কি অলীক? আমরা লর্ড নর্থব্রুককে এরূপ অপবাদ দিতে পারি না। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা এখনও বিশ্বাস করেন যে এরূপ অপবাদ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু তিনি আপনার বুদ্ধির নিমিত্তই হউক, আর কুলোকের পরামর্শ শুনিয়াই হউক বরোদা সম্বন্ধে আগাগোড়া যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে যদি কেহ এখন এই অপবাদ দেয়, তাহা হইলে তাঁহার আত্মীয় স্বজনের তাঁহার পক্ষ হইয়া কোন কথাই বলিবার আর সাধ্য নাই। মলহররাওকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তিনি শুধু অবিচার করেন নাই, তাঁহার বন্ধু বান্ধব, অনুগত আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে মর্ম্মান্তিক কষ্ট দিয়াছেন। লর্ড নর্থব্রুক ভারতবর্ষের অধীশ্বর, তিনি অতি উচ্চ আসনে আরূঢ়, তাঁহার চতুর্দিকে যে বায়ু ব্যজিত হয় তাহা অমৃতময়, তাঁহার কর্ণে যে শব্দ প্রবেশ করে তাহা মধুপূর্ণ. তিনি অহর্নিশি প্রফুল্লিত মুখদর্শন করেন, তাঁহার নিকট সম্ভবতঃ ভারতবর্ষবাসীদিগের মলিন মুখ প্রতিবিম্বিত হইবে না ভারতবর্ষবাসীদিগের দীর্ঘ বিশ্বাসে তাঁহার চতুঃপার্শ্বের বায়ুরাশি কম্পিত করিবে না। কিন্তু ভারতবর্ষে অনেকেই তাঁহার অনুগত ও বন্ধু। তাঁহারা প্রতিপদবিক্ষেপে ভারতবাসীদিগের মলিন মুখ দর্শন করিতেছেন আর লজ্জায় অধোমুখ হইতেছেন; তাঁহাদের কর্ণে যে শব্দ প্রবেশ করিতেছে, তাহাই ভারতবর্ষ-বাসীদিগের অসন্তোষভাব পূর্ণ; তাঁহারা যাহার নিকট যাইতেছেন, সেই বলিতেছে যে লর্ড নর্থব্রুক দ্বারা এই কার্য্যটী হইল। লর্ড নর্থব্রুক যদি মলহররাওকে বন্দী করিয়াই রাজ্যচ্যুত করিতেন, তাহা হইলে লোকে কষ্ট পাইত, কিন্তু সে কষ্ট তাহাদের মর্ম্মচ্ছেদ করিতে পারিত না। তিনি গাইকোয়াড়ের প্রতি সুবিচার করিবেন আমাদিগকে এই বাক্য দ্বারা কেবল সান্ত্বনা করেন নাই, যাহাতে এই গাইকোয়াড় এই

বিপদ হইতে উদ্ধার হন, তিনি পদে পদে তাহার সাহায্য করিয়াছেন। যখন লোকে জানিল যে, গাইকোয়াড় নিষ্কৃতি পাইলেন, যখন সকলে প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহাকে পুনর্ব্বার সিংহাসনারূঢ় দেখিবে প্রত্যাশা করিতেছে, যখন যাহারা গাইকোয়াড়ের উদ্ধারের নিমিত্ত ঈশ্বরের অর্চ্চনা করে, তাহারা ভাবিতেছে যে ঈশ্বর তাহাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন,—যখন গাইকোয়াড় নিষ্কৃতি হইলেন বলিয়া লর্ড নর্থব্রুকের অনুগত আত্মীয় স্বজন আনন্দিত হইতেছেন এবং দেশীয় লোক সকলে লর্ড নর্থব্রুকের জয়জয়কার করিতেছে, এই সময় সহসা গাইকোয়াড় রাজ্যচ্যুত হইলেন। সুতরাং এই নিদারুণ আজ্ঞা পূর্ব্বে লোকের মনে যত কষ্ট প্রদান করিত, এখন তাহা অপেক্ষা অসংখ্যগুণ অধিক কষ্ট প্রদান করিয়াছে। মলহররাও গেলেন তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি কি? খণ্ডারাওয়ের মৃত্যুর সময় ও আমরা বিন্দুমাত্র চক্ষের জল নিক্ষেপ করি নাই। মলহররাওয়ের যদি মৃত্যু হইত তাহা হইলেও বোধ হয় আমরা মুহূর্ত্তের নিমিত্ত দুঃখিত হইতাম না। তিনি রাজ্যচ্যুত হইলেন, তাঁহার স্থলে আর একজন গাইকোয়াড় নিযুক্ত হইতেছেন, সুতরাং তাঁহার রাজ্যচ্যুত হওয়াতেই বা আমাদের বিশেষ ক্ষতি কি হইল? কিন্তু লর্ড নর্থব্রুকের এই কার্য্যে নিরাশা আসিয়া আমাদিগকে অবসন্ন করিয়াছে, আমাদের আর বল ভরসা কিছু মাত্রই নাই। যখন নির্দ্দোষিতা মলহররাওকে রক্ষা করিতে পারিল না, যখন দেশীয় লোক একত্রিত হইয়া গবর্ণর জেনারেলের নিকট রোদন করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিল না, যখন টাইম্‌স ও ইংলণ্ডের যাবতীয় সংবাদ পত্র তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিল না, ষ্টেট সেক্রেটরী তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, তখন আমাদের রক্ষা কোথায়, যখন লর্ড নর্থব্রুকের ন্যায় প্রজারঞ্জক গবর্ণর জেনারেল দ্বারা এইরূপ নিদারুণ আজ্ঞা নিঃসৃত হইল, তখন আমাদের আর ভরসা কি?"

মলহররাওয়েব রাজ্যচ্যুতির ব্যাপার লইয়া অমৃতবাজার পত্রিকা ও হিন্দু প্যাট্রিয়টের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। বরোদার ব্যাপারে

লর্ড নর্থব্রুক যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় তীব্রভাবে তাহার সমালোচনা করিলে হিন্দু প্যাট্রিয়ট বড়লাট বাহাদুরকে সমর্থন করিয়াছিলেন।*

স্বীয় ব্যবহারে হিন্দু প্যাট্রিয়ট ক্রমশঃই দেশবাসীর বিশ্বাস হারাইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকার প্রসার ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শিশিরকুমার সকল উৎপাতের মূলীভূত কারণ, অতএব তাঁহাকে দমন করার জন্য হিন্দু প্যাট্রিয়ট দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। শিশিরকুমার বরোদার ব্যাপার লইয়া অমৃতবাজার পত্রিকায় যেরূপভাবে আন্দোলন করিয়াছেন, তাহাতে রাজদ্রোহিতার আভাস স্পষ্টই লক্ষিত হয়। রাজদ্রোহিগণ সংবাদ পত্রে আন্দোলন করিয়া গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের বহু বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য; এই মর্ম্মে হিন্দু প্যাট্রিয়ট্ পত্রিকায় এক অতি বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় "প্যাট্রিয়টের স্বদেশানুরাগ" (Patriot's Patriotism) শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকাকে অভিযুক্ত করিবার আয়োজন হইতে লাগিল। পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কোনটীর এক পংক্তির কোন অংশ, অন্য এক পংক্তির কতক অংশে যোগ করিয়া দিয়া এক নূতন পংক্তি সৃষ্টি করিয়া অমৃতবাজার পত্রিকাকে রাজদ্রোহ প্রচারক সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। অমৃতবাজার পত্রিকাকে আইন অনুসারে অভিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হইলে তাৎকালিক এড্ভোকেট্ জেনারেল মিষ্টার পল্ বলিয়াছিলেন যে, পত্রিকার প্রবন্ধগুলি বাস্তবিক রাজদ্রোহিতা দোষে দুষ্ট নহে,

* হিন্দু প্যাট্রিয়ট লিখিয়াছিলেন,—"The country could afford to lose many a Mulhar Rao, but could ill afford to lose the services of such an enlightened, high minded and just statesman as Lord North brook.

জুরিগণ বিচারে পত্রিকা সম্পাদককে শাস্তি দান করিবেন বলিয়া মনে হন না। এরূপ অবস্থায় গভর্ণমেণ্টের এই মোকদ্দমা না করাই কর্ত্তব্য। গভর্ণমেণ্ট এড্‌ভোকেট্‌ জেনারেলের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বলা-বাহুল্য হিন্দু প্যাট্রিয়ট্‌ ইহাতে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা ও হিন্দু প্যাট্রিয়টের বিবাদের কথা লইয়া "ভারত সংস্কারক" যাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম,—

"অমৃতবাজার পত্রিকা ও হিন্দু প্যাট্রিয়টের মধ্যে প্রকাশ্যরূপে বিবাদ চলিতেছে দেখিয়া আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। অমৃত-বাজার বলেন, আমরা যখন হিন্দু প্যাট্রিয়টের দোষ দর্শন করিয়াছি, তখনি গোপনে তৎসম্পাদককে তজ্জন্য অনুযোগ করিয়াছি এবং তদ্দ্বারা তাঁহার মত সময় সময় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু প্যাট্রিয়ট, আমাদের লেখার এক এক অংশ হইতে অন্যায় সমালোচনা পূর্ব্বক সাধারণের নিকট আমাদিকে অপদস্থ করিয়াছিলেন। তিনি এখন ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন, গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কিছু লেখা হইলে তিনি যদি তাহা সহ্য করিতে না পারেন, লোকে বলিবে তিনি এখন গভর্ণমেণ্টের সন্তোষ সাধনার্থী হইয়াছেন।' হিন্দু প্যাট্রিয়টের মতে অমৃতবাজার কর্ণেল ফেয়ারকে বিষ খাওয়াইবার কর্ত্তব্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। অমৃতবাজার এরূপ দোষে আদৌ দোষী কিনা তাহার আলোচনা আমরা এখানে করিতে চাহি না। কিন্তু হিন্দু প্যাট্রিয়ট্‌ এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বিজ্ঞোচিত কার্য করিয়াছেন আমরা কখন এরূপ বলিতে পারিব না। এরূপ উক্তির দ্বারা একজন সহযোগীর ঘোর বিপদাপন্ন হইবার সম্ভাবনা, প্যাট্রিয়ট্‌ কি তাহা বুঝিতে পারেন না? বিশেষতঃ অমৃতবাজারের সংগে যখন তাঁহার বাধ্য-বাধকতা রহিয়াছে তখন যথার্থ কোন ভ্রমপ্রমাদ দেখিলে গোপনে উপদেশ দিলেই বন্ধুর কার্য্য করা হইত। প্যাট্রিয়ট্‌ দেশীয় পত্র

সকলের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য হইয়াছেন, তিনি যখন কোন সহযোগীর উপর সম্পাদকীয় উক্তি প্রকাশ করেন, বিশেষ বিবেচনা সহকারে করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।”

মলহররাও এর স্থলে গভর্ণমেণ্ট যাঁহাকে গাইকোয়াড়ের পদে অভিষিক্ত করেন, লর্ড রিপনের শাসনকালে একবার তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পছন্দমত একটী লোককে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলে, পলিটিক্যাল এজেণ্ট তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। এজেণ্ট সাহেব নিজের নির্ব্বাচিত একটি লোককে দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করেন। প্রতিকারের আশায় গাইকোয়াড় কলিকাতায় আসিয়া লর্ড রিপণের শরণাপন্ন হন এবং লর্ড রিপণও তাঁহাকে এজেণ্টের যথেচ্ছাচারিতার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময় গাইকোয়াড় শিশিরকুমারকে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া তাঁহার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী মিষ্টার সমর্থকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে শিশিরকুমার গাইকোয়াড়কে বলিয়াছিলেন যে, তিনি পদচ্যুত মলহররাও পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি তাঁহার শত্রু। শিশিরকুমারের এই কথায় গাইকোয়াড় প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন, “আপনি যদি মলহররাওয়ের পক্ষাবলম্বন করিয়া আন্দোলন না করিতেন, তাহা হইলে বরোদার সিংহাসন সম্বন্ধে বোধ হয় স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইত। গভর্ণমেণ্ট হয়ত বরোদা রাজ্য স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া লইতেন; আর আমার বরোদার সিংহাসনে স্থান হইত না। সুতরাং আপনি আমার শত্রু নন, পরম বন্ধু।”

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের পিতৃদেব স্বর্গগত মহানুভব সপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজরূপে ভারত ভ্রমণে আগমন করিয়াছিলেন। কৌতূহল পরবশ হইয়া তিনি বঙ্গললনার রূপলাবণ্য দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশের সামাজিক রীতি ও নীতি তিনি অবগত ছিলেন না। তাঁহাদের দেশের ন্যায় এদেশেও স্বাধীনতা আছে, বোধহয় এই ভাবিয়াই তিনি নিঃসঙ্কোচে উপরোক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। বঙ্গললনাগণ অন্তঃপুরচারিণী; সর্ব্ব সাধারণের সমক্ষে বাহির হওয়া তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব, একথা যদি যুবরাজকে কেহ ভাল করিয়া বুঝিয়া দিতেন, তাহা হইলে তিনি বঙ্গললনার রূপলাবণ্য দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বঙ্গবাসীগণের হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক আঘাত প্রদান করিতেন কিনা সন্দেহ। যুবরাজের কৌতুহল নিষ্কৃতি করিতে হইলে দেশবাসিগণ অন্তরে দারুণ বেদনা প্রাপ্ত হইবে, একথা জানিয়াও তৎকালের গভর্ণমেণ্টের পক্ষীয় উকীলবাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় এক বঙ্গ মহিলা সভার আয়োজন ব্যাপৃত হন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে মহিলা সভার অধিবেশন হইল এবং সেই সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া যুবরাজ উপস্থিত হন। মর্ম্মাহত শিশিরকুমার এই ব্যাপার লইয়া তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন। এক প্রবল উত্তেজনার বন্যা যেন সমগ্র দেশকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। শিশিরকুমার পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, "রাজার নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে, পরিবারের গৌরব রক্ষা করিতে হিন্দুরা অনেক সময় রাজার বিরুদ্ধেও খড়্গ ধারণ করিয়াছেন। জগদানন্দবাবুর মনে কি এরূপ কথা একবারও উদয় হইল না যে তিনি যুবরাজকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিবারের মধ্যে লইয়া গেলে তিনি শুদ্ধ হিন্দু সমাজের নিকট হাস্যাস্পদ ও ঘৃণ্য হইবেন না, রাজপুরুষরাও তাহাকে ঘৃণা করবেন ?*** আমরা এতদিন পরে জানিলাম যে আমাদের চরম অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। যে হিন্দু পরিবরের মধ্যে অতি ঘনিষ্ট আত্মীয়ও প্রবেশ করিতে পারেন না, সেখানে রাজার তাহাতে আবার বিধর্ম্মী ও বিদেশীয় রাজার প্রবেশ, ইহা শুনিলে হিন্দু মাত্রেই রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবেন, লজ্জায় ও ঘৃণায় অধোবদন হইবেন।" এই সময়ই কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত "বেঁচে থাকো

মুখুয্যের পো,” “সাবাস ভবানীপুর সাবাস তোমায়” প্রভৃতি ব্যঙ্গ কবিতা অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই মহিলা সভার ব্যাপার লইয়া একখানি প্রহসন রচিত হইয়া ন্যাশানাল রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। জনসাধারনের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য রঙ্গমঞ্চের সত্বাধিকারিগণ প্রত্যেক রজনীতেই অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই অভিনয়ের ব্যাপার লইয়া যখন দেশমধ্যে একটা মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল, তখন গভর্ণমেণ্ট এক নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিলেন। এই আইন অদ্যাপিও বলবত্ রহিয়াছে। এই আইনেরই বলে আজকাল রঙ্গমঞ্চে কয়েকখানি অতি উচ্চাঙ্গের নাটকের অভিনয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই আইন বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে শিশিরকুমার ও তাঁহার সহোদরগণের চেষ্টায় এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

স্যার জে স্টিফেন যখন বঙ্গদেশের আইন সদস্যের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময় তিনি জুরীর বিচার প্রথা উঠাইয়া দিয়া বিচারকদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার জন্য এক নূতন বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই আইন দ্বারা পুলিশের হস্তে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদান করাও স্যার স্টিফেনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। অমৃতবাজার পত্রিকায় শিশিরকুমার সর্ব্বপ্রথমে প্রস্তাবিত বিধির বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিয়া জনসাধারণকে ইহার অপকারিতা বুঝাইতে আরম্ভ করেন। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি স্যার জেমস্ স্টিফেনের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রস্তাবিত বিধির সমর্থন করিতে লাগিল। তাহারা জনসাধারণকে এইরূপ বুঝাইতে লাগিল যে, দুর্ব্বলকে অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইলে রাজকর্ম্মচারীদিগের হস্তে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকা আবশ্যক ; জুরীর বিচার দ্বারা দেশের ভীষণ ক্ষতি হইতেছে, সুতরাং তাহা বিলোপ সাধন করিয়া বিচারকদিগের হস্তে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করাই কর্ত্তব্য। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান

সংবাদপত্রগুলি যাহা বুঝাইলেন, আমাদের দেশের নেতারাও অনেকে তাহাই বুঝিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকায় শিশিরকুমারের লেখনীনিঃসৃত সদ্‌যুক্তি ও তেজস্বীতাপূর্ণ প্রবন্ধগুলি অসার বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। শিশিরকুমার কিন্তু নিরুৎসাহ না হইয়া স্যার জেমস্ স্টিফেনের প্রস্তাবিত বিধির বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে থাকিলেন। একদিন তিনি বাবু কৃষ্ণদাস পালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, জুরীর বিচার প্রথা যদি বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে দেশের ভয়ঙ্কর ক্ষতি হইবে, এরূপ ক্ষেত্রে স্যার জে স্টিফেনের প্রস্তাবিত বিধির প্রতিবাদ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। প্রত্যুত্তরে বাবু কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন, "যে বিচার দ্বারা প্রকৃত অপরাধীরা অনায়াসে মুক্তি লাভ করিতে পারে, সে বিচার প্রথা যত শীঘ্রই দেশ হইতে অন্তর্হিত হয়, ততই মঙ্গল। আইন সদস্য স্যার জেমস্ স্টিফেন অনেক বিবেচনা করিয়া যে নূতন বিধি প্রণয়ন করিতেছেন, তাহা আমাদের প্রত্যেকেরই সমর্থন করা কর্ত্তব্য।

জাতীয় মহাসমিতির প্রধান প্রধান সদস্যগণকে শিশিরকুমার জুরীর বিচারের অনুকূলে জাতীয় মহা সমিতিতে আন্দোলন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই। কংগ্রেসের নায়কগণ ও জুরীর বিচার প্রথা সমর্থন করা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। শেষে এক অতি অদ্ভুত কারণে কংগ্রেসের পরিচালকগণ জুরীর বিচার সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অর্থাভাববশতঃ তাঁহারা মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে কংগ্রেসে যোগদান ও অর্থ সাহায্য দানের জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসে তাঁহার বিন্দুমাত্র আস্থা নাই, তবে শিশিরবাবু যদি কংগ্রেসের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তিনি তাহাতে যোগদান করিতে পারেন। জাতীয় মহাসমিতির পাণ্ডাগণ আসিয়া শিশিরকুমারকে ধরিয়া বসিলেন। শিশিরকুমারও সুযোগ বুঝিয়া বলিলেন যে তাঁহারা যদি কংগ্রেসে

জুরীর বিচার প্রথা সমর্থন করেন, তাহা হইলে তিনি মহারাজা বাহাদুরকে কংগ্রেসে যোগদান ও অর্থ সাহায্য দানের জন্য অনুরোধ করিতে পারেন। কংগ্রেসের নায়কগণ বাধ্য হইয়া শিশিরকুমারের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

স্যার জেমস্ স্টিফেনের প্রস্তাবিত ক্রিমিনাল প্রসিডিওর বিল (Criminal Procedure Bill) বিধিবদ্ধ হইলে শিশিরকুমার অমৃত-বাজার পত্রিকায় ইংরাজী ও বাঙ্গালায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ১৮৭২ খৃঃ অঃ ১৮ই এপ্রিল তারিখে তিনি লিখিয়াছিলেন—"Mr. Stephen's mission is fulfilled. Clive conquered the country, Mr. Stephen leaves it ENSLAVED. It was this lawciver, forced upon us by a despatic Government, who prevented us to cry freely to our Rulers for the redress of our grievance by his gagging act.*** The great boon which was granted to the natives during Mr. Beadon's administration, we mean, the trial by jury, was withdrawn last Tuesday." হায়! এই নির্ভীক সমালোচনার দিন গত হইয়াছে। সাধারণ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা ১৮৭২ খৃঃ অঃ ২৫শে এপ্রিলের অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে একটী প্রবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিলাম—

"তিনি (স্টিফেন) ভারতবর্ষ পরিত্যাগের অব্যবহতি পূর্ব্বে যে এক শেষ কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার সফল কীর্তির চূড়া স্বরূপ হইবে। বৃহস্পতিবারে তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন এবং মঙ্গলবারে তিনি ভারতবর্ষীয় ২০ কোটী প্রজাকে আমেরিকার দাসের ন্যায় করেন। দণ্ডবিধি আইন বিস্তৃত হইয়া আমাদের মুখবন্ধ হইয়াছে, কার্য্যবিধান আইন সংশোধিত হইয়া আমরা হস্তপদ বদ্ধ হইয়াছি। তিনি এই আইন দ্বারা এদেশ হইতে প্রকারান্তরে জুরির বিচার উঠাইয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে ম্যাজিষ্ট্রেটেরা একমাস মেয়াদ ও

একশত টাকা জরিমানা করিলে তাহার আপীল ছিল না। তিনি এই আইন দ্বারা ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের এ সম্বন্ধে ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। এক্ষনে ম্যাজিষ্ট্রেটরা তিন মাস মেয়াদ দিলে ও দুইশত টাকা জরিমানা করিলে তাহার আপীল হইবে না এমন নহে, ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের এরূপ মোকদ্দমার কোন নথী কি কাগজপত্র রাখিতে হইবে না। তাঁহারা মুখে একজনকে তিন মাস কারারুদ্ধ ও ২০০শত টাকা জরিমানা করিতে পারিবেন। আবার আসামী খালাস হইলে পূর্ব্বে তাহার আর কোনও বিপদ ছিল না, ষ্টিফেন সাহেব আইনের বলে এখন যদি কোনও আসামী জজের বিচারে খালাস হয়, তবে ম্যাজিষ্ট্রেটরা হাইকোর্টে আসামীর বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন, অর্থাৎ ইচ্ছা করিলে ম্যাজিষ্ট্রেটেরা যাহাকে তাহাকে উচ্ছন্ন ও চিরকাল কারাবাসে রাখিতে পারিবেন। এক্ষনে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাহারও উপর একটু কোপ হইলে তাহার আর নিস্তার নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবেন। ষ্টিফেন সাহেব ভারতবর্ষে আসিয়া এদেশীয়গণকে এইরূপে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া গেলেন। আমরা এখন আর মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিব না, এবং হাকিমদিগের ইচ্ছার বিপরীত কোন কার্য্য করিতে সাহস করিব না। তিনি আমাদিগকে আষ্টে পৃষ্টে বন্ধন করিয়া স্বেচ্ছাচারী মফঃস্বলের হাকিমদিগের ইচ্ছা ও কৃপার উপর নিক্ষেপ করিয়া গেলেন।”

ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট এক্টএর প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে শিশিরকুমারের যত্নে ও চেষ্টায় ইণ্ডিয়ান লীগের পক্ষ হইতে ১৮৭৭ খৃঃ অঃ ২১শে এপ্রিল তারিখে টাউন হলে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভার পূর্ব্বে শিশিরকুমার হাইকোর্টে গিয়া প্রত্যেক ভারতীয় ব্যারিষ্টারকে সভায় যোগদান করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় হইতে আমরা

যে অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছি, তাহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে গভর্ণমেণ্ট যে নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার জন্য কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন, তাহা প্রত্যেকরই প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য, শিশিরকুমার ইহা জনসাধারণকে সাধ্যমত বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। টাউন হলের সভায় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। রাজা শ্যামশঙ্কর রায়, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বাবু অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, মিষ্টার ফিস্ক, বাবু কালীচরণ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

লর্ড লিটনের কার্য্যকাল অবসানের পর লর্ড রিপন ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তারূপে এদেশে আগমন করেন। ভারতীয় মিল সমূহের শ্রমজীবিদিগের প্রতি তিনি একটু সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সহানুভূতি শিশিরকুমারের হৃদয়ে আনন্দের পরিবর্ত্তে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। ম্যাঞ্চেষ্টারের কলগুলির স্বত্ত্বধিকারীগণ আপন আপন স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এদেশীয় কলের স্বত্তাধিকারিগণের বিরুদ্ধে সর্ব্বদা এই অনুযোগ করিতেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের অধীন শ্রমজীবীগণের উপর নিদারুণ অত্যাচার করিয়া থাকেন। এদেশে পদার্পণ করিবার অব্যহিত পরেই লর্ড রিপণ মিলের 'শ্রমজীবিগণের প্রতি একটু সহানুভূতি প্রদর্শণ করায় শিশিরকুমার তাঁহাকে ম্যঞ্চেষ্টারের মিল সমূহের স্বত্বাধিকারীগণের একজন পরম সুহৃদ মনে করিয়াছিলেন। লাট বাহাদুরের সহানুভূতি এদেশীয় মিলগুলির ধ্বংসের ও ম্যাঞ্চেষ্টারের মিলগুলির উন্নতির কারণ হইবে, শিশিরকুমারের হৃদয়ে এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল। তিনি লর্ড রিপণের সহানুভূতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া অমৃতবাজার পত্রিকায় আন্দোলন করিলে লাট বাহাদুরের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী মিষ্টার প্রিমরোজ, তাহাকে লাট বাহাদুরের কয়েকখানি পুস্তক উপহার দিয়া লিখিয়াছিলেন, "আপনি গ্রন্থ কয়খানি অধ্যয়ন করিলে লাট বাহাদুরকে সম্যকরূপে বুঝিতে পারিবেন। এতদ্দেশীয় কলগুলির শ্রমজীবিগণের

প্রতি তাঁহার সহানুভূতিতে আপনার বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই। তাঁহার সহিত আমি আপনার পরিচয় করাইয়া দিব ; তাঁহার সংস্রবে আসিলে দেখিবেন, তাঁহার হৃদয়খানি কত প্রশস্ত, কত উদার। এদেশে শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে আপনারা লর্ড রিপনকে সৎপরামর্শ প্রদান করিলে তিনি বিশেষ বাধিত হইবেন।”

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে আসমুদ্র হিমাচল পর্যন্ত স্বায়ত্বশাসনের অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন চলিতেছে। গভর্ণমেণ্টের চক্ষে ভারতবাসিগণ এখনও স্বায়ত্তশাসনের পূর্ণ অধিকার লাভের উপযুক্ত হন নাই। পূর্ব্ব শিক্ষা ব্যতীত যে উপযুক্ত হওয়া সম্ভবপর নহে, রাজকর্ম্মচারিগণ তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন না। কিন্তু লর্ড রিপণ এদেশে পদার্পণ করিয়াই বুঝিতে পরিলেন যে, ভারতে ইংরাজ শাসন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ভারতবাসিগণকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করা কর্ত্তব্য। তিনি তাহার উপযুক্ত আয়োজনেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। লর্ড রিপনের ন্যায় ধর্ম্মভীরু ও মহানুভব শাসনকর্ত্তা এদেশে আর কখনও আগমন করেন নাই। লর্ড ক্লাইভ, ওয়ারেন হেষ্টিংস্ প্রভৃতি ইংরাজ রাজপুরুষেরা ভারতবাসীর শরীর জয় করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু লর্ড রিপন স্বীর কার্য্যদ্বারা ভারত-বাসীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন, আমরা এক্ষনে পাঠকবর্গকে তাহা অবগত করাইব।

ভারতবাসীগণ ক্রমশঃ যাহাতে রাজনীতি শিক্ষা করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে লর্ড রিপন বাহাদুর স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন (Local Self-Government) সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ করিয়া এদেশে যে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার সেই আইনের বিধান অনুসারে প্রায় প্রত্যেক জেলায় ডিষ্ট্রীক্ট ও লোকাল বোর্ড নামক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিরূপে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হইলে রাজা ও প্রজা উভয়েরই মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, লর্ড রিপন তৎসম্বন্ধে তাঁহার প্রধান সেক্রেটারী মিষ্টার

মেকেঞ্জীকে কয়েকটি উপদেশ প্রদান করিয়া একটী আইন লিপিবদ্ধ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। লাট বাহাদুরের অভিপ্রায় অনুসারে মিষ্টার মেকেঞ্জী প্রস্তাবিত বিধির পাণ্ডুলিপি তাঁহার নিকট পেশ করিলেন। পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া লর্ড রিপন পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই, তিনি স্বয়ং একটি বিধি লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণের অবগতির জন্য তাহা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, লাট বাহাদুরের মহৎ উদ্দেশ্য তখন ভারতবাসীগণ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে নাই। লর্ড রিপণ যখন দেখিলেন যে, তাঁহার প্রস্তাবিত বিধি গ্রহণের জন্য দেশবাসীরা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে না, তখন তিনি বড়ই বিস্মিত হইয়াছিলেন। দূরদর্শী শিশিরকুমার লাট বাহাদুরের মহৎ উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া 'এই সময় অমৃতবাজার পত্রিকায়, প্রস্তাবিত বিধির সমর্থনে, সদ্‌যুক্তি পূর্ণ প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। লর্ড রিপন পত্রিকার সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী মিষ্টার প্রিমরোজকে একদিন বলেন, "অমৃতবাজার পত্রিকায় আমার প্রস্তাবিত বিধির সমর্থনে যে সকল সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, আপনি কি সেগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন?" লর্ড রিপনের ন্যায় মিষ্টার প্রিমরোজও পত্রিকা মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন। প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি পড়িয়াছি।" লাট বাহাদুর তখন বলিলেন, "আমি অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাঁহাকে একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখুন।" লর্ড রিপনের অভিপ্রায় অনুসারে মিষ্টার প্রিমরোজ শিশিরকুমারকে পত্র লিখিলেন। শিশিরকুমারের শরীর তখন বিশেষ অসুস্থ ছিল। প্রত্যুত্তরে তিনি মিষ্টার প্রিমরোজকে জানাইলেন যে, শারীরিক্ অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অসমর্থ। লর্ড রিপন কিন্তু তাঁহার সহিত

সাক্ষাৎ করিবার জন্য উদ্বিগ্ন। প্রাইভেট্ সেক্রেটারী পুনরায় শিশির-কুমারকে লিখিলেন যে, স্বায়ত্বশাসন বিধির সমর্থনে অমৃতবাজার পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, লাট বাহাত্বর তাহা পাঠ করিয়া তৎসম্বন্ধে তাহার সহিত পরামর্শ করিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছেন, এরূপ ক্ষেত্রে যেরূপই হউক তাঁহাকে একবার লাট বাহাত্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। দ্বিতীয়বার যখন পত্র আসিল, শিশিরকুমারকে তখন বাধ্য হইয়া লাট ভবনে গমন করিতে হইয়াছিল। এই সাক্ষাতের সময় উভয়ের মধ্যে ভারতের শাসন সংক্রান্ত অনেক বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। লর্ড রিপন বলিয়াছেন, "আমি স্বায়ত্বশাসন প্রবর্ত্তনের যে প্রস্তাব করিয়াছি, তাহা আপনার দেশবাসী সমর্থন করিতেছেন না কেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।" শিশিরকুমার বলিয়াছিলেন যে, অনেক সময় সাধারণ লোকে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের ভয়ে প্রাণ খুলিয়া অনেক কার্য্যে যোগদান করিতে সাহস করে না, স্বায়ত্বশাসনের প্রস্তাবিত বিধিটি যদি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্গণ সাধারণ লোকদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সুফল ফলবে। সার রিচার্ড টম্সন্ তখন বঙ্গদেশের ছোট লাটের মসনদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শিশিরকুমারকে বড়লাট বাহাত্বর স্যার রিভার্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের সহিত আবশ্যক বন্দোবস্ত করিতে অনুরোধ করিলে শিশিরকুমার বলেন যে, স্যার রিভার্সের সহিত তাঁহার পরিচয় নাই। লর্ড রিপনই পত্র দ্বারা শিশিরকুমারকে ছোটলাট বাহাত্বরের নিকট পরিচিত করিয়া দেন। স্যার রিভার্সও লর্ড রিপনের ন্যায় শিশির-কুমারের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। লর্ড রিপনের প্রস্তাবিত বিধির আবশ্যকতা ও উপকারিতা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটগণ যাহাতে সাধারণ জনসম্প্রদায়কে বুঝাইয়া দেন, ছোটলাট বাহাত্বর বিভাগীয় কমিশনারগণকে তাহার উচিত ব্যবস্থা করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। স্যার রিভার্স স্বয়ং সাধারণের মতামত অবগত হইবার

জন্য মফঃস্বল পরিভ্রমণে বহির্গত হইবেন স্থির করিলেন। শিশির-কুমারের মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমার এই সংবাদ অবগত হইবামাত্র পল্লীতে পল্লীতে গমন করিয়া স্বতন্ত্র শাসনবিধির উপযোগীতা সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইতে লাগিলেন। ছোটলাট বাহাদুর ঢাকা, কৃষ্ণনগর বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন। হেমন্তকুমারের নির্দেশ মত প্রত্যেক স্থানেরই অধিবাসিগণ ছোটলাট বাহাদুরের অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। শোভাযাত্রার পতাকায় "আমরা স্বায়ত্ত্বশাসন চাই" লিখিত ছিল। তোরণ দ্বারে যে সকল পতাকা উড্ডীন ছিল, তাহাতেও "আমরা স্বায়ত্তশাসন চাই" লিখিত ছিল। ছোটলাট বাহাদুর বুঝিলেন যে, দেশবাসী বাস্তবিকই স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভের জন্য আগ্রহশীল। কোন কোন সম্প্রদায় কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইলেও লর্ড রিপন স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তন করিয়া ভারতবাসী-কে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

শিশিরকুমারের বুদ্ধির প্রাখর্য্য লক্ষ্য করিয়া লর্ড রিপন তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং স্যার রিচার্ড টেম্পলের ন্যায় তিনিও শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক সময় শিশিরকুমারের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা এখানে দুইটী ঘটনার উল্লেখ করিব। এক সময় এলাহাবাদে কয়েকজন সৈন্য মাতাল অবস্থায় একটী এদেশীয় স্ত্রীলোকের উপর ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল। এই অত্যাচারের ফলে হতভাগিনী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পিশাচগণ কিন্তু বিচারে মুক্তিলাভ করিল। এই বিচার বিভ্রাটের ব্যাপার লইয়া শিশিরকুমার ঘোরতর আন্দোলন করিয়াছিলেন। লর্ড রিপন এই বিচার বিভ্রাটের জন্য এলাহাবাদ হাইকোর্টের কৈফিয়ত চাহিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু শিশিরকুমার তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন, কৈফিয়ত তলব করিয়া হাইকোর্টের মর্য্যাদা লাঘব করা উচিত বলিয়া মনে হয় না। প্রকাশ্যভাবে কোনরূপে হৈ চৈ আর না করিয়া, যাহাতে ভবিষ্যতে এরূপ বিচার বিভ্রাট না ঘটে, গোপনে তাহার

ব্যবস্থা করিলে সুফলের সম্ভবনা আছে। বড়লাট বাহাদুর শিশির-কুমারের পরামর্শ মত কার্য্য করিয়াছিলেন। ওয়েব্ নামক জনৈক ইংরাজ কুলিদিগের রক্ষকরূপে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিল। এই পাষণ্ড একটী কুলি রমনীর উপর বলপূর্ব্বক পাশবিক অত্যাচার করিয়াছিল। অত্যাচারের ফলে রমনীটীর মৃত্যু হয়। আসাম জোড়-হাটের এসিস্টাণ্ট কমিশনার ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিষ্টার ম্যাক্লিয়ডের নিকট এই মোকদ্দমার বিচার হয়। বিচারে ওয়েবের মাত্র ১০০, একশত টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছিল। এই বিচার বিভ্রাটের ব্যাপার লইয়া শিশিরকুমার তাঁহার অমৃতবাজার পত্রিকায় স্বভাবসিদ্ধ নির্ভীকতা ও তেজস্বিতার সহিত ঘোরতর আন্দোলন করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি লর্ড রিপনকেও এই বিচার বিভ্রাটের কথা জানাইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ফলে গভর্ণমেণ্ট মোকদ্দমার সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন।*

---

*গভর্ণমেণ্টের মন্তব্যের কতক অংশ উদ্ধৃত হইল—

"On a review of Mr. Mcleod's proceedings the conclusion of the Government of India is that the allegations which have been made of a miscarriage of justice in the case must be largely attributed to the failure of the assistant Magistrate to make a full, searching and properly conducted enquiry. It is difficult to exaggerate the mischief which is done by such a case as the present. There is no province in India in which is strict, firm and impartial administration of justic between Europeans and Natives is of more vital importance than it is in Assam, and there is no place where cases arising out of assaults or alleged assults by Europeans on Natives are more likely to occur or where it is more important that such cases should be thoroughly investigated. In connection

আইনের বিধান অনুসারে পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যই পরিচালিত হইতেছে। আইনেরই উপর রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। এরূপ ক্ষেত্রে আইন গঠন বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। বড়লাট বাহাদুর লর্ড রিপন প্রচলিত ফৌজদারী আইনের সংশোধন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে আইন সদস্য মিষ্টার ইলবার্ট দেশীয় সিভিলিয়ানগণের হস্তে ইউরোপীয়ানদিগের বিচারভার অর্পন করিবার জন্য এক নূতন বিধান প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বিলটি ইলবার্ট বিল নামে পরিচিত। লর্ড রিপন স্বায়ত্তশাসন আইন প্রবর্ত্তন করিয়া ইউরোপীয়ানদিগের বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন। তাহার উপর ইলবার্ট বিলের প্রস্তাবে ইউরোপীয় সম্প্রদায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। শিশিরকুমার তাঁহাদের ক্রোধাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া তাহা চতুর্গুণ করিয়া তুলিলেন। তিনি অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে, যে সকল ইউরোপীয় দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেটগণের হস্তে সুবিচার পাইবেন না বলিয়া আশঙ্কা করেন, তাঁহারা কাপুরুষ। এই সময় অমৃতবাজার পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইংরাজদিগকে কাপুরুষ বলায় ইংলিশম্যান পত্রিকা বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি শিশিরকুমারকে

---

with this point, the Governor General in Council observes that at the hearing of the case in the High Court, the crown was not represented by council. The Governor General in Council regrets that this was the case, as had the Local Government been represented before the Court, it is imossible that the High Court Judges might have seen their way to ordering such a further investigation as Mr. Justice Noris at first appears to have thought desirable. In His Excellency's opinion it is specially important in such cases as he present that the crown should be properly represented..

লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন—"The Modern Radical may, one would think, be expected to understand that the spirit which openly describes the English in India as 'cowards' is one that cannot be safely tolerated." প্রত্যুত্তরে শিশিরকুমার ১৮৮৩ খৃঃ অঃ ১লা মার্চ্চ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন—"The Englishman is offended because of the application of the epithet 'cowards' to his constituents. We call them cowards who join with wives and children and madmen to protect themselves while they are conquerors, rulers, masters and lords over everbody and almost in everything. We call them cowards, who seek shelter in intrenchment, keeping the weak out to fight their battles. We call them cowards, who do not venture an open and fair trial, who demand special privileges for the criminals, and who demand lighter punishment for crimes committed by men of their class and higher punishment for others."

ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে ইউরোপীগণ ঘোরতর আন্দোলন করিয়াছিলেন। কলিকাতার যে অংশে তাঁহারা অবস্থান করিতেন, সেই অংশে এদেশীগণের গমনাগমন বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছিল। প্রস্তাবিত বিধির প্রতিবাদের জন্য ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক টাউন হলে এক মহতী সভা আহুত হইয়াছিল। ব্রান্‌সন্‌ নামক জনৈক ব্যারিষ্টার এই সভায় অতি কুৎসিৎ ভাষায় এদেশীয়গণকে গালাগালি করিয়াছিলেন। তিনি শিশিরকুমারকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"I can see—and I have thought the matter carefully over—no reason whatever for this suggested

change except as I have said the sentimental idea of taking away the grievance which the Bengalee Baboo felt, which that Bengalee Baboo with fellows wants to see taken away, that he may have the glorification or reighing over—of judging his conquerors whom, gentlemen, he has really had the audacity to stigmatise as 'cowards'! Verily and truly, the jackass kicketh at the lion! As you value your liberty show him that the lion is not dead but sleepeth; and in God's name let him dread the awakening!"

শিশিরকুমার ব্রান্‌সনের উক্ত উক্তির উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৮৩ খৃঃ অঃ ৮ই মার্চ্চ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় ব্রান্‌সন্‌কে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন, —

"Now, braying makes a jackass and the question is who brayed. Mr. Branson fancied that he was roaring like a lion, and his admirers fancied the same fancy. But only two days after the meeting he appeared before the public with his tails within his legs, showing indisputably that he was not a lion, but some animal lower than it."

এদেশীয় এটর্নিগণ ব্রান্‌সনের কটূক্তিতে ক্ষুব্ধ ও কুপিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা ব্রান্‌সন্‌কে আর কোনও মোকদ্দমা দিবেন না। তদানীন্তন এড্‌ভোকেট জেনারেল ব্রান্‌সনের জন্য মোকদ্দমা সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ব্রান্‌সন্‌কে বাধ্য হইয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল ইলবার্ট বিলের ব্যাপার লইয়া ইউরোপীয়গণ

কর্ত্তৃক লর্ড রিপন নানারূপে অপমানিত হইয়াছিলেন। অধিক কি, লাটভবন হইতে বলপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া একখানি জাহাজে করিয়া নির্ব্বাসিত করিবার ষড়যন্ত্র পর্য্যন্ত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে স্যার হেন্‌রি কটন মহোদয় তাঁহার Idian and Home Memories নামক গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন—

"A public meeting of protest by the European community was held at the Town Hall in Calcutta ; members of the Bar abandoned the noble traditions of their profession, and speakers and audience, frenzied with excitement, were lost to all sense of moderation and propriety. The viceroy was personally insulted at the gates of Government House. A gathering of tea planters assembled and hooted him at a railway station as he was returning from Darjeeling, when 'Bill' Beresford then an A. D. C. was with difficulty restrained from leaping from the railway carriage into their midst to avenge the insult to his chief. The non-official European community almost to a man boycotted the entertainments at Government House. Matters had reached such a pitch that a conspiracy was formed by a number of men in Calcutta who bound themselves in the event of Government adhering to the proposed legislation to overpower the sentries at Government House, put the viceroy on board a steamer at Chandpal Ghat and deport him to England round the cape."

কলিকাতা ইউরোপীয় সম্প্রদায় একরূপ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

তাঁহাদের ভাব লক্ষ্য কবিয়া বোম্বাই গেজেট তাঁহাদিগকে "Drunken helots" (মদমত্ত নীচ ব্যাক্তি) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদেব আন্দোলন সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকায় জনৈক ইংরাজ সংবাদ-দাতা লিখিয়াছিলেন,--

"Any attempt on the part of the Englishmen to lower the dignity of the viceroy or a weaken his authority in India is short sighted, unpatriotic, dangerous and cowardly, especially when we remember that mutinies and rebellions are not put down by lawyers and voluble gentlemen such as those who gathered in the Calcutta Town Hall."

লর্ড বিপন স্বভাবতঃ কোমল হইলেও কর্ত্তব্যপালনে স্থির প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ইউবোপীয়ানদিগেব আন্দোলনে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন—

"To arguments which are inconistent with the declared policy of the Crown and of Parliament, it would be inconsistent with my duty to listen. But to fair reasons urged in a manner to which the Government can give head, ears of myself and my colleagues will always be open on this and every other question. I observe that the opponents of the Bill speak of appealing to the House of Commons. I am the last man in the world to object to such a course being taken. To the decision of the House of commons both parties to this controversy must bow."

ইলবার্ট বিলের ব্যাপার লইয়া শেষে একটী মীমাংসার কথা

উঠিয়াছিল। ইউরোপীয় সম্প্রদায় বলিয়াছিলেন যে এদেশীয় সিবিলিয়ানদিগের নিকট তাঁহাদের বিচারে কোন আপত্তি নাই; তবে জজের নিকট যেমন জুরীর বিচার প্রথা প্রচলিত আছে, ম্যাজিষ্ট্রেটগণের নিকটও জুরীর বিচার প্রথা প্রবর্ত্তিত করা হউক। শিশিরকুমারের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য লর্ড রিপন বাহাদুর এই সময় তাঁহাকে একবার লাটভবনে যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। শিশিরকুমার তখন অসুখে শয্যাগত; তিনি যাইতে অসমর্থ, ইহা লাট সাহেবকে জ্ঞাপন করিলেন। লর্ড রিপন তাঁহাকে পুনরায় লিখিলেন যে, যেরূপই হউক একবার দেখা করিতে হইবে। তিনি শিশিরকুমারকে জানাইয়ালেন যে, তাঁহাকে কষ্ট করিয়া উপরে উঠিতে হইবে না, লাট প্রাসাদের নিচের একটী ঘরে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিবেন। শিশিরকুমার লাট সাহেবকে লিখিলেন যে, তিনি শয্যাশায়ী তাঁহার উঠিবার শক্তি নাই, সেজন্য তিনি লাটভবনে যাইতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তবে তাঁহার যদি কোনও আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে পরামর্শ প্রদানের জন্য সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিষ্টার মনোমোহন ঘোষকে তাঁহার নিকট পাঠাইতে পারেন। লর্ড রিপন সম্মত হইলেন। শিশিরকুমার মনোমোহনকে বিল সম্বন্ধে কয়েকটী উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইউরোপীয়গণ যেমন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট জুরীর বিচার প্রার্থনা করিয়াছেন, আপনিও সেইরূপ এদেশবাসীর পক্ষ হইতে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট জুরীর বিচার প্রথা প্রবর্ত্তনের জন্য লর্ড রিপনকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিবেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে মনোমোহন লর্ড রিপনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সেই সময় বিচার ও শাসন এই দুই বিভাগ পৃথক করিবার জন্য আন্দোলন চলিতেছিল। মনোমোহন এই সম্বন্ধেই লাট সাহেবের সহিত বিস্তৃত আলোচনা করিলেন, জুরীর বিচারের কথা আদৌ উত্থাপন করিলেন না। শিশিরকুমার মনোমোহনের কার্য্যে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। ইলবার্ট বিলের ব্যাপার

পার্লামেণ্টে উঠিলে লর্ড রিপন ও লর্ড স্যালিস্‌বারি বিলের বিপক্ষে এবং লর্ড কিম্বার্লি ইহার সমর্থনে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

শিশিরকুমার নিঃস্বার্থভাবে দেশের কার্য্য করিতেন বলিয়া লর্ড রিপন তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন লর্ড রিপনের কার্য্যকাল অন্তে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে শিশিরকুমার তাঁহার নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিতে গমন করিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। শেষে শিশিরকুমার যখন বিদায় গ্রহণ করেন, তখন লর্ড রিপণ তাঁহার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "শিশিরবাবু, আমি আপনার কি উপকার করিতে পারি?" সুযোগ বুঝিয়া শিশিরকুমার নতজানু হইয়া বলিয়াছিলেন, "আপনি এদেশীয়গণকে জুরীর বিচার প্রথা প্রদান করিলে আমি অনুগৃহীত হইব, এবং আজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিব।" লর্ড রিপন শিশিরকুমারের ভাব লক্ষ্য করিয়া ও কথা শুনিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। আপনার জন্যও প্রার্থনা না করিয়া শিশির যে দেশের জন্য প্রার্থনা করিবেন, একথা তাঁহার মনে হয় নাই। লর্ড রিপণ শিশিরকুমারকে উঠাইয়া বলিয়াছিলেন, "আমি লর্ড ডফারিনের হস্তে কার্য্যভার প্রদান করিয়াছি, সুতরাং এখন আর আমার দ্বারা কিছুই হওয়া সম্ভব নহে; তবে এ সম্বন্ধে আমি আপনাদের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাকে বলিয়া যাইব।" লর্ড রিপণ যাইবার সময় লর্ড ডফারিনকে বলিয়াছিলেন, "আপনি যদি প্রকৃত দেশহিতৈষী দেখিতে চান, তাহা হইলে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমারের সহিত আলাপ পরিচয় করিবেন।"

ভারতবর্ষে জাতীয় মহাসমিতির (Idian National Congrss) প্রতিষ্ঠাতা মিষ্টার হিউম পাঠকবর্গের পরিচিত, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা নিষ্প্রোজন। জাতীয় মহাসমিতি গঠনের কল্পনা তাঁহার অন্তরে জাগিয়া উঠিলে, তিনি শিশিরকুমারের সহিত একদিন

তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। সকল কথা অবগত হইয়া শিশিরকুমার বলিয়াছিলেন যে, যাহারা দেশের প্রকৃত শক্তি, সেই সাধারণ জনসম্প্রদায়কে বাদ দিয়া কেবলমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়কে লইয়া জাতীয় মহাসমিতি গঠনের চেষ্টা ভিত্তিহীন প্রাসাদ নির্ম্মাণের চেষ্টায় ন্যায় নিস্ফল হইবে। কথাগুলি শুনিয়া মিষ্টার হিউম বলিয়াছিলেন, এ দেশের সাধারণ শ্রেণীর লোকের নিকট আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত, এরূপ অবস্থায় তাহাদের সহানুভূতি লাভ করা কতদূর সম্ভব হইবে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। "শিশিরকুমার বলিয়াছিলেন যে, কিরূপে সাধারণ লোকদিগের হৃদয় অধিকার করিয়া তাহাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে হয়, তাহা তিনি দেখাইয়া দিবেন। যে কঠোর রাজনীতি শিক্ষিতসম্প্রদায়ও বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, নিরক্ষরদিগের নিকট তাহা কতদূর প্রীতিপদ হইয়া থাকে, পাঠকবর্গ তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারেন। ব্যবস্থাপক সভার প্রসার ও তাহাতে এদেশীয় সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া না দিলে দেশের উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে, ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতবর্ষেও সিবিল সার্ভিস্ পরীক্ষার প্রচলন হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, নিরক্ষর লোকদিগকে এই সকল কথা বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা যে অরণ্যে রোদনের ন্যায় নিস্ফল হইবে তাহা অসম্ভব নয়। কিন্তু যে সকল অভাব অভিযোগের সহিত নিরক্ষরদিগের স্বার্থ জড়িত, বুঝাইয়া দিলে তাহারা তাহা না বুঝিবে কেন ?—সেই সকল অভাব অভিযোগের প্রতিকারের চেষ্টা আলোচিত হইলে, দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণ দেশের প্রকৃত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের হৃদয়ও অধিকার করিতে সমর্থ হইবেন। অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে ক্ষেত্রটী উর্বর করাই প্রয়োজন। শিশিরকুমার এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পথকর, চৌকিদারী ট্যাক্স প্রভৃতির কথা অশিক্ষিত সম্প্রদায়ও অবগত আছে, শিশিরকুমার প্রথমে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করাই স্থির করিলেন। কিরূপে পথকরের টাকা অপব্যয়

হয়, গভর্ণমেণ্টের অজ্ঞাতে পুলিশের কর্ম্মচারিগণ প্রজাদিগের উপর মধ্যে মধ্যে কিরূপ অত্যাচার করিয়া থাকে, শিশিরকুমার তাহা নিরক্ষর লোকদিগের বুঝাইবার জন্য যত্নবান হইলেন। স্বীয় সহোদরগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, সাধারণ সম্প্রদায় লইয়া সভাসমিতি করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। শিশিরকুমারের মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমার, বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া নিম্ন শ্রেণীর ও অশিক্ষিত লোকদিগকে লইয়া সভা আহ্বান করিতে লাগিলেন। প্রায় দুই বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে ১৮৮৬ খৃঃ অঃ ১৩ই মার্চ তারিখে যশোহরের আট মাইল পশ্চিমে ঝিকরগাছা নামক স্থানে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। তৎকালে ভারতবর্ষের আর কোনও স্থানে সেরূপ বৃহৎ রাজনৈতিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। সভাস্থলে কতলোকের সমাগম হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় নাই। বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে বাবু আনন্দ মোহন বসু প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। শিশিরকুমারও তাঁহার সহোদরগণ আপন আপন প্রতিভা ও কার্য্য দ্বারা যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, ঝিকরগাছার সভার অধিবেশনের পর তাহা শতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুদূর আমেরিকার কোনও কোনও সংবাদ পত্রে এই সভার অধিবেশনের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল

সভার অধিবেশনের সময় যশোহর জেলার তৎকালিন ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিষ্টার টুট্ সভামণ্ডপে প্রবেশ করিয়া স্বীয় ব্যবহারে সভাপতি ও বক্তৃবর্গের যথেষ্ঠ বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিলেন। ভারতবাসী স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয় ; সমাগত জনমণ্ডলী ম্যাজিষ্ট্রেটের দুর্ব্ব্যাবহার প্রথমে নীরবে সহ্য করিলেও শেষে তাহাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল প্রত্যেকেরই মুখে একটা উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য

করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব সভামণ্ডপ পরিত্যাগ করা যুক্তি সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন। মণ্ডপের ভিতর স্থানাভাব বশতঃ বর্হিভাগে একটী অতিরিক্ত সভার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বাহিরের জনসংজ্ঘের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক লোকদিগকে আহ্বান করিয়া তাহারা কি উদ্দেশ্যে এবং কাহার কথায় সমবেত হইয়াছে জানিতে চাহিলেন। একটী বালক ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিয়াছিল—"বাবা আসিতে বলিয়াছেন বলিয়াই আসিয়াছি, কেন আসিয়াছি জানি না।" ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাড়াতাড়ি আপনার নোট বই-এ বালকের কথা কয়টী লিখিয়া লইলেন। কথা কয়টী লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, গভর্ণমেণ্ট যদি এই সভার কথা কখনও আলোচনা করেন, তখন তিনি বালকটির কথাগুলি উল্লেখ করিয়া বলিতে পারিবেন যে, এই সভায় জনমণ্ডলী কি উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়াছিল তাহা তাহারা অবগত নহে, এরূপ ক্ষেত্রে এ সভার কোনও মূল্য নাই। মণ্ডপের ভিতরের ন্যায় বাহিরেও তিনি জনসঙ্ঘের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইবার উপক্রম করিয়াছিলেন।

শিশিরকুমারের হৃদয়ে আদৌ যশোলাভের আকাঙ্খা ছিল না; স্বদেশ সেবার আকাঙ্ক্ষাই সর্বদা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া থাকিত। ঝিকরগাছার সভার প্রধান উদ্যোগী হইয়াও তিনি স্বয়ং সভায় উপস্থিত ছিলেন না, অন্তরালে থাকিয়া তিনি সভার যাবতীয় বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এই সভায় প্রধানতঃ চৌকিদারী বিলের প্রতিবাদ করা হইয়াছিল। এই বিলে কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, কি ধনী কি দরিদ্র সকল সম্প্রদায়েরই স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট সভার অধিবেশনের পর বুঝিতে পারিলেন যে দেশের লোকেরা যে কার্য্যে আপত্তি করিতেছে, গভর্ণমেণ্টের সে কার্য্য পরিহার করা কর্ত্তব্য। চৌকিদারী বিল পাশ হইল না। সৎকার্য্যে বাধা বিঘ্ন অনেক। যে উদ্দেশ্যে ঝিকরগাছার সভার অধিবেশন হয়, তাহা সফল হইলেও এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট সভার কার্য্য বিবরণী

আলোচনা করিয়া চিন্তাযুক্ত হইলেও, কতকগুলি ব্যক্তির ব্যবহারে গভর্ণমেণ্ট সে চিন্তার হস্ত হইতে অব্যহতি পাইয়াছিলেন, শিশির-কুমারও তাঁহার সহোদরগণ ঝিকারগাছার সভা আহ্বান করিয়া যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের তথাকথিত কয়েকজন নেতার হৃদয়ে সেই প্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। তাঁহারা ঝিকরগাছার সভার সমান কিম্বা তাহার অপেক্ষা বড় এক সভার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিশিরকুমার ও তাঁহার সহোদরগণ দুই বৎসর ধরিয়া নিরক্ষর লোকদিগকে দেশের প্রকৃত অভাব অভি-যোগের কথা বুঝাইতে যে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, এই নেতৃবৃন্দের সেরূপ পরিশ্রম করিবার সামর্থ্য কোথায়? তাঁহার চড়ক সংক্রান্তির সময় তারকেশ্বরের মেলায় উপস্থিত হইয়া এক সভার আয়োজন করিলেন। বক্তৃতার ফোয়ারা ছুটিল। ব্যবস্থাপক সভার প্রসার, ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতবর্ষে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা প্রবর্ত্তন ইত্যাদি বিষয় লইয়া বক্তৃবর্গ সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রোতৃবর্গ তাহাদের বক্তৃতা আদৌ উপভোগ করিতে পারে নাই সভার অধিবেশনের পর সংবাদ পত্রে সুদীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হইল। ক্রমান্বয়ে এই শ্রেণীর কয়েকটী সভার অধিবেশন হইলে গভর্ণমেণ্টের সেগুলির উপর বড় আস্থা রহিল না। ঝিকর-গাছার সভার অধিবেশনের পর ভারত গভর্ণমেণ্টের যে চাঞ্চল্য লক্ষিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী সভাগুলি সে চাঞ্চল্য দূর করিয়াছিল। নিরক্ষর লোকেরা যে ব্যবস্থাপক সভার প্রসার প্রার্থনা করিবে, একথা গভর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। মিষ্টার র‍্যানাডে একবার সিমলা হইতে ফিরিবার সময় কলিকাতায় আসিয়া অমৃতবাজার পত্রিকা অফিস পরিদর্শন করিতে আগমণ করিয়াছিলেন। তিনি শিশিরকুমারকে বলিয়াছিলেন যে, বড়লাট বাহাদুর লর্ড ডফারিণের সহিত ঝিকরগাছার সভা সম্বন্ধে তাঁহার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। লাট বাহাদুর বলিয়াছিলেন যে, ঝিকরগাছার সভা গভর্ণমেণ্টের মনে একটা

চিন্তা ও চাঞ্চল্য উৎপাদন করিয়াছিল। এই সভায় দেশের অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে রাজনীতি শিক্ষা প্রদানের অতি অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। দেশের সাধারণ লোকে যদি গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের সমালোচনা করিতে শিক্ষা করে, তাহা হইলে রাজ্য শাসনের জন্য গভর্ণমেণ্ট যখনই কোন নূতন বিধির ব্যবস্থা করিবেন, তখনই দেশের প্রকৃত শক্তি স্বরূপ এই সাধারণ জনসম্প্রদায় প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিবে। গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সাধারণের সেই প্রতিবাদ উপেক্ষা করা নিরাপদ হইবে না। ঝিকরগাছার সভার পরবর্ত্তী সভাগুলির কার্য্যাবলী গভর্ণমেণ্টের উদ্বেগ সম্পূর্ণ প্রশমিত করিয়াছিল।

শিশিরকুমার যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহার চূড়ান্ত না করিয়া ছাড়িতেন না। ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের অত্যাচার যখন ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, শিশিরকুমার তখন তাঁহাদের সেই অবিচার ও অত্যাচার লইয়া ঘোরতর আন্দোলন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে পোষ্ট অফিসের কার্য্য কিরূপ ভাবে পারিচালিত হইত, উদাহরণ স্বরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করিব। মিষ্টার কিস্ (Kisch) তখন পোষ্টমাষ্টার জেনারেল। একদিন কলিকাতা অফিস হইতে এত অধিক বিলম্বে ডাক পাঠানো হইয়াছিল যে, তাহা হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ডাকগাড়ী চলিয়া গিয়াছিল। ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষরা অস্থির হইঁয়া পড়িলেন এবং শেষে রেলকর্ত্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। পরামর্শ করিয়া একখানি স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হইল এবং এই স্পেশাল ট্রেন মোকামা স্টেশনে ডাক গাড়ীতে ডাক উঠাইয়া দিয়া আসিল। এই উপলক্ষে গভর্ণমেণ্টের ষোলশত টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ডাক বিভাগের কর্ম্মচারীগণের দোষে যে টাকা অপব্যয় হইল, তাহার জন্য কাহাকে দায়ী করা হইবে জিজ্ঞাসা করিয়া এবং ডাক বিভাগের কার্য্যের বিশৃঙ্খলতার কথা উল্লেখ করিয়া অমৃতবাজার পত্রিকার আন্দোলন চলিতে লাগিল। তখন ডাক বিভাগের কতকগুলি পদ

ভারতবাসিগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। ক্রমে ক্রমে দুই একটী করিয়া অশিক্ষিত ইউরোপীয়ান ও ইউরেশীয়ান উক্ত বিভাগে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং তাহারা আবার আপন আপন অধীনে দশবারোজন করিয়া আত্মীয় স্বজনকে চাকুরী দিয়া প্রতি পালন করিতে আরম্ভ করিল। যাহাদের অন্য ডাক বিভাগের চাকুরীগুলি নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাঁহাদের প্রার্থনা ক্রমশঃই অগ্রাহ্য হইতে লাগিল। অমৃতবাজার পত্রিকার বর্তমান সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল ঘোষ মহাশয় স্বীয় প্রতিভাবলে এই সময়ে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ছিলেন। জেষ্টাগ্রজ বসন্তকুমারকে সম্মুখে আদর্শ স্বরূপ রাখিয়া শিশিরকুমার যেমন কার্য্যক্ষেত্রে অবত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, মতিলালও সেইরূপ শিশিরকুমারকে আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন। পাব্‌লিক সার্ভিস্ কমিশনে সাক্ষ্য প্রদানের সময় তিনি যে অখণ্ডনীয় যুক্তি দ্বারা ডাক বিভাগের কার্য্যের সমালোচনা করিয়াছিলেন, যিনিই তাহা পাঠ করিবেন, তিনিই তাঁহার প্রশংসা করিবেন। কিন্তু এংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদ পত্রগুলি তাঁহার উপর অযথা নিন্দাবর্ষণ করিতে কুণ্ঠীত হন নাই।

ডাক বিভাগের চাকুরীর ব্যাপার লইয়া শিশিরকুমার অমৃত বাজার পত্রিকায় যে আন্দোলন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ভারত বাসিগণের প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া অশিক্ষিত ইউরোপীয়ানও ইউরেশীয়ানদিগকে ডাক বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত করা কিছুদিনের জন্য বন্ধ হইয়াছিল। আমাদের দেশে একটী গল্প প্রচলিত আছে যে, এক সময় কোন লোক বিপদে পড়িয়া উদ্ধারের জন্য মা কালীর নিকট মহিষ বলি দিয়া বলিয়া অঙ্গীকার করে। বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া লোকটী পূজা দেওয়ার কথা ভুলিয়া যায়। দেবী তখন স্বপ্নে আবির্ভূতা হইয়া তাহাকে পূজার কথা স্মরণ করাইয়া দেন। লোকটি কাতরভাবে দেবীকে জানাইল যে, সে নিতান্ত গরীব, এরূপ অবস্থায় মহিষের পরিবর্ত্তে দেবী যদি অনুগ্রহ করিয়া একটী ছাগ

গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সে শীঘ্রই পূজা দিতে পারে। দেবী তাহাতে সম্মত হইলেন। কিন্তু লোকটী আবার পূজা দেওয়ার কথা ভুলিয়া যায়। দেবী পুনরায় স্বপ্নে আবির্ভূতা হইয়া পূজার কথা স্মরণ করাইয়া দিলে লোকটী স্বীয় দুরবস্থার কথা জানাইয়া ছাগের পরিবর্ত্তে একটী ফড়িং দিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। দেবী তাহাতেই সম্মতা হইলেন। লোকটী বার বার দেবীর অনুগ্রহ পাইয়া একটু নির্ভয় হইয়াছিল। সে দেবীকে বলিল,—মা, ফড়িং ধরিতে আমার যথেষ্ট সময় লাগিবে ও কষ্ট হইবে, কিন্তু আপনি হাত বাড়াইলেই ফড়িং পাইতে পারেন। ডাক বিভাগের এদেশবাসীর চাকুরীর ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া উক্ত গল্পটী অবলম্বনে শিশিরকুমার একটী সুন্দর কবিতা লিখিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে কবিতাটি উদ্ধৃতি করিলাম—

THE GODDESS KALEEE & THE GRASSHOPPER

"Low at the Goddess Kalee's Shrine
His knee a zealot bent,
And in a fit of holy zeal,
From Heaven but rarely sent.

He vowed that chosen from his heards
with all convenient speed,
The lordliest of the buffalo bulls,
Should in her honour bleed.

The Goddess hailed with glad assent
This tribute to her fame,
And waited longingly and long
The gift that never came.

Before her feet with streaming tears
The devout fell again,
Told her of drought & failing crops,
of toil, and want, and pain.

And kalee, pity touched, decreed
That he his vow should keep,
But in lieu of lordly buffalo,
Might sacrifice a sheep.

Drying tears, the man went forth,
And vainly strove to find,
Among his fat and thriving flock,
One halt, or lean, or blind.

The hours glide by, day follows day,
And when the Goddess chid,
He strove to still her cowful ire,
By promising a kid.

For her, and her alone, should be
The first that came to hand.
He had not counted, first would come
The fattest of his band.

So time went on, and once again
Before her he appears,
Lies prostrate at great kalee's feet,
And bathes them with his tears.

'Goddess ! look down and pity me,
My children cry for bread ;
A kid is much, deign to accept
A grass-hopper instead'.

Well, be it so !' The Goddess said,
In deep disgust and pain ;
And rendered bolder by her words
The zealot spoke again.

'Lady', he said, 'to catch you one
Would cost me time and trouble,
Stretch out your hand in yonder field,
And take them from the stubble'.

Thou India ! to thy prayer at last
A gracious ear is lent,
Not buffalo, sheep, or kid is here,
But grass-hoppers are sent".

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতবাসীদিগের প্রতি বাহ্যিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকেন, এরূপ প্রকৃতির বহু ইংরাজ দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশে পরিলক্ষিত হয়। পাব্‌লিক সার্ভিস্‌ কমিশনে সাক্ষ্য প্রদানের সময় এই সকল মহাপুরুষের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। পাঠকবর্গের মধ্যে জন্‌বিম্‌সের নাম বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। তিনি একজন সুপণ্ডিত, ভাষাবিদ্‌ এবং কর্ম্মঠ রাজ-কর্ম্মচারী বলিয়া খ্যাত ছিলেন এবং আপনাকে ভারতবর্ষের অন্যতম অকৃত্রিম সুহৃদ বলিয়া পরিচয় দিতেন। তিনি যখন কটকের ম্যাজিস্ট্রেট্‌ ছিলেন, সেই সময় সুযোগ্য পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট বাবু জগদীশনাথ রায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। বাঙ্গালী জাতির প্রতি তাঁহার অনুরাগ সপ্রমাণ করিবার জন্য তিনি জগদীশ নাথের সহায়তায় বাঙ্গলা ভাষার উন্নতির নিমিত্ত একটি সমিতি গঠন করিয়াছিলেন কিন্তু পাব্‌লিক সার্ভিস্‌ কমিশনে সাক্ষ্য প্রদানের সময় বিম্‌সের প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই সময় তিনি রেভিনিউ-বোর্ডের মেম্বরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এই মর্ম্মে সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ই সংবাদ পত্রে রাজদ্রোহ সূচক প্রবন্ধাদি লিখিয়া গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচারণ করিয়া থাকেন। এদেশের অধিবাসীগণের যত অধিক পরিমাণে গভর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অপসারিত করা যাইবে ততই মঙ্গল। শাসন ও বিচার কার্য্যে এদেশের লোক অপেক্ষা ইউরোপীয়ানরা যে যোগ্যতর সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতবাসীকে সিবিল সার্ভিসে প্রবেশাধিকার প্রদান করা কোন মতেই যুক্তি সঙ্গত নহে। মিষ্টার বিম্‌সের ন্যায় তথাকথিত ভারত বন্ধুর সাক্ষ্য পাঠ করিয়া দেশবাসিগণ বিস্মিত হইয়াছিল। শিশিরকুমার জানিতেন, যাহারা এইরূপ একটী সমগ্র জাতির উন্নতির অন্তরায় হয়, তাহাদিগের শিক্ষা প্রয়োজন। নিজেরা

যথেচ্ছ ব্যবহার করিব, আর ভারতবাসীর কল্পিত দোষ লইয়া তাহাদিগকে হেয় ও লাঞ্ছিত করিব, এ চেষ্টা সঙ্গত নয়। এই জন্য তিনি অমৃতবাজার পত্রিকায় মিষ্টার বিম্‌সের গুপ্তভাবে ঋণ গ্রহণের কাহিনী প্রকাশ করিয়া তৎপ্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ১৮৮৭ খৃঃ অঃ ২১ এপ্রিল তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় নিম্নলিখিত মন্তব্যটী প্রকাশিত হয়—

"We are curious to know if there are any records in the Bengal Secretariat showing that Mr. Beams, now an officiating member of the Board of Revenue in Calcutta by the graces of Sir Rivers Thompson, has been in impecunious circumstances in his official life. There have been some instances in which Mr. Beams has had to borrow money of native gentlemen connected in some way with the districts in which he held office and now that he is placed in a very high and responsible post in this province, we take it that the holder there of has now placed himself in such a position that he is no longer under the necessity of begging for loans, and that the Government has satisfied itself that his Surroundings are such as not to impair his efficiency. Mr. Beams has had to barrow monies from Roy Dhunpat Singh and late Roy Luchmiput Singh, Zemindars and bankers of Purnea and Moorshidabad. And at one time when ceased to have any official connections with Bengal and Behar, that is, when he was the District Magistrate of Cuttack and officiating Commissioner

of the Orissa Division, he did not feel himself restrained by any consideration of delicacy and honour from applying for a loan of Rs. 30,000 to late Raja Digambar Mittra of Calcutta, who owned the very valuable Zamindary of Patamanda in the District of Cuttack. Raja Digambar very wisely did not choose to lend the money himself, but got a relative of his, a Hindu lady to advance the sum of Rs. 30,000 to Mr. Beams Mr. Beams it must be said, is not now under any pecuniary obligation to this lady. We are not familiar with the rules, which govern the convenented civil service, but we know of instances in which members of that service, who have been found to be in pecuniary embarassments of this kind have been degraded or relieved of offices of trust. We should like to know if Mr. Beams ever communicated the nature of his pecuniary transactions with natives of the country to the Government he has been serving. We only trust that the Government is in full possession of the facts. If not, the present L. G. of Bengal owes a duty to himself, to the rest of the members of the covenented civil service, and to the public to make strict enquiry as to the truth or otherwise of the statesments which we publish to-day For, according to our common sense views of the things, we do not see any difference between the act of the Hon'ble

Mr. Sullivan for which he was expelled from the service and that of Mr. Beams."

উক্ত মন্তব্যটী প্রকাশিত হইলে মিষ্টার বিম্‌স প্রথমে অদৌ বিচলিত হন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালী পরিচালিত সংবাদ পত্রের কথায় গভর্ণমেণ্ট সহজে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না; সুতরাং তাঁহার কোন ক্ষতির সম্ভবনা নাই কিন্তু শিশিরকুমার যে তাঁহার ঋণ গ্রহণের ব্যাপার প্রমাণ সহ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা তিনি আদৌ মনে করিতে পারেন নাই। বঙ্গের ছোট লাট বাহাতুরের অব্যহিত পরবর্ত্তী কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে সংবাদ পত্রে কোন অভিযোগের কথা আন্দোলন করিতে হইলে যে পূর্ব্ব হইতেই তাহার প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে, শিশিরকুমার তাহা ভাল রূপই জানিতেন। তিনি ক্রমান্বয়ে তিনমাস অমৃতবাজার পত্রিকায় মিষ্টার বিম্‌সের ঋণ গ্রহণের ব্যাপার লইয়া আন্দোলন পূর্ব্বক তৎপ্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। মিষ্টার বিম্‌স রায় ধনপত, রায় লছ্‌মীপৎ ও রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের আত্মীয়ার নিকট ব্যতীত রায় শ্রীনাথ রায় বাহাতুর ও বাবু উমেশচন্দ্র মণ্ডলের নিকট হইতেও ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস্‌ পত্রিকা অমৃতবাজার পত্রিকার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্তু কলিকাতার ইংলিশম্যান ও প্রয়াগের পাইওনিয়র বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়া মিষ্টার বিম্‌সকে রক্ষা করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকার আন্দোলনের ফলে বড়লাট বাহাতুর লর্ড ডফারিণ ও ছোটলাট বাহাতুর স্যার স্টুয়ার্ট বেলি উভয়েই মিষ্টার বিম্‌সের ঋণ গ্রহণের ব্যাপারটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন বুঝিতে পারিলেন যে, শিশিরকুমার যে আন্দোলন করিতেছিলেন, তাহার মূলে সত্য রহিয়াছে, তখন তাঁহারা মিষ্টার বিম্‌সকে রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বরের পদ হইতে অপসৃত করিয়া অন্যপদে নিযুক্ত করিবার আদেশ

প্রদান করিয়াছিলেন। নিম্নে গভর্ণমেণ্টের আদেশে লিপিবদ্ধ হইল—

"His Excellency in council has further come with great regret to the conclusion that the period of Mr. Beams' present officiating appointment in the Board of Revenue must be at once terminated and that he should be transfered to a suitable appointment within the juridiction of which no native creditor of his resides or has an estate or commercial establishment."

শিশিরকুমারের সহিত মিষ্টার বিম্‌সের ব্যক্তিগত কোন শক্রতা ছিল না। কিন্তু বিম্‌স সমস্ত ভারতবাসীর যে অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহারই প্রতিকারের জন্য তিনি তাঁহার আচরণ লোকের গোচর করিয়াছিলেন। তাঁহার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। সিবিলিয়নদিগের মধ্যে অনেকেরই এদেশীয়দিগের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা অভ্যাস ছিল। তাঁহাদিগকে এই আইন বহির্গত কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার উদ্দেশ্যেই শিশিরকুমার তাঁহার অমৃতবাজার পত্রিকায় বিম্‌সের ব্যাপারটি অতি তীব্রভাবে আলোচনা করিয়া প্রতিকারের আশায় তৎপ্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। মিঃ বিম্‌সের দণ্ড দেশবাসীর কি উপকার করিয়াছিল, বুদ্ধিমান পাঠকবর্গ তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। মিষ্টার বিম্‌সের বিচার ফলে ইংলিশম্যান ও পাইওনিয়র মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। এই দুইখানি পত্রিকা অমৃতবাজার পত্রিকার সহিত ভারতবাসীর ওপরও ভীষণ ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ দেশীয়গণকে কোনও বিষয়ে প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, পাইওনিয়র এইরূপ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। যাহা হউক ইংলিশম্যান ও পাইওনিয়রের সমবেত চেষ্টা বিম্‌সকে রক্ষা করিতে পারে নাই। অপরাধীর সমর্থন করিয়া পত্রিকা দুইখানি স্ব স্ব প্রকৃতির সম্যক্

পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ইংলিশম্যান অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমারকে আইন অনুসারে অভিযুক্ত করিয়া কারগারে নিক্ষেপ করিবার জন্য বিম্‌স্‌কে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। শিশির-কুমারকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলে ইংলিশম্যানের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে না, বরং দেশে একটা ভয়ানক উত্তেজনার বন্যা প্রবাহিত হইবে, এই কথা বলিয়া ঢাকা গেজেট লিখিয়াছিলেন—

"The great oracle of the Hare Street (the Englishman) Seems to think that if the Editor of the Amrita Bazar Patrika is mulcted a sum of two or three thausand rupees and be made to rot for some weeks in some of the Indian Jails, all the troubles would cease. We can only pity the man for his utter ignorance of the Amrita Bazar and the spring from which it draws its life blood. We would ask the Englishman and its followers to try the experiment once forall. We would be no false prophet if we were to say here that as soon as the news spreads throughout the country that the Editor of the Amrita Bazar is in troubles, the whole country from Pesewar to Assam, from Himalaya to Comorin, will rise to one man to help him and send forth a growl that will shake the throne of the Queen mother and make her look attentively into the affairs of India. Why, such a course of action, if followed up at all, will only lend to Strengthen the cause which they propose to smother by all means."

১৮২৩ খ্রীঃ অঃ ৭ আইনের বিধান অনুসারে বিম্‌স্‌কে কর্ম্মচ্যুত

করাই উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না করিয়া গভর্ণমেণ্ট তাহাকে কেবলমাত্র রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বরের পদ হইতে অপসারিত করিয়া অন্য কার্য্যে নিযুক্ত করায় শিশিরকুমার সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তিনি মিষ্টার বিম্‌সের বিচার ফল লইয়া আন্দোলন করিতে বিরত ছিলেন না। ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস্ পত্রিকা অমৃতবাজার পত্রিকার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, সেজন্য এদেশীয়গণ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। অপমানিত মিষ্টার বিম্‌স অধিক দিন ভারতবর্ষে কার্য্য করিতে পারেন নাই; তিনি বিদায় লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন, আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই।

মিষ্টার বিম্‌সের পর আর একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে শিশিরকুমার লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম স্যার লেপেল গ্রিফিন (Sir Lepel Griffin)—তিনি মধ্যভারতে বড়লাট বাহাদুরের (Agent) প্রতিনিধি ছিলেন। কার্য্যপটুতার এবং বিদ্যাবুদ্ধির জন্য তাঁহার প্রশংসা ছিল। কিন্তু তাঁহার ন্যায় দাম্ভিক, যথেচ্ছাচারী ইংরাজ এদেশে অধিক আসে নাই। সকল বিষয়েই তিনি আপনাকে 'সর্ব্বেসর্ব্বা' জ্ঞান করিতেন। স্যার লেপেলের অত্যাচারে মধ্যভারতের রাজন্যবর্গ উত্যক্ত হইয়াছিলেন। বড়লাট বাহাদুরের নিকট কোনও অভিযোগ করিতে হইলে তাহা স্যার লেপেলের নিকট পাঠাইতে হইত। আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দেখিলে স্যার লেপেল তাহা বড়লাট বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করিতেন না। তাঁহার অত্যাচার কাহিনী অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া শিশিরকুমার কিরূপে তৎপ্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ছিলেন আমরা এক্ষণে তাহা বিবৃত করিতেছি।

রেওয়ার বর্ত্তমান মহারাজা শ্রীযুক্ত গোলাপ সিং এর পিতামহী চান্দেলিন মহারানী রাজপুত রমনী। স্বাধীন মহারাজার মহিষী হইয়া পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকা তাঁহার পক্ষে কতদূর সম্ভব, সহৃদয় পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন। মহারাজার মৃত্যুর পর

স্যার লেপেল গ্রিফিন নাবালক মহারাজ কুমারের শিক্ষার যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, মহারানী তাহাতে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। এই ব্যাপারে মহারাণী একটু স্বাধীন ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন ; স্যার লেপেলের নিকট তাহা অসহ্য বোধ হইয়াছিল। মহারাজ কুমারকে জোর করিয়া তাঁহার জননীর নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে স্বতন্ত্র স্থানে রাখা হইয়াছিল। স্যার লেপেল স্বীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া মহারাণীর প্রতি নানারূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন, এমন কি প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে সৈনিক পাহারার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, এজেন্টের এই দুর্ব্ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া মহারাণী স্বীয় প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসীণী হইয়াছিলেন। সেখানে তিনি মাত্র কান্দা ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করিতেন। রাজপ্রাসাদে বাস করা যাঁহার অভ্যাস, দাসদাসীগণ সর্ব্বদাই যাঁহার আদেশ প্রতিপালনের জন্য ব্যতিব্যস্ত ; সেই মহারাণী, স্যার লেপেলের অত্যাচারের আশঙ্কায়, অরণ্যবাসিনী হইয়া শিবিকায় শয়ন করিয়া রজনী অতিবাহিত করিয়াছিলেন ! মর্ম্মাহতা মহারাণী চান্দেলিন স্বীয় দুঃখ কষ্টের কথা বড়লাট বাহাদুরকে একখানি পত্রে জানাইয়া প্রতিকারের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমরা সেই পত্রের অংশ বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"In the meantime Sir Lepel visited Rewah, and according to Dr. Goldsmith and Major Martelli's report againest us he issued a Rubkar, by virtue of which all the Maharani's kinsmen and sirdars have been ordered to keep seperate from the young Maharaja."

"Now Dr. Goldsmith is the master, tutor and director of the young Maharaja. The amount of Rs. 3400 allotted for the maintenance of the prince,

which was formerly disbursed by me, being his own mother has also been given into the hands of Dr. Goldsmith. It was formerly proposed that Dr. Goldsmith will dine in one compartment and master Puranmal in another and the Maharaja in the next. But it was not carried into effect. Still the doctor made the teaching staff eat with the Maharaja which should not have been done till his marriage. I fear they are taking steps to convert him."

"Since the Doctor has been made in charge of the Maharaja's food, he has commenced to do many things which are quite aganist the Hindu religion. He comes with his shoes on near the rosoyee when the food is ready to inspect it. A Hindu cooking place is not an English hotel, and I fear, if this news will be abroad there will be great difficulty in celebrating the marriage of the prince. The Hindus are very rigid in these matters and excommunicate such persons.

"Though the Rubkar issued by Sir Lepel Griffin permitted me to remain with the prince, yet it

---

*মহারাণী লিখিয়াছিলেন—We are declared rebels; troops and artillery were arrayed in front of our abode,

†মহারাণী লিখিয়াছিলেন—At last I left the state and went to a foreign place, where I lived in a jungle for more than six months.

forbade me to prepare the Maharaja's food according to my will, and as no relative or sirdar was permitted to stay with me, I thought it proper to withdraw myself. Their motive in permitting me is that they will establish their freedom in case any evil be falling the prince."

Formerly when the Maharaja had to march from Rewah to Sutna, Colonel Kalyan Sing, who was the most confident Sirdar of the state, had to prepare accomodation in Rampur Situate between Rewah and Sutna where the Maharaja had to lodge during the night. The next day he had to stay in Kirpalpur his own birth-place and thus on the third day the journey had most conveniently to come to an end.

"The present manager Dr. Goldsmith caused the Maharaja to march the distance of 31 miles in one day from Rewah to Sutna, and as no accomodation was ready he made the Maharaja starve all night and sleep on the ground."

ইহা ব্যতীত মহারাণী চান্দেলিন স্যার লেপেল গ্রিফিনের বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খল রাজ্যশাসন ও স্টেটের অর্থ অপব্যয়ের অভিযোগ করিয়াছিলেন। বড়লাট বাহাদুর স্যার লেপেলের নিকট মহারাণীর অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে স্যার লেপেল মহারাণীকে উন্মাদিনী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এজেণ্টের এই অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী শিশিরকুমার তাঁহার অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া তৎপ্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বড়লাট

বাহাত্বর লর্ড ডফারিণ পত্রিকা পাঠে বিচলিত হইয়া স্বয়ং রেওয়ায় গমন করিবেন, স্থির করিলেন। বড়লাট বাহাত্বর রেওয়ায় গমন করিবেন, এই সংবাদ যখন প্রচারিত হইল, রেওরার অধিবাসিগণের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু মহারাণীর কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কেহই ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন না, সেজন্য একটু চিন্তার কারণ হইয়াছিল। মহারাণী চান্দেলিনের প্রতি স্যার লেপেল গ্রিফিনের ভীষণ দুর্ব্ব্যহারের কথা বড়লাট বাহাত্বরকে বুঝাইয়া দিবার জন্য মহারাণীর পক্ষ হইতে শিশিরকুমারকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল, কিন্তু পাছে 'হিতে বিপরীত' হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় শিশিরকুমার রেওয়া গমনে অসম্মত হইয়াছিলেন। লর্ড ডফারিনের রেওয়া গমনের পূর্বে মহারাণীকে অরণ্য হইতে প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে মহারাণী এই উত্তর করিয়াছিলেন যে, যতদিন না স্যার লেপেলের অত্যাচারের প্রতিকার হয়, ততদিন তিনি অরণ্যবাসিনী থাকিবেন, রাজপ্রাসাদে প্রত্যাগমন করিবেন না। বড়লাট বাহাত্বর রেওয়ায় উপস্থিত হইলে মহারাণীর কর্ম্মচারিগণ এজেন্টের অত্যাচারের কথা যথা সম্ভব তাঁহার গোচরে আনয়ন করিলেন। লর্ড ডফারিণ ভারতীয় কোন ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন না, এজন্য জনৈক অনুবাদকের সাহায্যে তিনি মহারাণীর কর্ম্মচারিগণের বক্তব্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। মহারাণীর সকল অভিযোগের কথা নিরপেক্ষ ভাবে লাট বাহাত্বরের গোচর করা হয় নাই। স্যার লেপেলের ব্যবস্থাগুণে অনেক কথাই অপ্রকাশিত ছিল। শিশিরকুমার কিন্তু পত্রিকায় তীব্রভাবে মহারাণীর প্রতি অত্যাচারের কথা আন্দোলন করিতে লাগিলেন। এই আন্দোলনের ফলে লর্ড ডফারিণ শেষে মহারাণীর প্রতি যাহাতে আর কোনরূপ অত্যাচার বা উৎপীড়ন না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন জানাইয়াছিলেন। শিশিরকুমারের চেষ্টায় ও লর্ড ডফারিণের অনুগ্রহে মহারাণী এইরূপে স্যার লেপেলের অত্যাচারের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন।

যাহারা অত্যাচারপ্রিয়, তাহাদের পাত্রাপাত্র বিচার থাকে না। স্যার লেপেল গ্রিফিন রেওয়ার মহারাণীকে গৃহচ্যুত করিয়াছিলেন; ইহার পর ভূপালের বেগম সাহেবার উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। ভারতবাসী হউন বা ভারতবাসিনী হউন, প্রত্যেকেই ইংরাজ কর্ম্মচারীর নিকট মস্তক অবনত করিয়া থাকিবেন, ইহাই তাঁহার বিবেচনায় সঙ্গত ছিল। পরাজিত জাতির আবার আত্মমর্য্যাদা কি, ইহাই তিনি ভাবিতেন। ভূপালের বেগম সাহেবা কোনও কারণবশতঃ তাঁহার কয়েকজন কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী বেগম সাহেবার প্রতি স্যার লেপেল গ্রিফিনের পূর্ব হইতেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, তাহার উপর এই বিদায় প্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণের প্ররোচনায় বেগম সাহেবা গ্রিফিনের বিরক্তির পাত্রী হইলেন। এই কর্ম্মচারিগণ সর্ব্বদাই স্যার লেপেলের নিকট বেগম সাহেবার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিত। কোন কারণে বেগম সাহেবা বড়লাট বাহাদুরকে একখানি পত্র (Kharita) লিখিয়াছিলেন। পদচ্যুত কর্ম্মচারিগণ স্যার লেপেলকে জানাইয়াছিল যে বেগম তাঁহার বিরুদ্ধে লাট বাহাদুরের নিকট অভিযোগ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। গ্রিফিন তৎক্ষণাৎ বেগম সাহেবার কৈফিয়ৎ চাহিলেন। ইংলণ্ড হইতে জেনারেল ডালি (General Daly) বেগম সাহেবাকে ভূপালের রেলওয়ে সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। বেগমা সাহেবা তাহার উত্তর প্রদান করিলে চক্রান্তকারী কর্ম্মচারিগণ স্যার লেপেল গ্রিফিনকে জানাইল যে, বেগম সাহেবা তাঁহার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে পত্র লিখিয়াছেন। স্যার লেপেল এই সকল মিথ্যা অভিযোগ সত্য জ্ঞান করিয়া বেগম সাহেবার প্রতি নানা অন্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বেগম সাহেবাকে তাঁহার আইন পরামর্শ দাতা মিষ্টার বেলের সহিত পত্র বিনিময় বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। স্যার লেপেল গ্রিফিন এইরূপ ব্যবস্থা করেন যে, রাজ্য সংক্রান্ত কোনও পত্র গভর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইতে হইলে তাহা তাঁহার যোগে পাঠাইতে হইবে।

নবাব সাহেব সিদ্দিক হোসেন নামক একজন সম্ভ্রান্ত আফগানকে বেগম সাহেবা প্রথমে তাঁহার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হোসেন সাহেবের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা লক্ষ্য করিয়া স্যার লেপেল গ্রিফিন চিন্তাযুক্ত হইলেন। পরে বেগম সাহেবা যখন সিদ্দিক হোসেনের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন, স্যার লেপেলের ভীষণ গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। এজেণ্ট সাহেব একবার ভূপালে উপস্থিত হইয়া একটী দরবার আহ্বান করেন। এই দরবারে উপস্থিত সম্ভ্রান্ত ওমরাওগণের সমক্ষে তিনি সিদ্দিক হোসেনকে নানারূপে অপমানিত করিয়া চিরদিনের জন্য ভূপাল পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু নবাব সাহেব তাঁহার এই অন্যায় আদেশ প্রতিপালন করা উচিত বলিয়া মনে করেন নাই। ক্রমে ক্রমে তিনি স্যার লেপেলের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিলেন। ক্রোধোন্মোত্ত গ্রিফিন নবাব সাহেবের অবস্থানের জন্য প্রাসাদ হইতে বহুদূরে একটী বাড়ী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। স্বামী ও স্ত্রীতে যাহাতে আদৌ সাক্ষাৎ না হয়, তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইতেছে কিনা—তাহা জানিবার জন্য তিনি গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অমানুষিক অত্যাচার ভূপালবাসিগণের হৃদয়ে বিলক্ষণ অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল। স্যার লেপেল, বেগম সাহেবা, ও তাঁহার কন্যা লুতম্ জেহানের মধ্যে মনোমালিন্য উৎপাদনের চেষ্টা করিয়া এই অসন্তোষ শতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এই ভীষণ অত্যাচার কাহিনী শিশিরকুমারের শ্রবণ গোচর হইলে, তিনি প্রতিকারের চেষ্টায় অমৃতবাজার পত্রিকায় আন্দোলন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণাদি হস্তগত না হইলে তিনি কোন বিষয়ের আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করিতেন না। বিপন্না বেগম সাহেবাকে স্যার লেপেল গ্রিফিনের অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইয়াছিল বলিয়াই যেন ভগবান অলক্ষ্যে তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছিলেন। এক অতি অদ্ভুত উপায়ে

ভূপালের রাজ্য সংক্রান্ত সরকারী কাগজ পত্রাদির নকল শিশিকুমারের হস্তগত হয়। ভূপালের জনৈক পুস্তক বিক্রেতার সহিত শিশির-কুমারের প্রায়ই পত্র বিনিময় হইত। এই পুস্তক বিক্রেতাই সরকারী কাগজ পত্রাদির নকল তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সকল কাগজ পত্রের অকৃত্রিমতাও অতি অদ্ভুত উপায়ে জানিতে পারা গিয়াছিল। ডাক্তার কারি (Dr. Currie) নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কোন কারণে স্যার লেপেল গ্রিফিনের চক্ষুঃশূল এবং শেষে ভূপাল হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। অপমানিত ডাক্তার, প্রতিকারের আশায়, কলিকাতায় আসিরা শিশিরকুমারের নিকট ভূপালে স্যার লেপেল গ্রিফিনের অত্যাচার কাহিনী বিবৃত করেন। শিশিরকুমার পুস্তক বিক্রেতার নিকট হইতে যে সকল কাগজ পত্র পাইয়াছিলেন, তাহা ডাক্তার কারিকে দেখাইলে, ডাক্তার কারি শপথ পত্রে স্বাক্ষর করিয়া সেগুলির অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে শিশির কুমারের সংশয় দূর করিয়াছিলেন। প্রমাণাদি সংগৃহীত হইলে শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় স্যার লেপেলের বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলেন। সংগে সংগে ভারতদ্বেষী কয়েক খানি সংবাদপত্র স্যার লেপের পক্ষাবলম্বন করিয়া, তাঁহাকে অমৃত-বাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে বিচারালয়ে অভিযোগ আনয়ন করিতে পরামর্শ দিতে লাগিল। কিন্তু গ্রিফিনের পক্ষে এই পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করা সম্ভব হয় নাই। তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদককে শাস্তি প্রদানের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করেন নাই।

আহম্মদ আলি খাঁ নামক জালালাবাদের জনৈক যুবকের সহিত বেগম সাহেবার কন্যা লতুম্ জেহানের বিবাহ হইয়াছিল। ভূপাল ষ্টেট্ হইতেই এই যুবকের শিক্ষার যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার প্রকৃত শিক্ষা হয় নাই। আহম্মদ আলি

খাঁ শ্বশ্রূকে অপসারিত করিয়া ভূপালে আধিপত্য লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কন্যা লতুম্ জোহানও স্বামীকে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রির পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মাতাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বেগম সাহেবা নানা কারণে কন্যার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই লইয়া মাতা, কন্যা ও জামাতার মধ্যে মনোবাদ চলিতেছিল। স্যার লেপেল গ্রিফিনই ইহার মূল ছিলেন। তিনি বেগম সাহেবাকে স্বামীর নিকট হইতে দূরে রাখিয়া বেগম সাহেবা ও তাঁহার কন্যা এবং জামাতার মধ্যে মনোমালিন্য ও বিচ্ছেদ উৎপাদনে চেষ্টা করিয়া এবং পদচ্যুত কর্ম্মচারিগণকে পুনরায় ষ্টেটের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া কৌতুক উপভোগ করিতেছিলেন। ইহার প্রতিকারের জন্য শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় তীব্র আন্দোলন করিতে লাগিলেন। এই আন্দোলন দীর্ঘকাল চলিয়াছিল।

শিশিরকুমারের চেষ্টা নিষ্ফল হয় নাই। লর্ড ডফারিণ পত্রিকা পাঠ করিয়া স্যার লেপেল গ্রিফিনকে ভূপাল হইতে সরাইয়া নিজাম রাজ্যে গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। স্যার লেপেল কিন্তু নূতন পদে কার্য্য করিতে পারেন নাই। অমৃতবাজার পত্রিকার তীব্র সমালোচনা তখন দেশীয় রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার ফলে গ্রিফিন যে একজন অত্যাচারী পুরুষ, ইহা সকল রাজারই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। এই কলঙ্কের ভার স্কন্ধে লইয়া গ্রিফিন কোথাও কার্য্য করা সুবিধাজনক মনে করেন নাই; তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শিশির-কুমারের লেখনী ধারণ সার্থক হইয়াছিল। অত্যাচারীর হস্ত হইতে মধ্যভারতের রাজন্যবর্গকে রক্ষা করিয়া তিনি সমগ্র ভারতবাসীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শিশিরকুমারকে শাস্তি প্রদানের জন্য স্যার লেপেল গ্রিফিন গভর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই, তাহা পূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। স্যার লেপেল তাঁহার কয়েকটি বন্ধুর উত্তেজনায়

স্বয়ং শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে বিচারালয়ে অভিযোগ আনয়ন করিতে কৃত সংকল্প লইলে, স্বর্গগত সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন যে তিনি এক মাস ধরিয়া তাঁহাকে জেরা করিবেন এবং তাহাতে তাঁহার আরও কীর্ত্তি কাহিনী প্রকাশ হইয়া পড়িবে। বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ে কথা অবগত হইয়া স্যার লেপেল শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনয়ন করিতে সাহস করেন নাই।

ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া স্যার লেপেল গ্রিফিন পার্লামেণ্ট মহাসভার আপনার ব্যাপারটী লইয়া আন্দোলন করিবার অভিপ্রায়ে একদিন পরামর্শ কবিবার জন্য মিষ্টাব ব্রাড্‌লর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছিলেন। মিষ্টার ব্রাড্‌ল পূর্ব্ব হইতেই স্যার লেপেলের অত্যাচার কাহিনী অবগত ছিলেন, সেজন্য তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। স্যার লেপেল গ্রিফিন মধ্য-ভারতে রাজন্যবর্গকে তাঁহার দ্বারদেশ হইতে অনেক সময়ই উপেক্ষা করিয়া ফিরাইয়া দিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে যে মর্ম্মান্তিক আঘাত প্রদান করিতেন, সেই আঘাতই তিনি মিষ্টার ব্রাড্‌লর দ্বারদেশ হইতে প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এই ঘটনাটীর সম্বন্ধে ১৮৮৯ খৃঃ অঃ জানুয়ারী মাসে ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউজ পত্রিকা লিখিয়াছিলেন—

"Proud as he is it must have been great hnmiliation to him to knock at the door of a M P. and to be refused admittance. It was a case of.

'Take physic, pomp !
Expose thyself and feel what wretches feel.
And show the heavens more just ?

Sir Lepel was spurned from the door just as he has spurned the chiefs of Central India and especially

as he treated with the greatest contumely the lady who has ever been friendly ally of the English Government.

নির্ভীক ও নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশের জন্যই গভর্ণমেণ্টের নিকট অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিপত্তি। পার্লামেণ্টের সভ্য মিষ্টার ব্রাড্‌ল ও মিষ্টার কেইনের অনুগ্রহে এই প্রতিপত্তিটুকুই দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত মতিবাবু এই দুই মহানুভবের হৃদয় অধিকার করিয়া তাঁহাদিগকে ভারতবন্ধু করিয়াছিলেন। মিষ্টার কেইন প্রথমে মাদক দ্রব্য প্রচলনের প্রথা বিলোপ সাধনেব জন্য যত্নবান হন। মতিবাবু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতবর্ষের দুঃখ কষ্টের কথা জ্ঞাপন পূর্ব্বক প্রতিকারের জন্য পার্লামেণ্টে আন্দোলন কবিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু মিষ্টার কেইন ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ কবিতে কোন মতেই সম্মত হন নাই। কিন্তু মতিবাবু ছাড়িবার লোক নহেন, তিনি পুনঃ পুনঃ ভারতের অভাব অভিযোগের কথা মিষ্টাব কেইনের নিকট বর্ণনা করিয়া তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। স্বদেশ সেবায় মতিবাবুর আন্তরিকতা লক্ষ্য করিয়া মিষ্টার কেইন অমৃতবাজার পত্রিকায় লণ্ডনের সংবাদদাতারূপে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। মতিবাবু অমৃতবাজাব পত্রিকা হইতে শিশিরকুমারের কতকগুলি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া Indian Sketches নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মিষ্টার কেইন এই গ্রন্থের ভূমিকায় শিশিরকুমারের একটী অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়াছিলেন, গ্রন্থের পরিশিষ্টে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

১৮৮৯ খৃঃ অঃ স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় মিষ্টার ব্রাড্‌ল একবার বোম্বাইয়ে আগমন করিয়াছিলেন। এই সময় বোম্বাইয়ে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইতেছিল। শ্রীযুক্ত মতিবাবু কলিকাতা হইতে মহাসমিতিতে যোগদান করিতে গমন করিয়াছিলেন। শিশির-

কুমার একবার পত্র দ্বারা ভারতবর্ষের অভাব অভিযোগের কথা মিষ্টার ব্রাড্‌লকে জানাইয়া পার্লামেণ্টে আন্দোলন করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই। পত্র বিনিময়ে অনেক সময় কার্য্য সিদ্ধি হয় না, মিষ্টার ব্রাড্‌ল যখন ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দেশের প্রকৃত অবস্থা তাঁহার গোচরে আনয়ন করিতে পারিলে নিশ্চয়ই তাঁহার সহানুভূতি লাভ করিতে পারা যাইবে, এই ভাবিয়া মতিবাবু একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহার সারাংশ লিপিবদ্ধ করিলাম।

মতিবাবু,—"পার্লামেণ্ট মহাসভায় ভারতবর্ষের দুঃখকষ্টের কথা আলোচনা করিয়া আপনি যদি অনুগ্রহ পূর্বক তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সমগ্র ভারতবাসী আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিবে।

মিঃ ব্রাড্‌ল—"শিশিরবাবুর পত্রোত্তরে আমি এসম্বন্ধে আমার মতামত পূর্ব্বেই জ্ঞাপন করিয়াছি, সর্ব্বপ্রথমে আমার নিজের দেশের শ্রমজীবীগণের (working people) ইষ্টানিষ্টের প্রতি দৃষ্টি রাখাই আমার কর্ত্তব্য"।

মতিবাবু—"তাঁহারা স্বাধীনজাতি; তাঁহারা তাঁহাদিগের দুঃখ-মোচনে ও স্বার্থ সংরক্ষণে সমর্থ।"

মিঃ ব্রাড্‌ল—"ভারতবর্ষের রাজনীতি শাস্ত্রে আমি অনভিজ্ঞ। আমি কোনও বিষয়ের আন্দোলন করিবার চেষ্টা করিলে ভারত সচিব (সেক্রেটারী অব্‌ ষ্টেট্‌স) হয়ত এরূপ উত্তর প্রদান করিবেন যে, আমাকে নীরব হইয়া থাকিতে হইবে। এই সকল কারণে আমি আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।"

মতিবাবু—"আপনি একজন ইংরাজ। ভারতবাসী যাহাতে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের হস্তে সুবিচার প্রাপ্ত হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা

কি আপনাদের কর্ত্তব্য নহে, মতিবাবুর যুক্তি তর্ক মিষ্টার ব্রাড্‌লকে বিচলিত করিতে পারিল না। শেষে মতিবাবু ভারতবাসীর প্রতি কয়েকটি অবিচারের কথা এরূপ করুণভাবে বর্ণনা করিলেন যে, তাহাতে সহৃদয় ব্রাড্‌লর অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইয়া গেল। মিঃ ব্রাড্‌ল পুনরায় বলিলেন—"ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু অবগত নহি, এরূপক্ষেত্রে কোনও কথা উত্থাপন করিলে আমাকে হয়ত অপদস্থ হইতে হইবে।"

মতিবাবু—"আপনি সেজন্য চিন্তিত হইবেন না। মিষ্টার ডিগ্‌বি আবশ্যক মত আপনাকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সকল কথা অবগত করাইবেন। ভারতবর্ষের ব্যাপার লইয়া পার্লামেণ্টে আন্দোলন করিলে আপনি যাহাতে প্রত্যেকবারেই সফল হইতে পারেন, অমৃত-বাজারপত্রিকা অফিস হইতে আমরা তাহার রীতিমত ব্যবস্থা করিব।"

মিঃ ব্রাড্‌ল—"বেশ। আমি পার্লামেণ্টে আপনাদের দুঃখ-কষ্টের কথা আন্দোলনে সম্মত হইলাম।

এই সময়ে কাশ্মীরের মহারাজা প্রতাপ সিং এক ভীষণ চক্রান্তে পতিত হইয়া রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। মহারাজার এই রাজ্যচ্যুতির বিস্তৃত বিবরণ শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় বিবৃত করিয়া কিরূপে মহারাজাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। মতিবাবুর নিকট মিঃ ব্রাড্‌ল ভারতের দুঃখ-কষ্টের কথা পার্লামেণ্ট মহাসভায় আন্দোলন করিতে প্রতিশ্রুত হইলে মতিবাবু তাঁহার নিকট কাশ্মীরের মহারাজার প্রতি অবিচারের কথা ব্যক্ত করিলেন। মহারাজার নাম শুনিয়া মিষ্টার ব্রাড্‌ল বলিলেন, "ভারতীয় রাজন্যবর্গের সম্বন্ধে কোনও কথার সংশ্রবে থাকা আমার পক্ষে সুবিধা হইবে না।"

মতিবাবু—"কেন, তাঁহাদের অপধাধ কি?"

মিঃ ব্রাড্‌ল—"মতিবাবু, আমি গরীব লোক। আমি যদি

তাঁহাদের সংশ্রবে থাকি, তাহা হইলে সাধারণে মনে করিবে যে, আমি তাঁহাদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছি।”

মতিবাবু—“আপনাকে যদি কেহ উৎকোচ প্রদান করিতে চায়, আপনি কি তাহা গ্রহণ করিবেন?”

মিষ্টার ব্রাড্‌ল হাসিয়া কহিলেন—“কিছুতেই নহে। মিষ্টার হিউম আমাকে বলিয়াছেন হে, বড়লোকের সংশ্রবে না থাকাই ভাল।”

মতিবাবু—“সাধারণের বিশ্বাস যে মিষ্টার ব্রাড্‌ল কর্ত্তব্যপরায়ণ সত্যের সমর্থনে তিনি প্রাণপণ করিতেও পশ্চাৎপদ নহেন। আপনি পবিত্র জীবনযাপন করিতেছেন এরূপ ক্ষেত্রে আপনার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্ক কালিমা অর্পণ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। সাধারণ লোকের মিথ্যা দোষারোপের আশঙ্কায় আপনার ন্যায় কর্ত্তব্য পরায়ণ মহানুভবের কি কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত হওয়া উচিত?”

মিঃ ব্রাড্‌ল—“মতিবাবু, এই কাশ্মীরের মহারাজার কথা লইয়া লাহোরের উকীলবাবু যোগীন্দ্রচন্দ্র বসুও কাশ্মীর ষ্টেটের ইঞ্জিনীয়ার মিষ্টার আই, সি, সরকার আমার নিকট আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া দিয়াছি।”

মতিবাবু—“আমাকে কিন্তু আপনি বিদায় করিয়া দিতে পারিবেন না।”

মিষ্টার ব্রাড্‌ল—“কাশ্মীরের মহারাজা যদি আমার নিকট আগমন করিয়া তাঁহার অবিচারের কথা আমাকে বলিতে পারেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে আন্দোলন করিতে পারি।”

মতিবাবু—“বর্ত্তমানে তাঁহার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাঁহার আপনার নিকট আগমন করা অসম্ভব।”

মিঃ ব্রাড্‌ল—“তাঁহার প্রজাগণ যে তাঁহার রাজ্যচ্যুতিতে দুঃখিত, তাহা আমি কিরূপে বুঝিব?”

মতিবাবু—"মহারাজার প্রজাদিগের প্রতিনিধিরা আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা বলিতে পারেন।"

মিঃ ব্রাড্‌ল—"বেশ, আমি তাঁহাদের বক্তব্য গ্রহণ করিব। মহারাজার সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য স্থির করিব।"

জাতীয় মহাসমিতিতে কাশ্মীর হইতে তিনজন প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। মতিবাবু তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহারাজার সম্বন্ধে ও তাঁহার মিষ্টার ব্রাড্‌লের মধ্যে যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা উল্লেখ করিলেন। প্রতিনিধিত্রয় মতিবাবুর পরামর্শগত একখানি আবেদন পত্র সহ মিষ্টার ব্রাড্‌লের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রতিনিধিত্রয়ের মধ্যে লাহোরের পণ্ডিত গোপীনাথ ছিলেন। মহারাজার রাজ্যচ্যুতিতে তাঁহার প্রজাগণ যে মর্ম্মাহত হইয়াছে, আবেদনে তাহা উল্লেখ করা ছিল। মিষ্টার ব্রাড্‌ল, তখন মহারাজার পক্ষে পার্লামেণ্টে আন্দোলন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তিনি প্রথমে ম্যাজিষ্ট্রেট ও পলিটিক্যাল এজেণ্টদিগের বুদ্ধিবিকারের কথা পার্লামেণ্টে উত্থাপন করিতে সম্মত হন নাই; কিন্তু মতিবাবু ছাড়িবার লোক নহেন, তিনি শেষে মিষ্টার ব্রাড্‌লকে সে সম্বন্ধেও সম্মত করাইয়াছিলেন। মিষ্টার ব্রাড্‌ল ও মিষ্টার কেইনকে ভারতবন্ধু করিয়া মতিবাবু শিশিরকুমারের সহোদরের যোগ্য কার্য্যই করিয়াছেন। ইহাদের উভয়ের ন্যায় আরও একজন সহৃদয় ইংরাজ শিশিরকুমারের গুণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ইনি সুপরিচিতনামা মিষ্টার উইলিয়াম ডিগ্‌বি।

Prosperous British India, India for the Indians—and for England প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা, ভারতের অকৃত্রিম সুহৃৎ মিষ্টার উইলিয়ম ডিগ্‌বি C. I. E. মহোদয়ের বিশেষ পরিচয় প্রদানের আবশ্যক হইবে না। এ দেশের বহু রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি অপেক্ষা তিনি ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অধিকতর যত্ন ও আগ্রহের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। এই ডিগ্‌বি শিশিরকুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধু

ছিলেন। তিনি অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসে উপস্থিত হইয়া অনেক সময় শিশিরকুমারের সহিত ভারতীয় রাজনীতিক ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিতেন। ইংলণ্ডে ভারতের কথা আন্দোলন করিবার জন্য ইণ্ডিয়ান পলিটিক্যাল এজেন্সী (Indian Political Agency) নামে সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উইলিয়ম ডিগ্‌বি ইহার জীবনস্বরূপ ছিলেন। উক্ত এজেন্সী অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে নানা বিষয়ে সাহায্য প্রাপ্ত হইত। ভারতবর্ষের কোন কথা পার্লামেণ্টে আন্দোলন করিতে হইলে শিশিরকুমার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া মিষ্টার ডিগ্‌বি সেই সকল বিবরণ মিষ্টার কেইন ও মিষ্টার ব্রাড্‌লকে বুঝাইয়া দিতেন। পার্লামেণ্টে কিরূপভাবে প্রশ্ন করিতে হইবে, শিশিরকুমার অনেক সময় তাহা ডিগ্‌বির নিকট লিখিয়া পাঠাইতেন। এই পলিটিক্যাল এজেন্সী কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, আমরা পাঠকবর্গকে তাহা পরে অবগত করাইব। আমরা এক্ষণে কাশ্মীরের ব্যাপারটী আলোচনা করিব।

১৮৮৫ খৃঃ অঃ সেপ্টেম্বর মাসে কাশ্মীরের মহারাজা রণবীর সিং মৃত্যু মুখে পতিত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপ সিং কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। এই সময় গভর্ণমেণ্ট কাশ্মীরে একজন রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৮৪৬ খৃঃ অঃ ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সহিত গোলাবসিং-এর যে সন্ধি হয়, তাহাতে গর্ভর্ণমেণ্টের রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা উল্লেখ ছিল না। কাশ্মীরে রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইলে মহারাজা প্রতাপ সিং এর ক্ষমতা ও মর্য্যাদার লাঘব হইবে, এই ভাবিয়া তিনি গর্ভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে গভর্ণমেণ্ট মহারাজকে জানাইয়াছিলেন যে, রেসিডেণ্ট কেবলমাত্র সদুপদেশ দান করিবেন, রাজ্য শাসন সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে তিনি কখনই হস্তক্ষেপ করিবেন না। যাহা হউক, মহারাজার প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৮৮৬ খ্রীঃ অঃ মার্চ্চ মাসে মিষ্টার প্লাউডেন কাশ্মীরের রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত হইলেন।

স্বীয় ব্যবহারে মিষ্টার প্লাউডেন এদেশে সুনাম রাখিয়া যাইতে পারে নাই। কার্য্যে যোগদান করিয়াই তিনি মহারাজা প্রতাপ সিং-এর সহিত অসৎ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে মিষ্টার যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু এম এ, বি এল, তাঁহার "Kashmir and its prince" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"Mr. plowden, however, from the moment he took over charge of his office assumed an attitude unfavourable to his Highness. He seems to have joined his post with a foregone conclusion against the Maharaja. He affected a lofty supercilious air, and treated the Durbar with almost undisguised contempt. On occasions he went so far as to inisist upon the Ministers retiring before he would condescend to speak to Maharaja."

প্লাউডেন মহারাজার সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা খর্ব করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিবার লোকেরও অভাব হয় নাই। মহারাজার সহোদর অমর সিং স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্লাউডেনকে সমর্থন করিয়াছিলেন।

গিলগিট (Gilgit) কাশ্মীরের অন্তর্গত একটী বিভাগ। ইহার মধ্য দিয়া বহিঃশত্রুর ভারতবর্ষে প্রবেশ সম্ভবপর। তাহা ব্যর্থ করিতে হইলে তথায় ইংরাজ সৈনিকাবাস স্থাপন আবশ্যক। এই জন্য রেসিডেণ্ট মিষ্টার প্লাউডেন গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই বিভাগটি গ্রাস করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে মহারাজা প্রতাপ সিং সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। তিনি মহারাজাকে সিংহাসন হইতে অপসারিত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। প্লাউডেনের অসদ্ব্যবহারে উত্ত্যক্ত হইয়া মহারাজ বড়লাট বাহাদুর লর্ড ডফরিণের

শরণাপন্ন হইলে লাট বাহাদুর প্লাউডেনকে কাশ্মীর হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। প্লাউডেনের পর কর্ণেল প্যারি নিস্‌বেট (colonel parry nisbet) রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। ইনি বাহিরে মহারাজার সহিত সদ্ব্যবহার করিলেও অন্তরে গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান ছিলেন। মহারাজার সহোদর রাজা অমর সিং সর্ব্বদাই কাশ্মীরের সিংহাসন লোলুপ দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেন। রেসিডেণ্ট ও রাজা অমর সিং আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিতে লাগিলেন। অমর সিং-এর কয়েকজন অনুগত ভৃত্য ও মহারাজা প্রতাপ সিং-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়াছিল। মহারাজা প্রতাপ সিং চরিত্রহীন, তিনি রাজ্য শাসনে অনুপযুক্ত, তিনি রুস গভর্ণমেণ্টের নিকট ইংরাজ রাজদ্রোহাত্মক কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছেন, এইরূপ কয়েকটি অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে রাজ্য পরিচালনার ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। মহারাজা রেসিডেণ্টের মিথ্যা অভিযোগের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন এবং তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। দুঃখে কষ্টে মহারাজা একরূপ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মহারাজার রাজ্যচ্যুতিতে তাঁহার প্রজাগণ মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইয়াছিলেন। পাছে প্রজাগণ উত্তেজিত হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় মহারাজকে একখানি পরোয়ানাতে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। রাজা অমর সিং মহারাজাকে নানারূপে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; মহারাজা কিংবর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। রাজা অমর সিং জ্যেষ্ঠাগ্রজকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি পরোয়ানাখানিতে স্বাক্ষর করিলে ভবিষ্যতে তাঁহার আর কোনও বিপদ থাকিবে না। মহারাজা পরোয়ানাখানি পাঠ করিয়া প্রথমে তাহাতে কিছুতেই স্বাক্ষর করিতে সম্মত হন নাই, কিন্তু যখন বুঝিতে পারিলেন যে স্বাক্ষর না করিলে তাঁহার ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকারময় হইবে, তখন তিনি স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরোয়ানাখানিতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। মহারাজা

রাজ্যের মঙ্গলের জন্য স্বেচ্ছায় রাজ্য শাসনের ক্ষমতা পাঁচজন সভ্যের হস্তে অর্পণ করিতেছেন, এই মর্ম্মে পরোয়ানাখানি লিখিত হইয়াছিল।

এই পরোয়ানায় লেখা ছিল, নিজের পারিবারিক বিষয় ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যেই মহারাজার অধিকার থাকিবে না। রাজ্যের আয়ব্যয়, শাসন সংরক্ষণ সমস্তই প্রকারান্তরে কাউন্সিলের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। ষড়যন্ত্রকারীদিগের অত্যাচারের আশঙ্কায় মহারাজা স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে উক্ত পরোয়ানায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্ণেল নিস্‌বেট গভর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট করেন যে, মহারাজা প্রতাপ সিং প্রজার মঙ্গলের নিমিত্ত স্বেচ্ছায় পাঁচ বৎসরের জন্য রাজ্যশাসনের ক্ষমতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। মহারাজা প্রতাপ সিং যে বাধ্য হইয়া পরোয়ানা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, পাঠকবর্গকে তাহা অবগত করাইবার জন্য আমরা মহারাজা কর্ত্তৃক বড় লাট বাহাদুরকে যে পত্র লিখিত হইয়াছিল, তাহা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিলাম—

"With the information of these letters and with the full Confidence and strength of being supported by my own brother and his now strong party, Colonel R. P. Nisbet dashed into my room at a fixed time and brought such great and many sided pressure in all solemnity and seriousness that I was obliged to write what was desired by him inorder to relieve myself for the moment—having full faith that your Excellency's Government would never accept such onesided view of the case and that opportunity will be given to me of defending myself"

উক্ত পত্রে মহারাজা প্রতাপ সিং বড়লাট বাহাদুরকে ইহাও জানাইয়া ছিলেন যে, গভর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাকে তাঁহার স্বাধীনতা প্রদানে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে লাট বাহাদুর যেন স্বহস্তে তাঁহার জীবন

গ্রহণ করিয়া তাঁহার সকল যন্ত্রনার অবসান করেন। মহারাজা লিখিয়াছিলেন,—

"In case the liberty is not allowed to me by the supreme government: and I have to remain in my present most miserable condition, I would most humbly ask your Excellency to summon me before you and I will be most happy to obey such summon —and shoot me through the heart with your Excellency's hands and thus at once relieve an unfortunate prince from unbearable misery, contempt, and disgrace for ever."

মহারাজার পত্রখানি পাঠ করিলে নয়নে স্বতঃই অশ্রু প্রবাহিত হয়। পরের দুঃখ, শিশিরকুমার আপনার দুঃখ মনে করিয়া, প্রতিকারের চেষ্টা করিতেন, একথা পাঠকবর্গ অবগত আছেন। কাশ্মীরের মহারাজা প্রতাপ সিং এর প্রতি অবিচার ও অত্যাচারের কথা অবগত হইয়া শিশিরকুমার তাঁহার পত্রিকায় ও মিষ্টার ব্রাড্‌লর সাহায্যে পার্লামেণ্ট মহাসভায় আন্দোলন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এ সময়ে শিশিরকুমারের শরীর ভাল ছিল না; তাঁহার উপযুক্ত সহোদর শ্রীযুক্ত মতিবাবু তাঁহার পরামর্শ মত পত্রিকা পরিচালনা করিতেন। ন্যায়নিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিগণ কখনও ভগবানের আশীর্ব্বাদ ও অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হন না। উৎপীড়িত অপমানিত ও রাজ্যচুত মহারাজা প্রতাপসিংহকে অত্যাচারী ও ষড়যন্ত্রকারিগণের চক্রান্ত হইতে উদ্ধার করিয়া কাশ্মীরের সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা শিশিরকুমার ও তাঁহার অনুজ মতিবাবুর হৃদয়ে বলবতী হইয়াছিল বলিয়াই যেন ভগবান তাঁহাদিগকে সহায়তা করিয়াছিলেন। প্রজাগণের মঙ্গলের জন্য মহারাজা প্রতাপসিংহ পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত রাজ্যের রশ্মি পরিত্যাগ করিয়াছেন ইহা যে সত্য নহে; গভর্ণমেণ্ট

কাশ্মীরের অন্তর্গত গিলগিট (gilgit) বিভাগটি অধিকার করিবার জন্যই যে মহারাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন, তাহা সাধারণকে অবগত করাইবার জন্য শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় গভর্ণমেণ্টের একখানি গুপ্ত দলিল প্রকাশ করেন। ১৮৮৯ খ্রীঃ অঃ অক্টোবর মাসে ৩রা তারিখে শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় উক্ত গুপ্ত দলিল প্রকাশ করিয়া যে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক তাহা হইতে সকল কথা অবগত হইবেন—

"To-day we shall publish a document which will startle India—probably lord Lansdowne himself lord Lansdowne, we are credibly informed, has been very much disgusted with the Kashmir business. We have a very high authority for stating that His Excellency was actuated by the best of motives in accepting what he calls the Edict of Resignation by the Maharaja. But when he accepted this responsibility of governing Kashmir through a Rasident, he had no notion that there was so much intrigue, to put the matter mildly, surrounding the business. His excellency's heart now recoils at what he is obliged to do to defend a measure which is wholly untenable. A noble englishman of high priciples, His Excellency is not willing to stick to a mcasure which his conscience does not justify. And therefore, he is only seeking an opportunity to restore kashmir to its legitimate owner. Our information, incredible as it may appear, is derived from such a high source that we cannot help putting faith in it.

"In the following document, the original of which His Excellency will find in the Foreign office, the viceroy will find the real reason why the Maharaja of Kashmir has been deposed, It will be seen that His Highness was deposed not because he resigned or oppressed his people, but because Gilgit was wanted for strategical purposes by the British Government. Mr. Plowden proposed that the principalities of Gilgit should be occupied by the British Government at once, and this proposal of Mr. plowden was the main cause of his down fall. Sir H. N. durand, the Foreign secretary, however, condemned Mr. Plawden's proposal, and him as Rasident, in the following memorandum which was submitted to the then viceroy, lord dufferin :—

'Opinion of Foreign Secretary about the occupation of Gilgit.

'To His EXCELLENCY'

'I do not agree with Mr. Plowden, the Resident in kashmir, in this matter. He is too much inclined to set kashmir aside in all ways, and to assume that if we want a thing done we must do it ourselves.

'The more I think of this scheme, the more clear it seems to me that we should limit our overt interference as far as possible to the organisation of a responsible military force in Gilgit. So far we can hope to carry the Darbar thoroughly with us. If we

annex Gilgit or put an end to the Suzerainty of Kashmir over the petty principalities of the neighbourhood, and, above all, if we put British troops into Kashmir just now, we shall run a risk of turning the Durbar aganist us and thereby increase the difficulty of the position. I do not think this is necessary. No doubt we must have Practically, the control of Kashmir relations with those Principalities, but this we already have. Indeed, the Durbar has now, since the dimissal of Lachman Das, asked Mr. plowden to advise the Gilgit authorities direct without reference to them. If we have a quiet and judicious officer at Gilgit, who will get the Kashmir force into thorough order and abstain from unnecessary exercise of his influence, we shall, I hope, in a short time have the whole thing in our hand, without hurting any one's feelings.

'Altogether, I think our first step should be to send up temporarily and quietly a selected Military officer (capt. A. Durand, of the intelligence Department) and a junior Medical officer. Both of them will have the support of the Durbar when and where it will be necessary, and they will not display any indiscretion, so that the Durbar may not have any hint of the work they are about to undertake, and they will have to obtain the consent of the Durbar in matters concerning military difficultics. Once

we can establish a belief that our undertaking is nothing but the welfare of the Durbar, We are surely to attain our object. Time will show that my view is not a wrong one. In it lies, I venture to hope, the safe realisation of that object, which was once cotemplated in Lord canning's time, and afterwards was abandoned after deliberation.

Eventually Major Mellis should go to Kashmir on the part of the Durbar and submit a mature scheme for the better administration of the state, which is at present very badly managed indeed. This scheme should include the outline of our arrangements for strengthening the Government policy.

'After the expiry of six months we will be in a position to decide whether the parmanent location of a political Agency at Gilgit, also a contingent of troops for the defence of the frontier, for which the Durbar have already agreed to put their resources and troops at the disposal of the British Government.

'(sd) H. M. Durand'.
'6th May'.

'Very well'.
'(sd) Dufferin'
'10th May.'

All the suggestions contained in the above have been carried out. Capt. A. Durand is just now in the neighbourhood of Gilgit, with 'a junior medical

officer'; the political agency has been established; and 'eventually' Major Mellis has gone to Kashmir on the 'part of the Durbar……to submit a Scheme… for strengthening the Government policy.' Sir H. Durand's suggestions have been disregarded only on one point, and that, we belive, by himself. He says, 'we already have the control over the Gilgit principalites' and we can 'have the whole thing without hurting any one's fellings.' Being one of the wisest men in India, why did not Sir H. Durand stick to the wise suggesstion of his own of controlling the affairs of Kashmir without hurting any one's fellings? So it will be seen that, when Sir John Gorst said that he would not be surprised if a feeble-minded man like pertab sing would withdraw his resignation; or when Lord cross declared that the Maharaja cruelly oppresses his subjects, or when Lord Lansdowne wrote to the Maharaja that His Highness was an extravagant and bad ruler, they were not aware of the real reason of the Maharaja's deposition. It was Gilgit that the Government wanted.

"One of the rumours very current in India is that, when the viceroy comes to Lahore, the Foreign office will invite the Maharaja to meet His Excellency there. The Maharaja would, of course, come, and then he would be persuaded to open a real Edict of

Rsignation. We notice this rumour at all to show how people are prone to attribute all sorts of motives to the Government. We have, however, very little doubt that there will be a meeting at Lahore, and we hope everything will be satisfactorily settled. If there be any talk of Gilgit, of course the Maharaja should cordially Cooperate with the Government for the defence of the Empire"

অমৃতবাজার পত্রিকার উক্ত মন্তব্যটি প্রকাশিত হইলে ভারতবর্ষের কোনও সংবাদপত্র তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। লর্ড ল্যাসডাউন তখন বড় লাট বাহাতুরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটির অংশ বিশেষ কল্পিত বলিয়া প্রকাশ করিলেও তাহার মূলে যে সত্য নিহিত ছিল, তাহা তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। গভর্ণমেণ্টের গোপনীয় সংবাদ প্রকাশ করিয়া অমৃতবাজার পত্রিকার পরিচালকগণ বড়লাট বাহাতুরের বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহাতে তাঁহারা উৎপীড়িত, অপমানিত, রাজ্যচুত্য মহারাজা প্রতাপসিং বাহাতুরকে ধ্বংসের মুখ হইতে উদ্ধার করিয়া জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা, ভক্তি ও আশীর্ব্বাদ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তৎকালে কোনও বিধান প্রচলিত না থাকায় গভর্ণমেণ্ট অমৃতবাজার পত্রিকার পরিচালক শিশিরকুমার প্রভৃতিকে আইন অনুসারে অভিযুক্ত করিতে পারেন নাই। ভবিষ্যতে যাহাতে গভর্ণমেণ্টের কোন গোপনীয় সংবাদ প্রকাশ না হয়, তাহার ব্যবস্থার জন্য লাট বাহাতুর "Official Secrets Act" নামে এক নূতন আইন বিধিবদ্ধ করেন। মহারাজা বাহাতুরের পক্ষাবলম্বন করিয়া শিশিরকুমার ও মতিবাবু মিষ্টার ব্রাড্‌লর সহায়তায় পার্লামেণ্ট মহাসভায় ভারত গভর্ণমেণ্টের অবিচারের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন করিয়াছিলেন। সদানুষ্ঠানে মানব চিরদিনই ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিয়া

থাকে। অত্যাচার প্রপীড়িত মহারাজাকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য শিশিরকুমার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াই ভগবানের অনুগ্রহে তিনি সাফলতা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিশিরকুমার গভর্ণমেণ্টের গুপ্ত দলিল প্রকাশ করিয়া আন্দোলন না করিলে কাশ্মীরের মহারাজার ভবিষ্যৎ যে কিরূপ ভয়ঙ্কর হইত, পাঠকবর্গ তাহা সহজে অনুমান করিতে পারেন। মহারাজের প্রতি অবিচারের কথা কিরূপভাবে পার্লামেণ্টে আন্দোলন করিতে হইবে, শিশিরকুমার বিস্তৃতভাবে তাহা মিষ্টার ব্রাড্‌লর নিকট লিখিয়া পাঠাইতেন এবং তাহারই ফলে মহারাজা প্রতাপসিং বাহাদুর স্বীয় সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া এখনও সুখে স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করিতেছেন।

———

সপ্তম অধ্যায়

পাঠকবর্গ পূর্ব্ব অধ্যায়ে পলিটিক্যাল এজেন্সীর নাম অবগত হইয়াছেন। আমরা এক্ষণে সেই পলিটিক্যাল এজেন্সী, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন (Indian Union) ও রিলিফ সোসাইটী (Relief Society) সম্বন্ধে কয়েকটি কথা উল্লেখ করিব। সেই সঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকা কিরূপে সাপ্তাহিক হইতে দৈনিক হইয়াছিল, তাহাও বলিব। প্রথমেই উল্লেখ করা আবশ্যক যে শিশিরকুমারের ভগ্ন স্বাস্থ্যই ইণ্ডিয়ান লীগের অধঃপতের কারণ হইয়াছিল। দ্বারবঙ্গের বর্ত্তমান মহারাজা বাহাদুরের অগ্রজ মহারাজা স্যার লছমীশ্বর সিং বাহাদুর অমৃতবাজার পত্রিকা পাঠ করিয়া, তাহার সম্পাদক শিশির-কুমারের সহিত পরিচয় করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বয়ঃ প্রাপ্তির পর, কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ হইতে স্বীয় হস্তে বিষয়ের ভার গ্রহণ করিয়া তিনি কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক একদিন তাঁহার প্রাইভেট্ সেক্রেটারীকে শিশিরকুমারের নিকট প্রেরণ করিলেন। শিশির-কুমার এই সময় সাধারণ লোকদিগকে লইয়া একটি জাতীয় সমিতি গঠনের চেষ্টা করিতেছিলেন ; দ্বারবঙ্গেশ্বরের সাদর আহ্বানে তিনি মহারাজা বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি জাতীয়সমিতি গঠনের সঙ্কল্প করিলেন। সাক্ষাৎ হইলে উভয়ের মধ্যে দেশের সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। এই কথোপকথনে শিশিরকুমার বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন যে, মহারাজা বাহাদুরের হৃদয় উদারতায় পূর্ণ এবং স্বদেশ-সেবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁহার অন্তরে জাগরূক রহিয়াছে। এই প্রথম সাক্ষাতের সময় শিশিরকুমার ও মহারাজা লছমীশ্বর সিং বাহাদুরের মধ্যে সাধারণভাবে দেশের কথা আলোচিত হইয়াছিল ; শিশিরকুমার জাতীয়সমিতি গঠনের কথা তাঁহার নিকট উত্থাপন করিবার সুযোগ পান নাই। তিনি একদিন হঠাৎ অবগত হইলেন যে, মহারাজা বাহাদুর কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। স্বীয়

অভিপ্রায় মহারাজা বাহাতুরকে জানাইতে না পারায়, শিশিরকুমার বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। মহারাজা বাহাতুর হঠাৎ যেমন কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ হঠাৎ আবার একদিন কলিকাতায় আগমন করেন। শিশিরকুমার সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেও মহারাজা লছমীশ্বর সিং নিরহঙ্কার পুরুষ ছিলেন। আহারান্তে তিনি বিশ্রাম করিতেছিলেন ; শিশিরকুমার সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বহির্ব্বাটীতে আগমন করিয়া সাদর অর্ভ্যথনায় শিশিরকুমারকে অপ্যায়িত করিলেন। উভয়ের মধ্যে কথোপকথন চলিতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া শিশিরকুমার তাঁহার সঙ্কল্পিত জাতীয়সমিতি গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। এই প্রসঙ্গে দেশের তুরবস্থার কথা বর্ণনা করিতে করিতে স্বদেশপ্রেমিক শিশিরকুমারের হৃদয় উথলিয়া উঠিল ; তাঁহার নয়ন যুগল হইতে কয়েক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। স্বদেশসেবক শিশিরকুমারের ভাব লক্ষ্য করিয়া মহারাজা বাহাতুর মুগ্ধ হইলেন। তিনি বলিলেন—"শিশিরবাবু, আমার দ্বারা দেশের কি উপকার হইতে পারে বলুন ?"

শিশির—"দেশের সাধারণ জনসম্প্রদায়কে তাহাদিগের তুরবস্থার কথা বুঝাইতে না পারিলে প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হওয়া অসম্ভব। সাধারণ লোকদিগকে লইয়া আমি মহারাজা বাহাতুরের পৃষ্ঠপোষকতার এক জাতীয় সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করি।"

মহারাজা—"শিশিরবাবু, প্রকাশ্যভাবে যদি আমি রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগদান করি, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট আমার উপর যে অসন্তুষ্ট হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

শিশির—"রাজনৈতিক ব্যাপারের সংশ্রবে থাকা যদি আপনার অনভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আপনি দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি বিষয়ে সহায়তা করিতে পারেন। ইহাতে দেশের প্রকৃত উপকার হইবে।"

মহারাজা—"বেশ, তাহাতে আমার কোনও আপত্তি নাই; আমাকে কি করিতে হইবে বলুন।"

শিশির—"আপনি প্রথমে একটী 'মিল' প্রতিষ্ঠা করুন।"

মহারাজা—"আমি প্রতি বৎসর মিলের জন্য চারি লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে সম্মত আছি। কিন্তু আপনাকে মিলের কার্য্য পরিচালনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিশিরকুমারের পরামর্শ অনুসারে, মিল প্রতিষ্ঠার জন্য, বোম্বাই হইতে জনৈক বিশেষজ্ঞকে আনাইয়া সম্ভাবিত ব্যয়ের একটী হিসাব প্রস্তুত করা হইল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোন অজ্ঞাত কারণে, মিল প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন

ইণ্ডিয়ান লীগের জীবনান্তের পূর্ব্বেই ভারত সভা (Indian Association) প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশপূজ্য বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম হইতেই ইহার জীবনস্বরূপ ছিলেন। ভারতবাসীমাত্রেরই কল্যাণকল্পে প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষিত ব্যক্তিগণেরই সভা; নিরক্ষর জনসাধারণ ইহার সংস্রবে আসিতে পারে নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শিশিরকুমার সাধারণ লোকদিগকে লইয়া একটী সমিতি গঠনের চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সময় সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিষ্টার মনোমোহন ঘোষ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শিশিরকুমার জাতীয় সমিতি গঠনে মনোমোহন বাবুর সাহায্য লাভ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। মনোমোহন বাবু শিশিরকুমারকে অন্তরের সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। বাগ্মীবর লালমোহন ইংলণ্ডে পার্লামেণ্ট মহাসভায় প্রবেশ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তাঁহার কিঞ্চিৎ অর্থাভাব হইয়াছিল। শিশিরকুমার এ কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার সাহার্য্যার্থ অর্থ প্রেরণ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। তিনি দ্বারবঙ্গেশ্বর লছমীশ্বরকে

জানাইলেন যে, লালমোহন পার্লামেণ্ট মহাসভায় প্রবেশ করিতে পারিলে দেশের অনেক মঙ্গল সাধিত হইবে ; কিন্তু অর্থাভাববশতঃ তিনি ভালরূপ চেষ্টা করিতে পারিতেছেন না। এরূপ অবস্থায় মহারাজা বাহাদুর যদি তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করেন, তাহা হইলে দেশের একটী মহৎ উপকার হইবে। দ্বারবঙ্গেশ্বর তিন হাজার টাকা দিতে সম্মত হইলেন। শিশিরকুমার সানন্দে এই সংবাদ মনোমোহন বাবুকে জ্ঞাপন করিলেন। মনোমোহন বাবু বলিলেন, "মহারাজার উদারতার জন্য বিশেষ বাধিত হইলাম, কিন্তু শুনিয়াছি, মহারাজা বাহাদুর প্রতিজ্ঞা করিবার সময় যে তৎপরতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, প্রতিজ্ঞা পূরণের সময় তাঁহার বড়ই অভাব লক্ষিত হয়।" শিশিরকুমার মনোমোহন বাবুকে বলিলেন—"আপনি চিন্তিত হইবেন না ; আমি শীঘ্রই টাকা আদায় করিয়া দিতেছি।" তিনি দ্বারবঙ্গেশ্বরকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, লালমোহনকে সাহায্য করা যদি তাঁহার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তিনি যেন তাঁহার প্রতিশ্রুত সাহায্য সত্বর প্রেরণ করেন। মহারাজা বাহাদুর অবিলম্বে তাঁহার প্রতিশ্রুত চাঁদা শিশির-কুমারের নিকট প্রেরণ করিলেন। লালমোহনকে এইরূপে সাহায্য করিয়া শিশিরকুমার মনোমোহন বাবুর সহানুভূতি লাভ করিলেন।

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন জমিদারদিগের সভা ; ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সভা, কিন্তু দেশের প্রকৃত শক্তি স্বরূপ সাধারণ লোকদিগের কোনও সভা ছিল না। শিশিরকুমার ইহাদিগের জন্য একটী সমিতি প্রতিষ্টার চেষ্টা করিতেছিলেন। সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিষ্টার টি, পালিতের আফিস গৃহে এক সভার অধিবেশন হয়। মনোমোহন, উমেশচন্দ্র প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টারগণ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে হাইকোর্টের উকিল বাবু মহেশচন্দ্র সেন সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে বলিয়াছিলেন যে, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন

বর্ত্তমান থাকিতে আবার একটী নূতন সমিতি প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা নাই। সভ্যগণের মধ্যে একজন প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, ইণ্ডিয়ান লীগ থাকিতে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা যেমন দোষাবহ নহে, সেইরূপ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বর্ত্তমানে অন্য কোন সমিতি প্রতিষ্ঠা করিলে কোনও দোষ হইতে পারে না। যাহা হউক, উক্ত সভায় দেশের সাধারণ লোকদিগকে লইয়া একটী জাতীয় সমিতি গঠিত হইবে, স্থির হইল।

শিশিরকুমার একদিন দ্বারবঙ্গেশ্বরকে পত্র দ্বারা জানাইয়াছিলেন যে, কতকগুলি বাঙ্গালী ভদ্রলোক, বিশেষ কোন কার্যের জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন। প্রত্যুত্তরে মহারাজা বাহাদুর সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। নির্দিষ্ট দিবসে সন্ধ্যা আট ঘটিকার সময় শিশিরকুমার, মনোমোহন বাবু প্রভৃতি ষাটজন বাঙ্গালী দ্বারবঙ্গেশ্বরের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী দ্বারদেশে সকলকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। এই উপলক্ষে মহারাজা বাহারদুর স্বীয় বাড়িখানি আলোক মালায় সজ্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মধুর ব্যবহারে তাঁহার অতিথিগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সকলের মুখপাত্রস্বরূপ মনোমোহন বাবু মহারাজা বাহাদুরের নিকট আপনাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া দেশের প্রকৃত শক্তি স্বরূপ সাধারণ জনসম্প্রদায়কে লইয়া তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় একটী জাতীয় সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। শিশিরকুমার পূর্ব্বে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে মহারাজা বাহাদুর তখন সম্মতিদান করিতে পারেন নাই, একথা পাঠক অবগত আছেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি অসম্মত হইতে পারিলেন না। তিনি প্রস্তাবিত সমিতিতে যোগদান ও সাহায্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। একটি প্রকাশ্য সভায় সমিতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইবে, স্থির হইল। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ২রা মার্চ্চ তারিখে এলবার্ট হলে দ্বারবঙ্গেশ্বরের সভাপতিত্বে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন (Indian Union) নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। নব প্রতিষ্ঠিত

সমিতির উন্নতিকল্পে মহারাজা বাহাদুর দশ সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান লীগ প্রতিষ্ঠার পর, তাহার সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়া শিশিরকুমার যে যন্ত্রনা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া তিনি ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের কোন পদ গ্রহণে সম্মত হন নাই। দ্বারবঙ্গেশ্বর সভাপতি ও মিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সমিতির সম্পাদক মনোনীত হইলেন। ইঁহাদিগের সহিত মনোমোহন, শিশিরকুমার প্রভৃতি মনীষীগণ সভ্য হইলেও ইহা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। উমেশচন্দ্র স্থায়ীভাবে হাইকোর্টের স্টাণ্ডিং কাউন্সেল মনোনীত হইলে ডাক্তার ত্রৈলোকনাথ মিত্র মহাশয় তাঁহার স্থলে সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দ্বারবঙ্গেশ্বর দশ হাজার টাকা দিয়াছিলেন; ইহা ব্যতীত সভ্যগণের নিকট হইতেও নিয়মিত চাঁদা আদায় হইত; সুতরাং কোনকালেই ইউনিয়নের অর্থাভাব ঘটিত না। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়ের উদাসীন্যই ইউনিয়নের অস্তিত্ব লোপের কারণ হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং কোনও কার্য্য করিতেন না এবং সভ্যগণকেও কোন কার্য্য করিবার সুযোগ দিতেন না। ক্রমেই সভ্যগণের মধ্যে বিরক্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইল এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহারা সভায় যোগদানেও বিরত হইলেন। উমেশচন্দ্র ও শিশিরকুমারের ভগ্নীপতি কিশোরীলাল সরকার মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইউনিয়নের কার্য্য পরিচালনার জন্য যে সকল বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা উপেক্ষিত হইতে লাগিল। এইরূপে অতি অল্পদিনের মধ্যেই ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল। শিশিরকুমার ইহাতে প্রাণে মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিলেন।

পলিটিক্যাল এজেন্সী

ইংলণ্ডে ব্রিটিশ কংগ্রেস কমিটি (British Congress Committee) নামে একটি সমিতি আছে, ইহা বোধ হয় পাঠকবর্গ অবগত আছেন। স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবরণ (Sir William

Wedderburn) ইহার জীবনস্বরূপ ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন। ব্রিটিশ কংগ্রেস কমিটি ভারতবর্ষের অভাব অভিযোগের কথা সাধারণভাবে আলোচনা করিয়া থাকেন। ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের বিলোপের পর শিশিরকুমারের হৃদয়ে আর এক ইচ্ছা জাগিয়া উঠিয়াছিল। শিশিরকুমার বুঝিয়াছিলেন যে স্বায়ত্ত্ব-শাসন লাভ কিম্বা শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথকের জন্য সাধারণভাবে আন্দোলন করা অপেক্ষা এদেশে গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অবিচার ও অত্যাচারের কথা পার্লামেণ্টে উত্থাপন করিয়া আন্দোলন করিলে দেশের অধিক উপকার হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে ইংলণ্ডে 'পলিটিক্যাল এজেন্সী' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই এজেন্সীর উন্নতি কল্পে উমেশচন্দ্র, দাদাভাই নওরজী প্রভৃতি জন্মভূমির সুসন্তানগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবরণ যেমন কংগ্রেস কমিটির জীবনস্বরূপ ছিলেন, মিষ্টার উইলিয়ম ডিগ্‌বি সেইরূপ পলিটিক্যাল এজেন্সীর জীবনস্বরূপ ছিলেন। শ্রীযুক্ত মতিবাবু কিরূপে মিষ্টার ব্রাড্‌লকে ভারতবন্ধু করিয়াছিলেন, আমরা পূর্ব্বে তাহা উল্লেখ করিয়াছি। গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের অত্যাচার ও অবিচারের কথা এখান হইতে বিশদরূপে লিখিয়া মিষ্টার ডিগ বির নিকট পাঠান হইত এবং মিষ্টার ডিগ্‌বি সেই সকল কথা পার্লামেণ্টে আলোচনা করিবার জন্য ব্রাড্‌লকে বুঝাইয়া দিতেন। সিবিলিয়ান পুঙ্গবেরা পলিটিক্যাল এজেন্সীকে বিশেষ ভয় করিয়া চলিতেন। মিষ্টার এইচ, এ, ফিলিপ্‌স্ (H. A. Phillips) ময়মনসিং ও রাজসাহীর ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। স্বাধীনচেতা মহারাজা সূর্য্যকান্তের সহিত তাঁহার কয়েকবার সংঘর্ষ হইয়াছিল। ফিলিপ্সের অত্যাচারের ভয়ে জেলাবাসিগণ সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিতেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব কেবল গভর্ণমেণ্টের কার্য্য করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই; তিনি রাজনৈতিক ব্যাপারে মিশিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতা (Calcutta

Review) নামক পত্রিকার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। একবার তিনি তাঁহার পত্রিকায় মিষ্টার উমেশচন্দ্র—জাতীয় মহা-সমিতিতে গালাগালি করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার ও মতিলাল অমৃতবাজার পত্রিকায় মিষ্টার ফিলিপ্সের এই অন্যায় ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন এবং পার্লামেণ্টে আন্দোলন করিবার জন্য মিষ্টার ডিগ্‌বিকে যথোপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ফলে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে বাধ্য হইয়া কলিকাতা রিভিউ পত্রিকার সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। পার্লামেণ্টে কোন বিষয়ের আন্দোলন করিতে হইলে, তাহা কিরূপভাবে করিতে হইবে ; শিশিরকুমার এখান হইতে সমস্ত স্থির করিয়া দিতেন ; এমন কি, তিনি অনেক সময় প্রশ্ন পর্য্যন্তও ঠিক করিয়া দিতেন। পারিশ্রমিক স্বরূপ মিষ্টার ডিগ্‌বিকে অমৃতবাজার পত্রিকা অফিস হইতে মাসিক ৫০০, পাঁচশত টাকা পাঠান হইত। এই টাকা, যাঁহাদের অভিযোগের কথা পার্লামেণ্টে আলোচনা হইত, তাঁহাদের নিকট হইতে ও সাময়িক চাঁদা হইতে পাঠান হইত। পাইওনিয়র পত্রিকা এই পলিটিক্যাল এজেন্সীকে অবজ্ঞাও করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

পলিটিক্যাল এজেন্সী দ্বারা বহু উপকার সাধিত হইলেও কংগ্রেস কমিটির সদস্যগণ স্ব স্ব সমিতির জন্য টাকা আদায় করিয়া বেড়াইতেন। নাটোরের সহৃদয় জমিদার স্বর্গীয় রাজা যোগেন্দ্র নাথ রায় পলিটিক্যাল এজেন্সীর সাহায্যকল্পে একবার ৫০০, পাঁচশত টাকা দান করিয়াছিলেন। মতিবাবু রাজার নিকট হইতে এই অর্থ আনিবার সময় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া এই মর্ম্মে একখানি পত্র দেন যে, অমৃতবাজার পত্রিকার পরিচালকগণ দেশের যে কোন হিতকর কার্য্যে ইচ্ছামত এই টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন, তাহা হইলে বাধিত হইব।" রাজা যোগেন্দ্রনাথ সেইরূপই পত্র দিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে, কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে কোন কোন সভ্য রাজার

নিকট চাঁদার জন্য গমন করেন। রাজা যোগেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, তিনি পূর্ব্বেই মতিবাবুর নিকট ৫০০, পাঁচশত টাকা দিয়াছেন, আর কিছু দিতে পারিবেন না। এই সময় পণ্ডিত অযোধ্যা প্রসাদ কংগ্রেসের এজেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি একদিন অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসে উপস্থিত হইয়া শিশিরকুমার ও মতিবাবুকে বলিলেন—"নাটোরের রাজা যোগেন্দ্রনাথ যে ৫০০, পাঁচশত টাকা দিয়াছেন, তাহা আপনারা এখনই আমার হাতে প্রদান করুন। উক্ত টাকা কংগ্রেসের হাতে না দিয়া আপনারা প্রতারণা করিয়াছেন।" শিশিরকুমার ও মতিবাবু হাসিলেন; পণ্ডিতজীর অপ্রীতিকর বাক্যে তাঁহারা দুঃখিত বা ক্রুদ্ধ হইলেন না। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, পণ্ডিত অযোধ্যাপ্রসাদ সম্ভবতঃ রাজার এই ৫০০, পাঁচশত টাকা দানের বিশেষ বিবরণ অবগত নহেন। রাজা যোগেন্দ্রনাথ উক্ত টাকা পলিটিক্যাল এজেন্সীতে দিয়াছেন, মতিবাবু পণ্ডিতজীকে ইহা বুঝাইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অযোধ্যাপ্রসাদ কিছুতেই তাহা বুঝিলেন না। তিনি বিরক্তির সহিত পত্রিকা অফিস পরিত্যাগ করিলেন। ইহার পর জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে তিনি সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়াছিলেন—"বড়ই দুঃখের বিষয় নাটোরের রাজা যোগেন্দ্রনাথ প্রদত্ত ৫০০, পাঁচশত টাকা উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ অপব্যয় করিয়াছেন।" শ্রীযুক্ত মতিবাবু তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া পণ্ডিতজীর উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। ব্যাপার ক্রমশঃই গুরুতর হইতেছে দেখিয়া বাঁকিপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকিলবাবু গুরুপ্রসন্ন সেন, অযোধ্যাপ্রসাদও মতিলালকে নিরস্ত করিয়া রাজার ৫০০, পাঁচশত টাকা দানের প্রকৃত কথা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু অযোধ্যাপ্রসাদ কিছুতেই নিরস্ত হইবার নন। শেষে এই বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য মিষ্টার হিউম ও মিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে মধ্যস্থ নিযুক্ত করা হইল। তাঁহারা অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসে উপস্থিত হইলে মতিবাবু রাজা যোগেন্দ্রনাথের

পত্রখানি তাঁহাদিগকে দেখাইলেন। কংগ্রেস কমিটির সদস্যগণ তখন নীরব হইলেন।

ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটী

সুশৃঙ্খলায় রাজ্যশাসন করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের বিশেষ বিবেচনার সহিত আইন প্রণয়ন করা যেমন আবশ্যক, প্রণীত আইন অনুসারে কর্ম্মচারিগণ শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন কিনা, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা গভর্ণমেণ্টের সেইরূপ কর্ত্তব্য। খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ আইন বহিঃগত কার্য্য করিয়া প্রজাবৃন্দের উপর অত্যাচার, অবিচার ও উৎপীড়ন করিতে কুণ্ঠিত হন না। এই সকল অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য শিশিরকুমারের যত্নে ও চেষ্টায় ১৮৯৩ খৃঃ অব্দের প্রথম ভাগে ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সমিতির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ইহার কার্য্য বিবরণীতে এইরূপ লিখিত আছে—"এই সোসাইটী জনৈক বিচক্ষণ হিন্দু সাধুর উপদেশে গঠিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার দেশবাসীকে বলিয়াছিলেন,—ইংরেজরা তোমাদের স্বাধীনতা হরণ করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা তোমাদের মঙ্গল কামনা করেন; তোমাদের সুশাসনের সহিত তাঁহাদের অধিকাংশ লোকেরই স্বার্থ জড়িত তাঁহাদিগকে তোমাদের অভাবের কথা জ্ঞাপন করিয়া, তোমাদের ন্যায্য অধিকার নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অবিশ্রান্তভাবে প্রার্থনা কর। আইনসঙ্গত উপায়ে অবিচলিতভাবে আন্দোলন করিলে তাঁহারা প্রতিকূলতাচরণ করিতে পারিবেন না। যাঁহারা পুরস্কারের প্রত্যাশা না করিয়া কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকেই কার্য্যে ব্রতী করিতে হইবে। সভ্যগণকে বিশেষভাবে আত্মত্যাগী হইতে হইবে। কোন সভ্য সাধারণের সমক্ষে আপনার প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিতে পারিবেন না। দাম্ভিক ও আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠাকারীকে সভ্যপদ হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে।

স্বীয় কার্য্য তৎপরতা দ্বারা দেশবাসীর মধ্যে জীবনী শক্তি সঞ্চারিত কর। সত্য-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকিলে ভগবান তোমার পরিশ্রম সার্থক করিবেন।”* শ্রীযুক্তবাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সোসাইটীর সম্পাদক ছিলেন। আমরা তাঁহারও শ্রীযুক্ত মতিবাবুর নিকট অবগত হইয়াছি যে শিশিরকুমারকে ‘হিন্দু সাধু’ (Hindu sage) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বাগবাজারে অমৃতবাজার পত্রিকার অফিস গৃহেই ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটীর কার্য্যাদি নির্ব্বাহ হইত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে সোসাইটীর প্রতিনিধিগণ সোসাইটীর কার্য্যের সহায়তা করিতেন। ইংলণ্ডে মিষ্টার উইলিয়ম ডিগ্‌বি প্রথমে কিছুদিনের জন্য ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটীর এজেণ্টের কার্য্য করিয়াছিলেন। কার্য্যাধিক্য বশতঃ তিনি পদত্যাগ করিলেন, তাঁহার স্থলে মিষ্টার ডবলিউ, এস্, কেইন মহোদয় ১৮৯৬ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত সোসাইটীর অবৈতনিক এজেণ্টের কার্য্য করিয়াছিলেন। মিষ্টার কেইনের অভিপ্রায় অনুসারে ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটী ইংলণ্ডের

---

*"It was formed with the advice of a Hindu sage, who delivered himself thus : The English people are always in a penitent mood for having taken away your liberty. They, however, mean you well the interests of the large majority of Englishman lie in Governing you well. Let them know your wants ; press your claims ceaselessly. Educated under constitutional principles, they cannot resist persistent agitation. Select for your works only those who are willing to labour without any reward. Make one essential condition of membership self-effacement. Allow no member to thrust forward, expel him who is vain and hankers after prominence. Impart vitality to your people by your own activity. Stick to truth and God will bless your labours."— Report of the Indian Relief Society.

এংলো ইণ্ডিয়ান টেম্পারেন্স এসোসিয়েশনের (Anglo Indian Temperance Association) অঙ্গীভূত করা হইয়াছিল। সোসাইটীর সদস্যগণ প্রত্যেক বিষয়ে শিশিরকুমারের পরামর্শ ও উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতেন। শিশিরকুমারের হৃদয় এবং মস্তিষ্ক বিশ্রাম জানিত না। দেশের অভাব, জাতীয় দুর্গতি এবং অত্যাচার, অবিচার দেখিলেই প্রতিবিধান সঙ্কল্প তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিত ; সেই জন্যই তিনি নানাভাবে, নানা উপায়ে, সমাজ কল্যাণের জন্য সভা সমিতি স্থাপনের চেষ্টা করিতেন। এই ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটী তাঁহার বেদনানুভূতিরই ফল। ইহা যে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদের বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইলে, একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিতে হয় ; আমরা নিম্নে কয়েকটী কার্য্যের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

জেলা সংস্কার—কারাগারে বন্দীগণের দুরবস্থা শিশিরকুমারের হৃদয়কে বিচলিত করিয়াছিল। প্রতিকারের আশায় তিনি অমৃত-বাজার পত্রিকায় এ বিষয়ে ঘোরতর আন্দোলন করিয়াছিলেন। এখানে আন্দোলনে বিশেষ কোন ফল হইতেছে না দেখিয়া, শেষে ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটী শিশিরকুমারের নির্দ্দেশমত জেলার থানায় কয়েদিগণের দুরবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিয়া, ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে একটী রিপোর্ট প্রকাশ করেন এবং সেই রিপোর্টের কয়েক খণ্ড ইংলণ্ডে হাওয়ার্ড এসোসিয়েশনে (Howard Association) প্রেরণ করেন। উক্ত এসোসিয়েশনের সম্পাদক রিপোর্টের একখণ্ড ভারত সচিবের নিকট প্রদান করিয়া তাহার সত্যাসত্য অনুসন্ধান করিবার জন্য অনুরোধ করেন। (Lord Kimberly) রিলিফ সোসাইটীর রিপোর্টটি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ফলে একটী জেল কমিটি গঠিত হয় এবং রেভিনিউ বোর্ডের তদানীন্তন সিনিয়র মেম্বার মাননীয় ডি. আর. লায়াল সি, এস, আই মহোদয় তাহার প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হন। অনুসন্ধান কার্য্যে সহায়তা করিবার

জন্য জেল কমিটি ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটী হইতে শ্রীযুক্ত মতিবাবু ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুকে জেল পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। মতিবাবু হীরেন্দ্রবাবু জেল পরিদর্শন করিয়া কয়েদিগণের অভাব অভিযোগের কথা কমিটির নিকট বর্ণনা করিতেন। আমরা তাঁহারা প্রেসিডেন্সী জেল পরিদর্শনের বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

মতিবাবু ও হীরেন্দ্রবাবু প্রেসিডেন্সী জেল পরিদর্শন করিতে যাইবেন জানাইয়া তদানীন্তন জেল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মিষ্টার ডোনাল্ডসনকে পত্র লিখিলেন। পরিদর্শকদ্বয়ের পত্র পাইয়া সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সাহেব যে নির্দিষ্ট দিবসে জেলের সকল কার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যথাসময়ে মতিবাবু ও হীরেন্দ্রবাবু প্রেসিডেন্সী জেলে উপস্থিত হইলেন। মিষ্টার ডোনাল্ডস তাঁহাদিগকে যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। সেখানে সহস্রাধিক কয়েদী বায়স্কোপের চিত্রের ন্যায় কার্য্য করিতেছিল। কাহারও মুখে একটি কথা নাই; সকলেই আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত। মতিবাবু আশাহত হইয়া মিষ্টার ডোনাল্ডসকে বলিলেন,—"একসঙ্গে এতগুলি কয়েদী কার্য্য করিতেছে; কাহারও মুখে একটী কথা নাই; ইহারা কি সকলেই বোবা?"

মিষ্টার ডোনাল্ডসন প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—"বোবা কেহই নহে। একাধিক কয়েদী একত্রে লইয়া সুশৃঙ্খলায় কার্য্য করিতে হইলে একটু কঠোরতা আবশ্যক এবং সেই কঠোর নিয়মের ফলেই কয়েদিগণ সুসংযত হইয়াছে।"

মতিবাবু ও হীরেন্দ্রবাবু মিষ্টার ডোনাল্ডের সহিত সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যদিকে গমন করিতেছেন, এমন সময় মতিবাবু দেখিলেন যে, একটী কয়েদী জোড় হাতে কাতর নয়নে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে এবং তাঁহাদিগকে কিছু বলিবার জন্য যেন আদেশ প্রার্থনা করিতেছে। মতিবাবু তাহাকে দেখিয়া সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সাহেবকে
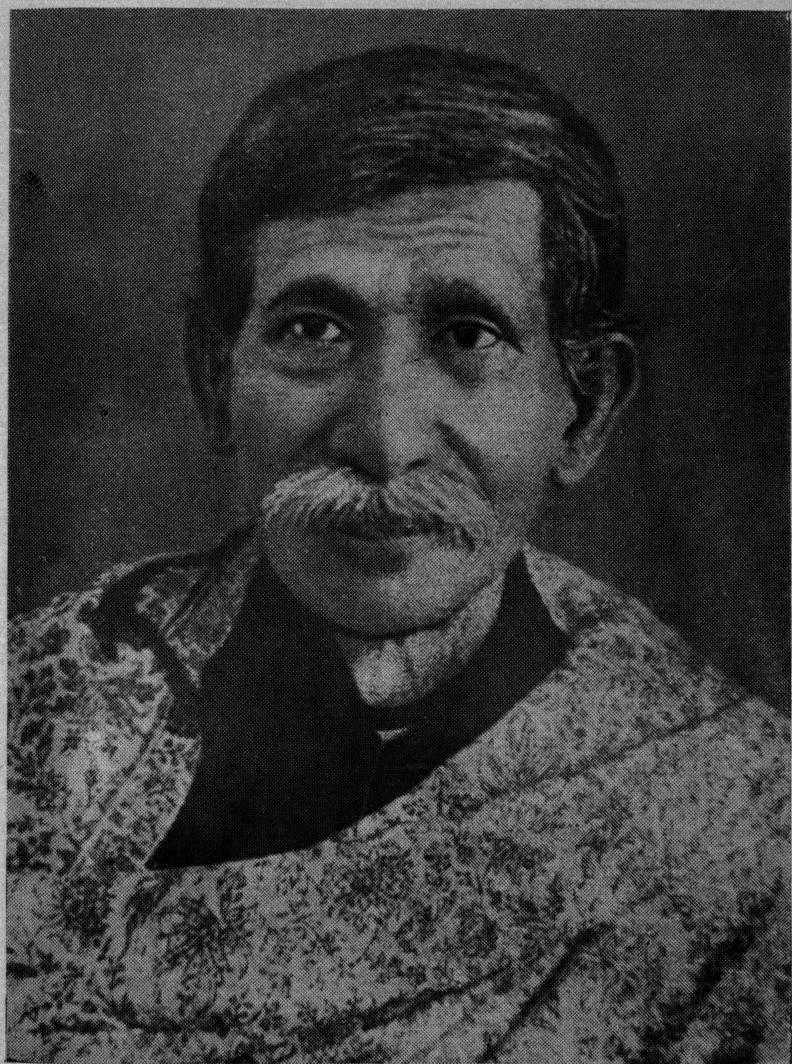
মতিলাল ঘোষ।

জিজ্ঞাসা করিলেন,—“লোকটী এরূপভাব দেখাইতেছে কেন, বোধ হয় আমাদিগকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করে।”

ডোনাল্ডসন—“এখনই উহাকে বেত্রাঘাত করা হইবে, সেইজন্য এইরূপ ভাব দেখাইতেছে।”

মতিবাবু—“বেত্রাঘাত করা হইবে কেন? উহার অপরাধ কি?”

মিঃ ডোনাল্ডসন—“লোকটা বড়ই দুষ্ট প্রকৃতি; কোন দিনই উহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে পারে না।”

মতিবাবুর ইঙ্গিতে কয়েদী তাঁহার নিকট আগমন করিল; তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি তোঁমার কার্য্য কর না কেন?”

কয়েদী—“ধর্ম্মাবতার! একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যথাশক্তি আমি আমার কার্য্য করিয়া থাকি। অনেক সময় আমাকে এরূপ কার্য্য দেওয়া হয়, যাহা আমার সাধ্যাতীত; সুতরাং আমি তাহা সম্পন্ন করিতে পারি না এই অপরাধে বেত্রাঘাতে আমি জর্জ্জরিত।”

মতিবাবু জেলের সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট সাহেবকে বলিলেন, “মিষ্টার ডোনাল্ডসন আপনি ত এই কয়েদীকে বেত্রাঘাত করিয়াও সংশোধন করিতে পারিবেন না। আমার মনে হয় কঠোরতা অপেক্ষা সদ্ব্যবহার দ্বারা দুষ্টপ্রকৃতি লোককে শীঘ্রই সংশোধন করা যায়। আপনি এই লোকটির প্রতি ভাল ব্যবহার করিয়া দেখুন, সে নিশ্চয় ভাল হইবে।”

মিষ্টার ডোনাল্ডসন—“আপনাদের এই পরিদর্শনের সম্মানার্থ আমি উহার প্রতি বেত্রাঘাতেব আদেশ রহিত করিলাম। উহার সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া দেখি কিফল হয়।”

কয়েদীটি নীরবে, করুণ দৃষ্টিতে শ্রীযুক্ত মতিবাবুর প্রতি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া স্বীয় কার্য্যে প্রস্থান করিল।

মিষ্টার ডোনাল্ডসন্ শেষে পরিদর্শকদ্বয়কে রন্ধন শালায় লইয়া গেলেন। কয়েদীগণের আহারের ব্যবস্থা দেখিয়া মতিবাবু ও হীরেন্দ্রবাবু বিস্মিত হইয়া ছিলেন। পরিষ্কার চাউলের অন্ন, উৎকৃষ্ট

মুগের ডাল ও অন্যান্য আহার্য্য বস্তুর আয়োজন দেখিয়া তাঁহারা সহজেই বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহারা পরিদর্শনে আগমন করিবেন বলিয়া কেবল সেই দিনের জন্য এরূপ সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। মিষ্টার ডোনাল্ডসন পাত্র হইতে কতকটা ডাল তুলিয়া লইয়া খাইতে খাইতে বলিলেন, "আহা কি সুন্দর রান্না হইয়াছে!" তাঁহার ব্যাপার দেখিয়া মতিবাবু ও হীরেন্দ্রবাবু হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। মিষ্টার ডোনাল্ডসন বলিলেন,—"আপনারা মনে করিতেন যে কারাগারে কয়েদীগণের আহারের বড়ই কষ্ট হয়, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাহাদের আহারের কিরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকে, তাহা ত আপনারা স্বচক্ষে দেখিলেন। আপনারা একখানি সার্টিফিকেট দিন।"

মতিবাবু—"গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা ভাল থাকিতে পারে, কিন্তু সেই ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য হয় বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিনা। আজ আমরা জেল পরিদর্শনে আসিব বলিয়াই আপনারা আহারের এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রত্যহই এইরূপ ব্যবস্থা হয়, তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারিনা। অদ্যকার ব্যবস্থা দেখিয়া আমরা কোনওরূপ সার্টিফিকেট দিতে পারিব না।"

শ্রীযুক্ত মতিবাবুর কথা শুনিয়া সাহেব অবাক; তিনি নিরুত্তর রহিলেন। মতিবাবু ও হীরেন্দ্রবাবু শেষে কয়েদীগণের পায়খানার দুরবস্থার কথা সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট সাহেবকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিলেন। ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটীর পক্ষ হইতে মতিবাবু ও হীরেন্দ্রবাবু জেল কমিটির নিকট কারাগারে কয়েদীগণের আহারের ও পায়খানার কষ্ট ও অত্যধিক মৃত্যুর কারণ অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। রিলিফ সোসাইটীর যত্নে ও চেষ্টায় কয়েদীগণের আহারের ও পায়খানার কষ্ট কতক পরিমাণে দূর হইয়াছিল এবং তাহাদের পরিশ্রমের সময়ও কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

বালাধুন হত্যার মোকদ্দমা (The Balladhun Murder Case)—একবার আসামে জনৈক ইউরোপীয় চা-করকে হত্যাকরার

অপরাধে চারিজনের প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা এবং তিন জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হয়। দায়রা জজের বিচার ফলে দেশে উত্তেজনা ও অসন্তোষের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল। এই বিচারের বিরুদ্ধে আসামিগণ হাইকোর্টে আপিল করিয়াছিল, কিন্তু অর্থাভাব বশতঃ তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য উপযুক্ত উকিল কিম্বা ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিতে পারে নাই। শেষে তাহাদের নিম্ন আদালতের উকিল ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটীর নিকট তাহাদের নির্দোষতা সপ্রমাণ করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করেন। নিরপরাধগণকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সোসাইটী যত্নবান হইলেন এবং অর্থ সংগ্রহ করিয়া আসামীগণের পক্ষ সমর্থনের জন্য উপযুক্ত ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিলেন। মহামান্য হাইকোর্টের বিচারে আসামিগণ মুক্তি লাভ করিল। পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও দায়রা জজ যেরূপভাবে এই মোকদ্দমা পরিচালন করিয়া চারিজনের প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা ও তিনজনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের ব্যবস্থা করেন, হাইকোর্টের বিচারপতিগণ তৎপ্রতি তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটী এই বিচার বিভ্রাটের কথা মিষ্টার কেইনের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়া পার্লামেন্টেও আন্দোলন করিয়াছিলেন।

মিষ্টার বিট্সন্‌বেল,—মিষ্টার বিট্সন্‌বেল যখন খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন, সেই সময় স্থানীয় এক জমিদারের জনৈক কর্ম্মচারী তাঁহাকে এক গ্লাস দুগ্ধ দিতে অস্বীকার করায় ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তাঁহাকে প্রহার করিয়াছিলেন। ঘটনাটি তদানীন্তন ছোটলাট বাহাদুর স্যার চার্লস্ ইলিয়টকে জানান হইলে তিনি তাহার কোন প্রতিবিধান না করিয়া বরং ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। মিষ্টার বেলের এইরূপ অন্যায়ের প্রতিকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটী ঘটনাটি ভারত গভর্ণমেণ্টের গোচরে আনয়ন করিয়াছিলেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট মিষ্টার বেলকে তাঁহার অন্যায় কার্য্যের জন্য তীব্র তিরস্কার করিয়াছিলেন।

No Conviction, No Promotion।—গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাগুনে ফৌজদারী বিভাগের শাসন কর্ত্তাদিগের মধ্যে এইরূপ একটি ধারনা হয়, যে ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের মধ্যে যিনি যত শাস্তি দিতে পারিবেন তাঁহার তত উন্নতি হইবে। ইহাতে অনেক সময় বহু নির্দোষ লোক অকারণে শাস্তি পাইত। এই শ্রেণীর শাসনকর্ত্তৃগণ সুবিচারের দিকে দৃষ্টিপাত করা অপেক্ষা আপনাদিগের উন্নতির দিকেই অধিক পরিমাণে লক্ষ্য রাখিতেন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে যে ধর্ম্মভীরু হাকিম ছিলেন না, তাহা নহে। একবার একজন জেলাজজ এই প্রকার বিচার বিভ্রাটের প্রতি মহামান্য হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রতিকার করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। এই ব্যাপার লইয়া হাইকোর্ট ও গভর্ণমেণ্টের মধ্যে মতানৈক্য হয়। হাইকোর্টের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইলে দেশের যে ভীষণ ক্ষতি হইবে, তাহা স্মরণ করিয়া শিশিরকুমারের নির্দেশমত ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটী পার্লামেণ্টে আন্দোলন করিবার জন্য আবশ্যক সংবাদাদি ইংলণ্ডে জনৈক মেম্বরের নিকট প্রেরণ করেন। ভারত সচিব সকল কথা অবগত হইয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। শেষে তাঁহার ব্যবস্থাগুণে হাইকোর্টেই জয়লাভ করিয়াছিলেন।

এইরূপে ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটী শিশিরকুমারের উপদেশমত দেশের অনেক উপকার করিয়াছিলেন।

দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকা

হরি মাইতি নামক জনৈক নিম্ন শ্রেণীর লোক তাহার একাদশ বর্ষীয়া স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়াছিল ; ফলে বালিকাটী মৃত্যুমুখে হয়। হরি আইন অনুসারে অভিযুক্ত ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। ভবিষ্যতে যাহাতে এই লোমহর্ষক ব্যাপারের পুনরভিনয় না হয়, সেজন্য গভর্ণমেণ্ট ১৮৯১ খৃঃ অঃ ১৯শে মার্চ তারিখে "সম্মতি আইন" (Age of Consent Bill) নামে এক নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সার এ, স্কোব্‌ল (Sir A, Scoble) এই আইনের সৃষ্টি

কর্ত্তা। এই আইনের বিধান অনুসারে স্ত্রীর বয়স দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে স্বামীর পক্ষে স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ ; আইনভঙ্গ করিলে স্বামীর দশ বৎসর কারাবাস কিম্বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের ব্যবস্থা আছে। হিন্দুসমাজের বহু ব্যক্তি এই আইন ধর্ম্মবিঘ্নকর বলিয়া বিবেচনা করিতেন। গভর্ণমেণ্টের আইন মানিয়া চলিতে হইলে অশাস্ত্রীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, সুতরাং নূতন আইনের প্রতিবাদ করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া এদেশীয় কোন কোন সংবাদপত্রে বিশিষ্ট আন্দোলন চলিয়াছিল। ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকা পূর্ব্বেই দৈনিক হইয়াছিল। ইণ্ডিয়ান মিরর সম্মতি আইন সমর্থন করায় ইহা ব্রাহ্ম-দিগের পত্রিকা বলিয়া অনেকেরই ধারণা জন্মিয়াছিল। অমৃতবাজার পত্রিকা তখন সাপ্তাহিক ছিল। দেশে যখনই কোন একটা গুরুতর কাণ্ড ঘটিয়াছে, অমৃতবাজার পত্রিকা তখনই তাহা অবলম্বনে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। সাপ্তাহিক পত্রিকায় আশানুরূপ আন্দোলন হইতেছে না দেখিয়া হিন্দু পেট্রিয়ট দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, এই দুঃসময়ে যদি দেশে একখানি হিন্দু দৈনিক পত্রিকা থাকিত, তাহা হইলে দেশের মহদোউপকার হইত। কথাটী শিশিরকুমারের হৃদয়ে বড়ই বাজিয়াছিল। তিনি এই অভাব দূর করিবার জন্য কৃত সঙ্কল্প হইলেন। একখানি দৈনিক পত্রিকা পরিচালন করিতে হইলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তাহা ব্যয় করা পত্রিকা পরিচালকগণের পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না। কিন্তু যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া শিশিরকুমারের মনে একবার জাগিয়া উঠিত, যেরূপেই হউক তিনি তাহা সম্পন্ন করিতেন। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি সহোদরগণের সহায়তায় সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি ১৮৯২ খ্রীঃ অঃ ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমেই দৈনিকে পরিণত করিলেন। দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকা দেখিয়া হিন্দু পেট্রিয়ট লিখিয়াছিলেন, "আমরা দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকাকে অভিনন্দন ও ইহার সফলতা কামনা করি। আমাদের সহযোগী যদি পূর্ব্বের ন্যায় সাহসিকতা, ভক্তিমতা ও বিশ্বস্ততার সহিত তাঁহার

কর্ত্তব্য সম্পাদনে নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেশের মহদুপকার করা হইবে।"*

প্রস্তাবিত আইন বিধিবদ্ধ হইলেদেশে যে একটী প্রবল আন্দোলন হইবে, অমৃতবাজার পত্রিকা গভর্ণমেণ্টকে তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়াছিলেন। যাঁহারা সম্মতি আইন সমর্থন করিতেন, শিশিরকুমার অমৃত বাজার পত্রিকায় তাঁহাদিগকেও সম্মতি আইনের সৃষ্টিকর্ত্তা সার এ, স্কোবলকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন,—

"If a husband is sent to jail for life or far ten years, what will become of his girl wife ? Who will protect her then ? Who will feed her ? What will be her fate ? She will be a miserable creature for life ; Perhaps she will die a harlot. Will she not curse the philanthropist, who, in going to protect her from a fanciful danger will make her miserable for life ?"

"Suppose Sir A. Scable sits as a judge and a husband and girl wife are hauled up before him. He sends the husband to jail for ten years and then the girl tells him, 'Benevolent Judge ! I am a girl of eleven and therefore very foolish. I agreed to what my husband proposed. Indeed I was not aware of the existence of any law about this matter. You now

---

*"We welcome the Amrita Bazar Patrika on its development into a daily broad sheet and wish it very success in the new existence. If our contemporary continues to do his duty to his country as boldly, loyally and faithfully as he has done in his past, great good will certainly be done to our country's cause." Hindu Patriot.

send him to jail. Can you provide me with another husband ? Why do you make me miserable for life ? Who will protect me now ? Who will maintain me ? And who can make me happy in life except my husband ? You profess to be my friend and a philanthropist, why do you make an innocent girl who is your object of tender care, miserable for life ?' What reply will Sir A. Scoble give her ?"

অর্থাৎ স্বামীর প্রতি যাবজ্জীবন কিম্বা দশ বৎসরের কারাবাসের আদেশ হইলে, তাহার বালিকা পত্নীর অবস্থা কি হইবে ? কে তাহাকে রক্ষা করিবে ? কে তাহাকে আহার দান করিবে ? তাহার অদৃষ্ট কি হইবে ? সে চিরকালের জন্য দুর্দ্দশাগ্রস্তা হইবে এবং হয়ত বারাঙ্গনা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। তাহার যে হিতৈষীগণ তাহাকে কাল্পনিক বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টায় তাহাকে জনম দুঃখিনী করিতে যাইতেছেন, তাঁহারা কি তাহার অভিশাপগ্রস্ত হইবেন না।

মনে করুন, সার এ, স্কোবল্, বিচারপতিরূপে আসীন এবং সম্মুখে একটি স্বামী ও তাহার বালিকা পত্নী বিচারের জন্য উপস্থিত। বিচারে স্কোবল্ স্বামীকে দশ বৎসরের জন্য কারাগারে প্রেরণ করিলেন। তখন সেই বালিকা পত্নী যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, "সদাশয় বিচার পতি আমি একাদশবর্ষীয়া বুদ্ধি হীনা বালিকা। সত্যই আমি তোমাদের আইন অবগত নহি, আমি আমার স্বামীর প্রস্তাবে সম্মতিদান করিয়া-ছিলাম। তুমি আমার স্বামীকে কারাগারে প্রেরণ করিলে, কিন্তু তুমি কি আমাকে দ্বিতীয় স্বামী প্রদান করিতে পার ? কেন তুমি আমাকে চিরদিনের জন্য দুঃখিনী করিলে ? কে আমায় রক্ষা করিবে ? কে আমায় ভরণপোষণ করিবে ? আমার স্বামী ব্যতাত কে আমাকে জীবনে সুখী করিবে ? তুমি আমার হিতৈষী বলিয়া পরিচয় দাও,

আমি তোমার স্নেহের পাত্রী, তবে কেন তুমি আমার জীবন চিরদিনের জন্য দুর্দশাগ্রস্থ করিলে ?' স্যার এ, স্কোবল্ এ প্রশ্নের কি উত্তর প্রদান করিবেন ?

প্রস্তাবিত আইন বিধিবদ্ধ হইলে কেবল সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপার নহে, গভর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করা হইবে, ইহা দেখাইবার জন্য অমৃতবাজার পত্রিকা লিখিয়াছিলেন,—

"The inert people of India can be moved by two means, viz, by meddling with their religion and meddling with their women. It is apprehended that this measure has the effect of meddling with both. That there will be a conculsion about this matter we believe ; that there will be any lawlessness we do not believe. What we further believe is that the measure will create a sore in the heart which will remain there unnoticed by both the people and the Government. But if any attempt be made hereafter to bring the law under operation, the sore will break out afresh. The Government is wise. It will do what is proper. We can only give it our honest advice."

অর্থাৎ ভারতবাসী নির্জীব হইলেও যখন তাহারা বুঝিতে পারিবে যে গভর্ণমেণ্ট তাহাদের ধর্ম্মেও রমনীগণের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, তখন তাহাদের সে নির্জীবতা দূর হইবে। বর্ত্তমান আইন এই উভয় ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করিতেছে। আমাদের মনে হয়, এই উপলক্ষে দেশে একটি মহা হাঙ্গামা উপস্থিত হইবে, তবে তাহাতে কোন আইন বহির্গত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু এই নূতন বিধি সাধারণের ও গভর্ণনেণ্টের অজ্ঞাতে ভারতবাসীর হৃদয়ে যে ক্ষত উৎপাদন করিবে, তাহা আইন কার্য্যকর করিবার চেষ্টা

হইলে পুনরায় নূতন হইয়া উঠিবে। যাহা সঙ্গত, বিচক্ষণ গভর্ণমেণ্ট তাহাই করিবেন, আমরা কেবল সৎ পরামর্শ প্রদান করিতে পারি।

গভর্ণমেণ্টের ভাব লক্ষ্য করিয়া শিশিরকুমার বড় দুঃখে অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন :—"The people of India do not know now who their masters are. Are they the subjects of the Queen or the British Committee to whom the Viceroy referred? Is the Viceroy the High Priest of the Hindus? Is the Queen's proclamation a hoax and a snare? Is the irresponsible British Committee to rule the Viceroy?"

অর্থাৎ ভারতবাসিগণ, বর্ত্তমানে তাহাদের ভাগ্যবিধাতা কে, তাহা অবগত নহে। তাহারা মহারাণীর প্রজা না বৃটিশ কমিটির প্রজা? বড় লাট বাহাদুর এই ব্রিটিশ কমিটিকেই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। বড়লাট বাহাদুর কি হিন্দুদিগের প্রধান যাজক? মহারাণীর ঘোষণা পত্র কি প্রবঞ্চনাপূর্ণ? বড়লাট বাহাদুরকি দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্রিটিশ কমিটী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবেন?

প্রস্তাবিত বিধির প্রতিবাদ করিবার জন্য গড়ের মাঠে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়, সেই সভায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল। দলে দলে হিন্দু মুসলমান শিখ, জৈন উন্মত্তের ন্যায় বড়লাট বাহাদুরের বাটির চতুর্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া যখন কাতর বচনে "ধর্ম্মরক্ষা কর, ধর্ম্মরক্ষা কর" বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিল, তখন যে দৃশ্য হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। আন্দোলনে কোনও ফলোদয় হইতেছে না দেখিয়া, ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ, বিপদ হইতে উদ্ধারের আশায়, কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে এক মহাপূজার আয়োজন করিয়াছিলেন। সেই মহাপূজার অভাবনীয় ব্যাপারও বর্ণনা করিতে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম। তীব্র প্রতিবাদ করিয়া অমৃতবাজার পত্রিকা ঘোরতর আন্দোলন করিলেও কোন ফল হয় নাই। গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের অভিমত পদদলিত করিয়া "সম্মতি আইন" বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে

আইন বর্ত্তমানে কার্য্যকর দেখা যায় না। বঙ্গবাসী পত্রিকাও এই আইনের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন করিয়াছিলেন। ইহার স্বত্ত্বাধিকারী, সম্পাদক, অধ্যক্ষ ও মুদ্রাকর আইন অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষে তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অব্যাহতি লাভ করেন।

আধুনিক বঙ্গের অন্যতম নায়ক শিশিরকুমার বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সকলে ভাই ভাই হইতে না পারিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হওয়া অসম্ভব। ধর্ম্মের অভ্যুদয়েই দেশের জাগরণ এবং সেই জন্যই তিনি ধর্ম্মের উন্নতি বিধানে আপনাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা তাঁহার ধর্ম্মজীবনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। শিশিরকুমারের ধর্ম্মজীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকের কার্য্যভার শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের উপর পতিত হয়। প্রাচীন ঋষিগণ, লোকালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অরণ্যে ও পর্ব্বত গহ্বরে অবস্থান করিয়াও আত্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও সমাজের মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম সাধনে আত্মনিয়োগ করিবার পর হইতে শিশিরকুমার অধিকাংশ সময়ই তাঁহার বৈদ্যনাথ দেওঘরের বাটীতে অবস্থান করিতেন। কিন্তু বাহিরে অমৃতবাজার পত্রিকার সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেও তিনি প্রকৃত পক্ষে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া দেশের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত ছিলেন। পত্রিকার গ্রাহকগণ পত্রিকা পাঠ করিতে করিতে প্রবন্ধের মধ্যে যখনই কোন বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতেন, তখনই তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন যে, প্রবন্ধটী শিশিরকুমারের লেখনী নিঃসৃত। তাঁহার অমৃতবাজার পত্রিকা দেশের কি পরিমাণ উপকার করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে পাঠকবর্গ তাহা সম্যক রূপে অবগত আছেন। জ্যেষ্ঠাগ্রজ বসন্তকুমার যেমন শিশিরকুমারের হৃদয়ে দেশের ও সমাজের কার্য্যকরী সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, শিশিরকুমারও সেইরূপ সহোদর মতিলালকে স্বদেশ সেবায় অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন

শিশিরকুমারের একনিষ্ঠ সেবক হইয়া, তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়াই শ্রীযুক্ত মতিবাবু অমৃতবাজার পত্রিকার পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। নির্ভীকতা, তেজস্বিতা ও ন্যায়নিষ্ঠা শিশিরকুমারের ন্যায় তাঁহারও চরিত্রে পরিস্ফুট এবং সেইজন্যই বঙ্গের শাসন কর্ত্তারা অনেক সময় তাঁহার সহিত শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকেন। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল মহোদয় মতিবাবুকে প্রায়ই লাট ভবনে আহ্বান করিতেন। আমাদের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা লর্ড রোনাল্ডসেও তাঁহাকে যথেষ্ঠ সম্মান করিয়া থাকেন। ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ বাহাদুর, যুবরাজরূপে যখন কলিকাতায় আগমন করেন, সেই সময় তিনি শ্রীযুক্ত মতিবাবুকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অধিকার প্রদান করিয়া তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। যুবরাজের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী সার ওয়ালটার লরেন্স (Sir w. lawrence) শিশিরকুমারের বন্ধু ছিলেন। তিনি অমৃতবাজার পত্রিকা নিয়মিত যত্ন সহকারে পাঠ করিতেন। যুবরাজ ভারতবর্ষে আগমন করিলে অমৃতবাজার পত্রিকা, বেঙ্গলী ও স্টেটস্ম্যান পত্রিকা যাহাতে তাঁহার নিকট না পোঁছায়, তাহার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল বলিয়া একটি জনরব উঠিয়াছিল। কিন্তু সার ওয়ালটার লরেন্স প্রত্যহই অমৃত-বাজার পত্রিকা যুবরাজকে পাঠ করিতে দিতেন। সার ওয়ালটার লরেন্সের নির্দ্দেশমত অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিনিধিরূপে শ্রীযুক্ত মতিবাবু একদিন (গভর্ণমেণ্ট হাউসে) লাট প্রাসাদে উপস্থিত হন। সেখানে যুবরাজের প্রাইভেট্ সেক্রেটরী স্যার ওয়ালটারের সহিত নানা কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় স্যার ওয়ালটার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন ?" মতিবাবু শুনিয়া অবাক হইলেন। যাহা হউক সার ওয়ালটার তাহাকে যুবরাজের নিকট লইয়া গেলেন ও তাহার সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। যুবরাজ মতিবাবুর করমর্দ্দন করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত

করিলে মতিবাবু বিনীতভাবে বলিলেন,—"করমর্দ্দন করিলে আমাদের ভাবী সম্রাটের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হইবে না।" তিনি যুবরাজকে অভিবাদন করিয়া তাহার সম্মুখে নতজানু হইয়া সজল নয়নে গদগদ কণ্ঠে বলিলেন,—

Please your Royal Highness : Humble as I am greatly honoured by this interview. I shall ever remember it with gratitude. Now I am in the presence our future King Emperor. Permit me to say that poor India is in a bad way. It needs protection at your Royal Highness' hands, for you are our future sovereign. Pray, don't forget Indians ; but remember that they are as much yours as the forty millions of England. What they need most is the genuine sympathy of their rulers.

অর্থাৎ যুবরাজ! আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনি আমাকে যথেষ্ট সম্মানিত করিয়াছেন এবং আমি ইহা চিরদিন কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিব। ভারতের অবস্থা অতীব শোচনীয়, ইহাই আমি আমাদের ভাবী সম্রাটের নিকট বলিতে চাই। আপনি আমাদের ভাবী সম্রাট ; ভারতবর্ষকে আপনি রক্ষা করুন। ভারতবাসীকে বিস্মৃত হইবেন না ; ইংলণ্ডের চারিকোটী প্রাণী যেমন আপনার, ভারতবাসীরাও সেইরূপ আপনার, ইহা স্মরণ রাখিবেন, এই আমার প্রার্থনা। শাসনকর্ত্তাদিগের প্রকৃত সহানুভূতিই ভারতবাসিগণের প্রধান অভাব।

শ্রীযুক্ত মতিবাবুর ভাব লক্ষ্য করিয়া যুবরাজ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সার ওয়ালটার লরেন্স যুবরাজের পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনিও বিচলিত হইয়াছিলেন। যুবরাজ মতিবাবুকে উঠিতে বলিয়া প্রাণস্পর্শী ভাষায় বলিয়াছিলেন :—

"I am very pleased to come across you. You want an assurance from me that I will not forget the Indians.

Well, I assure you, I shall not and cannot forget the Indians. I shall ever remember them and make it a point to tell my father how immensely gratified I have been with the magnificent reception your people have given me. It shall also be-my pleasant duty to tell my father that you are in need of wider sympathy. I carry with me very happy impressions about India."

অর্থাৎ—আপনার সহিত সাক্ষাতে আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। ভারতবাসীকে আমি বিস্মৃত হইব না। আপনি আমার নিকট হইতে আশ্বাসবাক্য প্রার্থনা করেন। আমি ভারতবাসীকে ভুলিব না, ভুলিতে পারিব না, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। আমি চিরদিন তাহা-দিগকে স্মরণ করিব, আপনার দেশবাসিগণ মহাসমারোহের সহিত আমাকে অভ্যর্থনা করিয়াছে। এবং তাহাতে আমি যে পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি তাহাও আমি আমার পিতৃদেবের নিকট নিবেদন করিব। শাসনকর্ত্তাদের নিকট হইতে আপনার যে অধিকতর সহানুভূতির আশা করিয়া থাকেন, ইহাও আমার পিতাকে জানাইব। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমার বড় সুন্দর ধারণা হইয়াছে।

যুবরাজ ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়া গিল্ডহলে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি সেই বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "শাসন কর্ত্তারা যদি ভারতবাসী-দিগের প্রতি অধিকতর সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে ভারত শাসন আমাদের পক্ষে অতি সহজ হইবে।

বঙ্গদেশে আন্তরীণের (Internnent) ব্যাপার লইয়া বহু পরিবারে যে হাহাকার উঠিয়াছে, পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। এসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মতিবাবু অমৃতবাজার পত্রিকায় ঘোরতর আন্দোলন করিয়া যে মহোপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। ভারতে স্বায়ত্তশাসনের (Home rule) অধিকার লাভের জন্য আসমুদ্র হিমাচল যে আন্দোলন চলিতেছে, মতিবাবু সেই আন্দোলনের অন্যতম নেতা। সপ্ততিবর্ষের অধিক বয়স হইলেও তাহার উদ্যম

যুবকগণেরও অনুকরণীয়। দেশের কল্যানসাধনে নিযুক্ত বলিয়াই ভগবান তাঁহাকে মঙ্গল হস্তে রক্ষা করিতেছেন। শিশিরকুমার যেমন মতিবাবুকে মানুষ করিয়াছিলেন, মতিবাবুও তেমনি শিশিরকুমারের জ্যেষ্ঠপুত্র পীযূষ কান্তিকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। মতিবাবুর কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত গোপাললাল ঘোষ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ পত্রিকার কার্যপরিচালনে নিযুক্ত। আমরা আশা করি ভবিষ্যতেও অমৃতবাজার পত্রিকা স্বীয়-পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা করিয়া দেশের মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত থাকিতেন।

শিশিরকুমারের সংসর্গের ফলে তাঁহার পরিবারস্থ পুরুষগণ যে তেজস্বী হইবেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু তাঁহার পরিবারস্থ মহিলাগণও কিরূপ তেজস্বিনী হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন। ঘটনাটী গিরিডির উকিল শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র রায়ের নিকট হইতে আমরা অবগত হইয়াছি। সতীশবাবুর পিতা স্বর্গীয় বরদাকান্ত রায় দেওঘরের পুলিশ সব্-ইন্সপেক্টর ছিলেন। সেই সময় স্বর্গীয় বসন্তকুমার মিত্র তথাকার পুলিশ ইনস্পেক্টর ছিলেন। একদিন শিশিরকুমারের সহধর্ম্মিনী, বসন্তবাবুর স্ত্রী ও বরদাবাবুর স্ত্রীর সহিত নানা বিষয়ের আলাপ করিতেছেন, এমন সময় বরদাবাবুর স্ত্রী শিশিরকুমারের সহধর্ম্মিনীকে বলিলেন,—“আপনার স্বামী যেরূপভাবে সংবাদপত্র লিখিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার জেল হওয়া অসম্ভব নয়। আপনি বোধ হয় সেজন্য সর্ব্বদাই ভয়ে থাকেন, শিশিরকুমারের স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, “ভয় কিসের? তিনি যদি জেলে যান, তাহা হইলে তাঁহার সহোদরগণ কাগজ চালাইতে পারিবেন। আর তাঁহারা সকলেই যদি জেলে যান, তাহা হইলে আমরা, মেয়েরা, তাঁহাদের জেল হইতে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত বাঙ্গালায় কাগজ চালাইব। কর্ত্তব্য কার্য্যে তাঁহারা কখনও বিচলিত নহেন, আমরাও নহি।” এ উক্তি যে শিশিরকুমারের সহধর্ম্মিনীরই উপযুক্ত তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

কুমুদিনী দেবী।

অষ্টম অধ্যায়

কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না, এ নিয়ম ভৌতিক জগতের ন্যায় আধ্যাত্মিক জগতেও লক্ষিত হয়। শিশিরকুমারের সহোদর হীরালাল আত্মহত্যা করেন; সেই হইতেই শিশিরকুমার প্রেতাত্মবাদ (spiritualism) অনুশীলনে প্রণোদিত হন, একথা আমরা এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহরে সফলতার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। ভ্রাতৃবিয়োগ জনিত হৃদয়ের নিদারুণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াই তিনি পরলোকতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একান্তমনে প্রেতাত্মবাদ আলোচনার ফলে তিনি যখন পরলোকগত সহোদরের আত্মার সহিত কথোপকথনে কৃতকার্য্য হইলেন, তখন তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না; তাঁহার জননী ও সহোদর সহোদরাগণের হৃদয়ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু নিজ পরিবারের মধ্যেই এই মহাতত্ব প্রচারে তিনি তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। সেই তত্ত্ব সাধারণে প্রচার করিয়া শোক তাপ দগ্ধ হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণ করিবার জন্য শিশিরকুমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

প্রেতাত্মবাদ শিক্ষার জন্য শিশিরকুমার আমেরিকায় গমন করিবেন স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে স্বনামধন্য স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় তিনি বাটীতে বসিয়াই প্রেতাত্মবাদ শিক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রেতাত্মার আমন্ত্রণ জন্য তিনি তাঁহার জননী, ভ্রাতা ও ভগিনীগণের সহিত চক্র (circle) করিয়া বসিতেন। তাঁহাদের এই চক্রে, বাহিরের কোনও লোক থাকিত না। গৃহের এক নির্জ্জন কক্ষে তাঁহারা একটী গোলাকার টেবিলের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়া, পরস্পর পরস্পরের হস্তধারণ করিয়া, একান্ত মনে সমস্বরে ঈশ্বরের স্তুতিগানে নিযুক্ত হইতেন। বিশেষ একাগ্রতার সহিত চক্র করিয়া বসিলেও, প্রথম দুইদিন তাঁহারা কোনও আত্মার আবির্ভাব লক্ষ্য

করেন নাই। ইহাতে শিশিরকুমার একটু চিন্তিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "প্রাণের ভাই হীরালাল ব্যতীত জীবণ ধারণ অসম্ভব। ইচ্ছামত যদি হীরালালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারি, তাহা হইলে আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিব।" যে মৃত্যু প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মানব জীবনকে শান্তিহীন করিয়া তুলে, সেই মৃত্যুকে জয় করিবার অভিপ্রায়ে, শিশিরকুমার প্রেতাত্মবাদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আশায় নিরাশ হইলে হৃদয় স্বভাবতঃ উৎসাহশূন্য ও ব্যথিত হয়। প্রথম দুই দিবস চক্র করিয়া বসিয়া শিশিরকুমার ও তাঁহার সহোদরগণ যখন তাঁহাদের মধ্যে কোন আত্মাকে আনয়ন করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা চিন্তিত ও বিশেষ ভাবে দুঃখিত হইয়া পড়িলেন। তৃতীয় দিবস স্তুতিগানের সময় শিশিরকুমারের এক সহোদরের শারীরিক ও মানসিক ভাবে একটা অস্বাভাবিকতা লক্ষিত হইল। প্রথমে তিনি হস্ত দ্বারা টেবিলে আঘাত করিতে ও শেষে কাঁপিতে ও কাঁদিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা যেন কিছু ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শিশিরকুমার তাড়াতাড়ি একটী পেন্‌সিল লইয়া তাঁহার সহোদরের অঙ্গুলির মধ্যে দিলেন, এবং একখানি কাগজ তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন।

শিশিরকুমারের আবিষ্ট ভ্রাতা লিখিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, কেবল দাগ টানিয়া কতকগুলি কাগজ নষ্ট করিলেন। কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হন নাই। এই তৃতীয় দিবসের ফলাফল লক্ষ্য করিয়া শিশিরকুমার আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহার চেষ্টা যে নিষ্ফল হইবে না, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন।

চতুর্থ দিবস সন্ধ্যায় অব্যবহিত পরেই শিশিরকুমার ভ্রাতা ভগিনী-গণের সহিত চক্র করিয়া বসিলে, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সহোদরের শরীরে প্রেতাত্মার আর্বিভাব লক্ষিত হইল। সম্পূর্ণ জ্ঞানলোপ না হইলেও তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। তাঁহার হস্তে একটী পেন্‌সিল দেওয়া

হইলে তিনি কাগজের উপর তাঁহার পরলোকগত সহোদর হীরালালের নাম লিখিলেন হীরালালের নাম দেখিয়া শিশিরকুমার বুঝিলেন যে, হীরালালের আত্মাই তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে। আনন্দে শিশিরকুমার, তাঁহরে জননী ও ভ্রাতা ভগিনীগণের নয়নে প্রবাহিত হইল। তখন মিডিয়ম (Medium) ধীরে ধীরে স্বহস্তে তাঁহার জননী ও সহোদর সহোদরাগণের অশ্রু মুছাইয়া দিয়া, আবেগভরে সকলকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

পারিবারিক চক্রে পরলোকগত সহোদর হীরালালের আত্মার আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়া শিশিরকুমার পরলোকতত্ত্বে বিশ্বাসবান্ হইয়াছিলেন। জন্মান্তরে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। তিনি বলিতেন যে, মৃত্যুর পর মানব ইহজগতের ন্যায় পর জগতেও বর্ত্তমানে থাকিয়া আপন আপন কার্য্যানুরূপ ফলভোগ করিয়া থাকে। চক্র করিয়া বসিলে শিশিরকুমারের মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমারের ও শ্রীযুক্ত মতিবাবুর শরীরেই অধিকাংশ সময় প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইত। চতুর্থ দিনের চক্রে হীরালালের আত্মা আবির্ভূত হইয়া তাঁহার নিজের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম,—

"আমি এখন যেখানে অবস্থান করিতেছি, তাহা জড়জগৎ অপেক্ষা সহস্র গুণে মনোরম। এখানে আসিলেও ভগবান কিম্বা তাঁহার অনুগৃহীত কোনও আত্মার সহিত এখনও আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। এখানে নাস্তিক আত্মার অভাব নাই; তাহারা এখনও ভগবানের অস্তিত্ব বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই। কোন মানবের শরীর আশ্রয় না করিলে আমি স্থূল জগত দেখিতে পাই না।"

শিশিরকুমারের পারিবারিক চক্রে হীরালালের প্রেতাত্মা ব্যতীত ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের পরিচিত, ও অপরিচিত বহু উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর আত্মারও আবিভাব হইতে লাগিল। এই সকল প্রেতাত্মার মধ্যে কেহ কেহ মিডিয়াম দ্বারা জানাইলেন যে, "জীব আপন আপন কার্য্যানুসারে ফলভোগ করিয়া থাকে। শরীরে কোনও ব্যাধি আশ্রয়

গ্রহণ করিলে যেমন কষ্টের সীমা থাকে না, সেইরূপ পাপানুষ্ঠান করিলে আত্মারও দুঃখ কষ্ট ও অশান্তির সীমা থাকে না। নরক যন্ত্রণা করিব কল্পনা নহে; মরজগতে মানব ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক কলুষিত জীবন যাপন করিলে পরজগতে যে তাহার আত্মাকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আবার তাহারা পাপাকার্য্য করিয়া অনুতপ্ত না হইয়া বরং অহঙ্কার করে এবং তাহাদের কার্য্যের জন্য ভগবানকে নিন্দা করিয়া থাকে, তাহাদের যে কিরূপ শোচনীয় অবস্থা হয়, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।"

মৃত্যুর পর মানবের আত্মা পরজগতে বর্ত্তমান থাকে, সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার রায়বাহাদুর দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ও স্বচক্ষে একটী ঘটনা দেখিয়া একথায় বিশ্বাস করিয়াছিলেন। সে ঘটনাটি এই, রায়-বাহাদুরের গ্রামের একটী বয়স্ক ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুনরায় দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের একটী বিধবা কন্যা ছিলেন, তিনি বয়সে তাঁহার বিমাতা অপেক্ষা বড় ছিলেন। একদিন অপরাহ্নে কন্যা বিমাতার কেশ বিন্যাস করিতে করিতে হঠাৎ 'সতীন খাবো, সতীন খাবো,' বলিয়া ভীষণ চীৎকার করিয়া তাঁহার বিমাতার গণ্ডদেশে দংশন করিলেন। দংশন যন্ত্রণায় বিমাতা অস্থির হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার স্ত্রীর সহায়তায় অগ্রসর হইলে, কন্যা বিমাতাকে ছাড়িয়া দিয়া, অতি তীব্র ভাষায় পিতাকে বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় দায় পরিগ্রহ করিবার জন্য তিরস্কার করিতে লাগিলেন। লোকের বিশ্বাস, এই বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার শরীরে তাঁহার গর্ভধারিণীর আত্মা আবির্ভূত হইয়াই স্বামীর ও সপত্নীর প্রতি উক্তরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

প্রেতাত্মাবাদ আলোচনা দ্বারা শিশিরকুমার যখন প্রেতাত্মার সহিত কথোপকথনে কৃতকার্য হইলেন, তখন তিনি আনন্দের সহিত এই সংবাদ সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ৺আনন্দমোহন বসু ও নিজের কনিষ্ঠ ভগিনীপতি স্বর্গীয় কিশোরীলাল সরকারকে জানাইলেন। তাঁহারা

সাধারণের নিকট প্রচারার্থ এই সংবাদ অবিলম্বে ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস সংবাদপত্রে লিখিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাদের পত্র প্রকাশিত হইলে দেশে একটা মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। প্রেতাত্মাবাদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া ক্রমে শিশিরকুমারের নিকট এত-পত্র আসিতে লাগিল যে, তাঁহার পক্ষে যথা সময়ে সকল পত্রের উত্তর দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। সংবাদপত্রেও প্রেতাত্মাবাদ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ চক্র করিয়া বসিয়া প্রেততত্ত্ব আলোচনায় মনোনিবেশ করিলেন। চক্রে উচ্চ ও নীচ উভয় শ্রেণীর প্রেতাত্মার আর্বিভাব লক্ষিত হইত। কৃষ্ণ-নগরে কতকগুলি যুবক কৌতুহল পরবশ হইয়া প্রেততত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের চক্রে কেবল নীচ শ্রেণীর প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইত। যুবকগণ কারণ অনুসন্ধান জন্য শিশিরকুমারকে পত্র লিখিয়াছিলেন। শিশিরকুমার নিজ পারিবারিক চক্রে আবির্ভূত প্রেতাত্মাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে এই উত্তর পাইয়াছিলেন—"আম-গাছ ও তেঁতুলগাছ একই মাটী হইতে রসগ্রহণ করে, কিন্তু আম সুমিষ্ট ও তেঁতুল টক কেন,"—শিশিরকুমার ইহার অর্থ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রেতাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর হইল—"কৃষ্ণনগরের যুবকগণ কেবল কৌতুক করিবার জন্য চক্র রচনা করিয়া থাকে, সেই জন্য সেখানে কেবল নীচশ্রেণীর প্রেতাত্মার আর্বিভাব হয়। উচ্চ শ্রেণীর আত্মার সহিত কথোপকথন করিতে হইলে যুবকগণকে ধীর, স্থির ও প্রার্থনাপরায়ণ হইতে হইবে।" শিশিরকুমার ও তাঁহার সহোদর সহোদরাগণ পবিত্রভাবে চক্র করিয়া বসিতেন বলিয়াই তাঁহাদের চক্রে উচ্চ শ্রেণীর প্রেতাত্মা আর্বিভূত হইতেন, নীচ শ্রেণীর প্রেতাত্মার আবির্ভাব অতি অল্পই লক্ষিত হইত।

স্বীয় পরিবারিক চক্র ব্যতীত শিশিরকুমার অন্য কোন চক্রে বড় যোগদান করিতেন না। কেবল যশোহরে একবার একটি চক্রে তিনি উপস্থিত ছিলেন। যশোহরে একদিন সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু

মিত্র, পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রাপ্তাবসর সব্‌জজ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও শিশিরকুমার চক্র করিয়া বসিয়াছিলেন। দীনবন্ধুর শরীরে প্রেতাত্মার আবির্ভাব লক্ষিত হইল। প্রথমে তিনি টেবিলে আঘাত করিতে লাগিলেন, শেষে যেন কিছু লিখিবার চেষ্টা করিলেন। সভ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, "দীনবন্ধু দেখিতেছি, চালাকি করিতেছে।" শিশিরকুমার তাঁহাদিগকে মৃদু তিরস্কার করিয়া, মিডিয়মের হস্তে একটি পেন্সিল দিলেন ও তাঁহার সম্মুখে একখণ্ড কাগজ রাখিলেন। প্রথমে অকৃতকার্য্য হইলেও, মিডিয়ম শেষে লিখিলেন, "কুরন সরকার।" সভ্যগণের মধ্যে কেহই এই লেখার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। দীনবন্ধু চৈতন্য লাভ করিয়া লেখা দেখিয়া বলিলেন, "কুরন সরকার আমাদের গোমস্তা ছিলেন, দীর্ঘকাল পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।" চক্রে বসিবার সময় কুরন সরকারের কথা তাঁহার মনে আদৌ উদয় হয় নাই। অন্য একদিনের চক্রে গিরিচন্দ্রের শরীরে প্রেতাত্মার আর্বিভাব হইয়াছিল। তাঁহার হস্তে পেন্সিল ও সম্মুখে কতকগুলি কাগজ দেওয়া হইল। প্রথমে দাগ টানিয়া কতকগুলি কাগজ নষ্ট করিয়া শেষে তিনি মিল্টনের নাম লিখিলেন। মহাকবিই মিল্টনের নাম দেখিয়া সভ্যগণ বিস্মৃত হইলেন। তাঁহারা মিডিয়মকে একটি লাটিন কবিতা লিখিতে অনুরোধ করিলে, পাঁচ ঘণ্টাকাল চেষ্টার পর মিডিয়ম লাটিন ভাষায় একটি অসম্পূর্ণ কবিতা লিখিলেন। গিরিশচন্দ্র ও অন্যান্য সভ্যের মধ্যে কেহই লটিন জানিতেন না, সুতরাং মিডিয়ম যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় বিভাগীয় স্কুল ইন্‌স্পেক্টর সুপণ্ডিত মিষ্টার ক্লার্ক বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থ যশোহরে উপস্থিত হন। তাঁহাকে চক্রের কথা কিছু না বলিয়া, কাগজখানি দেখানো হইয়াছিল, তিনি তাহা পাঠ করিয়া বলেন ইহা একটি অসম্পূর্ণ লাটিন কবিতা, কিন্তু ইহাতে অনেক ভুল রহিয়াছে। গিরিশ-চন্দ্রের শরীরে পাঁচ ঘণ্টাকাল প্রেতাত্মার আর্বিভাব ছিল; আরও

দীর্ঘকাল থাকিলে পাছে মিডিয়মের কষ্ট হয়, সেজন্য পাঁচ ঘণ্টা পরে চক্র ভঙ্গ করিতে হইয়াছিল। আরও কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিলে হয়ত কবিতাটী নির্দ্দোষভাবে লিখিত হইত।

হেমন্তকুমার ও মতিবাবুর ন্যায়, শিশিরকুমারের তৃতীয় পুত্র পয়যকান্তি ও কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুহাসনয়না ও মিডিয়মের শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ কোমল স্বভাব বিশিষ্ট লোকেরাই ভাল মিডিয়ব হইতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ রিভিউ অব রিভিউজের সুযোগ্য সম্পাদক স্বর্গীয় ডবলিউ, টি, স্টেড্ (W. T. Stead) মহোদয় শিশিরকুমারের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি শিশির-কুমাবকে মিডিয়ম করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। শিশিরকুমাব যখন তাঁহার পুত্র কন্যাগণকে লইয়া চক্র করিয়া বসিতেন, তখন তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা শীঘ্রই আবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। চক্র কবিয়া বসিয়া শিশিরকুমার মিডিয়মকে যে সকল প্রশ্ন করিতেন এবং তাহার যে উত্তর পাইতেন, তাহা তিনি লিখিয়া রাখিতেন। আমরা নিম্নে তিনটী চক্রের প্রশ্নোত্তর উদ্ধৃত করিলাম। এই তিনটী চক্রেই শ্রীমতী সুহাসনয়না মিডিয়ম ছিলেন। শিশিরকুমারের ভাষাই আমরা যথাযথ উদ্ধৃত করিয়াছি, কেবল দুই এক স্থানে আবশ্যক মত দুই একটি শব্দ সংযোগ করিয়াছি।

১

এই চক্রে শিশিরকুমারের পিতার প্রেতাত্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

প্রশ্ন। তুমি কে?

প্রথমে কোনও উত্তর নাই। পরে মিডিয়ম কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন। শেষে অতি গম্ভীর স্বরে উত্তর—আমি তোমার বাবা।

আমি তোমায় সাবধান করিতে আসিয়াছি, কারণ তোমায় শীঘ্র আসিতে হইবে। অতএব ধর্ম্মে মতি দাও।

প্রঃ। ধর্ম্মে মতি কিরূপে দিব ?

উঃ। সংসার ছাড়।

প্রঃ। আমি কি বৃন্দাবন যাইব,

উঃ। তা নয়, গৌরাঙ্গের চরণে আত্মসমর্পণ করে দিবানিশি পাদপদ্ম সেবা কর।

প্রঃ। বাবা, আমি ভাবিতাম মরিয়া তোমার চরণ ধরিয়া তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করিব, কারণ তোমাকে কত তাচ্ছিল্য করিয়াছি।

উঃ। আমার ক্ষমা না চাহিয়া তাঁহাকে (ভগবানকে) ডাকো। তোমার মা দশ বৎসর কি কঠোর সাধন ভজনা করেছেন তা কি তুমি জান না ? তুমি সেখানে এখানে উভয় স্থানে ধন্য হও। আমি যাই। এই মিডিয়ম আমাকে সহ্য করিতে পারিতেছে না। তুমি কাঁদিতেছ কেন ? কাঁদিয়া আমাকে দুঃখ দিতেছ, ইহা স্বার্থপরতা। কাঁদিবার কারণ কি ? সব পাবে, সুখময়।

প্রঃ। আপনি কি দাদাদের সঙ্গে আছেন ?

উঃ। আমি আর তোমার মা একত্রে আছি। একত্রে আর ভিন্ন কি, বলিতে গেলে সকলে একত্রে আছি। আমি যাই, আর থাকিতে পারিতেছি না।

২

এই চক্রে শিশিরকুমারের দ্বিতীয় পত্নী কুমুদিনীর প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয়।

প্রঃ। আমি কবে মরিব ?

উঃ। আমি সে সব জানি না। ভগবান ইহা জানিতে দেন না। তিনি (বাবা) যে শীঘ্র বলিয়াছেন, তাহার মানে দু বৎসর হইতে পারে,

চারি বৎসর হইতে পারে। তিনি যখন এলেন, তখন চারি পাশে আমরা দাঁড়াইয়াছিলাম।

প্রঃ। এস আমোদ করি। তুমি আর তোমার দিদি ইহার মধ্যে ভাল কে?

উঃ। দিদি ভাল।

প্রঃ। তা ত তুমি বলবেই। তোমার দিদি কবে সাধন ভজন করল? তুমি কত সাধন ভজন করিয়াছ।

উঃ দিদি আজ ৪০ বৎসর সাধন ভজন করিতেছেন। তুমি ভাব যে তিনি এতদিন চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন? আর আমি যে সাধন ভজন করি সে প্রথমে, আমি তাহার পর পাষাণ হইয়াছিলাম।

(ক্রন্দন)

প্রঃ। কাঁদিতেছ কেন?

উঃ। একটা কথা মনে করিয়া কান্না আসিল। তোমাকে বলিয়া দুঃখ দিব না।

প্রঃ। এতদূর বলিলে ত, তবে বল।

উঃ। যেদিন আমি আসি, সেদিন বিকাল বেলা প্রাণ ছট ফট করিতে ছিল। ইচ্ছা ছিল, তোমাকে বুকে করিয়া হৃদয় জুড়াইয়া যাই।

প্রঃ। (কষ্ট প্রকাশ করিলাম)।

উঃ। তোমাকে বলিয়া অন্যায় করিলাম।

প্রঃ। ও সব কথা যাক্। এস আমোদ আহ্লাদ করি। এস হাসি। তুমি আর তোমার দিদি, ইহার মধ্যে কে বেশী রূপবতী?

উঃ। (হাস্য) তুমি বল দেখি, কাহাকে তুমি বেশী ভালবাস? (হাস্য) কাল দিদির অনেক কথা বলিবার বাকি ছিল। বলিতে পারে নাই বলিয়া দুঃখিত হইয়াছে। আমি অনেক বলিলাম যে তুমি যাও, তবু আমাকে জোর করিয়া পাঠাইয়াছিল। ছিদাম (১) তো পাগল হইয়াছে। সে রোজ আসিতে চায়।

প্রঃ। আসিতে দাও না কেন ?

উঃ। তাহার আসিতে আমাদের সম্পূর্ণ সাহায্য প্রয়োজন। ফুলিকে (২) আমি যত সহজে ইনফ্লুয়েন্স করিতে পারি, দিদি তাহা পারেন না, কারণ সে আমার মেয়ে। আমি ওখানে ভাবিতাম যে, তুমি আমার স্বামী অতএব আমার সামগ্রী ; তাহাতেই তোমাকে তাচ্ছিল্য করিয়াছি। মনে আসিলেও মুখে করিতাম না। ভাবিতাম জোর আমার। হরিমোহনকে (৩) দেখিও। তাহার বড় অবনতি হইয়াছে। তুমি না পার, তোমার তুই ছেলেকে বলিও।

প্রঃ। তাহারা আমার কথা শুনে না।

উঃ। শেষকালে আমি বড় কষ্ট পাইয়াছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতাম যে, ভগবান ছয় মাস আমাকে স্বাস্থ্য দেও, আমি একবার স্বামী সেবা করিব।

(এইখানে আরও অনেক কথা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা লেখা হয় নাই)

* * * * *

প্রঃ। আবার কান্না কাটনা' আরম্ভ করিলে ?

উঃ। না। আমি না লিখিয়া কেন কথা কহিতেছি, জান ? তুমি কৃপণ লোক। তোমার কাগজ খরচ হইবে না।

প্রঃ। কাল ভুবন (৪) আসিয়া যাহা লিখিল, তাহাতে বুঝিলাম যে, সে এখন আর বোকা নাই।

উঃ। চিরকালই বোকা থাকিবেন ? যে প্রাণ হইতে কথা বলে, তাহার কথায় বোকামি থাকিবে কেন ? আমি যাই। আমাদের অধিকক্ষণ থাকিবার নিয়ম নহে।

---

(১) ছিদাম—শিশিরকুমারের একটি পুত্র ; অতি শৈশবেই মৃত্যু হয়।

(২) ফুলি (মিডিয়ম)—শিশিরকুমারের কনিষ্ঠা কন্যা সুহাস নয়নার ডাক নাম।

(৩) হরিমোহন—শিশিরকুমারে শ্যালক।

(৪) ভুবন—শিশিরকুমারের প্রথমা স্ত্রী ভুবনমোহিনী।

প্রঃ। তোমার কি অধিকক্ষণ থাকিতে কষ্ট হয় ?

উঃ। ঠিক তা নয়। ভগবান কৃপা করিয়া এরূপ কথা কহিতে সুবিধা দিয়াছেন ; আমাদের উচিত নহে যে বহুক্ষণ এইরূপ করি ?

মিডিয়মের চৈতন্য হইবার অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার শরীরে এক দুশ্চরিত্রা কুলি রমণীর প্রেতাত্মার আবির্ভাব লক্ষিত হইল। মিডিয়ম লাফাইয়া উঠিয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা কহিতে লাগিল। শিশির-কুমার তাঁহার কন্যার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিলে, মিডিয়ম তাঁহাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করিয়াছিল। অনেক চেষ্টার পর মিডিয়মের চৈতন্য হইয়াছিল।

৩

এই চক্রেও শিশিরকুমারের দ্বিতীয়া পত্নী কুমুদিনীর প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয়।

প্রঃ। অত ভয় কর কেন ? আমরা থাকিতে ভয় ?

উঃ। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একটা পতিতা স্ত্রীলোক কয়েকদিন আসিবার চেষ্টা করিতেছিল। আমরা আসিতে দিই নাই। সেদিন হঠাৎ প্রবেশ করিয়া ফেলিল, আমরা তখনই তাহাকে তাড়াইতাম, কিন্তু একটু সময় লাগে।

প্রঃ। কেমন করে তাড়ালে ?

উঃ। আমরা রুক্ষভাবে চাহিলাম, তাহাতেই সহ্য করিতে পারিল না। সে মাগী একটা চা-বাগানের মেয়ে কুলি। তাহার চরিত্র মন্দ হয়। তাহার স্বামীকে বিষ খাওয়াইয়া মারে। তাহার অবস্থা দেখিলে ভয়ও হয়, দুঃখও হয়।

প্রঃ। তাহাকে ভাল উপদেশ দাও না কেন ?

উঃ। কদিন দিয়াছি, তা সে কাণে করে না। শুন, তোমাদের মধ্যে ঝগড়া, দ্বেষ, হিংসা আছে। যে সব লোক কুইচ্ছা পৃথিবী হইতে লইয়া আসে, তাহা সহজে অতিক্রম করিতে পারে না। কাজেই যে

মন্দ কাজ করে, সে মন্দ লোক অনেকদিন থাকে। তাহার মন্দ অভ্যাস সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে। আমি এক কথা তোমাদের বলিয়া রাখি একথা তুমি সকলকে বলিও। ওখানে যাহা এক বৎসরে হয়, এখানে তাহা কুড়ি বৎসর লাগিবে।

প্রঃ। তোমার দিদিকে আসিতে দিলে না কেন?

উঃ। তিনি কাছে দাঁড়াইয়া।

প্রঃ। তোমার দিদির সহিত ঝাগড়া বাঁধাইয়া দিব দেখিবে?

উঃ। কখনও নয়। অসম্ভব। তিনি যে কত ভাল তাহা তুমি অনুভব করিতে পার না। তিনি ৪০ বৎসর তোমার পথ চাহিয়া আছেন।

প্রঃ। তোমরা মেয়ে মানুষ হইয়া পেত্নীকে তাড়াইলে কি করিয়া?

উঃ। এখানে মেয়ে মানুষ পুরুষ বিভিন্ন নাই। যে যত ভাল, তাহার তত শক্তি। আমি পরম ভাগ্যবতী তোমাকে পাইয়াছিলাম।

প্রঃ। আমাকে না পাও, কেদার হালদারকে পাইতে।

উঃ। (হাস্য) কেদার হালদার নয়, নামটা ভুলিয়া গিয়াছি।

প্রঃ। ওখানকার সমুদয় কথা বল।

উঃ। তুমি প্রশ্ন কর, আমি বলিতেছি।

প্রঃ। তোমরা কিরূপে দিন কাটাও?

উঃ। হাসি, কাঁদি, গল্প করি, বেড়াই, ঘুমোই।

প্রঃ। তোমরা কি ঘুমাও?

উঃ। ঠিক ঘুম নয়, একরূপ বিশ্রাম করি।

প্রঃ। দাদাদের সংগে কি দেখা হয়?

উঃ। সর্ব্বদা দেখা হয়, কিন্তু দিদির সংগে চব্বিশ ঘণ্টা একত্রে থাকি।

প্রঃ। আমার মনে হয়েছে। তাহার নাম চণ্ডী হালদার।

উঃ। (উচ্চ হাস্য) ঠিক।

প্রঃ। তুমি কি এখন ফুলিকে খুব কায়দা করিয়াছ ?

উঃ। সম্পূর্ণরূপে।

প্রঃ। সে পেত্নীটা এসেছিল কেন ?

উঃ। বাঁদরামি করিতে।

প্রঃ। তুমি কি ফুলিকে ঠিক কায়দা করিয়াছ ?

উঃ। হাঁ করিয়াছি।

প্রঃ। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তাহা উত্তর করিতে পারিবে ?

উঃ। হাঁ পারিব।

প্রঃ। যা ফুলি না জানে।

উঃ। হাঁ পারিব।

প্রঃ। তুমি এমন কথা বল, যাহা ফুলি না জানে।

উঃ। দেখ, বোটে যাওয়ার কথা, হাঁসখালিতে থাকার কথা, ইহা তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, জিজ্ঞাসা কর।

প্রঃ। বোটে তোমরা কে কে গিয়াছিলে ?

উঃ। তুমি, আমি, পীযূষ, পাঁড়ে, রাখালের মা। এই দেখ পাঁড়ে ও রাখালের মায়ের কথা ফুলি কিছুই জানে না।

(প্রকৃত কথা পাঁড়ে, চণ্ডী হালদার ও রাখলের মায়ের কথা মিডিয়ম কিছুই জানিতেন না। শিশিরকুমারের সহিত বিবাহের পূর্ব্বে চণ্ডী হালদারের সহিত কুমুদিনীর বিবাহের কথা হইয়াছিল, সেইজন্য শিশিরকুমার রহস্য করিয়া চণ্ডী হালদারের নাম করিয়াছিলেন।)

শিশিরকুমার প্রেতাত্মবাদ আলোচনা করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। এদেশে প্রেততত্ত্ব প্রচারে তিনি সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক আবর্ত্তে পতিত হইয়া প্রথমে তিনি ও তাঁহার সহোদরগণ প্রচার কার্য্যে আপন আপন শক্তি সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করিবার অবসর পান নাই। তবে তাঁহারা যে একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন, তাহাও নহে।

যাহা হউক, রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া

শিশিরকুমার প্রেততত্ত্ব প্রচারে পুনরায় বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন। তাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রেতাত্ত্ববাদ আলোচনার সুবিধা হয়, সেইজন্য তিনি "হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন" (Hindu Spiritual Magazine) নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন। এইরূপ পত্রিকা প্রকাশ করিলে দেশবাসিগণ তাহা সাদরে গ্রহণ করিবে কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া শিশিরকুমার মহারাজা বাহাদুর স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়কে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। মহারাজা বাহাদুর শিশিরকুমারকে ভাল রূপ জানিতেন। তিনি শিশিরকুমারকে প্রত্যুত্তরে জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত পত্রিকা প্রকাশিত হইলে দেশের একটি অভাব দূর হইবে এবং দেশবাসিগণ তাহা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিবে। চিঠিতে তিনি শিশিরকুমারের বিদ্যা, বুদ্ধি ও কার্য্য দক্ষতার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে মহারাজের চিঠিখানি উদ্ধৃত করিলাম—

My dear Shishir Babu,

I have read with great interest the cutting you have enclosed. I should indeed be only too glad to have the opportunity of expressing myself what I think of the all important work about to be set on foot and about the unquestionably competent hand which is to undertake the same.

The "Hindu Spiritul Magazine" will certainly meet a want that has long been sadly felt, and will, I am sure, be hailed with joy by everyone who feels a craving for occult knowledge and spiritual research. I can hardly think of any other Hindu gentleman so well qualified as yourself to edit a

magazine of the kind. Knowing you as I do to be a man of exceptional intelligence and of a highly cultured mind, with rare originality of conceptions which belong to a man of genius, as also with what energy and earnestness you have devoted your life to the study and dissemination of spritual knowledge, I have every reason to hope that your project will be attended with success. True it is that you are widely known as a political character, that is by reason of your long connection with the 'Amrita Bazar Patrika', but the author of so many religious works, breathing deeply of devotional feelings and high spirituality, should be even more widely known in connection with spiritual culture.

The importance of such a magazine can never be over estimated. It has been very aptly said by that great statesman Gladstone, that psychical research is the greatest and the most important subject that can engage the attention of man. I know too with what energy and singlenees of purpose you work when you take a matter in hand. Moreover the work of the proposed 'Magazine' will be a labour of love with you, into which you are sure to put your whole heart ; and with the stock of your personal experinces in the psychic line, the magazine will not fail to command all the elements of succes. Besides, such a periodical, the only one of its kind in our country,

will be a suitable vehicle to convey to the public in a collected form the research and experiences of others who are given to labour in the field of psychic research.

Yours sincerely
(sd.) Jotendra Mohan Tagore

শিশিরকুমারকে সম্পাদকতায় ১৯০৬ খ্রীঃ অঃ মার্চ্চ মাসে হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনের" প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রেতাত্মবাদ আমাদের দেশে নূতন না হইলেও, আলোচনার অভাবে ইহা ক্রমে দেশবাসিগণের নিকট নূতন হইয়া উঠিয়াছিল। শিশিরকুমার উদ্যোগী হইয়াছিলেন বলিয়াই যে প্রেততত্ত্ব ভারতবর্ষে পুনঃ প্রচারিত হইয়াছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার পত্রিকা প্রকাশিত হইলে এদেশীয় ও বিদেশীয়গণ ও তাহা অতি সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। লুপ্তপ্রায় তত্ত্বের পুনরালোচনায় এদেশবাসীগণ ক্রমে ক্রমে মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন। ইহা পাঠ করিয়া এডুকেশনিষ্ঠ, পাঞ্জাবী, স্টেটস্-ম্যান, কাটিহার টাইমস্, করাচী ক্রনিকল, পাওয়ার এণ্ড গার্জ্জেন, সিটিজেন, হিন্দু লাইট, মাইশোর স্টাণ্ডার্ড, বেহার হেরাল্ড, মাদ্রাজ মেইল, টাইম্স অব আসাম, রিভিউ অব রিভিউজ, ইণ্ডিয়ান নেশন প্রভৃতি বহুদেশীয় ও বিদেশীয় সংবাদপত্র ইহার আবশ্যকতা এবং এরূপ পত্রিকা পরিচালনে শিশিরকুমারের যোগ্যতা সম্বন্ধে অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা এই সকল মত উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকের বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না।

আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থাগার ডাক্তার জে, এম, পিবলস্ এম এ, এম-ডি, পি এইচ ডি, (J. M. peebles M. A., M. D. Ph. D.) জগতের অধ্যাত্মবাদিগের অগ্রহী ছিলেন বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। তিনি "স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন" পাঠ করিয়া শিশিরকুমারকে শত মুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন।

শিশিরকুমারের পত্রিকায় তিনি মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পত্রিকার বৃদ্ধি গৌরব করিতেন। একবার তিনি শিশিরকুমারকে তাঁহার পত্রিকার প্রশংসা করিয়া যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, আমারা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

My Dear Brother,

Your last 'Hindu spiritual Megazine' reached me safely by the Oriental Mail. It is the last number upon the whole that you have yet issued, and its contents are interesting, instructive and very valuable. I read it with a great degree of pleasure.

I take the liberty of sending you an article or rather extracts from a lengthy lecture that I delivered at one of our great American camp meetings on a Sunday. I suppose there were nearly 2000 people present. The meeting was held in a very beautiful grove near some mineral springs with charming surrounding Scenery.

I have not yet given up the idea of coming to India late this autumn. My heart and soul often go to that land of Aryans, land of vedas, and those magnificient poems that taught a future immortal existence; and that further taught that happiness could be obtained in the world only through obedience to law, and the aspiration to be good, and pure, and spiritually minded.

Very Cordially yours,
(sd.) J. M. Peebles M. D.

Battle Creek

Mich, Sept 14

P. S. As signs and tokens now indicate, I shall reach India in December. I sail from London in about two weeks.

১৯০৭ খৃঃ অঃ ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে ডাক্তার পিবলস্ কলিকাতায় আগমন করেন। মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের আমন্ত্রণে তিনি তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া টেগোর কাসেলে (Tagar Castle) অবস্থান করিয়াছিলেন। ডাক্তার পিবলস্ মহারাজা বাহাদুরের প্রসাদের হলে প্রেতাত্মবাদ সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমেরিকা ও ইউরোপে সুপরিচিত হইলেও, ভারতবর্ষে জনসাধারণের নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন না। মহারাজ-কুমার সার প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুর তাঁহার পিতার প্রতিনিধিরূপে একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিয়া সমবেত শ্রোতৃবর্গের নিকট ডাক্তার পিবল্‌সের পরিচয় প্রদান করেন। ডাক্তার পিবল্‌সের বক্তৃতা শিশিরকুমারকে প্রেতাত্মাবাদ প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল প্রেতাত্মবাদ আলোচনার ফলে শিশিরকুমার কলিকাতায় বহু ইংরাজ নরনারীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে মিষ্টার ও মিসেস আর্মিটেজের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রচার কার্য্যে তাঁহারা শিশিরকুমারকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। মিসেস আর্মিটেজ একজন শক্তিশালিনী মিডিয়ম ছিলেন। তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর যত্নে ও চেষ্টায় কলিকাতায় সাইকিক্যাল সোসাইটী (Psychical Society) নামে একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য মহারাজা বাহাদুরের প্রসাদে ডাক্তার পিবল্‌সের সভাপতিত্বে ১৯০৭ খৃঃ অঃ ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটীকার সময় এক সভার অধিবেশন হয়। প্রেতাত্মবাদ প্রচারই এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে লইয়া সমিতি গঠিত হইয়াছিল—

পৃষ্ঠপোষক—মহারাজা বাহাদুর সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কে, সি, এস্ আই।

প্রেসিডেন্ট—ডাক্তার জে, এম, পিবলস্।

ভাইস প্রেসিডেন্ট— { মিষ্টার জে, জি, মিউজেন্স ও বাবু শিশিরকুমার ঘোষ

সম্পাদক— { বাবু পীযূষকান্তি ঘোষ ও মিষ্টার সি, সি, অর্মিটেজ

ধনরক্ষক—মিষ্টার ডবলিউ, জে, মামফোর্ড।

সভ্যগণ—মিষ্টার ডবলিউ এবং ক্যারোল, ডাঃ মনিয়র এম বি, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, বাবু মতিলাল ঘোষ, মিষ্টার এন এন, ঘোষ, রায়বাহাদুর নিরঞ্জন মুখার্জ্জী, মিঃ জে মুখার্জ্জী, বাবু জয়চন্দ্র চৌধুরী, ডাঃ হেমচন্দ্র সেন, মিঃ জি ডুবার্ণ ও বাবু প্রেমতোষ বসু।

শিশিরকুমার যে শক্তি তাঁহার দেশবাসিগণের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্বর্গারোহনের পর হইতে যেন ক্রমশঃ হীন হইয়া পড়িতেছে। প্রেতাত্মাবাদ প্রচারে শিশিরকুমার যাহা করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিতে হয়। আমরা অতি সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে শিশিরকুমারের কার্য্যের কথা লিপিবদ্ধ করিলাম।

মোহিনী বিদ্যা (হিপ্‌নটিজম্) যে ভারতবর্ষেব অজ্ঞাত নহে, তাহা তন্ত্রগ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়। ফ্রান্সে প্রথমে মিষ্টার মেস্‌মার (Mr. Mesmer) মোহিনী বিদ্যা প্রচার করেন। তাঁহার নাম হইতেই মেসমেরিজম্ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আলোচনার অভাবে আমাদের দেশের বহু তত্ত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে। শিশিরকুমার মোহিনী বিদ্যার চর্চ্চায়ও মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু একদিনের ঘটনা হইতেই তিনি এই চর্চ্চায় বিরত হন। শিশির-কুমার তাঁহার এক ভগিনীকে মেস্‌মেরাইজ করিতেন। তাঁহার সেই

ভগিণী প্রথমে সামান্য নিদ্রানুভব করিয়া, শেষে গভীর নিদ্রায় অভিভূতা হইয়া পড়িতেন। কৌতূহল পরবশ হইয়া একদিন শিশির তাঁহার ভগিণীকে বহুক্ষণ ধরিয়া মেস্‌মেরাইজ করিয়াছিলেন। ভগিণী নিদ্রাভিভূতা হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি ঘুমাইয়াছ ?" প্রশ্নের কোন উত্তর হইল না। শিশিরকুমার উচ্চৈস্বরে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া যখন কোনও উত্তর পাইলেন না, তখন তিনি চিন্তিত হইলেন। শেষে তিনি ভগিণীর হাত ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে স্পন্দন নাই, ব্যস্ত হইয়া বুকে হাত দিয়া দেখিলেন তাহাও স্পন্দনহীন! শিশিরকুমার অধীর না হইয়া স্থিরভাবে ভগিণীর চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে শিশিরকুমার পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি ঘুমাইয়াছ,"

উত্তর। "আমি মরিয়াছি।"

প্রশ্ন। "মরিয়াছ! তুমি কি বলিতেছ" ?

উত্তর। "হাঁ, আমি মরিয়াছি। মৃত্যুর পর মানুষ যেখানে আসে আমি সেইখানে আসিয়াছি।"

শিশিরকুমার তাঁহার ভগিণীর উত্তর শুনিয়া ভীত হইলেন। তিনি তাঁহাকে মৃতদেহে প্রত্যাগমন করিতে বলিলে তাঁহার ভগিণী অস্বীকার করিয়া উত্তর করিলেন—"আমাকে ফিরিবার জন্য বলিতেছ কেন ? মৃত্যু মানব জীবনের একটা পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ পরিবর্ত্তন প্রার্থনীয়।"

ব্যথিত হৃদয়ে শিশিরকুমার বলিলেন—"তুমি যাহা বলিতেছ, সত্য হইতে পারে ; কিন্তু তুমি কি আমার অবস্থা বুঝিতে পারিতেছ না ? তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলে আমার হৃদয় যে ভাঙ্গিয়া যাইবে।"

উত্তর। "আমি যেখানে আসিয়াছি সেস্থান স্থূলজগৎ অপেক্ষা সহস্রগুণে মনোরম। আমি অতি সহজেই এখানে আসিয়াছি ; তুমি আমাকে ভালবাস, তবে কেন স্বার্থপরবশ হইয়া আমাকে পুনরায় দুঃখময় স্থানে টানিয়া লইয়া যাইতে চাও ?"

শিশিরকুমার উক্ত উত্তর শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং শেষে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে বলিলেন—"তুমি যদি ফিরিয়া না আইস, তাহা হইলে আমাকে হয়ত ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে।

এই কথা শুনিয়া শিশিরকুমারের ভগিণীর আত্মা তাঁহার শরীরে প্রত্যাগমন করিতে সম্মত হইলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া আরম্ভ হইল এবং শেষে তিনি চৈতন্য লাভ করিলেন। কাহারও কাহারও নিকট এইরূপ ঘটনা অলৌকিক বলিয়া অবজ্ঞাত হইবার আশঙ্কা থাকিলেও, আমরা ইহা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি। শিশিরকুমারের জীবন কথা সংগ্রহের জন্য আমরা তাঁহার এই ভগিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে অনেক কথার পর তিনি সজল নয়নে বলিয়াছিলেন—"আমার সেজদাদার কথা কি বলিব? তিনি আমাকে স্বর্গ দেখাইয়াছিলেন।"

অনেক সময় সাধুসন্ন্যাসিগণ দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির শরীরে হাত বুলাইয়া তাহাকে নিরাময় করিয়াছেন, এইরূপ দেখা গিয়াছে। একথার মূলে যে আদৌ সত্য নাই, তাহা নহে! শিশিরকুমার একবার আহারের অনিয়মে বিসূচিকা রোগগ্রস্ত হন। একথা তিনি পরিবার-বর্গের নধ্যে কাহাকেও বলেন নাই। তাঁহার দেহ ক্রমশঃই অবসন্ন হইতে লাগিল এবং শেষে নাড়ী ছাড়িয়া যাবার উপক্রম হইল। তখন তিনি মতিবাবুকে ডাকিয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য বলিলেন। শিশিরকুমার সহোদরের বুকে আশ্রয় লইয়া বলিলেন—"মতি, আমার কলেরা হয়েছে।" মতিবাবু শুনিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। শেষে তিনি একরূপ মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন, এবং সেই অবস্থায় ধীরে ধীরে শিশিরকুমারের পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রত্যেক হস্ত সঞ্চালনে শিশির-কুমার সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন এবং শীঘ্রই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর তিনি দেখিলেন যে তাঁহার শরীরে কোন গ্লানি নেই। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন। শিশিরকুমারের

বিশ্বাস যে, তাঁহার বিপদ দেখিয়া, তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য কোন উচ্চশ্রেণীর প্রেতাত্মা মতিবাবুর শরীরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

এই ঘটনা সম্বন্ধে শিশিরকুমার তাঁহার Hindu Spiritual Magazine-এ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল,—

'Here is a personal experience of mine, which, whenever I think of it, gives me a thrill. I had takes some indigestible food, and that made me sick. I committed auother outrage while suffering from acute diarrhoea; and this time found that I had brought upon myself cholera, the real disease.*** I felt that I was going to faint away from exhaustion, and the griping of the stomach.***My pulse was then sinking rapidly. My younger brother Matilal, who was with me sitting apart, had no idea of the danger which had overtaken me. I called him to my side, told him to sit behind my back, so that I could lean upon him. He did as he was bid; I told him with great difficulty that I had got chobra; and a strange thing happened immediately after. His hands and limbs began to shake, and he showed by other sings that he was beside himself. It seemed that he had been suddenly overtaken by convulsion. I was so surprised that I cound not utter a word, even to ask what the matter was with him. He however soon after regained some control over himself, and then he began to make passes on my back with his right hand. I then perceived that he was making mesmeric passes

and doing this while in an unconscious state himself. I had practised hypnatism but he had never done so. I realised then what the matter was. It was this ; I was in danger, and a good spirit was trying to nip my disease in the bud by these mesmeric passess. My brother was a good medium ; a good sprit possessed him, so that he became unconscious for the time being and was in that state while making the passes to cure me. Every pass of his was followed by relief,—immense relief. I felt as if by these passes my brother was infusing into me new life, nay, strength and ecstasy. A little before, I was going to faint from fatigue and divers sorts of uneasy sensations ; two minutes after, I felt strong, happy and disposed to go to sleep. I addresed, not my brother, but the spirit—Thanks, I am all right ; and then fell asleep under an uncontrollable influence, from which I awoke quite refreshed—a new man. I know that God and his angels take care of us."

পূণ্যভূমি ভারতবর্ষ যোগবিত্মার উৎপত্তি স্থান ; একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। এই যোগরহস্য আলোচনার জন্য ধর্ম্মপ্রাণা রুস মহিলা মাদাম ব্লাভাৎস্কি তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত আমেরিকা নিবাসী কর্ণেল অল্‌কট্‌কে সংগে লইয়া এদেশে আগমন করেন। ইংলণ্ড হইতে মিষ্টার উইন্‌ব্রিজ নামক জনৈক চিত্র শিল্পীও মিসেস বেটস্‌ নাম্নী জনৈকা ভদ্র মহিলা তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। মাদাম ব্লাভাৎস্কি প্রবর্ত্তিত যোগবিদ্যা প্রথমে আমেরিকায় প্রচারিত হইয়াছিল এবং এই বিদ্যা আলোচনার জন্য প্রথমে আমেরিকায় থিওজিফিক্যাল

সোসাইটী বা ব্রহ্মবিদ্যা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কর্ণেল অল্‌কট্‌ এই সমিতির প্রতিষ্ঠা ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ধর্ম্মক্ষেত্রে ভারতবর্ষের ধর্ম্মতত্ত্ব মনোনিবেশ সহকারে আলোচনা করিয়া অনেক সময় বহু বিদেশীকে আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টায় যত্নবান হইতে দেখা গিয়াছে। আলোচনার অভাবে আমাদের দেশের বহু তত্ত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে। মধুচক্র নির্ম্মাণ করিবার জন্য মক্ষিকাগণ যেমন নানা জাতীয় পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহে যত্নবান হইয়া থাকে, ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসিগণ সেইরূপ আপন আপন জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধিশালী করিবার জন্য সমগ্র জগতের বিভিন্ন জাতির জ্ঞানাম্বুধি মন্থন করিয়া সার সংগ্রহে যত্নবান হইয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে ভারত-বাসীর মধ্যে যে পরিমাণ ঔদাসীন্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা জগতের বোধ হয় অন্য কোনও স্থানের অধিবাসীদিগের মধ্যে লক্ষিত হয় না। বিদেশ হইতে নূতন কোন তথ্য সংগ্রহ করা ত দূরের কথা, ভারত-বাসিগণ কর্ম্মদোষে আপনাদিগের বহু অমূল্য রত্ন নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। রুস মহিলা মাদাম ব্লাভাৎস্কি যোগ-রহস্য আলোচনা করিতে করিতে যখন বুঝিতে পারিলেন যে, যোগবিদ্যার উৎপত্তি স্থান ভারতবর্ষে আগমন করিলে বহু নূতন তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন তখন তিনি তাঁহার অনুচরগণ সহ এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বোম্বাই যে আগমনের সংবাদ তত্রত্য একখানি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। শিশিরকুমার সংবাদ পত্রে মাদাম ও কর্ণেলের এদেশে আগমনের সংবাদ ও তাঁহাদের অলৌকিক ক্ষমতার কথা অবগত হইয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। শিশিরকুমার তাঁহাদের ভারতবর্ষে আগমণের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কর্ণেল অল্‌কট্‌কে পত্র লিখিলে, কর্ণেল পত্রোত্তরে জানাইয়াছিলেন তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা ও বিদ্যাদানের জন্যই এদেশে আগমন করিয়াছেন। শিশিরকুমার কর্ণেল অল্‌কট্‌কে পুনরায় পত্র লিখিলেন "বিদ্যা অর্থে আপনারা কি বুঝিয়া থাকেন"? উত্তরে কর্ণেল বিদ্রূপ করিয়া

লিখিলেন, "আপনি হিন্দু অথচ বিদ্যা কাহাকে বলে তাহা জানেন না ? জগতে কেবল একটী মাত্র শিক্ষণীয় বিদ্যা আছে ; সে বিদ্যার নাম যোগবিদ্যা"।

সাহেব যোগশিক্ষার জন্য ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন, এই কথা অবগত হইয়া শিশিরকুমার বিস্মিত হইয়াছিলেন। মাদাম ব্লাভাৎস্কি ও কর্ণেল অল্‌কটের এবং তাঁহাদের কার্য্যকলাপের বিশেষ বিবরণ অবগত হইবার জন্য শিশিরকুমারের প্রাণে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। তিনি কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া কর্ণেলকে পত্র লিখিলে কর্ণেল প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে, তিনি যদি বোম্বাইয়ে আসিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত সকল কথার আলোচনা হইতে পারে।

শিশিরকুমার বোম্বাইয়ে যাইবেন স্থির করিয়া কর্ণেলকে পত্র লিখিলেন। নির্দিষ্ট দিবসে তিনি বোম্বাইয়ে উপস্থিত হইলেন। কর্ণেল সাহেব তাঁহার জন্য রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। শিশির-কুমার কর্ণেল অল্‌কটকেই তাঁহাদের সম্প্রদায়ের নায়ক জানিতেন, কিন্তু উভয়ে স্টেশন হইতে বাড়ী যাইবার সময় কর্ণেল শিশিরকুমারকে বলিলেন, "আমাদের সম্প্রদায়ের কর্ত্রী মাদাম ব্লাভাৎস্কির প্রতি আপনি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিবেন।" শিশিরকুমার মাদামের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। শিশির-কুমার বোম্বাইয়ে মাদাম ও কর্ণেলের সহিত একত্রে তিন সপ্তাহকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি মিষ্টার উইন্‌ব্রিজ ও মিসেস্ বেট্‌সের সহিতও পরিচিত হইয়াছিলেন।

বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইয়া মাদাম ব্লাভাৎস্কি ও কর্ণেল অল্‌কট আমেরিকার ন্যায় এদেশেও একটি থিওজফিক্যাল সোসাইটী ('ব্রহ্মবিদ্যা সমিতি') প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমে তাঁহারা কাহারও সহানুভূতি লাভ করিতে পারেন নাই ; কেবল জনৈক পার্শী যুবক তাঁহাদের বক্তব্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। শিশিরকুমারও

তাঁহার ন্যায় দুই একজন শক্তিশালী পুরুষের যত্নে, চেষ্টায় ও সহায়তায় মাদাম ব্লাভাৎস্কি ভারতবর্ষে ব্রহ্মবিদ্যা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি, শিশিরকুমার তখন ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সনাতন হিন্দুধর্ম্মে আস্থাহীন হইয়া তিনি তাঁহার সহোদরগণের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও তিনি হৃদয়ে শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তিনি ব্যাকুল চিত্তে সত্যের অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। ক্ষেত্রে উত্তম-রূপ শস্য উৎপাদন করিবার জন্য কৃষক যেমন লাঙ্গল সংযোগে মৃত্তিকা কর্ষণ পূর্ব্বক সার দিয়া প্রথমে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে, শিশিরকুমারও সেইরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতির আশায়, ধর্ম্মবীজ বপন করিবার পূর্ব্বে, প্রেতাত্মবাদ দ্বারা স্বীয় হৃদয়ক্ষেত্র উত্তমরূপে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মে মানব মুক্তিলাভ করিতে পারে, একথায় শিশিরকুমারের আর সংশয় রহিল না। উদার হৃদয় কর্ণেল অল্‌কটের বালসুলভ সরলতায় শিশিরকুমার মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মাদাম ব্লাভাৎস্কির চরিত্রের বিশেষত্ব তিনি কখনও বিস্মিত, কখনও চমৎকৃত, কখনও মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। মাদাম ও কর্ণেলের চরিত্রগুণে শিশিরকুমার তাঁহাদের উভয়েরই প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বোম্বাই-বাসিগণের নিকট হইতে কোনরূপ সহানুভূতি ও সহায়তা পাইবেন না বুঝিতে পারিয়া কর্ণেল অল্‌কট তাঁহাদের ভারতবর্ষে আগমনের উদ্দেশ্য শিশিরকুমারের নিকট প্রকাশ করেন। শিশিরকুমার ও কর্ণেল অল্‌কটের মধ্যে এ সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহার সারাংশ লিপিবদ্ধ করিলাম—

কর্ণেল—যোগাভ্যাস দ্বারাই জগতে মহাত্মারা অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের মধ্যেই অধিক সংখ্যক মহাত্মা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মাদাম ব্লাভাৎস্কি যোগসিদ্ধা রমণী।

মহাত্মাদিগের নির্দ্দেশক্রমেই তিনি ভারতবর্ষে যোগবিদ্যা আলোচনার জন্য একটি সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করিয়াছেন।

শিশির—মহাত্মারা তাঁহাদের শক্তি প্রভাবে এমন কোন আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন, যাহা সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব ?

ক—নিশ্চয়ই পারেন। তাঁহারা তাঁহাদের শরীর পরিত্যাগ করিয়া কিংবা সশরীরেও, ইচ্ছামত নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে পারেন। ইচ্ছামত তাঁহারা লোক চক্ষুর সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইতেও পারেন।

শি—স্বচক্ষে না দেখিলে কিরূপে বিশ্বাস করিব ? আচ্ছা, আমাদের ভাগ্যে কি এই মহাত্মাদিগের দর্শন ঘটিতে পারে না ?

ক—আপনি যদি তাঁহাদের অনুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা হইলে আপনাকে তাঁহাদের কার্য্যে সহায়তা করিতে হইবে।

শি—তাঁহারা আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন বা নাহি করুন, আমি তাঁহাদের কার্য্যে যথাসাধ্য আত্মনিয়োগ করিতে প্রস্তুত আছি। আমি এই কয়েকদিন বোম্বাইয়ে অবস্থান করিতেছি, কিন্তু মাদাম এ পর্য্যন্ত আমাকে কোন অদ্ভূত ঘটনা প্রত্যক্ষ করান নাই।

ক—আপনি আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলে, মাদাম আপনাকে কিছুই দেখাইতে পারেন না।

শি—যদি তাহাই হয়, তবে আমাকে আজই দীক্ষিত করুন।

শিশিরকুমারের অভিপ্রায় অনুসারে কর্ণেল অল্‌কট তাঁহাকে মাদাম ব্লাভাৎস্কির নির্দ্দেশমত দীক্ষিত করিলেন। কর্ণেল শিশির-কুমারকে কতকগুলি উপদেশ প্রদান করিয়া কয়েকটি সাঙ্কেতিক শব্দ শিখাইয়া দিলেন।

শিশিরকুমার দশ টাকা দিয়া থিওজফিক্যাল সোসাইটির সভ্য হইলেন। ভারতবর্ষে তিনিই বোধ হয় এই সমিতির সর্ব্বপ্রথম সদস্য।*

*শিশিরকুমার লিখিয়াছেন—"I was, beliee, the first member of he Society"—Hindu spiritual Magazine, Vol III, PT II, P. 426.

শিশিরকুমাব ক্রমে ক্রমে বোম্বাইয়ে মালাবারি, মুরারজী, গোকুলদাস প্রভৃতি তাঁহার কয়েকজন বন্ধুকে মাদাম ব্লাভাৎস্কি ও কর্ণেল অল্‌কটের সহিত পবিচিত করিয়া দিলেন। তিনি বোম্বাই হইতে বঙ্গদেশে তাঁহার কতিপয় বন্ধুকে থিওজফিক্যাল সোসাইটি বা ব্রহ্মবিদ্যাসমিতির উন্নতিকল্পে অর্থসাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। কাশিমবাজারের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী, যশোহরের অন্তর্গত চাঁচড়ার রাজা বরদাকান্ত রায় প্রভৃতি বহু সহৃদয় ধনী ব্যক্তি সমিতিকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

শিশিরকুমার ভারতে থিওজফিক্যাল সোসাইটিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণ যত্নে কার্য্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু মাদাম ব্লাভাৎস্কি তাঁহাকে কোনও অদ্ভুত ঘটনা দেখাইলেন না। শিশিরকুমারের ধৈর্য্য যেন ক্রমশঃই হ্রাস হইতে লাগিল। তাঁহার ভাব লক্ষ্য করিয়া কর্ণেল অল্‌কট একদিন তাঁহার সমক্ষে মাদামকে বলিলেন,—"হিন্দুদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রথমে সোসাইটিতে যোগদান করিয়াছেন এবং তাহার উন্নতিকল্পে অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিতেছেন, তাঁহাকে এখনও কোন অলৌকিক ব্যাপার না দেখাইয়া আপনি অকৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

মাদাম নিরুত্তর, তিনি যেন কর্ণেলের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কিন্তু শিশিরকুমার ইহার পরেই কয়েকটী ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ঘটনা কয়টি নিম্নে বিবৃত হইল।

(১)

শিশিরকুমার যে বাংলোতে অবস্থান করিতেন, একদিন তাহার বারান্দায় শয়ন করিয়া তিনি কর্ণেল অল্‌কটে্‌র সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। কর্ণেল অনাবৃত দেহে শিশিরকুমারের ক্রোড়ে মস্তক রক্ষা করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। বাংলোটি রাস্তার উপরে; সম্মুখে

একটী প্রাচীর থাকিলেও রাস্তা হইতে লোকে উভয়কেই দেখিতে পাইত। মাদাম ব্লাভাৎস্কি এই সময় নিজের বাংলোতে অবস্থান করিতেছিলেন। শিশিরকুমার ও কর্ণেলের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময় মাদামের প্রিয় পরিচালক বাবুলা আসিয়া একখণ্ড কাগজ কর্ণেলের হস্তে প্রদান করিল। কাগজখানি পাঠ করিয়া কর্ণেল ব্যস্ত-ভাবে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় কোট পরিধান করিলেন। শিশিরকুমার ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কর্ণেল, মাদাম লিখিত কাগজখণ্ড তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। শিশিরকুমার তাহা পাঠ করিয়া দেখিলেন, তাহাতে লেখা রহিয়াছে,—"অনাবৃত দেহে সাধারণের সমক্ষে থাকিবার কারণ কি? আপনার কোট পরিধান করিয়া সভ্য হউন।" শিশিরকুমার বিস্মিত হইলেন। তাঁহার ভাব লক্ষ্য করিয়া কর্ণেল বলিলেন,—"এইরূপেই মাদাম তাঁহার অন্তরঙ্গ অনুচরগণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকেন। শিশির বাবু, আপনি মাদামের নিকট গিয়া এই ঘটনার কথা অনুসন্ধান করিতে পারেন।" মাদাম ব্লাভাৎস্কি অন্য এক বাংলোতে অবস্থান করিতেছিলেন। সেখান হইতে শিশির-কুমার ও কর্ণেলকে দর্শন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না; এরূপ অবস্থায় কর্ণেল যে অনাবৃত দেহে শয়ন করিয়াছিলেন, তাহা তিনি কিরূপে জানিতে পারিলেন, এই চিন্তায় শিশিরকুমার অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মাদাম ব্লাভাৎস্কির নিকট উপস্থিত হইয়া, সেই কাগজখানি তাঁহাকে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার এ আদেশের তাৎপর্য্য কি?

মাদাম। কর্ণেল যদি ভদ্রভাবে না থাকেন, তাহা হইলে এদেশের লোকেরা আমাদিগকে সম্মান করিবে কেন?

শিশির। কর্ণেল যে অনাবৃত দেহে আমার বাংলোতে শয়ন করিয়াছিলেন, তাহা আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন?

মাদাম। আপনাদের এই দেশেরই জনৈক মহাত্মার অনুগ্রহে জানিতে পারিলাম।

শিশির। তিনি কে ?

মাদাম। মহাপুরুষ ; আমাদের প্রভু।

শিশিরকুমার শুনিয়া বিস্মিত হইলেন।

(২)

শিশিরকুমার একদিন প্রাতে আট ঘটিকার সময় কর্ণেল অল্‌কট, মিষ্টার উইন্‌ব্রিজ ও মিসেস্ বেট্‌সের সহিত একত্রে আহার করিতেছেন, এমন সময় মধুর ঘণ্টাধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ঘরের ভিতরে অন্য কেহ ছিল না, অথচ ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে লক্ষ্য করিয়া শিশিরকুমার বিস্মিত হইলেন। তিনি কর্ণেলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিসের শব্দ ?

কর্ণেল মৃদু হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন—ঘণ্টাধ্বনি।

শিশির। কে বাজাইতেছে ?

কর্ণেল। মাদাম।

শিশির। মাদাম ? কৈ তিনি ত এখানে উপস্থিত নাই।

কর্ণেল অলৌকিক শক্তি প্রভাবে তাঁহার পক্ষে সকলই সম্ভব।

শিশিরকুমার ও কর্ণেলের মধ্যে উক্তরূপ কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময় বাবুলা একখণ্ড কাগজ লইয়া শিশিরকুমারকে প্রদান করিল। শিশিরকুমার দেখিলেন, মাদাম লিখিয়াছেন,—মিষ্টার ঘোষ, তুমি কি আমার স্বর শুনিতে পাইতেছ ? মাদাম অপর বাংলোতে অবস্থান করিতেছিলেন, শিশিরকুমার ছুটিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। মাদাম তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে হাস্য করিতে লাগিলেন। শিশিরকুমার তাঁহার অলৌকিক শক্তি লক্ষ্য করিয়া চমৎকৃত হইলেন।

(৩)

একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে শিশিরকুমার ও কর্ণেল অল্‌কট্ বসিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময় পূর্ব্বোক্ত পার্শী যুবক তাঁহাদের নিকট

আসিয়া উপবেশন করিলেন। যুবকটি মাদাম ব্লাভাৎস্কির অলৌকিক শক্তি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার একজন অনুরক্ত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কর্ণেল ও মাদামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। তিনি শিশিরকুমার ও কর্ণেলের সহিত কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় মাদাম সেখানে উপস্থিত হইলেন। মাদাম যুবকের মস্তকে হস্ত দিয়া বলিলেন,—"উপরি উপরি দুইটি টুপি মাথায় দেওয়া কি এদেশের প্রথা?" ইহার পর তিনি যুবকের মস্তক হইতে একটি টুপি খুলিয়া লইলেন, আর একটি তাহার মস্তকেই রহিল। যুবক একটি টুপি মাথায় দিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু কিরূপে দুইটি টুপি হইল তাহা বুঝিতে না পারিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। শিশিরকুমার মাদামের কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। কর্ণেল অল্‌কট্ হাসিয়া বলিলেন,—"শিশিরবাবু, দেখিলেন ত? যুবক একটি টুপি পরিয়াআসিয়াছিলেন, কিন্তু মাদাম তাঁহার টুপি স্পর্শ করিবামাত্রই ঠিক সেইরূপ আর একটি টুপি সৃষ্ট হইল।"

শিশিরকুমার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, দুইটি টুপিই একরূপ। স্বচক্ষে যাহা দর্শন কবিলেন, শিশিরকুমার কিরূপে তাহা অবিশ্বাস কবিবেন? কিন্তু তাঁহার মনোমধ্যে নানা চিন্তার উদয় হইতে লাগিল;—মাদাম আসিবার সময় কি তাঁহাদের অলক্ষ্যে একটি টুপি হাতে লইয়া আসিযাছিলেন? যদি তাহাই হয়, তবে পার্শী যুবক যে টুপি মাথায় দিয়া আসিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ টুপি তিনি তৎক্ষণাৎ কোথা হইতে পাইলেন? শিশিরকুমার মনের মধ্যে অনেক যুক্তি তর্ক করিয়া স্থির করিলেন যে, মাদাম টুপি লইয়া আসেন নাই। তবে কি পার্শী যুবক মাদামের নির্দ্দেশ মত একই রকমের দুইটি টুপি মাথায় দিয়া আসিয়াছিলেন? তাহাও সম্ভব হইতে পারে না; কারণ প্রতারণা দ্বারা মানবের হৃদয় অধিকার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। মাদাম যদি পার্শী যুবকের সহিত একযোগে প্রতারণার দ্বারা শিশিরকুমারকে মুগ্ধ করিবাব চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে যুবক কিছুতেই মাদামের অনুরক্ত

সেবক হইতে পারিতেন না। তিনি যতই মাদামের অলৌকিক শক্তির কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রতি তাহার ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

(৪)

একদিন শিশিরকুমার ও কর্ণেল বসিয়া কথোকথন করিতেছেন, একসময় কর্ণেল একগুচ্ছ সুচিকণ কেশ শিশিরকুমারকে দেখাইলেন। শিশিরকুমার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কেশ কাহার ? আপনি রাখিয়াছেন কেন ?" প্রত্যুত্তরে কর্ণেল বলিলেন—"এ কেশ মাদাম আমাকে দিয়াছেন। একদিন তিনি তাহার মস্তষ্ক হইতে একগুচ্ছ পলিত কেশ লইয়া স্বীয় শক্তি প্রভাবে তৎক্ষণাৎ তাহা এইরূপ সুচিকণ কৃষ্ণবর্ণে পরিণত করিয়া আমাকে প্রদান করিয়াছেন। শিশিরকুমার দেখিলেন, ইহাও এক অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। তিনি একদিন মাদাম ব্লাভাৎস্কিকে বলিলেন, "আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এইরূপ কেশগুচ্ছ আপনার মস্তক্ষ হইতে দিন, আমি তাহা কলিকাতায় আমার বন্ধুবর্গকে দেখাইব।"

মাদাম বলিলেন,—"আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার করিতে পারিব না, কারণ মহাত্মাদের অনুগ্রহ ব্যতীত আমার এই পক্ককেশ কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইতে পারে না।"

এইরূপ কথোপকথনের দুই একদিন পরে, একদিন রাত্রে শিশির-কুমারের শয়ন কক্ষে বসিয়া কর্ণেল, মাদাম ও শিশিরকুমার হিন্দু বিবর্ত্তনবাদ (Hindu theory of Evolution) সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। মাদাম বক্তা, শিশিরকুমার ও কর্ণেল শ্রোতা। মাদাম ব্লাভাৎস্কির জ্ঞানের গভীরতা লক্ষ্য করিয়া শিশিকুমারের মনে হইতে লাগিল যে, মাদাম মানবী নহেন, তিনি দেবী ; এজগতের সৃষ্টি-রহস্য যেন তাঁহার কিছুই অজ্ঞাত নাই। তিনি আপনাকে মাদামের দাসানু-দাস বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। কোন হিন্দু মহাত্মা মাদামের

শরীরে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়াই শিশিরকুমারের ধারণা জন্মিয়াছিল। মাদামের বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে শিশিরকুমার বলিয়া উঠিলেন—"আর নয়, আজ এই পর্য্যন্ত থাক ; আমি আপনার গভীর তত্ত্বগুলি আর হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না।"

মাদাম নীরব হইলেন। তিনি স্বীয় কক্ষে গমন করিবার জন্য আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলে শিশিরকুমার তাঁহাকে বলিলেন—"কৈ, আমাকে ত কর্ণেলের ন্যায় কেশ গুচ্ছ দিলেন না।"

"তুমি আমার কেশ চাও ? আচ্ছা, এই গ্রহণ কর।" এই বলিয়া মাদাম স্বীয় মস্তক হইতে এক গুচ্ছ পক্ককেশ ছিড়িয়া লইয়া শিশির-কুমারের হস্তে প্রদান করিলেন। শিশিরকুমার দেখিলেন, সেই কেশ গুচ্ছ শুভ্র নহে, তাহা সুচিকণ কৃষ্ণবর্ণ। তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি মাদামের অলৌকিক শক্তির কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সুমধুর ঘণ্টাধ্বনি তাঁহার শ্রবণগোচর হইল। তিনি শেষে দেখিলেন যে মাদাম অঙ্গুলি সঞ্চালন কবিতেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে মাদাম অঙ্গুলি সঞ্চালন বন্ধ করিয়া বলিলেন—"ব্যাস্"। সঙ্গে সঙ্গে সেই মধুর ঘণ্টাধ্বনিও থামিয়া গেল।

বোম্বাইয়ে অবস্থানকালে শিশিরকুমার মাদামের অলৌকিক শক্তির বহু পরিচয় পাইয়াছিলেন। শিশিরকুমারের সহিত থিওজফি বা ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় মাদাম তাঁহার বিচার-শক্তি লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

মাদাম ব্লাভাৎস্কি ও কর্ণেল অলকট ক্রমে ক্রমে আপনা-দিগের সমিতির কার্য্য প্রচারের জন্য একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা কবিতে ইচ্ছা কবেন। এ সম্বন্ধে তাঁহাবা শিশিরকুমারের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার পরামর্শ অনুসারে "থিওজফিষ্ট" (Theosophist) নামক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

শিশিরকুমার জন্মান্তর বিশ্বাস করিতেন না, একথা আমরা পূর্ব্বে

উল্লেখ করিয়াছি। মাদাম ব্লাভাৎস্কি কিন্তু জন্মান্তরবাদিনী ছিলেন। জন্মান্তর রহস্য লইয়া উভয়ের মধ্যে মহাতর্ক উপস্থিত হয়। তাঁহাদের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহার সারাংশ লিপিবদ্ধ করিলাম।

শিশির। আপনার জন্মান্তরে বিশ্বাস, ভারতবর্ষে আপনার প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের অন্তরায় হইবে।

মাদাম। কেন?

শিশির। আপনি যদি ব্রহ্মবিদ্যার সহিত জন্মান্তরবাদ সংযোগ করেন, তাহা হইলে আপনাদের সমিতির উন্নতি হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না।

মাদাম। কি কাবণে?

শিশির। মৃত্যু মানব হৃদয়ে যে ভীতি সঞ্চার করিয়া থাকে, তাহা প্রেতাত্মবাদ দ্বারা দূর হইয়া যায়। আপনার ব্রহ্মবিদ্যার সহিত যদি জন্মান্তরবাদ সংযোগ করেন, তাহা হইলে, লোকে ব্রহ্মবিদ্যার পরিবর্তে প্রেতাত্মবাদই সাদরে গ্রহণ করিবে।

মাদাম। আত্মার ধ্বংস নাই এবং মৃত্যুর পরও আত্মা বর্ত্তমান থাকে, একথা ত আমরা বিশ্বাস করি।

শিশির। পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস দ্বারা মানবের মৃত্যুভয় যে কিরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা আমি আপনাকে বুঝাইয়া দিতেছি। মানব যদি বুঝিতে পারে যে মৃত্যু একটা পরিবর্তন ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং এই পরিবর্তনের পর তাহারা পরজগতে গমন করিয়া আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত মিলিত হইবে, তাহা হইলে তাহারা মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারিবে। কিন্তু মানব যদি জন্মান্তরবাদী হয়, তাহা হইলে তাহার মৃত্যুভয় দূর হইতে পারে না; ববং মৃত্যুর পর তাহার স্বরূপত্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, তাহার স্বজনগণের সহিত মিলন হইবে না, এই সকল চিন্তা তাহার হৃদয়ে ভীতি ও অশান্তি উৎপাদন করিবে।

শিশিরকুমারের যুক্তিতর্ক মাদাম ব্লাভাৎস্কির নিকট সমীচীন বলিয়া

বিবেচিত হইল না, তিনি শিশিরকুমারের প্রতি বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ছি, ছি, তুমি হিন্দু হইয়া জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস কর না।"

শিশির। বর্ত্তমানে হিন্দুগণ জন্মান্তর বিশ্বাস করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রকারগণের অনুমোদিত নহে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বিগণই জন্মান্তরবাদের প্রবর্ত্তক।

মাদাম। প্রমাণ কোথায়?

শিশির। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, স্মৃতি ও পুরাণ এই দুইয়ের মধ্যে মতানৈক্য লক্ষিত হইলে পুরাণ, পরিত্যাগ করিয়া স্মৃতিই গ্রহণ করিতে হইবে। আবার স্মৃতি ও বেদের মধ্যে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হইলে, স্মৃতি পরিত্যাগ করিয়া বেদ নির্দ্দিষ্ট মত গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতবর্ষে বেদই সর্ব্বপ্রধান; বৈদিক মতের বিরুদ্ধে হিন্দুদিগের কোনও কার্য্য করা সম্ভব নহে। মানব মৃত্যুর পর পরজগতে বর্তমান থাকে, ইহা বেদ প্রচারিত এবং অধ্যাত্মবাদও সেই মত অনুসরণ করিয়া থাকে।

মাদাম। তুমি বেদ হইতে যাহা বলিলে, আমাকে তাহা দেখাইতে পার?

শিশির। বেদের শ্লোকগুলি আমার স্মরণ নাই, কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সম্পূর্ণ সত্য।

শিশিরকুমার জন্মান্তরবাদী নহেন দেখিয়া মাদাম ব্লাভাৎস্কি তাঁহার উপর বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন।

শিশিরকুমার তিন সপ্তাহকাল বোম্বাইয়ে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার বোম্বাই পরিত্যাগের ঠিক দুইদিন পূর্ব্বে, মাদামের সহিত তাঁহার জন্মান্তর-রহস্য লইয়া উক্তরূপ তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। মাদাম শিশিরকুমারের উপর এত দূর বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি দুইদিন তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। নির্দ্দিষ্ট দিবসে শিশিরকুমার বোম্বাই হইতে কলিকাতায় আসিবার সময় মাদামের নিকট বিদায়

গ্রহণ করিতে উপস্থিত হইলেন। তিনি মাদামের সম্মুখে নতজানু হইয়া করযোড়ে বলিলেন,—"জননী, আমাকে ক্ষমা করুন, কেবল ক্ষমা কেন, আমাকে আশীর্বাদ করুন।"

মাদামের ক্রোধ দূব হইয়া গেল। তিনি সজলনয়নে সস্নেহে শিশিরকুমারের মস্তকে হস্ত স্থাপন কবিয়া বলিলেন—"ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

শিশিরকুমার কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। ভারতবর্ষে থিওজফিক্যাল সোসাইটি বা ব্রহ্মবিদ্যাসমিতি প্রতিষ্ঠার সময় মাদাম ব্লাভাৎস্কি ও কর্ণেল অল্‌কট শিশিরকুমাবেব নিকট যে সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা আজীবন স্মরণ করিতেন। মাদাম ও কর্ণেল শিশিরকুমারকে অন্তবের সহিত ভালবাসিতেন। তাঁহাবা অনেক সময় কলিকাতায় শিশিরকুমাবেব বাটীতেই অবস্থান করিতেন। একেশ্বরবাদী শিশিবকুমার, প্রেতাত্মবাদ ও ব্রহ্মবিদ্যা বা যোগবিদ্যা আলোচনা দ্বারা স্বীয় হৃদয়ক্ষেত্রকে ধর্ম্মবীজ বপনেব উপযুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

———

নবম অধ্যায়

রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি উভয় ক্ষেত্রেই যাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁহারা যে অসাধারণ শক্তিমান পুরুষ সেবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু এই শ্রেণীর লোক সংসারে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। শিশিরকুমার এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।* স্বদেশ সেবায় আত্মনিয়োগকারী শিশিরকুমার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আপনাকে কিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন, পাঠকবর্গ তাহা অবগত আছেন। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তেজস্বী স্বাধীনচেতা শিশিরকুমার, শুষ্ক রাজনীতি লইয়া বিভোর থাকিয়াও কিরূপে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের প্রবর্ত্তিত সুধামধুর প্রেমধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, আমরা এক্ষণে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। শিশিরকুমারের পূর্ব্ব পুরুষগণ শক্তি উপাসক ছিলেন; হরিনারায়ণ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র বসন্ত, হেমন্ত ও শিশিরকুমার পাশ্চাত্য শিক্ষা ও রীতিনীতির আলোক প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বপুরুষগণের অবলম্বিত ধর্ম্মপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমরা এসকল কথা এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শিশিরকুমার তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। "ব্রাহ্মধর্ম্মে যাহা আছে, তাহা বৈষ্ণবধর্ম্মে আছে,

---

*শিশিরকুমারের স্বর্গারোহনের পর টাউন হলে তাঁহার লোকসভায় স্বর্গীয় গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে মহোদয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—

"What struck me most in him was the combination of deep spirituality with passionate patriotism and this combination produced another combination of two seemingly contradictory qualities—deep peace and great restlessness of mind and energy. His patriotism made him a restless and incessant worker in the service of his country and yet behind it all was deep peace born of true spirtuality.

কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মে যে মাধুর্য্য, ভজন ও নিগূঢ় ব্রজের রস আছে, তাহা কোন ধর্ম্মে নাই।" শিশিরকুমার যখন ইহা বুঝিতে পারিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অনুরাগী হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের সমাজনীতি সমূহের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবই প্রেমের প্লাবন আনায়ন করিয়াছিলেন; কালক্রমে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম শুষ্ক ও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। শিশিরকুমারই আবার এদেশে সেই প্রেমের বন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন। অয়স্কান্ত-মণির স্পর্শে লৌহ যেমন তাহার গুণপ্রাপ্ত হয়, দেবীশক্তি সঞ্চারিত হইলে মানবের প্রকৃতিও সেইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। শিশিরকুমার কিরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে আকৃষ্ট হন, সে সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল গোস্বামী যখন রাইউন্মাদিনী লেখেন, তখন শ্রীমতীর পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিয়া একটী অদ্ভুদ পদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই পদটীর তাৎপর্য্য বলিতেছি। শ্রীমতী কোন সখিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'সখি। যখন প্রথমে অন্তরে কৃষ্ণ প্রেমের উদয় হইল, তখন আমি অগ্র-পশ্চাতের কথা ভাবিতে লাগিলাম; ভাবিলাম, আমার আর বাল্য চপলতা চলিবে না, যেহেতু কৃষ্ণ আমার চিত্তহরণ করিয়াছেন। এখন আমায় কণ্টক কর্দ্দম ও ভুজঙ্গময় পথে চলিতে হইবে। আমি যখন গুরুজনের মধ্যে বসিয়া থাকি, তখন যদি কৃষ্ণের বাঁশী শুনি, তবে আমাকে লজ্জা ভয় সকলি পরিত্যাগ করিয়া আমাকে বনে দৌড়িতে হইবে ইত্যাদি।' এই যে পূর্ব্বরাগকালে মনে নানাবিধ ভাবের উদয় হয়, তাহা প্রভুর কৃপাপাত্র ব্যতীত অন্যে বুঝিতে পারে না। আমি কোন সময়ে এই রাগের কিঞ্চিৎ আস্বাদ করিয়াছি। কেন যে প্রভু আমাকে কৃপা করিলেন, তাহা বলিতে পারি না। আমি সাধন ভজন করি নাই। এমন কি, আমি প্রভুর কৃপা পাইবার কোন কাজই জীবনে করি নাই। তবে প্রভু আমাকে এই মধুর রস কেন আস্বাদন করান,

তাহার কারণ আমার এই বোধ হয়। প্রভু ভাবিলেন যে, তাঁহার লীলা কথা জগতে প্রচার করিতে হইবে, আর সেই নিমিত্ত আমাকে বাছিয়া লইলেন। আমাকে যে বাছিলেন, সে আমি ভাল বলিয়া নহে; তবে কেন, না, আমাকে জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নীচ ভাবিয়া। আপনারা জানেন যে, শ্রীভগবান পঙ্গুকে নৃত্য করাইয়া থাকেন। তাই আমার ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা নীচ জীবের দ্বারা তাঁহার লীলা লেখাইলেন। কিন্তু লীলা লিখিতে শক্তির প্রয়োজন। তাই বোধ হয়, আমাকে লীলা লিখিবার উপযোগী করিবার নিমিত্ত, অসাধনে আমাকে পূর্ব্বরাগের রস কিঞ্চিৎ আস্বাদ করাইয়াছিলেন; কারণ তিনি ভাবিলেন যে, এরূপ আস্বাদ না করাইলে আমার দ্বারা তাঁহার লীলা লেখা হইবে না।

"যখন" চুরণীর ধারে হাঁসখালিতে আমি বাস করি, তখন কলিকাতা, হইতে একখানি শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ লইয়া গেলাম। তখন আমি যে গৌরভজন করিব কি তাঁহার পাদপদ্মে যে আমার চিত্ত সমর্পণ করিতে হইবে, ইহা কিছুই আমি জানিতাম না। শ্রীগৌরাঙ্গ বস্তুটির প্রতি চিরকালই আমার একটু টান ছিল। ভাবিলাম, এই বস্তুটির জীবনী গ্রন্থখানি পাঠ করিব, আর এই নিমিত্ত গ্রন্থখানি লইয়া যাই। গ্রন্থখানি যেই হাতে করিলাম, কেন জানি না, অমনি আমার অঙ্গ পুলকিত হইল; হাত পা কাঁপিতে লাগিল; এমন কি প্যাকেট হইতে পুস্তকখানি খুলিতে পারি না। তাহার পর পুস্তক পড়িতে গেলাম, কিন্তু সূচীপত্র অতিক্রম করিবার শক্তি হইল ন সূচীপত্র সম্মুখে করিয়া বসিয়া থাকিলাম। তাহার পরে অতি কষ্টে গ্রন্থ পড়িতে আরম্ভ করিলাম। পড়িতে আরম্ভ করিয়া বিহ্বলতা উপস্থিত হইল। তখন আমি যে আমি, তাহা অনেকটা ভুলিয়া গেলাম। সংসারে যত প্রিয়জন বা যত প্রিয়বস্তু আছে, তাহাদের প্রতি একপ্রকার উদাস্য জন্মিল। কেবলই ভাবি, কিন্তু কি যে ভাবি তাহা ঠিক করিতে পারি না। লোকের সঙ্গ করিতে

এমনকি, কথাবার্ত্তা কহিতেও রুচি হয় না। একা আপন মনে থাকি।

"গ্রন্থ পড়িয়া দেখি যে প্রথমেই কান্দাকাটার কথা। এ ভক্ত কৃষ্ণের নিমিত্ত রোদন করিতেছেন, ও ভক্ত কৃষ্ণের নাম শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন ইত্যাদি। কিন্তু কৃষ্ণের নাম করিয়া রোদন করা, ইহা কিরূপে হয়, বুঝিতে পারিলাম না। মনে ভাবিতাম, জগতে কি এখন এমন একটি লোকও আছেন, যিনি কৃষ্ণের নাম করিয়া রোদন করেন? আমার ভাগ্যে কি এরূপ কখনও হইবে যে, এরূপ লোক দর্শন পাইব? আর লোকে কৃষ্ণনাম করিয়াই বা কিরূপে কান্দে? আমি পূর্ব্বে যখন ব্রাহ্ম ছিলাম, তখন ঈশ্বরের নাম করিয়া কখন কখন কান্দিতাম। কিন্তু সে ক্রন্দনও শ্রীভাগবতে যে ক্রন্দনের কথা লেখা আছে, এ উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য। আমি তখন ইহাই বলিতাম যে, 'হে ঈশ্বর! আমি মহাপাপী, আমাকে নরককুণ্ডে ফেলিও না।' কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতে যে ক্রন্দন দেখি, তাহাতে নয়ন হইতে আনন্দধারা পড়ে। পাপ পাপ বলিয়া জুজু বুড়ীর ভয়ে আমরা পূর্ব্বে কান্দতাম। চৈতন্যভাগবতে দেখি যে সে কথার গন্ধও নাই।

"এই সমুদয় ভাবি, আর শ্রীভগবানের নিকট কাতরভাবে এই প্রার্থনা করি যে, হে ভগবন্! আমাকে এইরূপ একটি লোক দেখাও যে কৃষ্ণ বলিয়া কান্দে। আমি যে কৃষ্ণ বলিয়া কান্দিতে পারিব, তাহা আমি স্বপ্নেও কখনও আশা করি নাই। কৃষ্ণনগরে শ্রীরুক্মিনী গোঁসাই নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। তাহার নিকট আমি একদিন শ্রীভাগবত শ্রবণ করিয়া বড় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। অনেক যত্ন করিয়া বাবু দ্বারকনাথ সরকারের সাহায্যে তাঁহাকে হাঁসখালি আনাইলাম। গোস্বামী মহাশয় আসিলে কৃতার্থ হইলাম। তিনি আসিয়া দুই একটী বিষয় কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন আমার কাছে বিষয়-কথা বিষসম বোধ হইত। আমি তাঁহাকে অতি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, ঠাকুর এমন কোন লোক দেখিয়াছ, যিনি কৃষ্ণনাম করিয়া

রোদন করেন? তিনি বলিলেন, 'এরূপ লোক মেলা কঠিন বটে, কিন্তু, শ্যামখুড়ে একটি বৈষ্ণব আছেন, তিনি এইরূপ কৃষ্ণ কথা বলিতে বলিতে রোদন করিতে থাকেন।' আমি বলিলাম, 'ঠাকুর তিনি কিরূপ কৃষ্ণকথা বলিয়া রোদন করেন আমাকে বুঝাইয়া বল, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। এই ত আমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতেছি, কিন্তু কৈ আমার নয়নে ত একবিন্দুও জল আসিতেছে না?' ঠাকুর বলিলেন, 'তিনি করেন কি, যদি কেহ তাঁহার কাছে যায়, তবে বলেন, আমার যে কৃষ্ণ, আমার যে কৃষ্ণ, এইরূপে দুই একবার আমার যে কৃষ্ণ বলিয়া কান্দিয়া ফেলেন।' তবু আমি কিছুই বুঝিলাম না। ভাবিলাম, শ্যামখুড়ে যাইব; কিন্তু যাওয়া হইল না, শরীরও সেরূপ নয়।

"হাঁসখালির বৃহৎ মাঠে দাঁড়াইয়া থাকিতাম। দেখিতাম, দূরে কত গ্রাম রহিয়াছে; ভাবিতাম, ইহাতে কত সহস্র মানুষ রহিয়াছে। কিন্তু এমন কেহই নাই যে কৃষ্ণনাম করে, কি কৃষ্ণনাম বলিয়া ক্রন্দন করে। হাঁসখালির হাঠে গেলাম—দেখিলাম, সহস্র লোক কেনাবেচা করিতেছে, কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করা দূরে থাকুক, কাহার মুখে ত কৃষ্ণ নাম নাই। দেখিলাম, একজন বাউল বৈষ্ণব, তামাক বিক্রয় করিতেছেন। তাঁহার মস্ত পাকা দাড়ি, মাথায় লম্বা চুল, পরিধানে কৌপীন। তাঁহার অগ্রে যাইয়া আমি বসিলাম। আমি তাঁহার মুখে কৃষ্ণ নাম শুনিতে গিয়াছি; তিনি ভাবিলেন. আমি তামাক কিনিতে বসিয়াছি। সুতরাং তাঁহার সহিত ইষ্টগোষ্টি হইল না। এইরূপে কোথাও কৃষ্ণ নাম শুনিতে পাই না, আর কৃষ্ণনামে যে রোদন, সে ত অনেক দূরের কথা।

"এদিকে শ্রীচৈতন্যভাগবত পড়িতেছি। দুই এক পাতার অধিক পড়িতে পারি না। যখন পড়িতে বসি তখন নয়নজলে পুস্তকের পাতা ভিজিয়া যায়। যখন গৃহকার্য্য করি, তখনও কষ্টেশ্রেষ্টে নয়নজল নিবারণ করি। একটী সামান্য কথা বলিলেই অমনি নয়নজল আসে। কিন্তু কৃষ্ণ নাম করিয়া যে রোদন, ও প্রভুর লীলা পাঠ করিয়া আমার

যে নয়নাশ্রু পতন, এই দুইটী আমি পৃথক ভাবিতাম। আমি ভাবিতাম, আমার যে নয়নজল পড়ে, ইহা প্রভুর লীলামাধুর্য্যের শক্তিতে। ভাল ভাল নভেল পড়িয়াও ত নয়নে জল আইসে। কিন্তু ইহা সত্য যে, যে পরিমাণে আমি লীলাপাঠ করিতে লাগিলাম সেই পরিমাণে আমার বিহ্বলতা উপস্থিত হইতে লাগিল। ক্রমেই নানাবিধ অলৌকিক চিত্র দর্শন করিতে লাগিলাম। নিদ্রিত অবস্থাতে, স্বপ্নে, কেবল প্রভুর লীলা কার্য্য দেখি। দিবাভাগেও এইরূপ মাঝে মাঝে ছবি দেখতাম। তাহার একটী চিত্র আমি শ্রীঅমিয় নিমাই-চরিতে দ্বিতীয় খণ্ডের বন্দনায় বর্ণনা করিয়াছি। সে চিত্রটি এই—

'ফাল্গুনের শেষে, কৃষ্ণচূড়া ফুটে,
বসি সেই বৃক্ষতলে।
চুরণীর ধারে, বৃক্ষশোভা করে,
আছিনু আপন ভুলে॥
পুঁথি এক হাতে, গৌর কথা তাতে,
পহিলা পড়ছি লীলা।
আখরে আখরে, কত মধু ঝরে,
অঙ্গ এলাইয়া গেলা॥
এমন সময়, পাখী উড়ে যায়,
নামটি হলিদা পাখী।
উড়ে যায় চলে মুখে হরি বলে,
ডালেতে বসিল দেখি॥
আর কত পাখী, ডালেতে বসিয়া,
সেই সঙ্গে হরি বলে।
অচেতন মত, চিত চমকিত,
চাহি দেখি মুখ তুলে॥

সব পাখী মিলে, মুখে হরি বলে,
আর কিছু নাহি শুনি।
ক্রমে হরিনাম বাড়িয়া চলিল,
চারিদিকে হরিধ্বনি ॥
আকাশে তাকাই, দেখিবারে পাই,
মোটা মোটা আখরেতে,
আকাশ ভরিয়া, হরিদ্রা বর্ণের,
হরিনাম লেখা তাতে ॥
শ্রবণ আমার, নাহি শুনে আর,
শুধু হরিনাম বিনে।
যেদিকে তাকাই, দেখিবারে পাই,
অঙ্কিত হরির নামে ॥
ভাবিলাম মনে, এই ত্রিভুবনে,
সকলে গাইছে গুণ।
বলাই কেবল, দিন গোঁয়াইল,
বিষয়েতে দিয়া মন ॥

"তুলাধুনার ন্যায়, আমার হৃদয়ের মধ্যে দিবানিশি উল্‌ট পাল্‌ট চলিতেছে। কিন্তু তখনও হৃদয়ে বৈষ্ণবতা প্রকাশ পায় নাই। ইংরেজী পড়িয়া ও ব্রাহ্ম হইয়া, ধর্ম্ম সম্বন্ধে মনের যেরূপ গঠন হইয়াছে, কিছুতেই উহা যাইতেছে না। মনে কেবল এই এক ভাব যে, ধর্ম্ম মানে পাপের জন্য ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা! মনে মনে ভাবিতাম যে, মহাপ্রভু যতই রাধাকৃষ্ণ বলুন, তিনি প্রকৃতপক্ষে কেশব সেনের ব্রাহ্ম ধর্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন মাত্র। আমার মনে তখনও এই বিশ্বাস রহিয়াছে যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম আর কিছু নয়, এক প্রকার ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম।

"একদিন রজনীযোগে ভাবিলাম যে, আমার যেরূপ মনের ভাব ইহাতে প্রকৃত কোন কিছু সার বস্তু না পাইলে হৃদয় কখনই জুড়াইবে না। মনকে ফাঁকি দিয়া শান্ত হইতে পারিবনা। কিন্তু কেশব সেন

এই ২৫ বৎসর চেষ্টা করিয়া কিছুই করিতে পারেন নাই। আমি যে সেই পথ অবলম্বন করিয়া কিছু করিতে পারিব, তাহার আশা কোথায়? কিন্তু এই কথা ভাবিতে আশা আপনি আসিল। কে যেন আমাকে বলিয়া দিলেন যে 'তিনি আছেন' 'ঠিকই আছেন', 'ভালই আছেন', তাঁহাকে ডাকিলেই তিনি আসেন তবে সরল মনে কেহ তাঁহাকে ডাকে না। বা খোঁজে না।' তাই আমি কালাচাঁদ গীতায় লিখি :—

"যে মাত্র কেন্দেছে সরল অন্তরে!
'আছে' 'আছে' ভাব হৃদয়ে সঞ্চারে॥
'আছে' 'আছে' ভাব মনে সঞ্চারিল।
কোন মতে তাহা ছাড়িতে নারিল॥

'তখন ভাবিলাম আমি আছি, তিনি আছেন, তিনি আমার নিকটেই আছেন। স্থূল কথা, আমি যাহা বলি তিনি সবই শুনিতে পান, 'তিনি আমার সুহৃৎ, তিনি আমায় সৃষ্টি করিরাছেন, সুতরাং আমি তাঁহার উপর দাবী রাখি। তবে কেন তাঁহাকে আমি পাইব না? তাঁহাকে সরল মনে ডাকিব ও ধরিব। এইস্থানে কালাচাঁদ গীতার এই কয়েকটি পদ মনে পড়ে :—

বাপ! বাপ! বাপ! পুত্র ডাকে তোর।
কৃপা করি বাপ দেহগো উত্তর॥
কোথা বাপ কর সন্দেহ ভঞ্জন।
পরিচয় দাও ছাড় বিড়ম্বন॥
যদি কৃপা প্রভু, না করিবে মোরে।
যন্ত্রণা ঘুচাও হান বজ্রশিরে॥
মারিতাম আমি নিশ্চয় করিয়ে।
শুধু বেঁচে আছি আশা পথ চেয়ে॥
নতুবা তোমায় কি করিলে পাই॥
বলে দাও মোরে করিব তাহাই॥

তখন অন্তরে এই ভাবটি বিন্ধিয়া গেল যে, তাহাকে পাওয়া সহজ কথা। কাজেই মনে দৃঢ় সংকল্প হইল যে তাঁহাকে পাবই পাব।

'যদিও আমার তখন সর্ব্বদা হা-হুতাশ ভাব, কিন্তু তবু আমার একটি সুখ ছিল,—প্রভূর লীলা কথা পাঠ করা। যখন লালা পাঠ করিতাম, তখন আনন্দ-সাগরে ভাসিতাম। ফুরাইয়া যাইবে বলিয়া অল্প অল্প করিয়া পড়িতাম। ভাবিতাম চৈতন্য-ভাগবত পড়া শেষ হইলে কি পড়িব, এই মনে হইলে নিরাশায় হৃদয় শুকিয়া যাইত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তখন বিষয় কথা আমার কাছে বিষের ন্যায় লাগিত, গৌর কথা লইয়া থাকিতেই ভাল লাগিত; এমনকি, যদি কেহ ধর্ম্ম কথা বলিতেন, তবে তাহাতে গৌর কথা না থাকিলে আমার ভাল লাগিত না। গৌর কথা ব্যতীত যে অন্য কথা আছে তাহা আমি জানিতাম না। কিন্তু তাহাতে আমার কি? কে গৌর কথা জানেন, তাই অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতাম, দেখি কেহই জানেন না। বরং অনেক সময় তাঁহাদের বাক্য শুনিয়া মর্ম্মাহত হইতাম। তবে যদি কাহারও কাছে দুই একটী গোব কথা শুনিতে পাইতাম, তবে যেন তাঁহার নিকট চিরদিন বিক্রীত হইতাম। সেকথা মনে করিয়া চণ্ডীদাসের একটী পদ আস্বাদ করিতে পারি। যথা ঃ—

"অকথন ব্যাধি কহন না যায় রে।
যে করে বঁধুর নাম পড়ি তাঁর পায় রে॥

"এই সম্বন্ধে একটী কাহিনী বলিতেছি। শ্রীল কালিদাস নাথ অনেক গৌরকথা জানিতেন, তাঁহাকে বাড়ি আনিয়া তাঁহার নিকট গৌরকথা শুনিবার জন্য মনে বড় বাঞ্ছা হইল। আমি তখন হাঁসখালি হইতে কলিকাতায় আসিয়াছি। কিন্তু কালিদাস অন্যের চাকুরী করেন, আসিতে পারেন না। তাঁহাব বাসায় এত গণ্ডগোল যে সেখানে যাইয়াও সোয়াস্তি পাই না। সে যাহা হউক তাঁহাকে কোন প্রকারে বাড়ীতে আনিলাম। তখন আমি ভাবিলাম যে, আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম। কালিদাসকে আপনার বৈঠকখানায় পাইয়া

গললগ্নীকৃতবাস ও দণ্ডবৎ হইয়া তাঁহার সম্মুখে পড়িলাম ও বলিলাম, "তুমি কৃপা করিয়া আমাকে গৌরকথা শুনাইয়া আমাকে প্রাণদান কর।" আমার আকিঞ্চন দেখিয়া অবশ্য কালিদাস বড় কষ্ট পাইলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তখন আমি যে স্ববশে ছিলাম তাহা নহে।

"আমার মনে বিশ্বাস যে জীব মাত্রেরই জীবনে এমন এক সময় উপস্থিত হয়, তখন তাহার ভগবানের কথা মনে পড়ে। এই অবস্থাকে শাস্ত্রকারেরা পূর্ব্বরাগ বলিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বরাগ যাহার হৃদয়কে যতদূর অধিকার করে, তাহার প্রাণ ভগবত প্রাপ্তির নিমিত্ত ততদূর ব্যাকুল হয়। যেমন আধার তেমনি রাগ। মহাজনগণ এই পূর্ব্বরাগকে একটী পীড়ার সহিত তুলনা করিয়াছেন। ঠিক ইহা পীড়ার ন্যায়ই বটে। ইহাতে অন্তর ও বাহ্যের কতকগুলি পরিবর্তন হয়। পূর্ব্বরাগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ব্যাক্তিকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি প্রকৃতিস্থ নহেন। বোধ হয় যেন তাঁহার অন্তরে কি কথা কিম্বা শরীরে কি রোগ আছে। মহাজনেরাও শ্রীমতির ও শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বরাগ বহুতর পদে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমতির পূর্ব্বরাগ উপস্থিত দেখিয়া ললিতা বিশাখা এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, সখি। আমাদের সখী শ্রীমতীর একি দশা হইল। ইহার অন্তরের কি ব্যথা বলিতে পার? আমাদের সখীকে কি ভূতে পাইল? সখী বিনা কারণে কান্দে ও হাসে, মধ্যে মধ্যে দেখি অঙ্গ পুলকিত হয়, তাহার সংসারে একেবারে মন নাই, আহারে বিরতি, চক্ষে নিদ্রা নাই। সখী ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছে, কখনও বা কান্দিতেছে, কখনও বা রাঙ্গা বস্ত্র পরিধানে করে, বেশ-ভূষা করে না। আমাদের সখীর এরূপ ভাব কেন হইল? যমুনায় জল আনিতে যাইয়া কি তাহাকে অপদেবতায় পাইল।'

"এখন বিবেচনা করুন, শ্রীমতীর কি শ্রীপ্রভুর যে পূর্ব্বরাগ তাহা জীবে সম্ভবে না। সামান্য জীবে সামান্য লক্ষণের উদয় হয়। আমার অবস্থার এইটুকু পরিবর্ত্তন হইল যে আমি বুঝিলাম যে 'এতকাল

আমার জীবন বৃথা গিয়াছে, আমি অধনের নিমিত্ত ধন ত্যাগ করিয়াছি। আর আমার সময় নাই, কবে মরিয়া যাইব, আর কোথায় যাইব তাহার ঠিকানা নাই, অতএব সর্ব্বকার্য্য ফেলিয়া যাহাতে আমি শ্রীভগবানের পাদপদ্মে ভক্তিলাভ করিতে পারি, আমার তাহাই করা কর্ত্তব্য।' এই নিমিত্ত আমি কোথায় যাইব? কি করিব? কাহার কাছে যাইব? মনে অসুখ হইয়াছে জানিতেছি, কিন্তু এ রোগের বৈদ্য কোথায় বা ঔষধ কি তাহা কিছুই জানিতেছি না। প্রভুর লীলা যে পরিমাণে পড়িতেছি, সেই পরিমাণে রোগের বৃদ্ধি পাইতেছে। এই অবস্থায় আমি রোগ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত বহুতর লোকের চরণ ধরিয়া রোদন করিয়াছি।

"অমিয়নিমাই চরিতে আমি শ্রীঅদ্বৈতের অবিশ্বাস সম্বন্ধে একটু বিস্তার করিয়া লিখিয়াছি। এই অবিশ্বাসে অন্তর কিরূপ দগ্ধ করে তাহা বর্ণনা করিয়াছি। কারণ, প্রকৃতপক্ষে এই অবিশ্বাসের নিমিত্তই আমি জর্জ্জরীভূত হইতেছিলাম। আমি আরও লিখিয়াছি যে অবিশ্বাস বড় উপকারী বস্তু। তাহার কারণ এই যে, আমি এই অবিশ্বাস হইতে বিস্তর উপকার পাইয়াছি। আমি যে বৃশ্চিক-দষ্ট ব্যাক্তির ন্যায় ছটফট করিয়া বেড়াইতেছি, তাহার কারণ এই যে, বৈষ্ণবধর্ম্মের আগাগোড়া কিছুই আমি মানি না। অধিক কি বলিব, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে মনে মনে শ্রীভগবান বলিয়া বিশ্বাস করি না। আরো বলিব, শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নাম শুনিতে পারি না। এমন কি, আমার মনে পড়ে যে, একদিন আমি আমার মেজ দাদা মহাশয়কে [তিনি তখন দেশে ছিলেন] লিখিয়াছিলাম, 'প্রভু গৌরাঙ্গ যাহাই বলুন, আমি শ্রীরাধা-কৃষ্ণ মানিতে পারিব না।'

"এই গেল মনের ভাব। কিন্তু কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। প্রথমে হরিকীর্ত্তন করিতাম, যাহাতে প্রভুর নাম গন্ধ নাই, রাধা-কৃষ্ণের ত একেবারেই নাই। ক্রমে কীর্ত্তন প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। তারপরে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা লইয়া কীর্ত্তন করিতাম। এক একটি লীলা লইতাম,

আর এক একটি সেতার লইয়া যাহা মনে স্ফুরিত হইত, তাহাই উপস্থিত মত গাহিতাম। ইহাতে কীর্ত্তনের তেজক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

"কীর্ত্তন কিরূপ হইতেছে, তাহা জানিবার জন্য মেজদাদা দেশ হইতে পত্র লিখিলেন। আমি লিখিলাম, ঢলাঢলই বটে। এ কীর্ত্তনে খোল করতাল নাই, বৈষ্ণব নাই, আছেন বাড়ীর সকলে। ক্রমে বাড়ীর সকলে বড় অস্থির হইলেন; আর কীর্ত্তনের সময় ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। পূর্ব্বে সকালে এক ঘণ্টা হইত, ক্রমে তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত হইল। সে তিন ঘণ্টা উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অতি অল্পেরই বাহ্যজ্ঞান থাকিত।

"এক দিবস শ্রীমান মতিলাল বলিলেন যে, "আমি কীর্ত্তনের সময় একটি ছবি দেখিয়াছি। প্রথমে দেখিলাম, শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ছবি। পরে দেখিলাম, সেই তুই ছবি মিশিতে লাগিলেন, আর মিশিয়া শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু হইলেন।' ইহা আমি শুনিলাম, কিন্তু ইহাতে আমি বিশেষ বিচলিত হইলাম না। তারপরে এক দিবস কীর্ত্তন শেষ হইলে সেখানে বসিয়া আমি একা একটু বিশ্রাম করিতেছি, আর সকলে উঠিয়া গিয়াছেন, এমন সময় আমার মনের মধ্যে কতকগুলি ভাবের উদয় হইল। সেগুলি বিবরিয়া বলিতেছি।

"পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীভগবান বলিয়া মানিতাম না। কিন্তু তখন এতদূর মন নরম হইয়াছে যে, প্রভুর নিকটে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। সে প্রার্থনা এইরূপ, যথা—'হে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ, তোমার শীতল চরণ আমায় দাও। তুমি আমাকে প্রেম দাও, ভক্তি দাও; আর আমার অন্তর নির্ম্মল কর, ইত্যাদি।' মনে মনে ভাবিলাম শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান না হইলে তিনি যে ভগবানের দাস তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিতে পারিলেন, অবশ্য আমাকেও পারিবেন। খৃষ্টানেরা বলেন যে ভগবানকে ছাড়িয়া আর কাহাকেও প্রার্থনা করিলে ভগবান রাগ করেন। কিন্তু শ্রীভগবানের দাসকে প্রার্থনা করিলে শ্রীভগবান রাগ করেন কেন?

আমি শ্রীভগবানের দাসের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, ইহাও সেই ভগবানকে পাইবার নিমিত। রাজাকে যে না পায়, সে মন্ত্রীর নিকটে আবেদন করে, তাহাতে কি রাজা রাগ করেন? তাই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা না করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট প্রার্থনা করিতাম।

"তাহার পর দেখিলাম যে, ঈশ্বরকে যতই ডাকি, তাহাতে রস হয় না, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের নাম করিলে উল্লাস ও ভরসার উদয় হয়। কোথায় ভগবান তাহা জানি না; তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিতে হয়, তাহা জানি না। শ্রীগৌরাঙ্গকে জানি; তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিতে হয়, তাহাও জানি। ইহাই ভাবিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা না করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট প্রার্থনা করিতাম। এইরূপ তখনকার মনের ভাব।

"সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বিশ্রাম করিতেছি পূর্ব্বে বালয়াছি, এমন সময় কেহ যেন আমার কাণে কাণে বলিতে লাগিলেন, 'হে নির্ব্বোধ! শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান বলিতে তোমার আপত্তি কি; তোমার এই ত আপত্তি যে, যিনি অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি তিনি কেন মানুষ হইবেন? তুমি না তাঁহাকে দয়াময় ও প্রেমময় বলিয়া থাক? একথা মুখে বল না মনে বল? একবার মনের সহিত বল, ত'হা হইলে দেখিবে, শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীভগবান বলিতে তোমার আপত্তি থাকিবে না। যদি ভগবান প্রকৃত থাকেন, যদি তিনি প্রকৃত প্রেমময় হয়েন, তবে তাঁহার আমাদের নিকট না আসাই অন্যায়, আসা অন্যায় নহে। প্রকৃতই তিনি তোমার, তুমি তাঁহার। তাহার পর একবার মনের সহিত সরলভাবে তাঁহাকে প্রেমময় বলিয়া বিশ্বাস কর, তবে তিনি যে আসিয়াছিলেন, ইহা তোমার বিশ্বাস হইবে। তুমি দেখিবে, প্রকৃতই তিনি জীবকে অভয় দিতে মনুষ্যের দেহ ধরিয়া তোমাদিগের মধ্যে আসিয়াছিলেন। ইহা ভাবিয়া দেখ, তাহা হইতে তাঁহার প্রতি তোমার কোটি গুণ প্রেম বৃদ্ধি পাইবে। হে নির্ব্বোধ! মনে বিশ্বাস কর যে, তিনি এতই ভাল যে, প্রকৃতই তিনি তোমাদিগের মধ্যে

আসিয়াছিলেন। এই বিশ্বাস কর, করিয়া মনের আনন্দে নৃত্য করিয়া বেড়াও।'

"এই কথাগুলি শুনিয়া যেন আমার বক্ষ হইতে একটি পাষাণ সরিয়া গেল, যেন আমার অন্ধ নয়ন দীপ্তি পাইল। আমি ভাবিলাম, 'তবে তিনি এসেছিলেন। সেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, সেই জীবনের পরমগতি, আমাদিগের মধ্যে আসিয়া নৃত্য গীত করিয়া গিয়াছেন। আর পরিশেষে কাঙ্গাল বেশ ধরিয়া দ্বারে দ্বারে ইহাই বলিয়া ভিক্ষা করিয়া গিয়াছেন যে, হে জীব! আমি তোমাদের। আমি যেরূপ তোমাদিগকে ভালবাসিয়াছি, তোমরা সেইরূপ আমাকে ভালবাসিতে শিক্ষা কর।' এই সমস্ত কথা মনে আসিল এবং তখন মনে মনে আপনাকে শতবার ধিক্কার দিলাম। ভাবিলাম এমন যে ঠাকুর, তাঁহাকে না ভজিয়া বড় অন্যায় কাজ করিয়াছি। তিনি কাঙ্গালের ন্যায় আমাদের ভালবাসা ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছেন, আর আমরা তাঁহাকে স্মরণ করি না। আবার তখন বুঝিলাম যে, আমি একজন, আমি নিতান্ত একাকী নাই। আমি এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের একজন অধিকারী। ইহাতে গৌরবে হৃদয় উথলিয়া উঠিল।"

শিশিরকুমার জ্ঞানাভিমানী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও তেজস্বী হইলেও তাঁহার হৃদয় সরস ছিল। যে হৃদয় পরের দুঃখ দেখিয়া বিচলিত হয় না, তাহাই নীরস। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া স্বজাতির দুঃখমোচনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগই শিশিরকুমারের হৃদয়ের সরসতার পরিচায়ক। শিশিরকুমারের হৃদয় সরস ছিল বলিয়াই তাহা কলিযুগ-পাবন প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। শিশির-কুমার প্রথমে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিতেন না, পাঠক তাহা পূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন। একদিন তিনি তাঁহার মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমারকে পত্রে লিখিয়াছিলেন, "প্রভু গৌরাঙ্গ যাহাই বলুন, আমি শ্রীরাধাকৃষ্ণ মানিতে পারিবনা।" কিন্তু তিনি মানিতে না

পারিলে কি হয় ? ভগবানের প্রাণ যে সর্ব্বদাই ভক্তের জন্য ব্যাকুল। ভক্ত হৃদয়ের অসম্পূর্ণতা যে ভগবান স্বয়ংই পূর্ণ করিয়া থাকেন। একদিনের একটী ঘটনায় শিশিকুমারের শ্রীরাধাকৃষ্ণে কিরূপে বিশ্বাস হইয়াছিল, তাহা আমরা পাঠকবর্গকে অবগত করাইব। ঘটনাটি আমরা শ্রীযুক্ত মতিবাবুর মুখেই শুনিয়াছি এবং ঘটনাটি বর্ণনা করিবার সময় আমরা তাঁহার নয়নযুগল হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লক্ষ্য করিয়াছি। তখন শিশিরকুমার ও তাঁহার সহোদরগণ হরিসঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত, এমন সময় একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীযুক্ত মতিবাবু একজন দরোয়ান সঙ্গে লইয়া গঙ্গার ধারে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। ভ্রমণান্তর তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময় "মদনমোহনের" আরাত্রিকের বাদ্যধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয় মধ্যে এক অদ্ভুতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। তিনি বাড়ীতে ফিরিতে পারিলেন না, যেন কোন অজ্ঞেয় শক্তিপ্রভাবে "মদনমোহনের" মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মন্দিবে প্রবেশ করিয়া মতিবাবু দেখিলেন যে, সিংহাসনোপরি শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি বিরাজমান; ভক্তিগদগদচিত্তে পূজক ব্রাহ্মণ ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে আরতি করিতেছেন, আর কত শত দর্শক, গললগ্নীকৃতবাসে, ধীরে ও স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানের সেই আরিত্রিক দর্শন করিতেছেন। ভক্তের পক্ষে এ দৃশ্য কতই মধুর ! এ দৃশ্য দর্শনে ভক্তের হৃদয়ে ভক্তি ও প্রেমের তরঙ্গ উত্থিত হইয়া থাকে। মতিবাবুর হৃদয়ে তখন নবানুরাগের সঞ্চার হইয়াছে, ভগবানের আরিত্রিক দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি ও প্রেমের তরঙ্গ উত্থিত হইল। তিনি যেন দেখিতে পাইলেন যে, শ্রীরাধিকা তাঁহার দিকে অনিমেষলোচনে চাহিয়া রহিয়াছেন, আর মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। এদৃশ্য দর্শন করিয়া তিনি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না. বসিয়া পড়িলেন এবং শেষে তাঁহার চৈতন্য লোপ হইল। জ্ঞান লাভ করিয়া মতিবাবু দেখিলেন,

মন্দিরের জনতা কমিয়া গিয়াছে, কেবল কয়েকটি লোক তাঁহার শুশ্রুষায় নিযুক্ত। তিনি চৈতন্যলাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দেহ যেন অবশ। তিনি দারোয়ানের শরীরে ভর দিয়া ভগবানের আরাত্রিক, তাঁহার প্রতি শ্রীমতি রাধার অনিমেষ দৃষ্টি ও সুমধুর হাস্যের কথা চিন্তা করিতে করিতে ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বাড়ীতে পৌঁছিয়াই মতিবাবু সেজদাদাকে সকল কথা বলিলেন। ঘটনাটি বর্ণনা করিবার সময় তাঁহার অঙ্গ পুলকিত হইতে লাগিল। ভক্ত শিশিরকুমারের প্রেম সিন্ধু উথলিয়া উঠিল, তিনি অনুজ মতিলালকে বক্ষে ধারণ করিলেন ; উভয়ের নয়ন হইতে আনন্দধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই ঘটনার পর হইতেই শিশিরকুমার শ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ন্যায় ভক্তের পক্ষে অবিশ্বাস বর্জ্জন করিয়া হৃদয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিতে অধিক সময় প্রয়োজন হইল না ; অত্যল্পকালের মধ্যেই তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণে পূর্ণ বিশ্বাসী হইলেন।

শিশিরকুমার তাঁহার আত্মকাহিনীর মধ্যে এক স্থানে লিখিয়াছেন, "শ্রীগৌরাঙ্গ বস্তুটির প্রতি চিরকালই আমার একটু টান ছিল।" কেন যে তাঁহার এই টান ছিল, আমরা তাহা এক্ষণে উল্লেখ করিব। শিশিরকুমারেব বয়স তখন তের বৎসর এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠগ্রজ বসন্ত কুমারের বয়স আঠার বৎসর। কথা প্রসঙ্গে বসন্তকুমার একদিন বলিয়াছিলেন, "অবতারে দৃঢ় বিশ্বাস বড় ভাগ্যের কথা। তবে যদি কখন কোন অবতারে বিশ্বাস করিতে পারি, তবে নদের গৌরাঙ্গের শরণাগত হইব।" শিশিরকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কে?"

বসন্তকুমার—"তুমি শুন নাই, যেমন খ্রীষ্টিয়ানদের যীশুখৃষ্ট, তেমনি আমাদের নবদ্বীপের নিমাই—দুজনায় অনেক মিলে।" শিশিরকুমার নবদ্বীপের প্রেমাবতার নিমাই চাঁদের একখানি চিত্রপট একবার দেখিয়াছিলেন। এই নিমাইচাঁদ কে? তিনি কিরূপে বঙ্গদেশে ধর্ম্ম

শ্রীঅমিয় নিমাই চরিতের দ্বিতীয় খণ্ডের উৎসর্গ পত্র হইতে গৃহীত।

ও সমাজনীতির ভিতর দিয়া প্রেমের বন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন, শিশিরকুমার তখন তাহার কিছুই জানিতেন না। কিন্তু তিনি বঙ্গ ভাষার খ্রীষ্টিয়ানদিগের লুক্ লিখিত সুসমাচার পাঠ করিয়া ও জ্যেষ্ঠগ্রজ বসন্তকুমারের মুখে শুনিয়া যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি দাদাকে জিজ্ঞসা করিলেন,—'যীশুখৃষ্ট অনেক অলৌকিক কার্য্য করেন, নদের নিমাই কি তেমন কিছু করিয়াছিলেন ?"

বসন্ত উত্তর করিলেন,—"অদ্ভুত কার্য্য না করিলে সহজে কি লোকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া সম্মান করে ? যীশুর কার্য্য ও নিমাই এর কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, শ্রীভগবানের অবতার কার্য্যটি সত্য। কারণ অবতার কার্য্যটি একেবারে কল্পনা হইলে পৃথিবীর দুইস্থানে, দুই জাতির মধ্যে, দুই সময়ে, এরূপ ঠিক একরূপ ঘটনা হইবার সম্ভাবনা হইত না।" বসন্তকুমার কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিলেন,—"অবতার যদি কখনও মানিতে পারি, তবেই আরাম পাইব।"

শিশিরকুমার প্রশ্ন করিলেন—"যীশুখৃষ্ট না মানিয়া, দাদা, তুমি গৌরাঙ্গ কেন মানিবে ?"

বসন্তকুমার—"শ্রীভগবানের কার্য্যে ভুল নাই ও জটিলতা নাই। তিনি যে দেশের যে পীড়া, সেই দেশে তাহার ঔষধ দিয়া থাকেন। সাপের যদি ঔষধ থাকে, তবে যে দেশে সাপ আছে, সেই খানেই তাহা পাওয়া যাইবে। যদি তিনি দুইস্থানে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে সাধারণতঃ ইহুদীয় দেশের লোকের যীশুকে মানা কর্ত্তব্য, কিন্তু আমরা বাঙ্গালী কি ভারতবর্ষীয় লোক, আমাদিগকে গৌরাঙ্গ মানিতে হইবে।"

শিশির—"অবতারে বিশ্বাস বড় ভাগ্যের কথা, ইহার অর্থ কি ?"

বসন্তকুমার—"শিশির ! আমরা কেন কান্দিয়া বেড়াই জান ? আমরা সকলে যেন পিতৃহীন বালক, বিপদসাগরে পড়িয়া হাহাকার

করিয়া বেড়াইতেছি। ঈশ্বর বলিয়া ডাকি, কিন্তু তিনি শুনেন না শুনেন, তাহা জানি না। তিনি শুনেন, একথা যদি জানিতে পাই, তবেই দুঃখের লাঘব হয়। যদি আরও জানিতে পাই যে, তিনি শুধু শুনেন, তাহা নয়, আমাদের প্রতি তাঁহার প্রচুর স্নেহ-মমতা আছে, তবে আর একটুও দুঃখ থাকে না। অবতার মানে এই যে, তিনি আমাদের দুঃখে কাতর হইয়া, আপনি আমাদের মধ্যে আগমন করেন, কি কোন নিজ জনকে প্রেরণ করেন। সুতরাং অবতারে বিশ্বাস হইলে সেই সঙ্গে এ বিশ্বাসও হইবে যে, শ্রীভগবান অতি নিজ জন, তিনি আমাদের দুঃখে অতি কাতর। এরূপ যাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, তাঁহার আবার দুঃখ কি? দুঃখ হইলেও সে উহা অনায়াসে সহিয়া থাকিতে পারে।"

শিশিরকুমার তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ বসন্তকুমারের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "যেমন কাদা দিয়া পুতুল গড়ে, সেইরূপ তিনি আমাকে গড়িয়াছিলেন।" আমরা একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রাজনীতির ন্যায় ধর্ম্মনীতি ক্ষেত্রেও শিশিরকুমার তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজকে গুরুজ্ঞান করিতেন। আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি, বসন্তকুমার ও তাঁহার সহোদরগণ তখনও ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন নাই। অতি অল্প বয়সেই বসন্তকুমার ভগবদ্ভক্তিতে অভিসিঞ্চিত হইয়াছিলেন। শিশিরকুমার দাদার ভাব লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। একদিন বসন্তকুমার স্বরচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী গান করিতেছিলেন,—

"আমার বন্ধু কত রস জানে। ধ্রু।
(আমি) মনেতে ধরিতে নারি, বর্নিব কেমনে॥
(আমি) যখন চেতন থাকি, তাঁহারি করুণা দেখি,
তাঁহারি করুণা দেখি, নিশির স্বপনে॥"

বসন্তকুমার গানটী গাহিতেছেন, আর তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অবিরল প্রেমাশ্রু নিপতিত হইতেছে; এমন সময় শিশিরকুমার সেখানে উপস্থিত হইলেন। দাদার ভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি বিস্মিত

ও মুগ্ধ হইলেন এবং শেষে ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দাদা, তুমি কান্দ কেন?" দাদা নয়ন মুছিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "তুমি আর একটু বড় হও, বুঝিবে।" শিশিরকুমার এই ক্রন্দনের অর্থ ভবিষ্য জীবনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠাগ্রজের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের সম্বন্ধে কথোপকথনের পর হইতেই শিশিরকুমারের শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি টান হইয়াছিল।

বসন্তকুমার অতি অল্প বয়সেই ইহধাম পরিত্যাগ করেন, একথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি তাঁহার সহোদরগণের গুরু ছিলেন। শিশিরকুমার জ্যেষ্ঠাগ্রজের পরলোক গমনের পর মধ্যাগ্রজ হেমন্তকুমারকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মজীবন গঠনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। জ্ঞানাভিমানী শিশিরকুমার হেমন্তকুমারের সংসর্গে কিরূপে গৌরাঙ্গসেবক হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা পাঠকবর্গকে অবগত করাইবার জন্য আমরা তাঁহারই লিখিত একটি প্রবন্ধ ১২৯৯ সালের চৈত্র মাসের শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"কয়েক বৎসর গত হইল, আমরা দুই ভাই একটি শোক পাইয়া ব্যথিত হই। তখন আমরা ভাবিলাম যে যখন সকলকেই মরিতে হইবে, তখন মরিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু কি করিব, কোথায় যাইব? মরিবার জন্য প্রস্তুত কিরূপে হইতে হয়, ইহা লইয়া দুই ভাই চিন্তা ও বিচার করিতে লাগিলাম।

"পরিশেষে ইহা স্থির হইল যে মুক্ত হইবার দুইটি পথ আছে। এক জ্ঞান পথ, আর এক ভক্তি পথ। কিন্তু ইহার কোন্‌টী ভাল? কোন পথে আমরা যাইব? তখন এ সম্বন্ধে কোনরূপ নিশ্চয় করিতে না পারিয়া দুই ভাই দুইটী পথ ভাগ করিয়া লইলাম। মেজদাদা লইলেন ভক্তি পথ, আমি লইলাম জ্ঞান-পথ। এরূপ ভাগে আমরা কেহই অসন্তুষ্ট হইলাম না। কারণ আমার মেজদাদা মধুর প্রকৃতি, ভক্তিময় ও সর্ব্বজীবে দয়ালু; আর আমি জ্ঞানাভিমানী, তেজীমান, ভক্তিহীন ও হৃদয়শূন্য।

"মেজদাদার আমার অপেক্ষা অনেক সুবিধা ছিল। কারণ ভক্তি পথ শ্রীনবদ্বীপের শ্রীগৌরাঙ্গ পরিস্কার করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সে পথ দিয়া অন্ধ লোকেও যাইতে পারে। অতএব তিনি শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ অতি মনোযোগের সহিত অনুশীলন করিতে লাগিল। কিন্তু আমি বড় বিপদে পড়িলাম। জ্ঞান-পথের গুরু কোথায় ?

"অগ্রে আমার কথা কিছু বলিয়া লই। আমি যখন ব্যাকুল হইয়া জ্ঞান-পথের অনুসন্ধান করিতেছি, তখন শুনিলাম বোম্বাই নগরে আমেরিকা দেশ হইতে ব্লাভাটস্কী নাম্নী একটি মেম ও অল্‌কট্ নামক একটি সাহেব আসিয়াছেন, ইঁহারা পরম যোগী সিদ্ধপুরুষ, অনেক অলৌকিক ক্রিয়াও করিতে পারেন। এই কথা শুনিয়া আমি বোম্বাই নগরে তাঁহাদের নিকট যাত্রা করিলাম ও তিন সপ্তাহকাল তাঁহাদের গৃহে বাস করিলাম। তাঁহাদের নিকট কিছু কিছু দেখিলাম ও কিছু কিছু শিখিলাম। পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া যোগাভ্যাস করিতে লাগিলাম। কিন্তু দেহ অপটু, আর কলিকাতা জনাকীর্ণ স্থান। এই নিমিত্ত কৃষ্ণনগর জেলায় চুর্ণী নদীর ধারে, হাঁসখালি গ্রামে একটি পরিত্যক্ত নীল কুঠিয়ালের বাড়ী ভাড়া লইয়া সেখানে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলাম। আর সেখানে নির্জ্জনে কিছু কিছু মনঃসংযমের কার্য্যও অভ্যাস করিতে লাগিলাম।

"এদিকে আমার মেজদাদা মহাশয় আমাদের জন্মস্থান যশোহর জেলাস্থ মাগুরা (অমৃতবাজার) গ্রামে সপরিবারে থাকিয়া ভক্তি-চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। তিনি গ্রামস্থ লোক লইয়া একটী হরি-সংকীর্ত্তনের দল করিলেন। সন্ধ্যাকালে হরিসংকীর্ত্তন করেন, আর অন্যান্য সময়ে ভক্তি গ্রন্থানুশীলন করেন। মেজদাদা মহাশয়ের ভক্তি রস ক্রমেই উৎকর্ষ লাভ করিতে লাগিল। তাঁহার সদগুণে গ্রামস্থ অনেক লোকেও ভক্তিমান হইতে লাগিলেন।

"ক্রমে সঙ্কীর্ত্তনের তেজ বাড়িয়া উঠিল। প্রথম একবার করিয়া
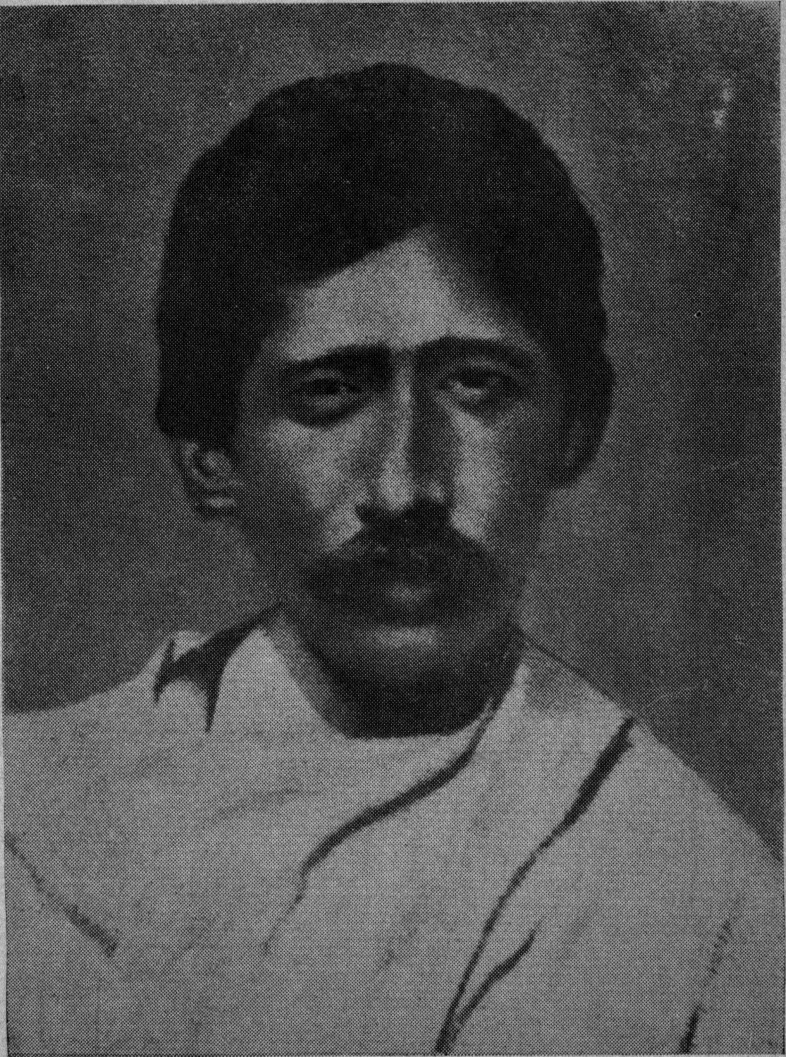
হেমন্ত কুমার ঘোষ।

সন্ধ্যাকালে হইতেছিল, পরে প্রাতে এবং অবশেষে আবার অপরাহ্ণেও সঙ্কীর্ত্তন হইতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মেজদাদা প্রায় অহর্নিশ সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

"গ্রামস্থ লোকে সেই তরঙ্গে ডুবিয়া গেলেন। এমন কি, অনেকে আপনাদের সাংসারিক কার্য্য করিতে অপারগ হইতে লাগিলেন। শেষে সঙ্কীর্ত্তনের বিবিধ দলের সৃষ্টি হইতে লাগিল। বালকের একদল হইল, এবং স্ত্রীলোকেও কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"আমার মেজদাদা মহাশয় তখন সঙ্কীর্ত্তনে দশা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। আর তখন তিনি সমুদায় বিষয় কার্য্য বিসর্জ্জন দিয়া কেবল ভক্তি তরঙ্গে সন্তরণ দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

"আমাদের প্রায় দুই মাস দেখাশুনা নাই। কিন্তু মেজদাদা সমস্ত দিবারাত্রি কিরূপে যাপন করেন, তাহা প্রত্যহ আমাকে লিখেন। আমিও প্রত্যহ পত্র লিখি। কিন্তু আমার লিখিবার কিছু নাই, সুতরাং বিষয় কথা ব্যতীত পরমার্থ কথা কিছুই লিখি না। এমন সময় আমাকে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, মেজদাদা মহাশয় হাঁসখালিতে শুভাগমন করিলেন।

"দেখি, মেজদাদা মালা ধারণ করিয়াছেন। মুখের আকৃতির কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। মুখ দেখিয়া বোধ হইল যেন হৃদয়ে ক্লেশ মাত্র নাই। নয়ন দেখিয়া বোধ হইল যেন অন্তরে আনন্দের তরঙ্গ খেলিতেছে। মেজদাদার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ভাবিলাম, মেজদাদা যে পথ লইয়াছেন, ইহাতে অবশ্য কিছু আছে।"

"মেজদাদাকে দর্শন করিয়া বড় সুখ বোধ হইল। তিনি তখন এক সন্ধ্যা আহার করেন; মৎস্যাদি সমুদায় ত্যাগ করিয়াছেন। আমি যত্ন করিয়া তাঁহার নিমিত্ত বিবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করাইলাম। মাংস রহিল না বটে, কিন্তু মৎস্যাদি বহু প্রকার রহিল। দুই ভ্রাতা ভোজন করিতে বসিলাম। মেজদাদার থালে মোটা চিঙ্গড়ীর মাছের দুটি ভাজা

মাথা ছিল। মেজদাদা আসনে বসিলেন। কিন্তু চিঙ্গড়ীর মাথা ও অন্যান্য মৎস্যের ব্যঞ্জন দেখিয়া কাতর ভাবে আমার দিকে চাহিতে লাগিলেন।"

"আমি বলিলাম, বৈষ্ণবগণ মৎস্যাদি খাইয়া থাকেন, তুমি কেন খাইবে না? তাহার পর বলিলাম, যে ধর্ম্মে খাইলে ধর্ম্ম যায়, না খাইলে ধর্ম্ম হয়, অর্থাৎ খাওয়ার সঙ্গে যে ধর্ম্মের ভাল মন্দ সম্বন্ধ আছে, সে ধর্ম্ম আমি মানি না।"

"মেজদাদা কোন উত্তর না দিয়া কাতরভাবে আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। তখন আমি হাসিয়া বলিলাম, ভণ্ডামি করিতে হয় বাহিরে করিও, আমার এখানে কেন? তবু মেজদাদা থালায় হাত দিলেন না। তখন বলিলাম, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ যত্ন করিয়া অতি ভক্তিপূর্ব্বক তোমার নিমিত্ত স্বীয় হস্তে পাক করিয়াছে। তুমি ভক্ত বৎসলের পূজা কর, ভক্তের দ্রব্য কেমন করিয়া ত্যাগ করিবে? ইহাই বলিয়া একটু মৎস্য হাতে করিয়া মেজদাদার মুখে দিলাম। আমি যখন নিজ হস্তে তাঁহার মুখে মৎস্য দিতে গেলাম, তখন মেজদাদা হাঁ না করিতে পারিলেন না। এইরূপে আমি মেজদাদার ধর্ম্ম নষ্ট করিলাম।"

"দেখা অবধি দুইজনে কথা চলিতেছে। এক মুহূর্ত্তও ফাঁক নাই। কখন সুখ দুঃখের কথা বলিতেছি। ধর্ম্মের কথা আরম্ভ হইলে ঘোর তর্ক বাধিয়া গেল। এইরূপে সারাদিন তর্কে গেল। আমি মেজদাদাকে বলিলাম, তোমার গৌর আমার বড় প্রিয় বস্তু। যদিও তাঁহার মতের সহিত আমার সমুদায় মিলে না, তবু তাঁহার নাম করিলে আমার আনন্দ হয়। কিন্তু তিনি যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন, সে স্ত্রীলোকের কি দুর্ব্বলচেতা মনুষ্যের জন্য। তেজস্বী পুরুষের স্ত্রীলোকের মত কান্দিলে চলিবে কেন? পুরুষ জ্ঞান চর্চ্চা করিতে পারিলে আর কান্নাকাটীর মধ্যে কেন যাইবে?"

"ভক্ত পাঠকগণ বোধ হয় বুঝিতেছেন যে, তখন আমার শ্রীগৌরাঙ্গে বিশ্বাস ছিল না। এমনকি মেজদাদা যদিও হরিনামে উন্মত্ত হইয়াছিলেন,

তবু তিনিও তখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতেন না। সে যাহা হউক, জ্ঞান বড় না ভক্তি বড়, এই কথা লইয়া তর্ক হইল। আমি বলি জ্ঞান বড়, মেজদাদা বলেন ভক্তি বড়। কিন্তু মেজদাদা আমার সহিত কখন তর্কে পারিতেন না। তবে আমার আন্তরিক টান বরাবরই ভক্তির দিকে ছিল।"

"মেজদাদা যদিও তর্কে পারিলেন না, কিন্তু আমি মনে বুঝিলাম যে, তিনি অগ্রবর্তী হইয়াছেন, আর আমি পাছে পড়িয়া গিয়াছি। ফল কথা, মেজদাদাকে দেখিয়া আমি বেশ বুঝিলাম, তিনি আমার অপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছেন। এমন কি, আমি তাঁহার মত হই নাই বলিয়া মনে মনে বড় দুঃখ হইতে লাগিল। কিন্তু মুখে আমি তাহা স্বীকার করিলাম না, ইহা আমার মনে মনে রহিল। মুখে আস্ফালন করিতেছিলাম, কিন্তু মনে বেশ বুঝিলাম যে তিনি আমার অপেক্ষা অনেক বড় হইয়াছেন, আর গৌরাঙ্গের মতন ভাল।"

"বিকালে দুই ভাই গাড়ীতে বেড়াইতে গেলাম। গাড়ীতেও ঐকথা। ফিরিয়া আসিতে রাত্রি হইল। তখন গাড়ী মধ্যে কথাবার্ত্তা বন্ধ হইল; মেজদাদার আপনার ভাবে রহিলেন, আমি আমার ভাবে রহিলাম।"

"একটু পরে মেজদাদা গুন্ গুন্ করিয়া গীত গাহিতে লাগিলেন। গীতটীর সমুদায় কথা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু কথা বুঝিবার প্রয়োজন হইল না। সেই গীতটী আমার হৃদয় কোমল ও শ্রবণ তৃপ্ত করিতে লাগিল। ফল কথা, ভক্তের কণ্ঠস্বর একরূপ মন্ত্র বিশেষ। ভক্তের শুদ্ধ কণ্ঠস্বরেই জীব মাত্রের হৃদয় স্পর্শ করে।"

"মেজদাদা গুন্ গুন্ করিয়া গাইতেছেন, আর আমার বোধ হইতেছে যেন শ্রীভগবান আমার হৃদয়ে বসিয়া করুণস্বরে রোদন করিতেছেন। আমি মনোনিবেশপূর্ব্বক সেই করুণা ও মধুর স্বর শুনিতে লাগিলাম। ক্রমে উহা আমার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল, আর ক্রমে আমাকে অস্থির করিতে লাগিল। সেই গুন্ গুন্ স্বরটী শেষে হৃদয়ে রহিয়া গেল,—অদ্যাপিও আছে।"

"মেজদাদা যে গীতটী গাইতেছিলেন তাহা আমি পরে শিখিয়াছিলাম। সে গীতটী তাঁহার নিজের কৃত। সেটী এই—

"হা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধূলায় পড়িল গোরা।
ধূলায় ধূসরিত অঙ্গ দুনয়নে বহে ধারা॥
ক্ষণেক চেতনা পায়, বলে আমার কৃষ্ণ নাই,
এই ছিল কোথা গিয়া লুকাইল মনোচোরা॥
হা হরি হরি হরি, হরি তুমি কোথা হে,
তুমি আমার প্রাণধন, তুমি আমার নয়নতারা॥

শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা ঘটিত গীত পূর্ব্বে মহাজনগণ কিছু কিছু প্রস্তুত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে প্রথা একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছিল। সেই প্রথা মেজদাদা কর্ত্তৃক পুনর্জ্জীবিত হইল। এখন উল্লিখিত আদি গীতটী দেখাদেখি গৌরাঙ্গলীলা ঘটিত কত শত পদে সৃষ্টি হইয়াছে।

"সে যাহা হউক, পর দিবস মেজদাদা বাড়ী চলিয়া গেলেন। তিনি গেলেন বটে, কিন্তু কিছু রাখিয়া গেলেন। তাঁহার সেই করুণ স্বরটুকু আমার হৃদয়ে রহিয়া গেল। মেজদাদা বাড়ী যাইয়া আমাকে একপত্র লিখিলেন, তাহার ভাবার্থ এই;—'শিশির। আমি জুড়াইবার নিমিত্ত তোমার কাছে গিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে জুড়াও নাই।'

"মেজদাদার এই পত্রে আমি মর্ম্মাহত হইলাম। কারণ, আমি বুঝিলাম যে মেজদাদা যে কথা লিখিয়াছেন, তাহা সমুদায় ন্যায্য। আমি আগেও বুঝিয়াছিলাম, তখন আরো বুঝিলাম, যে আমি বৃথা জ্ঞানের কথা বলিয়া মেজদাদার হৃদয়ে বড় ব্যথা দিয়াছি। তখন হৃদয়মাঝারে সেই গুন্ গুন্ শব্দটী আরো যেন কান্দিয়া উঠিল।

"তখন ভাবিলাম, শ্রীগৌরাঙ্গ আমার প্রিয়বস্তু, আর মেজদাদাও আমার প্রিয়বস্তু। এ উভয়ের অনুরোধে আমার শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা কিছু জানা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেও গৌরাঙ্গের লীলা কিছু কিছু শুনিয়াছিলাম, এবং শুনিয়া উহার প্রতি বড় লোভ জন্মিয়াছিল।

যখনই গৌরাঙ্গ-লীলা শুনিতাম, তখনই উহা আমার নিকট মধু হইতে মধুরতর বোধ হইত।”

“আর বিলম্ব না করিয়া কলিকাতা হইতে শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ পাঠাইতে লিখিলাম, আর মেজদাদার পত্রের উত্তর দিলাম। মেজদাদাকে যাহা লিখিলাম, তাহার ভাবার্থ এই;—এবার তুমি আমার সঙ্গে যে দুঃখ পাইয়াছ, অন্যবারে আমি তাহা দূর করিব। বিচিত্র কি, হয় ত আমিও তোমার মত হরিবোলা হইব।”

“শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থখানি আসিল। আমি উহার প্যাকেট খুলিলাম। পুস্তকখানি হাতে করিলাম, আর কি জানি কেন, আমার অঙ্গ দিয়া যেন একটী আনন্দের লহরী চলিয়া গেল। পিপাসাতুরের জলপান করিয়া যেরূপ অঙ্গ শীতল হয়, পুস্তকখানি স্পর্শ করিয়া সেইরূপ আমার তাপিত হৃদয় শীতল হইল। আমি চৈতন্যভাগবত অল্প অল্প করিয়া পড়িতে লাগিলাম। অল্প অল্প বলি কেন, না, অতি অল্পেই আমার হৃদয় ভরিয়া যাইতে লাগিল।”

“মেজদাদা মহাশয় কখন কখন আবিষ্ট হইতেন ও আবিষ্ট হইয়া আমাকে পত্র লিখিতেন, সে সমুদয় পত্রগুলি যেন তাঁহার হৃদয়ে কেহ প্রবেশ করিয়া লেখাইতেন। সেই আবিষ্ট অবস্থার আদেশগুলি আমি বড় মান্য করিতাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মেজদাদাকে আমি পত্র লিখিয়াছিলাম যে, পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইলে আর তাঁহাকে দুঃখ দিব না। সেই পত্রের উত্তর আসিল।”

“তখন সকাল বেলা, প্রায় আটটার সময়। আমি ঘরে একেলা আছি। আমার ঘরের মেঝে বাঁশের চাঁচ দ্বারা মণ্ডিত। মেজদাদার পত্রখানি খুলিলাম, তাহাতে যাহা লেখাছিল, তাহার ভাব এই;— ‘শিশির! কোন্ দেবতা, আমি তাঁহাকে চিনি না, আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বলিলেন যে, তোমার কনিষ্ঠ শিশির, ওটি শ্রীগৌরাঙ্গের চিহ্নিত দাস। ঐ দেহ দ্বারা মহাপ্রভু অনেক কার্য্য সাধন করিবেন।”

“এই পত্রখানি পড়িয়া আমি সেই চাঁচের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।”

"একটু পরে উঠিয়া বসিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। আমি এই মাত্র বলিয়াছি যে, মেজদাদা এরূপ আবিষ্ট হইয়া আমাকে যে উপদেশগুলি পাঠাইতেন, আমি তাহা বিশ্বাস করিতাম। মেজদাদার পত্রে সুতরাং যাহা লেখাছিল, আমি তাহা বিশ্বাস করিলাম। কিন্তু আমি মনে মনে এইরূপ ভাবিলাম, 'এ আবার শ্রীভগবানের কি লীলা? প্রেমভক্তি প্রচারের জন্য কি আর দেহ মিলল না? আমি কঠিন, কর্কশ, ভক্তিপূণ্য রাজনীতি লইয়া বিব্রত, ইংরেজী পড়িয়া এক প্রকার নাস্তিক হইয়াছি।' আবার ভাবিলাম, 'আমা দ্বারা শ্রীভগবান প্রেমভক্তি প্রচারের কার্য্য করিবেন, তাহা তাঁহার পক্ষে বৈচিত্র্য কি? তিনি ইচ্ছা করিলে অন্ধের দিব্য চক্ষু হয়। তাঁহার ইচ্ছা হইলে এই পাষাণবৎ হৃদয়ে ভক্তিব অঙ্কুর হইবে, তাহার আর বৈচিত্র কি?

"আমার এখন বোধ হয় যে, সে পত্রখানি দ্বারা মেজদাদা মহাশয় আমাকে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন।"

"আমি তখন অতি কাতরভাবে করযোড়ে শ্রীভগবানকে নিবেদন করিলাম যে, 'ভগবান! যদি তুমি অসাধনে, কেবল আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া, দয়ালু হইয়া, নিজগুণে আমার প্রতি এরূপ কৃপা কর তবে আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে যথাসাধ্য সরলমনে তোমার চরণ ভজন ও জগতে তোমার গুনগান করিব।"

শিশিরকুমার যে শ্রীগৌরাঙ্গের চিহ্নিত দাস ছিলেন' তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; কারণ তাহা না হইলে শুষ্কও কঠোর রাজনীতি লইয়া তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি শ্রীভগবানের প্রেম ও ভক্তি সাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে সমর্থ হইতেন না। নব্য শিক্ষিতগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত বৈষ্ণবসমাজকে শিশিরকুমার কিরূপে সমাদরভাজন করিয়াছিলেন, বৈষ্ণবসমাজের প্রকৃত উন্নতির ও পাশ্চাত্য প্রদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার জন্য তিনি কিরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করিব।

——

দশম অধ্যায়

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের ছোট হরিদাস নামে একজন ভক্ত ছিলেন। তিনি একদিন মাধবী নাম্নী একটি বিধবা স্ত্রীলোকের নিকট আতপ তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও, আমি তোমার মুখ দেখিতে চাই না।" প্রভুর আদেশ শ্রবণ করিয়া হরিদাস অস্থির হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া অন্যান্য ভক্তগণ প্রভুকে হরিদাসের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করিলে প্রভু বলিয়াছিলেন,—

"বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
হেরিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥"

বৈরাগীর পক্ষে প্রকৃতি সম্ভাষণমাত্র যাঁহার নিকট মহাপাপ বলিয়া বিবেচিত হইত, তাঁহার প্রবর্ত্তিত মধুর বৈষ্ণবধর্ম্মে নেড়ানেড়ীর আবির্ভাব ও যথেচ্ছাচারিতা গভীর পরিতাপের বিষয়! কতকগুলি স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি বৈষ্ণবধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া, প্রেম ও কামের পার্থক্য সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের মধুর ধর্ম্মকে এরূপ কলঙ্কিত করিয়াছে যে, বৈষ্ণব সমাজের নামে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে কেমন একটা ঘৃণার ভাব উদয় হইয়া থাকে। বৈষ্ণবধর্ম্মে নবানুরাগের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সিদ্ধান্ত, সাধন ও লীলা অবগত হইবার জন্য শিশিরকুমারের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্মোপদেশ লাভের আশায় শিশির-কুমার অর্থ ব্যয় করিয়া বিভিন্ন স্থান হইতে বহু খ্যাতনামা বাবাজী ও গোস্বামীকে আপন বাটীতে আনাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া তিনি হৃদয়ে শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই; বরং তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। এই বাবাজীও গোস্বামীগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে বলিয়াছিলে যে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পরস্ত্রীর সহিত যুগল

সাধনা ও নাগরী ভাবের সাধক হইয়া পরকীয়া রসের আস্বাদন করা একান্ত কর্ত্তব্য। বলা নিস্প্রয়োজন যে, শিশিরকুমার এই সকল উপদেশ বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং যে প্রেমে কামগন্ধ নাই, তাহাই প্রকৃত বৈষ্ণবের গ্রহণীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ শিশিরকুমারের নিকট বিশেষভাবে ঋনী, পরম বৈষ্ণব, পণ্ডিতবর প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে শিশিরকুমার বৈষ্ণব সমাজের উন্নতির জন্য কি করিয়াছিলেন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

শ্রীশ্রীহরিশরনং

৪০।১।এ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা।
৩রা কার্ত্তিক, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ

আশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন,—

আপনার পত্র পাইলাম, আপনি পরলোকগত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ পরিচয়াদি সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিয়াছেন। সন তারিখ ঠিক স্মরণ নাই, সম্ভবতঃ ১৩০৪ কি ১৩০৫ সালে তাঁহাদের বাগবাজারের বাটীতে আমি শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ কিনিতে যাই; সেই সূত্রে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। প্রথম আলাপেই তিনি আমাকে ভালবাসিয়া ফেলেন। তাহার পর হইতে প্রায় আমি তাঁহাদের বাড়িতে যাইতাম। কথায় কথায় কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি তাঁহার অসাধারণ প্রীতির পরিচয় পাইয়া পরম আনন্দলাভ করিতাম। প্লেগের প্রাদুর্ভাবে কলিকাতায় যে মহাসঙ্কীর্ত্তনের মহামঙ্গলময় অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহা শিশিরবাবুরই আন্তরিক প্রযত্নের অমৃতময় ফল। অবশ্য সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায় সংগ্রহ কিম্বা নূতন দল গঠন বিষয়ে আমাকে যথেষ্ঠ প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। ধর্ম্ম বক্তৃতার ভারটা প্রধানতঃ পাঁচকড়ি ভায়া (নায়ক সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং আমাকেই লইতে

হইয়াছিল। ঐ সময় শিশিরবাবু আমাদের দুইজনকে আদর করিয়া বলিতেন,—তোমরা দুইজনে হীরার টুকরা; তোমাদের সাহায্যে আমি বিশ্বজয় করিতে পারি, তাঁহার সহিত আমার সকল বিষয়ের মিল না থাকিলেও, তাঁহার আচার ব্যবহারও ঠিক বৈষ্ণব শাস্ত্র সম্মত না হইলেও, আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাঁহার কাছে যথেষ্ট ঋণী। তাঁহার মত শিক্ষিত ব্যক্তি অমন সরল ও সরস ভাষায় গৌরকথা প্রচার না করিলে আজ শিক্ষিত সমাজে এত আগ্রহের সহিত গৌর কথা বলিবার ও শুনিবার লোক পাইতাম বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত যে অন্য কোনই উপায় নাই, একথা তিনি যেমন বর্ত্তমানকালের উপযোগীভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তেমনটী আর কাহাকেও করিতে দেখা যায় না। তাঁহার সাধনা সফল হইয়াছে, তাঁহার অমিয়-নিমাই চরিতের অমৃত রসে আজ বিশ্বসংসার অভিষিক্ত; শান্তির পথ পাইয়া আজ সকলেই পুলকিত। ইতি—

সতত শুভানুধ্যায়ী
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ।

কিঞ্চিধিক চারি শত বৎসর পূর্ব্বে, প্রেমের দেবতা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেব নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার আদেশ ক্রমে নিত্যানন্দ ও হরিদাস প্রথমে নবদ্বীপেই কৃষ্ণনাম বিতরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহা তাঁহার ভক্তগণের চেষ্টায় ভারত-বর্ষে ও নানাদেশে প্রবেশ করিয়াছিল। বুদ্ধ শিষ্যগণের পর মহাপ্রভুর ভক্তগণ ভারতবর্ষে পুনরায় ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে হইতে যে প্রেমের বন্যা উত্থিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়া ভারতের শস্যক্ষেত্রে সরসতা ও উর্ব্বরতা শক্তি উৎপাদন করিয়াছিল। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও তাঁহার অনুরক্ত ভক্তগণ ভারতবর্ষে যে শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাবে দেশবাসিগণ কিছুকাল আত্মহারা হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু

কালক্রমে সুধামধুর বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার অভাবে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর পবিত্র ধর্ম্মে পাপ প্রবেশ করায় তাহা সুধীসমাজে ঘৃণার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে যে আদৌ কোন ধর্ম্মপ্রাণ ভক্ত ছিলেন না, একথা আমরা বলিতে চাহি না; তবে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, এই সকল ধর্ম্মত্রাণ মহাত্মা আপন আপন আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয়েই যত্নশীল ছিলেন, বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার কার্য্যে তাঁহারা অদৌ মনোনিবেশ করেন নাই। ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত জীবের পক্ষে কোন কার্য্যই করা সম্ভব নহে। ভক্ত শিশির কুমার গৌরাঙ্গ প্রেমে মজিয়া ও মহাপ্রভুর অনুগ্রহ লাভ করিয়া যখন দেখিলেন যে, পবিত্র ও মধুর বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচার অভাবে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, তখন তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারে বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্মই পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, ইহা প্রমাণ ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য শিশিরকুমার প্রথমে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা ও পরে শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা প্রথমে মাসিক ছিল। ক্রমে আবশ্যক বোধে ইহাকে পাক্ষিকে পরিণত করা হয়। সর্ব্বশেষে পত্রিকাখানিকে আনন্দবাজার ও বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা নাম দিয়া সাপ্তাহিক করা হইয়াছিল। এই সাপ্তাহিক পত্রিকায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিষয়ক নানা কথার সহিত সাধারণ সংবাদও প্রকাশিত হইত। বর্ত্তমানে ইহা অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। আনন্দবাজার ও বিষ্ণুপ্রিয়া প্রকাশিত হওয়ার পর কেবল বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশ্যে শিশিরকুমার শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা নামক আর একখানি মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এ পত্রিকাখানিও দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে নাই।

১৮৯৯ খৃঃ অঃ প্রথম ভাগেই (১৩০৫ সালের শেষাংশে) শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। শিশিরকুমার ইহার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিকে কোনও পদ গ্রহণ করেন নাই, কারণ প্রতিষ্ঠাশা তাঁহার হৃদয়ে কখনও স্থান পাইত না। টাকীর সুপ্রসিদ্ধ ও সুশিক্ষিত জমিদার রায় শ্রীযুক্ত

যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ মহাশয় ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত রসিক মোহন চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণ মহাশয় যথাক্রমে শ্রীসমাজের ধনাধ্যক্ষ ও সম্পাদক মনোনীত হয়েছিলেন। সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ বাগবাজারে একটী বাড়ী, ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। সেখানে সমাজের সাধারণ অধিবেশন পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা ও হরিনাম সংকীর্ত্তন হইত। ইংরাজ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ অধিকৃত হওয়ার ত্রিশ বৎসর পরে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারকগণ আমাদের দেশে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচারার্থ হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। হিন্দুর দেব দেবী কিছুই নহে ; দেবাদিদেব মহাদেব ভাঙ্ ও গাঁজাখোর, শ্রীকৃষ্ণ লম্পট শিরোমণি, দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবীগণ শোণিত লোলুপা,— সুতরাং তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং মুক্তির জন্য খৃষ্টধর্ম্ম আলিঙ্গন করিতে হইবে, ইহাই খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মপ্রচারকগণ পথে পথে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন। স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই উৎপাত কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিয়াছিলেন, কিন্তু এখনও নানাস্থানে খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারকগণকে তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচারের জন্য হিন্দুধর্ম্মের প্রতি কটাক্ষ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। শিশিরকুমার বুঝিয়াছিলেন যে, গৌরাঙ্গ-সমাজের গৃহে বসিয়া কেবল পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তন করিলে চলিবে না; গৌরাঙ্গ-সমাজের পক্ষ হইতে প্রচারকগণকে কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণের ন্যায় সোৎসাহে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে হইবে। কলিকাতার যে সকল স্থানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ বক্তৃতা করিতেন, শিশিরকুমারের নির্দ্দেশমত গৌরাঙ্গ সমাজের পক্ষ হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারকগণ সেই সকল স্থানে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিতেন। প্রচারকগণের মধ্যে গৌরাঙ্গ সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দেব, কবি কৌমুদী, শিশির কুমারের পুত্র ৺পয়সকান্তি ও ৺যতীন্দ্রনাথ ভবকিঙ্কর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বক্তৃতা করিতে করিতে পয়সকান্তি যখন সমধুর কণ্ঠে প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমের লীলা কীর্ত্তন করিতেন, তখন উপস্থিত

শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া যাইতেন, অনেকের নয়নে আনন্দাশ্রু উদগত হইত। গৌরঙ্গ লীলায় এমন একটি আকর্ষনী শক্তি আছে যে, তাহার প্রভাবে শ্রোতৃমণ্ডলী খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণের নিকট গমন না করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারকগণের বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট সমবেত হইতেন। কলেজ-স্কোয়ার, বিডন স্কোয়ার প্রভৃতি স্থানে গোরাঙ্গ লীলা কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ঘৃণার ভাব ক্রমে ক্রমে দূর হইয়া ভক্তির ভাব উদ্গত হইতে লাগিল ইহাতে প্রচারকগণের প্রচার কার্য্যেও উৎসাহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শিশির-কুমার তাঁহার আশা ফলবতী হইবে ভাবিয়া, হৃদয়ে অপার আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে উন্মুক্ত স্থানে প্রচারকগণ সভা করিয়া বক্তৃতা করিলেন ও গৌরাঙ্গ সমাজের উদ্যোগে ১৩০৫ সালের ফাল্গুন মাসের ৫ই, ১৪ই ও ২৮শে তারিখে যথাক্রমে ক্লাসিক থিয়েটারে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির প্রাঙ্গনে ও সিটি কলেজ হলে তিনটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথম সভায় প্রভুপাদ স্বর্গীয় পণ্ডিত গোকুল চন্দ্র গোস্বামী, দ্বিতীয় সভায় স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও তৃতীয় সভায় স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সভায় বহুগণমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার সরকার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, —“আমার পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স হইতে চলিল ; আমি অনেক সভা সমিতিতে উপস্থিত হইয়াছি, অনেক সভা সমিতির সভাপতির আসনও গ্রহণ করিয়াছি ; কিন্তু আজ কেমন পরিতোষ লাভ করিয়াছি, তেমন পরিতুষ্টি আমার ভাগ্যে আর কখনও হয় নাই। বাস্তবিক শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ব্যতীত আমাদের অন্য উপায় নাই, অন্য অবলম্বন নাই।

একদিন শিশিরকুমার তাঁহার কয়েকটী অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত গৌরাঙ্গ লীলা আলোচনা করিতে করিতে বলিয়াছিলেন,—“কলিকাতা সহরে প্রভুর জন্মোৎসব করিব, ইহা আমার বহুদিনের সাধ ; কিন্তু প্রভু সে সাধ পূরণ না করিলে ত হয় না। এ বৎসর গৌরাঙ্গ-সমাজ

হইতে এ সম্বন্ধে কিছু একটা করিতে হইবে। এইরূপ একটী অনুষ্ঠান করিলে শ্রীগৌরাঙ্গদেব পাদপদ্মে কতলোক আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।” প্রস্তাবটী শুনিয়া শিশিরকুমারের বন্ধুগণ বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে সম্মত হইলেন। কোনরূপ বাহ্যাড়ম্বর করা শিশিরকুমারের অভিপ্রেত ছিল না। কি উপায়ে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার অফিস গৃহে ও স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বাটীতে গৌরাঙ্গ সমাজের সভ্যগণের দুইটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই দুই সভায় কলিকাতার বহু হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার অধ্যক্ষ নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারা আনন্দের সহিত শিশিরকুমারের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ সমাজ হইতে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটী সহরে প্রচার করা হইয়াছিল।

“শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মতিথি উপলক্ষে এই কলিকাতা নগরীতে মহামহোৎসব হইবে, শ্রীসমাজ হইতে ইহার আয়োজন হইতেছে। ভক্ত মাত্রেরই এই মহোৎসব যোগদান করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। যাঁহাদের কীর্ত্তনের দল আছে, তাঁহারা সকলেই প্রস্তুত হইতে থাকুন। জন্মোৎসবের দিন তাঁহাদের খোল, করতাল, নিশান, ডঙ্কা, সিঙ্গা প্রভৃতি যিনি যাহা সংগ্রহ করিতে পারেন, লইয়া বাহির হইতে হইবে। এখন হইতে তাঁহার জন্মোৎসবের গীত অভ্যাস করুন। এ সম্বন্ধে অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের তারিখ ১৪ই চৈত্র।”

বিডন উদ্যান কলিকাতার উত্তরাংশের মধ্যবর্ত্তী স্থান, সুতরাং সেই খানে মহোৎসব হইবে স্থির হইয়াছিল। নির্দিষ্ট দিবসে, ১৩০৫ সালের ১৪ই চৈত্র (১৮৯৯ খৃঃ অঃ ২৭শে মার্চ্চ) বিডন উদ্যান মহাপ্রভুর জন্ম মহোৎসব উপলক্ষে যে অপূর্ব্ব দৃশ্য ধারণ করিয়াছিল, ভাষায় তাহা বর্ণনা করিবার সামর্থ্য আমাদের নেই। বিডনষ্ট্রিট, চিৎপুর রোড্ ও

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিটের যে দুই স্থানে মিলিত হইয়াছে, সেই দুই স্থানে দুইটী তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং সেই তোরণদ্বয়ের উপর হইতে নহবতের সুমধুর ধ্বনি কলিকাতাবাসিগণের কর্ণে মধুবর্ষণ করিয়াছিল। বিডনষ্ট্রিট ও উদ্যান পত্র পুষ্পে, পতাকায় ও অলোক-মালায় সজ্জিত করা হইয়াছিল। যিনি প্রাণের প্রাণ, জীবনের অবলম্বন, সেই ভক্ত বৎসল ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে যখন শতশত কীর্ত্তন সম্প্রদায় বিডনষ্ট্রিটে ও উদ্যানে সমবেত হইয়াছিলেন তখন সকলেই বিভোর ও আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিডন উদ্যানে ও তাহার চতুঃপার্শ্বের রাস্তায় বোধ হয় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল। দলে দলে সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় কীর্ত্তন করিতে করিতে আসিয়াছেন, দলে দলে সহস্র সহস্র দর্শক যাতায়াত করিয়াছেন, কিন্তু কোথায়ও বাক্‌বিতণ্ডা হয় নাই, রূঢ় কর্কশ ভাষাও ব্যবহৃত হয় নাই। ভক্তগণ সেখানে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া ভগবানের নাম সংকীর্ত্তনে মত্ত হইয়াছিলে, সেখানে ঈর্ষা হিংসার অনল কিরূপে প্রজ্বলিত হইতে পারে? প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমের প্রভাবে উচ্চ নীচ সমান হইয়াছিলেন, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত মুর্খ এক হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া ভক্তি ও প্রেমের তরঙ্গে অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। জোড়াসাঁকো থানার পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর কয়েকজন কনস্টেবল্ল লইয়া শান্তি রক্ষার জন্য বিডন উদ্যানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ফিরিয়া যাইবার সময় বলিয়াছিলেন,—"অনেক স্থানে অনেক মেলায় শান্তি রক্ষার জন্য গিয়াছি, কিন্তু এমন দৃশ্য কোথায়ও দেখি নাই। আমি শান্তিরক্ষার জন্য সভায় আসিয়াছিলাম ; স্বতঃই শান্তিরক্ষা হইয়াছে, এক্ষণে নিজের হৃদয়ে শান্তি স্থাপন করিয়া চলিলাম।" মহাপ্রভুর এই জন্মমহোৎসবে ন্যূন কল্পে প্রায় চারিশত সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় যোগদান করিয়াছিলেন। ভগবানের প্রেমে বিভোর হইলে মানবের বাক্‌শক্তি অন্তর্হিত হইয়া যায়। সেদিন একটী সংকীর্ত্তনের দল ভাবে এরূপ উন্নত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের মুখ

হইতে কথা বাহির হয় নাই। সেই দলের একজন যুবক শিঙ্গায় হরিনাম করিতেছে, সঙ্গে চারিখানি খোল বাজিতেছে, সম্প্রদায়ের সকলে তাহাদের বেষ্টন করিয়া, বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেছে, আর অসংখ্য জনমণ্ডলী তাহাদের সেই মধুর ভাব লক্ষ্য করিয়া হরিধ্বনি করিতেছে! পাঠক, এদৃশ্য অপূর্ব্ব! এদৃশ্য বর্ণনাতীত। পাশ্চাত্য শিক্ষিতাভিমানিগণ বিশেষ প্রমাণ না পাইলে কোন অলৌকিক ঘটনা বিশ্বাস করিতে সম্মত হল না; যাঁহারা মহাপ্রভুর এই জন্মোৎসব স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার এই ব্যাপার অলৌকিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মোৎসব সম্বন্ধে তৎকালে কয়েকখানি সংবাদ পত্র যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

বসুমতী—"পাঠক? যাহা কখন দেখ নাই,—যাহা দেখিলে মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়,—যাহা দেখিবার এবং শুনিবার জন্য শত জন্ম সাধনা করিলেও মনের সাধ মিটে কিনা সন্দেহ, তাহাই আজ নয়ন গোচর হইল। এই কলিকাতা সহরে গত ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে বিডন উদ্যানে এবং বিডন ষ্ট্রিটে, হরিনামের যে বিরাট বন্যা বহিয়া গিয়াছে, ধনী, দরিদ্র, বিলাসী, ব্যবসায়ী, হরিনামে মাতোয়ারা হইয়া যে ভাবে ধূলায় লুটাইয়াছিলেন, মনে হয় সেই ভাবের প্রবাহ আজ চারিশত বৎসর পরে এদেশে আবার ক্ষণেকের জন্য আসিয়াছিল। জানি না কি বলিয়া,—কি কথায় লিখিয়া, সে অপূর্ব্ব দৃশ্য তোমার মানসপটে চিত্রিত করিব। শব্দালঙ্কারের সে আলেখ্য চিত্রণ-শক্তি নাই, ভাবের সেই বহুধা বিস্তৃত ব্যাপ্তি নাই, উপমার দৃষ্টান্তের সে সার্ব্বাবয়বিক উপযোগিতা নাই—কি দিয়া কি বলিয়া তুলনা দিব—এই হরিনামের মহা সমারোহ কেমন হইয়াছিল? যে দেখিয়াছে, সে মজিয়াছে, যে শুনিয়াছে, সেই ধন্য হইয়াছে, যে ধূলা লুটাইয়াছে, সেই মানবদেহ সার্থক করিয়াছে। ক্ষুদ্র আমরা, সেই স্বর্গের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমাদের নয়ন নিমেষশূন্য হইয়াছিল, হৃৎপিণ্ড স্তম্ভিত হইয়া

গিয়াছিল, বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, কেমন একটা বিহ্বলতা আসিয়া মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারকে বিমূঢ় করিয়া রাখিয়াছিল। যাহা দেখিয়াছি, তাহা ইহ জন্মে আর কখনও ভুলিব না। একত্র লক্ষ কণ্ঠের যে ভাবে হরিয়াম কীর্ত্তন শুনিয়াছি, তাহা এদেহ ধারণ করিয়া আর বুঝি কখনও শুনিতে পাইব না।"

সোম প্রকাশ—"বহুদিন যে দৃশ্য অনেকেই দেখেন নাই, বহুদিন লোকের মনে যাহা আদৌ ধারনা হয় নাই, বহুদিন লোকের মনে যাহা স্বপ্নে ও অনুমান করিতে পারেন নাই, দোল পূর্ণিমার দিনে কলিকাতা সহরে সেই দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। বিডন উদ্যানে উক্ত দিবস প্রায় ২।৩ শত সঙ্কীর্ত্তনের সম্প্রদায় সমবেত হইয়া উচ্চকণ্ঠে হরিগুণ গান করিয়াছেন ; সেই মধুর পবিত্র নামে কলিকাতার প্রতি পল্লী প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, এমন অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার আমরা জীবনাবধি লক্ষ্য করি নাই। অমৃতবাজারের গৌরাঙ্গসেবক শিশিরবাবুর যত্নে, উৎসাহে ও চেষ্টায় বিডন গার্ডেনে কলিকাতার সর্ব্বসম্প্রদায় একত্র হইয়া নামকীর্ত্তন করিয়াছেন। লিখিবার নয় দেখিবার জিনিস। বেলা ৩।৪টা হইতে চারিদিক হইতে দল বাহির হইতে আরম্ভ হয়। অগণ্য পতাকা পতপত করিয়া উড়িতেছে ; এই ভক্তকণ্ঠ নির্গলিত সুধাস্রাবি হরিনাম বিকীর্ণ হইয়া চারিদিক আপ্লাবিত করিতেছে। দ্বেষ হিংসা, অসূয়া, মাৎসর্য্য, দম্ভ, অভিমান ও অহঙ্কার সব যেন কোথায় পলায়ন করিতেছে। চারিদিকেই যেন শান্তি—অভূতপূর্ব্ব উন্মত্ততা। মধ্যে মধ্যে উচ্চ কণ্ঠে হরি হরি রব। আহা সে দৃশ্য যে দেখিয়াছে সে আর ভুলিবে না। যাহাদিগকে আমরা চিরদিন হিরণ্যকশিপুর প্রিয় অনুচর, জাগাই মাধায়ের মন্ত্র শিষ্য বলিয়া জানিতাম, আজ তাহাদিগকেও চন্দচর্চ্চিত অঙ্গে নগ্নপদে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে হরি হরি বলিতে বলিতে ছুটিতে দেখিয়াছি। দয়াময় সকলি তোমার ইচ্ছা।"

ঋষি-বিগত ১৪ই চৈত্র সোমবার, কলিকাতা বিডন্ গার্ডেনে ও বিডিন স্ট্রিটে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ

সমাজ কর্ত্তৃক চৈতন্যদেবের জন্মতিথি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বহু সংখ্যক সঙ্কীর্ত্তনের দল মহানন্দে নৃত্যোন্মত্ত হইয়া নামকীর্ত্তন করিয়াছিল—স্থানদ্বয় লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। এমন দৃশ্য আমাদের নয়নগোচরে কদাপি আসে নাই। সনৃত্য হরিনাম গানের এমনই আকর্ষণী শক্তি অনুভূত হইয়াছিল যে যাঁহার শুধু আমোদ দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারও পরিশেষে ভাবোন্মত্ত হইয়া সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিয়ছিলেন। বড়ই সুখের বিষয় —যে বিডন উদ্যানে ইংরাজ পাদ্‌রী শত শত গলাবাজী করিয়া শ্রোতার কর্ণপাত আকর্ষণ করিতে পারেন না—সেই উদ্যানে চৈতন্যভক্তের সামান্য ইঙ্গিতাহ্বানমাত্রই লক্ষ লক্ষ লোক শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে ছুটিয়া আসিয়াছিল—আসিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিল। যাঁহারা চিরকাল পদব্রজে অনভ্যস্ত, এমন অনেক বড় লোক অনাবৃত পদে হাঁটিয়া আসিয়াছিলেন। আশা করা যায়, আগামী বৎসর আরও সমারোহ হইবে। যাঁহারা এবারে যোগদান না দিয়া পরে ঘটনা শ্রবণে অনুতপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা শতগুণে উৎসাহে যোগদান করিবেন। উচ্চ, নীচ, বড়, ছোট সকলেই একতান হৃদয়ে মিলিত হইবার উপযুক্ত এমত ধর্ম্ম আর নাই। ধন্য গৌরাঙ্গ! ধন্য গৌরাঙ্গ-সমাজের প্রবর্তক!"

পাঠক! অন্যান্য সংবাদপত্রের মতামত উদ্ধৃত করিয়া আর আমরা পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করিনা। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদের নবদ্বীপে সাত সম্প্রদান ও চৌদ্দ মৃদঙ্গ লইয়া বৈষ্ণবদ্বেষী কাজিকে দলন করিবার জন্য সঙ্কীর্ত্তনে বহির্গত হইয়াছিলেন। তাহার পর চারি শতবৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু যেরূপ সঙ্কীর্ত্তন আর কখনও হইয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। শিশিরকুমারের আন্তরিক প্রযত্নে গৌরাঙ্গ সেবকগণ আবার চারিশত বৎসর পরে, কলিকাতা মহানগরীতে, শত শত সম্পদায় ও শত শত মৃদঙ্গ লইয়া যে মহাসঙ্কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার ফলে কেবল

কলিকাতার নহে, সুদূর পল্লীগ্রামেও বহু ধর্ম্মদ্বেষী বিদলিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ কর্ত্তৃক যে কীর্ত্তনটি গীত হইয়াছিল, তাহা শিশিরকুমার কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। আমরা নিম্নে সেই গানটি উদ্ধৃত করিলাম—

(আর) ভয় নাই ভয় নাই আন্ধার গেল।
নবদ্বীপচাঁদের উদয় হলো,
(আন্ধার দূরে গেল।)
ঘোর আন্ধার, ঘেরিল সংসার,
ধর্ম্ম দূরে গেল।
রৈতে নারি প্রভু আপনি এলো,
(জীবের মলিন দশা দেখে।)
পতিত দেখিয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া,
জাবে করিল কোল।
শ্রীগৌরাঙ্গের জয় জয় বল॥

ধুয়া

হলো নয়নগোচর এতদিনে রে
জীবের প্রাণনাথ।
তাপ ভয় দূরে গেল রে॥

কীর্ত্তনপরিশ্রান্ত বৈষ্ণবগণের সেবার জন্য বিডন ষ্ট্রীটে স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে, চিৎপুর রোডে পি, সি, পাল, ব্যানার্জ্জি মল্লিক ও পাল ফ্রেণ্ডয়ের দোকানে ও অন্যান্য অনেকেরই বাটীতে ডাব, সরবত, মিষ্টান্ন প্রভৃতির আয়াজন ছিল। স্বধর্ম্মানুরাগী ভগবদ্ভক্ত স্বর্গীয় মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর অন্যূন পঁচিশ হাজার লোকের সেবার আয়োজন করিয়াছিলেন। ধনী, দরিদ্র ভদ্র, ইতর নির্ব্বিশেষে মহারাজা বাহাদুর সকলকেই সমভাবে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া সরবত ও মিষ্টান্নে পরিতুষ্ট করিরাছিলেন। নূতন বাজারের একজন ময়রা সকীর্ত্তনে মুগ্ধ হইয়া শেষে দুই হস্তে আপনার

দোকানের সমস্ত সন্দেশ 'হরিলুট' দিয়াছিল। পাঠক! এই মহাসঙ্কীর্তনের মহামঙ্গলময় অনুষ্ঠানের ফলে, মফঃস্বলের বহু স্থানে গৌরাঙ্গ সমাজের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ক্রমঃশই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রসার প্রতিপত্তি লক্ষিত হইতে লাগিল। মহারাজা যতীন্দ্র-মোহন গৌরাঙ্গ সমাজকে নানা উপায়ে সাহায্য করিয়াছিলেন।

সংসর্গগুণে মানবের চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। শিশিরকুমার ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে আত্মসমর্পণ করিলে, তাঁহার সংসর্গে আসিয়া বহু নাস্তিক ভগবানে বিশ্বাসবান হইয়াছিলেন, মহাপ্রভুর প্রেমে মজিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য সম্পাদক ; কলিকাতা ছোট আদালতের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্তবাবু অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক ৫ই ফাল্গুন ক্লাসিক থিয়েটারে যে সভা হইয়াছিল, সেখানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, উচ্চ শিক্ষার প্রভাবে অন্ধবিশ্বাস দূরে পলায়ন করিয়াছে—এখন যুক্তি তর্কের কাল উপস্থিত। শিক্ষাভিমানী এক্ষণে বিশিষ্ট প্রমানাভাবে কিছুই বিশ্বাস করিতে সম্মত নহেন। সাদৃশ ক্ষুদ্রজনও সে দোষে দোষী। আমি পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গে বিশ্বাসবান ছিলাম না—এমন কি ধর্ম্মর্চ্চায় আমার আসক্তি কিছুই ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভাগ্যক্রমে শ্রীল শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গপ্রাপ্তি লাভ হয়। এইখানে সাধুসঙ্গের সুফলত্বেরও প্রমাণ আপনারা পাইবেন। তাঁহার বাচনিক উপদেশে এবং তাঁহার অমৃতময় লেখনীপ্রসূত ধর্ম্ম পুস্তকগুলি পাঠে আমি এই শুভ্র ধর্ম্মজীবন পাই—আর সেই বলে বলীয়ান হইয়াই আজ আপনাদের সমক্ষে দণ্ডয়মান হইতে সাহসী হইয়াছি, শ্রীল শ্রীশিশিরবাবুর গ্রন্থাদি জীবের বড়ই উপকারী বস্তু—শিশির-বাবুই আমার ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক—শ্রীগৌরাঙ্গই আমার দৃঢ় অবলম্বন।”

পণ্ডিত কালীময় ঘটকের নাম পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন। তিনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বিনয়ী ছিলেন। শিশিরকুমার তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি

ও শ্রদ্ধা করিতেন। ক্রমে ক্রমে শিশিরকুমার বুঝিতে পারিলেন যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে পণ্ডিত মহাশয় কিছুই মানিতেন না! ভগবান কিম্বা পরকাল সম্বন্ধে কথা উঠিলে পণ্ডিত তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। শিশিরকুমার তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার নাস্তিকতার জন্য তিনি বড়ই দুঃখিত হইতেন। শেষে পণ্ডিত কালীময় ঘটক; কিরূপে গৌরাঙ্গভক্ত হইয়াছিলেন, তাহা ও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা সম্বন্ধে পত্রিকার তাৎকালীন অন্যতম সম্পাদক পণ্ডিত রাধিকানাথ গোস্বামী মহাশয়কে একখানি সুদীর্ঘ পত্রে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। পণ্ডিতের অভিপ্রায় অনুসারে এই পত্রখানি শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; আমরা সেই পত্রের কতক অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

*　　*　　*

"উচ্চ পদ অনুবীক্ষণ স্বরূপ, তাহাতে ক্ষুদ্র বস্তু বৃহৎ দেখায়। শিশিরবাবুর গৌর প্রেমের আয়তনকে বৃহৎ করিবার জন্য তাঁহার উচ্চপদকে অনুবীক্ষণ হইতে হয় নাই, তাঁহার উচ্চপদ সোনায় সোহাগা হইয়াছে। যেহেতু তদ্দারা অনেক বর্হিম্মুখ জীব কৃতার্থ হইয়াছে। বটতলায় চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যভাগবত; চৈতন্যচরিতামৃত চিরকালই ছিল এবং অনেক দীন দুঃখী, বৈষ্ণববৈরাগীও নিতাই গৌরকে চিনিতেন; কিন্তু শিশিরবাবুর গৌর ভক্তি হওয়ায় পূর্ব্বে নিতাই গৌরের নামে এমন জোর ডঙ্কা বাজিয়াছিল কি? তাই বলিতেছি, শিশিরকুমার উচ্চপদ ও গৌরপ্রেম যেন মণিকাঞ্চণের যোগ হইয়াছে। শিশিরবাবুর দ্বারা যে অনেক বহির্ম্মুখ, গৌরদাসের পদাশ্রয় পাইয়া জন্ম সফল করিয়াছেন, আমি নিজে তাহার একটি ক্ষুদ্র সাক্ষী! শিশিরবাবুরা যখম কলিকাতা আগমন করেন, তাহার পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদিগের সহিত আমাদের পরিচয় এবং আমাদিগের প্রতি তাঁহার প্রথম হইতেই অহেতুকী কৃপা ছিল। এজন্য তিনি আমাদিগের শুভাশুভের সন্ধান লইতেন। একদিন শিশিরকুমার আমায় জিজ্ঞাসা

করিলেন, 'তুমি শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস কর কি?' তখন তিনি গৌরপ্রেমের পাথারে ভাসমান। আমি উত্তর করিলাম, "আমি গৌরাঙ্গের বিষয় কিছুই ভাবি নাই; সুতরাং তোমার একথার উত্তর এখন দিতে পারি না।' তাহাতে শিশির বলিলেন, 'তবে তুমি এখানে বসিবার যোগ্য নহ, আমি তোমার মুখ দেখিব না।' এই কথাটা তখন আমার বড়ই বাজিয়াছিল; কিন্তু কালে বুঝিলাম, শিশিরকুমার আমাকে বড় ভালবাসিতেন, এবং মাদৃশ দীনহীন ব্রাহ্মণের প্রতি বড়ই কৃপা ছিল, তাই তিনি আমাকে ঐ দণ্ড দিয়াছিলেন। ঐ দণ্ড আমার মঙ্গল ঘট, কেননা ঐ দণ্ড হইতেই আমার গৌরাঙ্গ অনুশীলন আরম্ভ হয়। ভাগ্যদোষে আমি গৌরতত্ব বুঝিলালাম না, গৌরপ্রেম পাইলাম না বটে, আমার অনুশীলন দেখিয়া আমার অনেক সহচর ও বন্ধুবান্ধব গৌরভক্ত হইয়াছে, অনেকে গৌরপ্রেম তরঙ্গে ডগমগ হইয়াছেন। তন্মধ্যে একটির কথা উল্লেখযোগ্য। তাঁহাকে একটি ক্ষুদ্র প্রকাশানন্দ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেননা তিনিও ধর্ম্ম-রাজ্যে বহুদর্শী, শঙ্করমঠের শিষ্য, ব্রহ্মমন্ত্রী ৩২০।২৫টী শিষ্যের গুরু। তিনি আজ গৌরদানের পদরেণু। এই সকলই শিশিরকুমারের কীর্ত্তি!"

* * *

"নানাপ্রকার লৌকিক সংবাদ অবগত হইবার জন্য লোকে দৈনিক, সপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকাদি পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা পাঠে কত অলৌকিক সংবাদ জানা যায়। তন্মধ্যে কত শত বি, এ, কত শত এম, এ, কতশত ছাত্র, কতশত অধ্যাপকের হৃদয়ে গৌরভক্তি গুপ্তভাবে বিরাজ করিতেছে, তাহা অবগত হইয়া বড়ই আনন্দ হয়। এই সংবাদ কত আনন্দের, কত সুখের, কত আশ্বাসের, তাহা শত মুখে প্রকাশ করা যায় না। বিষ্ণুপ্রিয়াপত্রিকা পাঠে কত দিক্‌পাল, কত দিগ্‌গজ গৌরপদে লুণ্ঠিত হইতেছেন, তাহা জানা যায়।

"শ্রীপত্রিকা পাঠে যে কেবল আমরা এই সকল সুখের সংবাদ পাই, এমন নহে; পত্রিকা কি কি মহৎ কার্য্য করিতেছেন, তাহাও বুঝিতে পারি। বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, কত শত নাস্তিক-হৃদয়রূপ পাষাণ পাহাড়ে 'চরণ পাহাড়ির' সৃষ্টি করিয়াছেন।* কত শত আবিল ও অপবিত্র জলপূর্ণ কুপের সহিত শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের পয়ঃপ্রণালী মিলিত করিয়াছেন। কতশত ধনগর্ব্বিত বিলাসীর হৃদয়রূপ মরুভূমিতে গৌরদাসের তৃণাদপিনীচতা সুধা মধুরভাষতা, বাক্‌পটুতা বিষয়-বিরাগ এবং হরি প্রণয়-বিহ্বলা বুদ্ধির বিধান করিয়াছেন। কত শত ব্রাহ্ম-খ্রীষ্টানের নির্ব্বিশেষে ব্রহ্ম আলোচনা ও মুক্তিবিচার বিনাশ করিয়াছেন, কতশত ব্যক্তিকে লোকাচার ও বেদাচারের নিকট হইতে মুক্তি-দান করিয়াছেন। কত শত শাস্ত্রবিৎ বর্হির্ম্মুখের পরস্পর বিতণ্ডা বিধ্বস্ত করিয়াছেন; কত শত বিষয়াসক্ত সংসারী বিষয়-বিষ-দগ্ধ হৃদয়ে তীব্র বৈরাগ্যের বিধান করিয়াছেন; কতশত ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত ব্যক্তির কর্কশ হৃদয়ে বিনয়ের লহরী খেলাইয়াছেন; কত শত পাপা-চারের পাপ-কলুষিত চিত্ত ভক্তিবারিতে বিধৌত করিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা পাঠে কত শত উচ্চ বংশীয় কুলীন ব্রাহ্মণ শ্রীগৌরাঙ্গের পরিচয় পাইয়াছেন এবং গৌর ভজন বিনা অনেক জন্ম বৃথা গিয়াছে ভাবিয়া আপনাদিগের উজ্জ্বল কুলকে ধিক দিয়াছেন। বিদ্যা, যশঃ, বাগ্মিতা, শারীরিক সৌন্দর্য্য, নবযৌবন, বৈষয়িক কুশল— এমন কি ব্রাহ্মণ জন্মকেও ধিক দিয়াছেন। যে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তি বহুকাল হইতে প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে নানাবিধ ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, যথাবিধি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, যথাবিধি গুরুকরণ ও সাধুসঙ্গ করিয়া দীর্ঘকাল ভজন করিয়াছেন, হয়ত পবিত্র আশ্রম

---

*শ্রীবৃন্দাবন যাত্রিগণ নানা তীর্থস্থান দর্শন করিতে করিতে মথুরামণ্ডলের মধ্যে একটি কঠিন প্রস্তরের পাহাড় দেখিতে পান। তাহাতে গো, মহিষ, বৎস, বালকের পদচিহ্ন আছে। তাহার নাম 'চরণ পাহাড়ী'। ইহার বিবরণ ভক্ত মাত্রেই জ্ঞাত আছেন।

বিশেষও অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি; হঠাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকাদি পাঠে সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়ছে, তিনি নিতাই গৌরকে 'এই ত কলির ঠাকুর' এই ত আমাদের পরিত্রাতা যুগাবতার, তবে আমরা বৃথা কেন ঘুরিয়া মরিতেছি? হা গৌরাঙ্গ, তোমার প্রেমরসে বিশ্ব ভাসিয়া গেল, কেবল আমিই বঞ্চিত হইলাম?' প্রকাশানন্দেরও এই দশা হইয়াছিল। তিনি নানা শাস্ত্রের পণ্ডিত, পরমহংস এবং হাজার হাজার দণ্ডীগুরুর গুরু হইয়া দাম্ভিকভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। মনে করিতেন, তাঁহার আর জানিবার, শুনিবার কিছুই নাই। শেষে যখন গৌরাঙ্গের চরণ পাইলেন, তখন কহিলেন—

'বঞ্চিতোহস্মি বঞ্চিতোহস্মি বঞ্চিতোহোস্মি ন সংশয়ঃ
বিশ্বং 'গৌররসে মগ্নং স্পর্শোহপি মম না ভবেৎ ॥'

বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা বঙ্গদেশ মধ্যে এখন অনেকের হৃদয়ে এই ভাবের আবর্ত্ত তুলিয়া দিয়াছেন।

১৪ই ফাল্গুন শনিবার ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর প্রাঙ্গণে গৌরাঙ্গ-সমাজের যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে স্বর্গীয় কেদারনাথ দত্ত ভক্তি-বিনোদ মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শিশিরকুমারের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে শ্রীমান শিশিরকুমারের ভায়া যে অতি দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত ব্রতী হইয়াছেন, তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। এই গৌরাঙ্গ সমাজ তাঁহারই ঐকান্তিক যত্নের ফল। এই সমাজের দ্বারা যে প্রভুর ধর্ম্ম প্রচারিত হইবে, ইহাতে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য যে, আমিও আমার ভাই শিশিরকুমার অভিন্নাত্মা। তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গে নিষ্ঠাও প্রীতি সর্ব্বজন-বিদিত, আমি আর তাহার বিশেষ কি পরিচয় দিব। তাঁহার যত্নে গৌরাঙ্গসমাজের যে বিশেষ উন্নতি ঘটিবে, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার অমৃতময়ী লেখনীপ্রসূত অমিয়নিমাই চরিতে বাঙ্গালী পাঠক-গণের হৃদয়ক্ষেত্রে অক্ষয় অমিয়ময় ফল ফলিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ

সম্বন্ধে আমার ভাই শিশিরকুমার ঘোষ যে প্রসিদ্ধ দুই খণ্ড ইংরাজী গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে পাশ্চাত্য প্রদেশে গৌরাঙ্গের কথা বিশেষরূপে প্রচারিত হইতেছে ও হইবে।”

যে দেশে একতার বিশেষ অভাব, সে দেশে যে সভাসমিতি কখনও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, শিশিরকুমার তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের বিস্তৃতির জন্য কেবল গৌরাঙ্গ সমাজের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারেন নাই। বঙ্গবাসী, কেবল বঙ্গবাসী কেন, সমগ্র বিশ্ববাসী যাহাতে প্রেমের দেবতা শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের প্রবর্ত্তিত সুধামধুর বৈষ্ণবধর্ম্ম আলিঙ্গন করিয়া, প্রেমের স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া শান্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহার জন্য শিশিরকুমার বহু সাধনার ফলে, অক্ষয় অমিয় ভাণ্ডার স্বরূপ শ্রীঅমিয়নিমাইচরিতও লর্ড গৌরাঙ্গ নামক দুইখানি, অমূল্য গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত পাঠে কত পাষণ্ডের প্রাণ বিগলিত হইয়াছে, কত নাস্তিক আস্তিক হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা সুকঠিন। ভক্ত শিরোমণি কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন,—

“যদি বা না জানে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেই,
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজয়ে প্রীতি, জানিবে রসের গতি,
শুনিলেই বড় হয় হিত।”

উক্ত পংক্তি কয়টীর অক্ষরে অক্ষরে সত্যনিহিত রহিয়াছে। কতকগুলি মাতাল মহাপ্রভুর লীলা শ্রবণ করিয়া কিরূপে আপন আপন চরিত্র সংশোধন করিয়া বৈষ্ণব হইয়াছিল, আমরা পাঠকবর্গকে তাহা অবগত করাইব। হুগলীর অন্তর্গত শ্যামবাজার নামে এক পল্লীতে একটী মদের দোকান ছিল। এই দোকানের সত্বাধিকারী গৌরাঙ্গ ভক্ত ছিলেন, কেবল পরিবার বর্গের উদরান্নের জন্য তিনি এই জঘন্য ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। তিনি দোকানে বসিয়া হাতে জপমালা

লইয়া প্রত্যহ লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন। মাতালগণ দোকানে মদ খাইতে আসিয়া তাঁহাকে মুদিত নয়নে জপ করিতে দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিত; "বাবাজীয় আবির্ভাব হইয়াছে।" তাহাদের মধ্যে অনেকে আবার রঙ্গ করিয়া বলিত,—"দাদা, ধন্য তোমার মদের জোর; তোমার পাত্রে আমাদের ভক্তি সঞ্চার হইতেছে।" অনেকে আবার "ভক্তিদাও" বলিয়া বর প্রার্থনা করিত। দোকানী এই মাতালগণের মন ফিরাইবার জন্য একখানি শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত সংগ্রহ করিয়া দোকানে বসিয়া তাহা পাঠ করিতেন। মাতালগণ মদ খাইতে আসিয়া, সেই গ্রন্থ পাঠ শ্রবণ করিয়া, ক্রমশঃই নূতন জীবন লাভ করিতে লাগিল এবং শ্রীচৈতন্য লীলার উন্মাদিনীর শক্তির প্রভাবে তাহারা বৈষ্ণব হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল। পাঠক, এরূপ বহু ঘটনা উল্লেখ করিতে পারা যায়। বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও বহু গৌরাঙ্গ-সেবক আছেন; কিন্তু হিন্দী কিম্বা অন্যান্য ভাষায় উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবে তাঁহার মহাপ্রভুর লীলা সম্যক অবগত ছিলেন না। বড়ই আনন্দের বিষয়, বৃন্দাবনবাসী পরম বৈষ্ণব, ভক্ত ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী মহাশয় হিন্দী ভাষায় অমিয়নিমাই চরিতের অনুবাদ করিয়া এই অভাব দূর করিয়াছেন। এই অমূল্য গ্রন্থখানি গুজরাটী, তামিল ও তেলেগু ভাষায়ও অনূদিত হইয়াছে।

শ্রীঅমিয়নিমাই চরিতের আদর দেখিয়া শিশিরকুমার বুঝিয়াছিলেন যে, স্রোতের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে,—যে শিক্ষিত সম্প্রদায় বৈষ্ণবধর্ম্মকে ইতর লোকের ধর্ম্ম বলিয়া ঘৃণা করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রেমময়ের প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেছেন। বৈষ্ণবধর্ম বিশ্বজনীন ধর্ম হইলে ধরাতল আর নরশোণিতে রঞ্জিত হইবে না; হিংসা, দ্বেষ পলায়ন করিবে, ধরিত্রী চিরশান্তি ভোগ করিতে পারিবে, এই ভাবিয়া শিশিরকুমার বিদেশীয়গণকে গৌরাঙ্গলীলা আস্বাদ

করাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মতিবাবু স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে একদিন বলিয়াছিলেন,—"অমিয়নিমাই চরিতের ইংরাজী অনুবাদ করিলে কেমন হয়?" প্রত্যুত্তরে গুরুদাস বাবু বলিয়াছিলেন,—"গৌরাঙ্গলীলা ইংরাজীতে প্রকাশিত হইলে, আমার বিশ্বাস, জগতের মহৎ উপকার হইবে।" মতিবাবু তখন বলিলেন,—"আপনিই অমিয়নিমাই চরিতের ইংরাজী অনুবাদ করিবার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। সেজদাদার ইচ্ছা, আপনি এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন।" গুরুদাসবাবু উত্তর করিলেন,—"এই গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে হইলে যে বিদ্যা বুদ্ধির প্রয়োজন, আমার তাহা কিছুই নাই। রাস্কিনের (Ruskin) ন্যায় জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যতীত অন্য কেহ এ গ্রন্থ অনুবাদ করিতে সমর্থ হইবে না।" গুরুদাসবাবু এই অনুবাদ কার্য্যের ভার গ্রহণে অসম্মত হওয়ায় শিশিরবাবু ও মতিবাবু মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। শিশিরকুমার স্থির করিলেন যে, অমিয়নিমাই চরিতের যথাযথ অনুবাদ না করিয়া, তিনি নূতন করিয়া গৌরাঙ্গলীলা ইংরাজীতে লিখিবেন। দীর্ঘ সূত্রতা শিশিরকুমারকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই; যেমন চিন্তা তেমনই কাজ, শীঘ্রই তিনি লর্ড-গৌরাঙ্গ প্রকাশ করিলেন। স্বদেশে অমিয়নিমাই চরিতের ন্যায় বিদেশে লর্ড গৌরাঙ্গ যথেষ্ট আদর হইল। লর্ড গৌরাঙ্গ ইউরোপ ও আমেরিকার সুধী সমাজে একটা নতুন ভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল। আমেরিকার বহু শিক্ষিত নরনারী গৌরাঙ্গলীলা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সকল ধর্মপ্রাণ মহাত্মা ও মহিলা শিশিরকুমারকে গুরুজ্ঞানে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। আমেরিকায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রসারের জন্য শিশিরকুমারের চেষ্টায় চিকাগোতে একটী বৈষ্ণব মঠও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।* কোন কোন মহিলা স্বামী

*টাউনহলে শিশিরকুমারের শোকসভার দ্বারবঙ্গের মহারাজা সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—"He was **instrumental in Popularising vaisnabism in Amarica where**

অভয়ানন্দ, নিত্যানন্দ, রাধা, বিষ্ণুপ্রিয়া, লক্ষ্মী, মৈত্রেয়ী, দাস্যানন্দ প্রভৃতি নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামী অভয়ানন্দের সহায়তায় আমেরিকায় প্রচারকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৯০২ খৃঃ অঃ জুন মাসের প্রথম ভাগেই তিনি ভারতবর্ষে আগমন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু স্থানে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

মহিলাগণের ন্যায় আমেরিকার বহু পুরুষও ইষ্টানন্দ, সত্যানন্দ প্রভৃতি নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী নরনারী শিশিরকুমার ও গৌরাঙ্গ সমাজকে বহু পত্র লিখিয়াছিলেন। সকলপত্র উদ্ধৃত করিবার স্থান আমাদের নাই, সেজন্য মাত্র দুইখানি অতিক্ষুদ্র পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। প্রথম পত্রখানি মেরী লুই লিস্‌ট নাম্নী জনৈকা মহিলা শিশিরকুমারকে লিখিয়াছিলেন। এই পত্রে তিনি লর্ড গৌরাঙ্গ পাঠ করিয়া কিরূপ মুগ্ধা হইয়াছিলেন, তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পত্রখানি গৌরাঙ্গ সমাজের সভ্যগণকে লিখিত হইয়াছিল। লেখিকা বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা উক্ত পত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথম পত্র

Dear Sir,

The locality from whence comes this stray bit of correspondence, in an unfamiliar hand writing, is far, far distant from India's mighty Capital on the banks of the sacred Ganges, still you will recognise it as the present residence of Swami Abhayananda. Ah! as I think of her now, her great and universal love radiating like the light of warmth from the sun, I find myself, just a simple girl speaking to you at the

---

there are many converts to its faiths resulting in the erection of a Vaisnab Temple of Chicago."

head of a great daily paper—one of the world's power today—in the spirit of friendship···I ask you kindly to send me two vols of Lord Gouranga or Salvation for all.

I visited the Swami at her apartments a few days since, when she read to me several beautiful passages from its marvellous pages. It is a wonderful book, bringing one's soul into such a depth of conscious, vivid realization of unity, harmoney, peace with the blessed Lord, through the glorious, majestic avenue of His ideal Love.

2835 Washington St.
San Franscisco,
California
U. S. A.

Yours respectfully,
Marie Lauise Leist.

দ্বিতীয় পত্র

October 24, 1901
San Franscisco,
California.

Namo Krishnaya !
Namo Gourangaya !

Beloved Brethern,

In the spirit of our Lord Krishna, as a servant of our Lord Krishna, I address you.

Words fail to express my gratitude and thanks for the privilege of serving Krishna. Over 7 years ago I died to the world, that I might live to the spirit. I

tried to give myself with all I had or ever expect to have to the Lord, to work for him, but I was wandering in the wilderness with Krishna by my side, but did not know until our beautiful spiritual Mother and Teacher Swami Avayananda taught me how to reach the feet of our Lord and Master.

Oh ! Such "Bhakti"—such bliss. "I love Krishna" "I worship Krishna" ; "I will serve Krishna."

"Sri Krishna I am thine and thou art mine ; Thou art the life of my life ; Thou art the Ultimate goal of my existence."

"I am thine and thou art mine, in happiness and misery, sickness and health, now and for ever and ever."

On October the 3rd, 1901 I had the blessed privilege of being initiated into the Order of Service from our Srikrishna. May he ever be by my side to keep and strengthen me in pathway. May the great joy grow in my heart more and more each day as my love for Krishna expands untild it encompasseth everything, high and low, great and small.

My name was changed to Dasyananda. I was born again. Soul can feel with soul, but words can not express.

Srikrishna Saranam Mama.

I am your Sister and Servant of the Lord.

Dasyananda.

ইংলিশম্যান পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব ও স্টেটসম্যান্ পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক মিষ্টার এ, জে, এফ, ব্লেয়ার (Mr. A. J. F. Blair) শিশির-কুমারের শোকসভায় বলিয়াছিলেন যে, তিনি লর্ড গৌরাঙ্গ পাঠ করিয়াই হিন্দুজাতির আধ্যাত্মিকতার গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং শিশিরকুমারকে তিনি তাঁহার আধ্যাত্মিক গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন। মিষ্টার ব্লেয়ার বলিয়াছিলেন,

"His contributions to the religious and spiritual thought of tbis age constitute his most enduring fame. Speaking personally—and here I feel sure that I speak for many of my fellow countrymen—it was in that wonderful book Lord Gouranga, that I obtained my first startled glimpse into the depths of the Hindu mind. From the moment of that revelation I came to regard its author in the light of a spiritual Guru".

জনৈক জার্ম্মাণ দার্শনিক লর্ড গৌরাঙ্গ পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি সারা জীবন ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, একমাত্র এই গ্রন্থ পাঠে আমি তদপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি। ভারতবাসীর ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ জাতির মধ্যে যে এত অধিক অবতার আবির্ভূত হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।"*

---

*টাউনহলে শিশিরকুমারের শোকসভায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মল্লিক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—

"He (Shishir Babu) did me the honour of sending me whilst in London Several copies of his learned work on Gouranga. I distributed them amongst my friends. One of them happened to be a German Philosopher, who told me afteawards that he learnt more of the spiritual nature of the

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, "তাঁহার সাধনা সফল হইয়াছে—তাঁহার অমিয়নিমাই চরিতের অমৃতরসে আজ বিশ্ব সংসার অভিষিক্ত; শান্তির পথ পাইয়া আজ সকলেই পুলকিত।"

পৃথিবীর ধর্ম্মাচার্য্যগণ যে সকল ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের শিষ্য ও প্রশিষ্যগণের মধ্যে অনেকে তাহাদের প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিরা এবং আত্মপ্রত্যয় বা স্বাধীন চিন্তার অনুবর্ত্তী হইয়া শেষে ধর্ম্ম চর্চ্চায় মতভেদের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। শিশির-কুমার কোনও নূতন ধর্ম্মের প্রবর্তক ছিলেন না, তিনি অধঃপতিত বৈষ্ণব ধর্ম্মকে টানিয়া তুলিয়াছিলেন মাত্র, যে ধর্ম্মকে শিক্ষিত সম্পদায় ছোট লোকের ধর্ম্ম বলিয়া ঘৃণা করিতেন, সেই ধর্ম্মকে তিনি শিক্ষিত সমাজের নিকট মধুর, পবিত্র ও আদরণীয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গৌরভক্তি ও গৌরপ্রেমের উচ্ছাস লক্ষ্য করিয়া বহুলোক তাঁহার অনুগত হইয়া তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। তাঁহার ধর্ম্মজীবন আলোচনা করিলে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণের ন্যায় গৃহী শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া যুগলের দাস্যভাবের সাধক ছিলেন। কখনও কখনও তাঁহার হৃদয় বাৎসল্য ভাবেরও উদয় হইতে দেখা গিয়াছে। শিশির-কুমারের অনুরক্ত ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, তিনি নাগরীভাবের সাধক ছিলেন। কান্তভাবে ভগবানের সাধনা বড় মধুর সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা বড়ই কঠিন। এই কান্তভাবের সাধনা মূর্খগণের নিকট যথেচ্ছাচারে পরিণত হইয়াছে। যাঁহারা শিশির-কুমারকে গুরুর ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন, শুনিতে পাওয়া যায়,

---

Indian People from the perusal of this book than in his whole life-time and he significantly remarked that it was no wonder that such a deeply religious race as the Indians should have so many Avatars or religious heroes."

তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বেচ্ছাচারের পথ অবলম্বন করিয়া উহা শিশিরকুমারের নির্দিষ্ট বলিয়া প্রচার করিয়াছেম। আমরা শিশির-কুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি কাহাকেও কখনও উক্তরূপে যথেচ্ছাচারী হইতে আদেশ দান করেন নাই। শিশিরকুমার স্বয়ং মালা, তিলক, কৌপীন কিম্বা বহির্ব্বাসাদি ধারণ করিতেন না ; কিন্তু এ বিষয়ে অন্য কাহাকেও তিনি তাঁহার অনুকরণ করিতে উপদেশ দিতেন না। যাঁহার হৃদয়-দর্পণে ভগবৎ প্রেম ও লীলা সর্ব্বদাই প্রতিবিম্বিত হয়, তাঁহার মালাও তিলক ধারণ কিম্বা মালা জপের প্রয়োজন হয় না। শিশিরকুমার প্রেমময়ের লীলা অনুশীলন করিয়া বুঝিলেন যে,—

"নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাই, তিন চিদানন্দরূপ ॥"

ভক্ত হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমতরঙ্গ উত্থিত হইলে তাঁহার তখন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া শিশিরকুমার যখন সঙ্কীর্ত্তন করিতেন, তখন যিনিই তাঁহার ভাব লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যতত্ব প্রচারক পত্রের সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ নন্দী শিশির-কুমারকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। জীবনের শেষভাগে শিশিরকুমার প্রায় প্রত্যহই ডাক্তার নন্দীর বাটীতে বৈদ্যুতিক চিকিৎসার জন্য গমন করিতেন। এই সময় উভয়ের মধ্যে ভগবৎপ্রসঙ্গও হইত। শিশির-কুমার সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, একথা পাঠকবর্গ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণও সঙ্গীতশাস্ত্রে নিপুণ। শ্রীমান্ তুষারকান্তি যখন সঙ্গীতসম্রাট তানসেনের দাস্যভাবের ভজনাবলি সুমধুর কণ্ঠে আলাপ করিত, শিশিরকুমার তখন অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন না, তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইত। আমরা ডাক্তার নন্দীর মুখে শুনিয়াছি যে, একদিন অতি প্রত্যূষে শিশিরকুমার তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান তুষারকান্তি ও তাঁহার শ্যালক হরিমোহনবাবুকে সঙ্গে লইয়া শিয়ালদহে ডাক্তার নন্দীর চিকিৎসালয়ে আসিয়া উপস্থিত হন।

বাগবাজার হইতে শিয়ালদহ আসিবার সময় তুষারকান্তি তানসেনের দাস্যভাবের সঙ্গীত আলাপ করিতেছিল; শিশিরকুমার সেই সংগীত শুনিয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়েন। তাঁহার গাড়ী ডাক্তার নন্দীর চিকিৎসালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তুষারকান্তি ও হরিমোহন বাবু চিকিৎসালয়ে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু ভাবোন্মত শিশিরকুমার গাড়ী হইতে নামিয়া রাস্তায় যাহাকেই দেখিতে পান, তাহাকেই আলিঙ্গন করিয়া গাহিতে লাগিলেন;—

ধর, নাও সে কিশোরীর প্রেম,
নিতাই ডাকে আয়।"

শিশিরকুমারের তখন বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার অন্য কোনদিকেই লক্ষ্য ছিল না। ডাক্তার নন্দী উপর হইতে তাঁহার ভাব দেখিয়া তাড়াতড়ি রাস্তায় আসিয়া শিশিরকুমারকে ধরিয়া উপরে লইয়া গেলেন। আমরা শ্রদ্ধাস্পদ রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে শিশিরকুমার অনেক সময় সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হইতেন। শিশির-কুমারের নির্দ্দেশমত ও ডাক্তার প্রিয়নাথ নন্দীর যত্নে ও চেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যতত্ত্ব প্রচারিণী সভার প্রতিষ্ঠা হয় এবং শেষে গৌরাঙ্গ সমাজও তাহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল।

শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অতিশয় জটিল বিবেচনায় শিশিরকুমার তাহার ভিতর প্রবেশ করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতেন না। প্রাণের সহিত ভগবানের আরাধনা করিলে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তের বাসনা অবশ্যই পূরণ করিবেন, শিশিরকুমারের ইহাই বিশ্বাস ছিল। আমরা শ্রীযুক্ত মতি-বাবুর নিকট শুনিয়াছি যে, শিশিরকুমার তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ শ্রীঅমিয়-নিমাইচরিত লিখিবার সময় যখন কোনও সমস্যায় পড়িতেন, তখন তিনি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ফেলিয়া ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া মহাপ্রভুর নিকট ধন্না দিয়া পড়িয়া থাকিতেন। কখনও অর্দ্ধঘণ্টা, কখনও এক ঘণ্টা, কখনও বা দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত তিনি এইরূপ ঠাকুর ঘরের দরজা

বন্ধ করিয়া পড়িয়া থাকিতেন। তাহার পর যখন দ্বার উন্মোচন করিয়া শিশিরকুমার বাহিরে আসিয়া লিখিতে বসিতেন, তখন তাঁহার বদনে এক অতি অভূতপূর্ব্ব ভাব পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার মধুর ভাবে মুগ্ধ হইয়া বহু শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাকে গুরুজ্ঞানে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন, একথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শিশিরকুমার গুরু ব্যবসায়ী ছিলেন না। বর্ত্তমান-কালের ন্যায় শিষ্যগণের নিকট হইতে অর্থাদি লইয়া দীক্ষাদান করা শিশিরকুমারের ব্যবসা ছিল না। ব্যবসায়ী গুরুগণ শিষ্যগণের বিজ্ঞাপণের জোরে আপনাদিগকে এক একটি ছোট খাঁটি অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। প্রকৃত ভগবৎকৃপা সিদ্ধ মহাত্মাগণ কিন্তু গোপনে থাকিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা ও প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহারা অবতার সাজিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়েন না। শিশিরকুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও অনুচরগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে অবতার করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শিশিরকুমারকে দর্শন করিয়া উপদেশ লাভের জন্য কোনও গৌরাঙ্গভক্ত তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলে তাঁহারা বলিতেন, "তাঁহার দর্শন পাওয়া অসম্ভব, তিনি আর নরলোকে দর্শন দেন না।" ক্রমে তাঁহাদের এই ব্যবহারের কথা যখন শিশির-কুমারের শ্রবণগোচর হইল, তখন তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই বন্ধু ও অনুচরগণের স্বভাব তীব্র তিরস্কারে সংশোধন করিয়াছিলেন। তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের যে মধুর রস আস্বাদ করিয়া হৃদয়ে শান্তিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাই সাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল। আত্মপ্রচার শিশিরকুমারের উদ্দেশ্য ছিল না।

জনকজননীর গুণেই সন্তানের চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। শিশির-কুমারের জনকজননীর পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি। আমরা এখানে একখানি পত্র উদ্ধৃত করিয়া এই অধ্যায়টী শেষ করিব। পত্রখানি শিশিরকুমারের জননী শিশিরকুমারকে লিখিয়াছিলেন।

পাঠক, পত্রখানি হইতে আপনারা ভক্ত শিশিরকুমারের জননীর প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইবেন।

পত্র।

শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।

প্রাণাধিক শিশির,

যদিও আমার জীবন শুষ্ক কাষ্ঠবৎ হইয়া আছে, তথাচ তোমার পত্রখানি পাইয়া তাহাতেও আবার রসের সঞ্চার হইল। বাপ, আমি গোলকেই বাস করিতেছিলাম, জানি না কি অপরাধে আমি এখন গোলক ভ্রষ্ট হইয়াছি। আমার দেহের কষ্টে দুঃখ নাই, কিন্তু গৌরাঙ্গ বিরহে আমার দেহমন জরজর হইতেছে। আমি গোলকের পথ জানিতাম না, তুমিই আমার পথপদর্শক। আমি তোমা হেন সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়া ধন্য। আমার জগতে আর কোন সাধ নাই, কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণ। বাপ, এখন আমাকে শীভ্র গোলকে পাঠাইয়া আমায় সেই চরণ সেবায় নিযুক্ত কর।

বাপ, আমার জন্য তুমি চিন্তা করিও না। তুমি সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবি হইয়া জগতের মঙ্গল কর, আমি অন্তরের সহিত তোমাকে এই আশীর্ব্বাদ করি। সন্তানের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা তুমি আমাকে ঢের করিয়াছ। বাপ, জীবের পরম সম্পদ গৌরাঙ্গ নাম, তাহা আমি তোমার নিকটেই প্রাপ্ত হইয়াছি। ভক্তের বাঞ্ছা ভগবান পূর্ণ করিয়া থাকেন, অবশ্যই তোমার বাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করিবেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা

তোমার মা।

পত্রখানির প্রত্যেক পংক্তির প্রত্যেক অক্ষর হইতে যেন মধু ক্ষরণ হইতেছে। শিশিরকুমারে জননীর আশীর্ব্বাদ সফল হইয়াছে, সত্যই শিশিরকুমার প্রেমভক্তি বিতরণ করিয়া জগতের মঙ্গলসাধনে সমর্থ হইয়াছেন।

একাদশ অধ্যায়

শিশিরকুমারের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা তাঁহাকে রাজনীতি ও ধর্ম্ম-নীতি ক্ষেত্রের ন্যায় সাহিত্য ক্ষেত্রেও সুপরিচিত ও সম্মানিত করিয়াছে। দীনা মাতৃভাষার উন্নতি বিধান কল্পে শিশিরকুমার সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই; রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতির প্রচার, প্রসার ও সংস্কার উদ্দেশ্যেই তিনি বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন। প্রতিভাশালী ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তিগণ কোন বিষয়েই কাহারও অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা নিজেদের প্রত্যেক কার্য্যেই মৌলিকত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। দেশপূজ্য স্বর্গত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তেজস্বী লেখক স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহোদয় আধুনিক বঙ্গভাষার সৃষ্টি কর্ত্তা বলিয়া পরিচিত। কিন্তু তাঁহাদের ভাষা সংস্কৃত মূলক বলিয়া প্রধানতঃ শিক্ষিত সমাজেরই বোধগম্য হইয়াছে, সাধারণ জনসম্প্রদায়ের হয় নাই। তাঁহাদের পর সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গভাষাকে সৌন্দর্য্যশালিনী; জীবনময়ী ও জ্যোতির্ম্ময়ী করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারই প্রবর্ত্তিত ভাষা বর্ত্তমানে সাহিত্যসেবিগণের অনুকরণীয় হইয়া রহিয়াছে। বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র আপন আপন প্রতিভাবলে বঙ্গসাহিত্যের এক এক বিভাগে এক একটী রচনা-রীতি দেখাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু ভক্তি সম্বন্ধে ভাষা কিরূপে মনোগত করিয়া প্রকাশ করিতে পারা যায়, শিশির-কুমারই তাহার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। শিশিরকুমার কোন বিষয়ে অনুকরণপ্রিয় ছিলেন না, সুতরাং বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি আপন ভাবেই লেখনী সঞ্চালন করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যথার্থই বলিয়াছিলেন, "ইংরাজীতে যাহাকে Literary Genius (সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রতিভা) বলে, বাঙ্গলা সাহিত্যে শিশিরবাবুর সেই প্রতিভা নিজস্ব ছিল। শিশিরকুমারের রচনার মধ্যে এমন একটি আকর্ষণী শক্তি আছে যে, তাঁহার গ্রন্থ

অজ্ঞাতভাবে পাঠকের হৃদয় আকৃষ্ট করে। বিলাতী সাহিত্যের সংস্পর্শে আমাদের মাতৃভাষা যে এক অভিনব ভাব ধারণ করিয়াছে এবং কোন কোন বিষয়ে যে শ্রীমতী ও শক্তিশালিনী হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে ; কিন্তু ভাগ্যদোষে কোন কোন লেখক বিলাতী ভাষার ধরণে যে রচনানীতি বাঙ্গলা সাহিত্যে চালাইতে প্রয়াসী হন, তাহা অনেক সময় পাঠকের হৃদয়ে বিভীষিকার সঞ্চার করে। শিশির-কুমার ইংরাজী শিক্ষিত হইলেও তাঁহার বাঙ্গলা রচনা, আদৌ ইংরাজী ভাবাপন্ন নহে ; অনেকে বরং তাঁহার ইংরেজীকে বাঙ্গলা ভাবাপন্ন বলিয়া থাকেন। রাজনীতি চর্চ্চার ন্যায় সাহিত্যেরও প্রচারে শিশির কুমারের জীবনের প্রকৃত মহত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে ; সুতরাং তাঁহার গ্রন্থাবলীর পরিচয় প্রদান এস্থলে অপ্রসাঙ্গিক হইবে না। তাঁহার গ্রন্থাবলী আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিব। প্রথম বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রন্থাবলী ও দ্বিতীয় নাটকাবলী। নাটক তিন খানির মধ্যে "নয়শো রূপেয়া" ও "বাজারে লড়াই" ধর্ম্ম গ্রন্থাবলীর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং আমরা প্রথমে তাঁহার নাটকাবলীরই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। তাঁহার নাটকগুলি বঙ্গ সাহিত্যে স্থায়ী হইবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু সেগুলি তাঁহার যে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় প্রদান করে, তাহারই জন্য তাহাদিগের আলোচনা আবশ্যক।

শিশিরকুমার তিনখানি নাটক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। প্রথম 'নয়শোরূপেয়া', দ্বিতীয় 'বাজারে লড়াই' এবং তৃতীয় 'শ্রীনিমাইসন্ন্যাস'। নয়শো রূপেয়ায় সমাজনীতি, বাজারে লড়াইএ রাজনীতি ও শ্রীনিমাই সন্ন্যাসে ধর্ম্মনীতি আলোচিত হইয়াছে।

মানবচরিত্র ও সমাজচিত্র জীবন্তভাবে প্রদর্শনই নাটক রচনার উদ্দেশ্য। কবি তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া লালিত্যপূর্ণ ভাষায় মানব হৃদয়ে আনন্দ, আশা, উদ্দীপনা প্রভৃতি ভাবের সঞ্চার করেন ; ঔপন্যাসিক তাঁহার উপন্যাসে সুনিপুণ তুলিকার সাহায্যে সমাজও সংসারচিত্র অঙ্কিত করিয়া ক্রোধ, কৌতুক, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি নানাবিধ

ভাব পাঠকের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেন। কাব্য বা উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়, তখন দর্শক সেই চিত্র দর্শন করিয়া ভয়ে অভিভূত ও আনন্দে পুলকিত হইয়া থাকেন। কিন্তু কাব্য বা উপন্যাস বর্ণিত ঘটনাবলী সজীবভাবে নাট্যকাকারে প্রদর্শন করিতে অসাধারণ শক্তির প্রয়োজন। শিশিরকুমার একজন অসাধারণ শক্তিমাণ পুরুষ হইলেও এবিষয়ে যে সম্যক কৃতকার্য্য হইয়াছেন, একথা আমরা বলিতে পারি না। তবে সাধারণ নাটককার হইতে তাঁহার আদর্শ ও অভিজ্ঞতা যে উচ্চছিল, তাহতে সন্দেহ নাই। উচ্চাঙ্গের কাব্য এবং উপন্যাস প্রণয়ন করার ন্যায় উচ্চাঙ্গের নাটক রচনা করাও আয়াস সাধ্য। নাটকের প্রধান ঘটনার সহিত যদি অবান্তর ঘটনার সংযোগ করা হয়, তাহা হইলে নাটকের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হওয়া দূরের কথা, নাটকখানি অসার বলিয়া বিবেচিত হয়। নাটক পাঠ করিবার বস্তু নহে; নাটকের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে নাটকাভিনয় দর্শন করিতে হয়। শিশিরকুমার নাটকাভিনয়ের অনুরাগী ও পক্ষপাতী ছিলেন এবং সেইজন্যই তিনি তদানীন্তন নাট্য-সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করিতেন। একদিন শিশির-কুমার রায় বাহাদুর দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের সহিত তাঁহার বাটীতে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় সুপ্রসিদ্ধ নাটককার গিরিশচন্দ্র সেখানে উপস্থিত হন। রায়বাহাদুর শিশিরকুমারকে গিরিশচন্দ্রের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। তখন "সধবার একাদশী" মহাসমারোহে অভিনীত হইতেছিল। দীনবন্ধু বাবু শিশিরকুমারকে বলিলেন, "গিরিশবাবু নিমচাঁদের ভূমিকা যেরূপভাবে অভিনয় করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব।" এই বলিয়া দীনবন্ধুবাবু একখানি সধবার একাদশী লইয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু শিশিরকুমারের তাহা শুনিতে ভাল লাগিল না। শিশিরকুমার বলিলেন, "থাক, থাক, তোমার আর পড়িতে হইবে না; গিরিশবাবু স্বয়ং যখন উপস্থিত রহিয়াছেন, তখন তিনিই পাঠ করুণ, একটু শ্রবণ করি।" গিরিশচন্দ্র

আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন, শিশিরকুমার মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতে লাগিলেন। ইহার পর শিশিরকুমার ঘনিষ্টভাবে নাট্যসম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়াছিলেন। প্রধান নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, নাট্যজীবনের প্রথমভাগে তিনি শিশিরকুমারের নিকট নাটকরচনা ও নাটকাভিনয় সম্বন্ধে অনেক সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শিশিরকুমার কিছুকাল ন্যাশানাল থিয়েটারের অন্যতম ডাইরেক্টর ছিলেন। তাঁহার নাটকগুলি তাঁহার নাট্যানুরাগের ফল। কারণ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সুপ্রণালী ক্রমে অভিনীত হইলে তাঁহার রচিত নাটক সমাজের কল্যান সাধন করিবে। তাঁহার প্রথম নাটক।

নয়শোরূপেয়া

এখানি সমাজিক নাটক ; ইহাতে নাট্যকার স্বীয় নাম প্রকাশ করেন নাই। কলিকাতায় ন্যাশানাল রঙ্গমঞ্চে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে এই নাটকখানি সর্ব্বপ্রথমে অভিনীত হয়। তাহার পর চুঁচুড়ায় একটি অবৈতনিক সম্প্রদায় ইহার অভিনয় করিয়াছিলেন। বর্তমানে আমাদের দেশে পুত্র বিক্রয় প্রথা যেমন প্রচলিত হইয়াছে, এক সময়ে শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ সমাজে কন্যা বিক্রয় প্রথা সেইরূপ প্রচলিত ছিল। রূপে, গুণে অতুলনীয়া হইলেও কন্যাকে পিতা অর্থের জন্যে অপাত্রে অর্পণ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। সদ্বংশজাত, সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র কিন্তু দরিদ্র, এরূপ বহু ব্রাহ্মণ যুবকের অর্থাভাবে বিবাহ হইত না। সমালোচ্য নাটকখানিতে শিশিরকুমার সমাজের এই চিত্রটী চিত্রিত করিয়াছেন। কন্যার পিতা ঘরবর অপেক্ষা অর্থের কথাটা কিরূপ বুঝিতেন, পাঠক তাহা শ্রবণ করুণ।

হলধর মুখুয্যে। "আপনার একটি বয়স্থা অবিবাহিত কন্যা আছে না ?"

রামধন মজুমদার। "আছে।"

হল। "সম্বন্ধ কি স্থির হয়েছে ?"

রাম। "হচ্ছে যাচ্ছে, ওর ঠিক কি। কিন্তু কোথাও এমন স্থির হয় নাই।"

হল। "আমি একটি সম্বন্ধ এনেছি।"

রাম। "কত টাকা?"

হল। "কত টাকা! আগে ঘরবর কেমন? তা শুনুন।"

রাম। "ঘরবর ভাল হয়, তাতে আমার কিছু মাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু আপনি কত টাকা দিতে পারবেন?"

* * * *

হল। "কেমন ঘর তা আগে শুনুন। শম্ভু মুখোপাধ্যায়ের—"

রাম। "আপনার অত কষ্ট নিতে হবে না, যেখানে আসল কথার সাব্যস্ত হল না, সেখানে আর ঘরবরের কথা শুনে কি হবে।"

হল। "পাত্রটীর বয়স সবে এই কুড়ি বৎসর, দেখ্‌তে—"

রাম। "আমার তাতেও আপত্তি নাই।"

হল। "দেখ্‌তে দিব্য সুশ্রী, গৌরবর্ণ—"

রাম। "আমার তাতেও কিছুমাত্র আপত্তি নাই।"

হল। "আবার লেখাপড়ায় বেশ তৎপর, ইংরাজী বাঙ্গালায়—"

রাম। "বেশ, আমার তাতেও বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। হাজার টাকা ত দিতে পার্‌বে?"

রঙ্গ মঞ্চে নাটক অভিনয় দ্বারা সমাজের পৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়া কন্যা বিক্রয় প্রথা বিলোপ সাধনের আশায় শিশিরকুমার সমালোচ্য নাটকখানি লিখিয়াছিলেন। নাটকাভিনয়ে শিশিরকুমারের উদ্দেশ্য যে কতক পরিমাণে সফলতা লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃত নাটকে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, নয়শো রূপেয়ায় আমরা তাহা দেখিতে পাই না। বর্ত্তমান যুগে রঙ্গমঞ্চে যে সকল নাটক অভিনীত হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে দুই একখানি ব্যতীত অন্যগুলির সহিত তুলনা করিলে শিশিরকুমারের যৌবনের প্রথম প্রয়াসের ফল, সমালোচ্য নাটক খানির স্থান যে বহু উচ্চে, তদ্বিষয়ে

কোনও সন্দেহ নাই। আমরা কি পৌরাণিক, কি সামাজিক, কি ঐতিহাসিক, আধুনিক বহু নাটকে লক্ষ্য করিয়াছি যে, যে ভাষার নাট্যোল্লিখিত পাত্র-পাত্রীগণ কথোপকথন করিয়া থাকেন, তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে অনেক সময় পণ্ডিতের সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। নয়শো রূপেয়ার এদোষ নাই। নাট্যকার তাঁহার এই নাটক খানিতে সরল ও সহজবোধ্য ভাষা অবলম্বন করিয়াছেন। প্রেমিক প্রেমিকার প্রণয় চিত্র না দেখাইলে নাটক চিত্তাকর্ষক হয় না। কিন্তু এই উচ্চ ভাব ফুটাইয়া তুলিবার ক্ষমতা অধুনা অতি অল্প সংখ্যক নাট্যকারের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। শিশিরকুমার নয়শো রূপেয়ার চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে প্রেমিক প্রেমিকার পবিত্র প্রণয় ভাব অতীব দক্ষতা ও সতর্কতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। সমালোচ্য নাটকখানি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য; সেইজন্য চিত্রটি সুদীর্ঘ হইলেও আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম। রঞ্জন যুবক, সরলা যুবতী; উভয়ে উভয়ের প্রেমে আবদ্ধ; উভয়ের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইলে সরলা যখন শুনিলেন যে, রঞ্জনের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ; তাহাতে বিবাহ সম্ভবনহে, তখন তিনি রঞ্জনের সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। নাট্যকারের সেই চিত্রটি এই—

রঞ্জন। "এই যে কে আস্‌ছে, সরলাই বটে।"

(সরলার প্রবেশ)

"তুমি এখনও কাহিল আছো, আমার হাত ধরে বেড়াও।"

সরলা। "না, তুমি একটু তফাত দাঁড়াও, আমার খুব নিকটে এস না।"

রঞ্জন। "বিষয়টা কি বল দেখি? আমার তো ভয় করছে। তুমি ভয়ে রাত্রে একা বেরতে পার না, লজ্জায় আমার সঙ্গে দিনের বেলাও কথা বোল্‌তে পার না, আজ এই রাত্রে—"

সরলা। "শোন, আমার অপরাধ নাই বিপদে পোড়্‌লে লোকের ভয়ও থাকে না, লজ্জাও থাকে না।"

রঞ্জন। "সেকি! বিপদ আবার কি! আমার শুনে যে ভয়ে গা কাঁপ্‌ছে। সরলা, চল একটু তফাৎ যাই। কাল বাড়ীতে কাজ বোলে, এখনও কেউ কেউ ঘুমায় নাই, কে দেখ্‌তে পাবে।"

সরলা। "দেখে আর কি কর্‌বে, একটু ঠাট্টা কর্‌বে বৈ ত নয়? তা আমি সহ্য কোর্‌তে পারি। যার সঙ্গে কাল এমনি সময় থাক্‌লে দোষ না হয়, তার সংগে না হয় আজকে দুটা কথাই বোল্লেম?"

রঞ্জন! "বিপদটা কি?"

সরলা। "কাল তোমায় আমায় একটা কাণ্ড হবে।"

রঞ্জন। "বে হবে তাই বোল্‌ছ?"

সরলা। "আমার তোমার কাছে একটী মিনতি, শুনবে ত?"

রঞ্জন। "অবশ্য শুন্‌ব।"

সরলা। "আমার কথাগুলি মন দিয়ে শুন্‌তে হবে, আর হেসে উড়িয়ে দিতে পার্‌বে না।"

রঞ্জন। "আচ্ছা, বল শুন্‌ছি।"

সরলা। "সম্পর্কে নাকি বাধে?"

রঞ্জন। "আমি স্বরূপ বল্‌ছি, আমি ঠিক জানি না। কেউ বলে বাধে, কেউ বলে বাধে না। আমাদের এ দেশের মধ্যে বিখ্যাত পণ্ডিত বিদ্যাভূষণ ঠাকুর ব্যবস্থা দিয়াছে যে হতে পারে।"

সরলা। "তুমি নাকি তাঁকে কিছু টাকা দিয়েছ?"

রঞ্জন। "তা কি তুমি জান না যে পণ্ডিতের কাছে ব্যবস্থা নিতে গেলেই টাকা দিতে হয়?"

সরলা। "তাঁকে যখন টাকা দিতে চাও, তার আগেও কি তাঁর ঐ মত ছিল?"

রঞ্জন। "কথাটা হচ্ছে এই, আমাদের শাস্ত্রে—"

সরলা। "তোমার পায়ে পড়েছি, আমার কথার উত্তর দাও।"

রঞ্জন। "না, তখন আর একরকম মত ছিল। তাই কি?"

সরলা। "তা এই যে, তোমার কাছ থেকে টাকা খেয়ে তোমার মনোমত ব্যবস্থা দিয়েছেন।"

রঞ্জন। "তা নয়। আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমার মনোমত ব্যবস্থা তল্লাস করে দিয়েছেন।"

সরলা। "তুমি আমাকে বঞ্চনা কোর্‌বে না, আমার মাথা খাও?"

রঞ্জন। "না।"

সরলা। "তোমার নিজের মনের বিশ্বাস কি বল দেখি?"

রঞ্জন। "একটু মনোযোগ দিয়ে শোন। আমার নিজের মনের বিশ্বাস যে, এ বে ঠিক শাস্ত্র সম্মত নয়, কিন্তু তাই বোলে যে এতে কিছু দোষ হবে, তা আমার বোধ হয় না। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষের কতকগুলি লোক ছাড়া আর তাবত দেশের লোক আপন খুড়্‌তুত, পিস্‌তুত, মামাত বোনকে পর্য্যন্ত বে করে। তাদের সুন্দর সবল সন্তান হয়। তাদের মধ্যে আমাদের মত কত শত বিদ্বান, ধার্ম্মিক লোক হোয়ে থাকে। যদি এ সমুদায় বিবাহ পরমেশ্বরের অভিপ্রেত না হোত, তবে এরূপ কখনই হোত না। তুমি আমার দূর সম্পর্কের মামাত বোন, তোমার সংগে বে হলে দোষ হবে?"

সরলা। "যদি তোমার মত আমার বিদ্যা থাক্‌তো, তবে হয়ত আমারও সন্দ হোত না।"

রঞ্জন। "বিশেষতঃ তোমার মা, বাপ, গুরু, পুরোহিত, কুটুম্ব গ্রামস্থ লোক সকলেই তোমায় আমায় বে দিচ্ছেন, দোষ হয় তাদের হবে তোমার আমার কি?"

সরলা। "মা বাপে টাকা নিয়েছেন, গুরু পুরোহিত টাকা নিয়েছেন, গ্রামস্থ লোকে ফলার খাবে। যাদের বে, ভোগ কেবল তাদের।"

রঞ্জন। "তবে তুমি এখন বল কি? বে বন্ধ করব?"

সরলা। "সম্পর্কে যদি বাধে, তবে তুমি আমায় নিয়ে কর্‌বে কি ?"

রঞ্জন। "তবে তোমার কি ইচ্ছা আমি বে তে ক্ষান্ত দেব ?"

সরলা। "তা হলে তোমার পক্ষে ভাল হয়।"

রঞ্জন। "তোমার পক্ষে ?"

সরলা। "তা শুনে তোমার দরকার কি ?"

রঞ্জন। "তা বটে কিন্তু তা না শুন্‌লে আমি তোমার কথায় উত্তর দেব কিরূপে ?"

সরলা। "আমার তা হোলে জ্বালা যন্ত্রণা সব ঘুচে যায়।"

রঞ্জন। "তা হয় ত এখনি বন্ধ কর। আমি ত বোলেছি সরলা, তুমি আমার কথা ভেব না। তবে আমি জন্মের মত বিদায় হই। কিন্তু বিদায় হবার আগে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার আজ এরূপ ভাব দেখ্‌ছি কেন ?"

সরলা। কিরূপ ভাব ?"

রঞ্জন। "তুমি আমার উপর রাগ কোর্‌লে কেন ?"

সরলা। "কৈ, আমি তোমার উপর রাগ করিনি ত ?"

রঞ্জন। "রাগ না কর, আমার উপর যে কিছু স্নেহ, মমতা ছিল, তা গেল কেন ?"

সরলা। "কিসে বুঝলে ?"

রঞ্জন। "এই যে বোল্লে, আমার সঙ্গে তোমার বে না হোলে তোমার জ্বালা যন্ত্রণা সব ঘুচে যাবে।"

সরলা। "হাঁ, তা যায়।"

রঞ্জন। "সরলা, তুমি আমাকে নিয়ে খেলা কোরো না। আমার ধন, প্রাণ, মন, যথাসর্বস্ব তোমাতে সোঁপেছি। তুমি প্রকারান্তরে বোলছ, আমার উপর তোমার স্নেহ, মমতা কিছু কমে নাই। আজ যদি আমি বে তে ক্ষান্ত দেই, কাল তোমাকে একজন বে কোরে নে

যাবে। তখন বল দেখি, আত্মহত্যা ব্যতীত আমার আর কি উপায় থাক্‌বে ?”

সরলা। “তোমার খুব কষ্ট হবে। তা না হোলে আর গোল কি ?”

রঞ্জন। “তোমার কষ্ট হবে না ?”

সরলা। “হবার আগে ঔষধ খাব।”

রঞ্জন। “তবে আমায় কেন সে ঔষধ একটু দাও না ?”

সরলা। “তুমি অমন কথা মুখে এন না। তুমি আমার চেয়ে সহস্র গুণে ভাল আর একটি বে কোরে সুখে স্বচ্ছন্দে থাক। আমার পৃথিবীতে থেকে ফল কি ?”

রঞ্জন। “তবে তুমি প্রাণ ত্যাগ কর্‌বে ?”

সরলা। “আর আমার পথ কি আছে ? তুমি ক্ষান্ত দিলে, কাল বাবা আমাকে আর একজনের গলায় গেঁথে দেবেন।”

রঞ্জন। “তবু আমাকে বে কোর্‌বে না ?”

সরলা। “আমি কোর্‌তে চাইলে কি হয়, তুমি আমাকে নিয়ে কি কোর্‌বে ?”

রঞ্জন। “কেন ? বুঝ্‌তে পারলাম না।”

সরলা। “আত্মহত্যা নাকি বড় পাপ।”

রঞ্জন। “সর্ব্বনাশ ! অমন কথা মুখে আন্‌তে নাই, অমন পাপ পৃথিবীতে আর নেই।”

সরলা। “তাই ত। তুমি যদি এক কাজ কর, তবে এ পাপের দায় হোতে এড়াই। তুমি যদি আমাকে—”

রঞ্জন। “কি বোল্‌ছিলে বল ?”

সরলা। “তুমি যদি আমাকে বে কর।”

রঞ্জন। “তুমি আবল তাবল বক্‌ছো কেন ?”

সরলা। “শোন, কিন্তু দুইজনে—”

রঞ্জন। “বল, চুপ কোর্‌লে কেন ?”

সরলা। "দুইজনে—"

রঞ্জন। "আবার চুপ কোর্‌লে কেন ?"

সরলা। (অধোবদন) "দুইজনে ভাইবোনের মত থাক্‌ব, তুমি আর একটা বে করো। আমি তোমার কাছে থাক্‌বো। আমি তার চেয়ে আর সুখ চাইনে।"

রঞ্জন। "আচ্ছা, তুমিও একটি বে করো।"

সরলা। "ছি। আমি ত তামাসা কোর্‌ছি না।"

রঞ্জন। "তবে আমিই বা বে কোর্‌ব কেন ?"

সরলা। "তুমি পুরুষ মানুষ। আমার জন্যে কেন সংসারের সুখ থেকে বঞ্চিত থাক্‌বে।"

রঞ্জন। "আচ্ছা, এসব কথা বের পর হোলে ভাল হয় না ?"

সরলা। "না, বের আগে বলাই কর্ত্তব্য। আর তার জন্যই আমি লজ্জা ভয় ত্যাগ কোরে এই রাত্রে একা তোমার কাছে এসেছি। যদি তুমি এতে অসম্মত হও, তবে আমি আমার মনোমত কাজ করি।"

রঞ্জন। "যদি বের পরে আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারি যে এতে কোন দোষ নাই।"

সরলা। "আমার আর একটি মিনতি। এ সম্বন্ধে তুমি আমায় বুঝাবার চেষ্টা কোর্‌তে পারবে না।"

রঞ্জন। "এ আবার কি ! তাতে আবার দোষ কি ?"

সরলা। "আমরা মেয়েমানুষ, পুরুষ মানুষে আমাদের যা বুঝায়, তাই বুঝি। আর এ সম্বন্ধে তুমি আমাকে যা বোল্‌বে, তাতে আমার সায়দিতে ইচ্ছা কর্‌বে।"

রঞ্জন। "আমি ধর্ম্মত বোল্‌ছি, আমি তোমাকে ফাঁকি দিয়ে বুঝাবার চেষ্টা কোর্‌ব না।"

সরলা। "তুমি ভুল বুঝাবে কি সত্যি বুঝাবে, তা তুমি নিজে বুঝ্‌তে পার্‌বে না।"

রঞ্জন। "সরলা, তুমি জান আমি যদি তোমার সাক্ষাতে কোন প্রতিজ্ঞা করি, তা প্রাণ থাক্‌তে ভাঙতে পার্‌ব না।"

সরলা। "তা জানি।"

রঞ্জন। "তবে আমার কাছ থেকে কেন প্রতিজ্ঞা কোরে নিচ্ছ ?"

সরলা। "তোমার কাছে সুখে স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে নিঃশঙ্কে থাক্‌তে পার্‌বো বোলে। দেখ, তুমি আর একটা বে কোর্‌বে ত ?"

রঞ্জন! "না।"

সরলা। "আমার মাথা খাও, আর একটা বে কোর্‌তে হবে।"

রঞ্জন। "যদি আমি বে না কোরে আরও সুখে থাকি ?"

সরলা। "সে আর এক কথা। আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে।"

রঞ্জন। "যদি আমি প্রতিজ্ঞা করি, তবে সে তোমার অসম্মতি পর্য্যন্ত, তোমার সম্মতি হোলে আর প্রতিজ্ঞা থাক্‌বে না।"

সরলা। "তুমি কি তাই ভাব্‌ছো ? আজ আমি যাতে না বোল্‌ব, কাল আবার তাতেই হাঁ বোল্‌ব। তোমাদের বিবেচনায় মেয়ে মানুষ কি এত ছোট ?"

রঞ্জন। "বেশ, তবে ত চারিদিক্‌তেই চিত্তির। এ এক রকম বে মন্দ নয়। সরলা, তোমার সর্ব্বদা, তুমি এরূপ পাগলামি কথা সব বোলো না। তুমি ওর বদলে—"

সরলা। "তুমি আমার কাছে অমন কোরে দুঃখ করিও না। তুমি আমার কাছে ওরূপ কর, আর আমার বুকে ছুরি লাগে।"

রঞ্জন। "তবে উপায় কি ?"

সরলা। "তুমি না আমাকে বড় ভালবাস ? বোল্‌ব ? আমিও তোমাকে বড় ভালবাসি। তখন তুমি আমার কাছে ওরূপ কর কেন ?"

রঞ্জন। "দেখ দেখি তোমার কত বড় অন্যায় কথা। তুমি বুঝ্‌বে না, বোঝাতেও দেবে না। যদি প্রকৃত বে অসিদ্ধ না হয়, তবে কেন কষ্ট পাবে আর—দেবে।"

সরলা। "তা আমি ঠিক করিয়াছি। দেখ, বিদ্যাসাগর কিছু

টাকা খেয়ে মিথ্যা বলিবেন না। আমার উপরও তাঁর রাগ হবার কোন কারণ নাই। আর শুনেছি, তিনি নাকি স্ত্রীলোকের বড় সাপক্ষ লোক। (আঁচল দিয়ে চক্ষের জল মুছল) তাঁর কাছ থেকে এর পরে একখান্ ব্যবস্থা আন্‌তে পারবে?"

রঞ্জন। "তা বোধ হয় পার্‌বো।"

সরলা। "তবে এই কথা। তবে এখন যাও, আমিও যাই, মনে কষ্ট কোরো না। আমার কথা বোলে গেলাম, এখন তোমার ইচ্ছে।" (সরলার প্রস্থান)

রঞ্জন। (স্বগত) "সরলা গিয়াছে? দেখি অদৃষ্ট কোথা লয়ে যায়।" (প্রস্থান)

এই চিত্রটিতে অনেক কথা ভাবিবার, বুঝিবার ও শিখিবার আছে। সমালোচ্য নাটকে শিশিরকুমার সৃষ্টি চাতুর্য্যের সুন্দর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সাতুলাল তাঁহার একটি অদ্ভুত সৃষ্টি। এই সাতুলালকে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের নিমচাঁদের সহিত কতক পরিমাণে তুলনা করিতে পারা যায়। সাতুর চরিত্রে অনেক শিক্ষার জিনিস রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। নাটক-খানিতে নাট্যকার একটীও সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট করেন নাই। সঙ্গীত মানবের চিত্তবৃত্তির উপর যেরূপ স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে, আর কিছুই সেরূপ পারে না। সুতরাং নাটক খানিতে নাট্যকার যদি দুই একটি সঙ্গীত সংযোজন করিতেন, তাহাতে নাটকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইত। নাট্যকার স্বয়ং একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন; তিনি তাঁহার এই নাটকে কেন যে সঙ্গীতের অবতারণা করেন নাই, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। উপসংহারে আমরা একটী কথা বলিব। সুরুচির দ্বারা সুরুচির সংশোধনই বাঞ্ছনীয়। নাট্যকার যদি একটু কৌশলের সহিত লেখনী চালনা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার এই নাটকখানিতে স্থানে স্থানে অশ্লীলতা দোষ স্পর্শ করিতে পারিত না।

২। বাজারে লড়াই

বাজারে লড়াই একখানি অতি ক্ষুদ্র প্রহসন। এখানি নয়শো-রূপেয়ার পর ন্যাশানাল রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। ইহাতে নাট্যকার কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান ও কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব পুলিশ কমিশনার সার ষ্টুয়ার্ট হগের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। স্বর্গীয় বাবু হীরালাল শীলের ধর্ম্মতলায় একটী বাজার ছিল। হগ সাহেব এই বাজার ভাঙ্গিয়া একটি নূতন বাজার বসাইবার উদ্যোগ করিলে হীরালালবাবু আপনার বাজার রক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। বাজারের ব্যাপার অবলম্বনে রচিত বলিয়া নাট্যকার প্রহসন-খানির "বাজারে লড়াই" নাম দিয়াছেন। কলিকাতার করদাতৃগণের রক্তশোষণ করিয়া মিউনিসিপ্যালিটী যে অর্থ সংগ্রহ করিতেন, হগ-সাহেব সেই অর্থের কিরূপ সদ্ব্যবহার করিতেন, পাঠক এই নাটকে তাহার পরিচয় পাইবেন। হগসাহেব বলিতেন, "রেটপেয়ারদের টাকা আমার বুকের রক্ত, আমার উপর ধর্ম্মভার রয়েছে।" কিন্তু তিনি কিরূপে অর্থব্যয় করিতেন, পাঠককে তাহা অবগত করাইবার জন্য আমরা প্রহসনখানি হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিলাম। কেরানী নূতন বাজারের হিসাব হগসাহেবকে শুনাইতেছেন।

কেরানী। "শান্তিরাম মালি ২ টাকা।"

হগ। "কেন ?"

কেরানী। "নূতন বাজারে বেগুণ বেচিবে বলিয়া।"

হগ। "বেগুন বেচিবে বোলে দু-টা-কা! এরূপ অপব্যয় ? রেট পেয়ারদের টাকা আমার বুকের রক্ত, আমার উপর ধর্ম্মভার রয়েছে। বেগুনের জন্য দুটাকা ?"

কেরানী। "বেগুন না হলে বাজার হবে কিরূপে ?

হগ। "বেগুনে সাহেব লোকের কিছুই প্রয়োজন নেই।"

কেরাণী। "বুঝলেম। গাড়ী ভাড়া ৩৫০\ টাকা।"

হগ। "গাড়ী ভাড়া কেন ?"

কেরাণী। "নূতন বাজারে আস্‌বেন বোলে সাহেব লোককে গাড়ী ভাড়া।"

হগ। "উত্তম।"

কেরাণী। "মেঠাই খরচ ৪৩০, টাকা"।

হগ। "কি বাবদে?"

কেরাণী। "বাজারে যে সাহেবেরা আইসেন তাঁহাদিগকে পুরস্কার।"

হগ। "উত্তম। এ পুরস্কার সাহেব লোককে দেওয়া হয়েছে?"

কেরাণী। "কেবল সাহেব লোককে।"

হগ। "উত্তম।"

আমরা আরও একটু উদ্ধৃত করিতেছি। বাজার বসাইবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটী যে অর্থ মঞ্জুর করিয়াছিলেন, তাহা কিরূপে ব্যয় হইয়াছে পাঠক বুঝিতে পারিলেন। হগসাহেব পুনরায় বিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করিবার জন্য কমিশনারদিগের নিকট প্রস্তাব করিলে অন্যতম কমিশনার জেম্‌স সাহেব বলিতেছেন, "এ অতি উত্তম প্রস্তাব। এ টাকা দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু যাহাতে সাহেবেরা হাটে যান, তাহার কি উপায় করিয়াছেন? আমার বিচেনায় যাহারা হাটে যান, তাহাদের গাড়ী ভাড়া দেওয়া কর্ত্তব্য।"

হগ। (একটু হাসিয়া) "আমার বন্ধু কেমন করিয়া হাট বসাইতে হয়, তাহা জানেন না। গাড়ী ভাড়া না দিলে সাহেবেরা হাটে যাইবেন কেন? আমি গাড়ী ভাড়া খুপ দিতেছি তাহাতে আমাকে কেহ অভদ্র বলিতে পারিবেন না। আমি আরও করিতেছি, যাঁহারা হাটে আসিতে অবকাশ না পান, তাঁহাদিগের বাজার করিয়া বিল সম্বলিত তাঁহাদের বাটী পাঠাইতেছি।"

জেম্‌স্। হিয়ার, হিয়ার! বাটী পাঠাইতেছেন, কিন্তু একটি কথা আছে। সেই বিল লইয়া গণ্ডগোল বাধিয়া যাইবে, অনেকে বলিবে, বিলে বেশী ধরা হোয়েছে।"

উমেশ। "আমি সেসব বিল দেখিয়া দিব স্যার।"

জেম্‌স্। "তাহা বটে, কিন্তু আপনি নেটিব, আমার কথা বলি না, কিন্তু সাহেব লোকে, উমেশবাবু বুঝিতেছেন ত সাহেব লোকে—।"

হগ। "এত গণ্ডগোল কেন? মোটে বিল না করিলেই হবে। সাহেব লোককে বাজার করিয়া পাঠাইয়া দিব? আর বিল করিব না।"

জেম্‌স্। "তবে আর আপত্তি নাই। তবে আমি, আমার বাপ দাদা, যে যেখানে আছে, কেহ ধর্ম্মতলার বাজারে যাইবে না। এবিষয়ে আমি শপথ করিতে পারি।"

উমেশ। "আপনি অতি মহৎ, দেশহিতৈষী ও পরোপকারী।"

কৃষ্ণদাস। "যদি হাটের নিমিত্ত লোকে এত ব্যাকুল হয়ে থাকে, তবে তাহাদিগকে হাটে আসিবার নিমিত্ত এত লোভ দেখান কেন?"

হগ। "কৃষ্ণদাস, তুমি বোঝ আমার—কলা। হাটের নিমিত্ত এদেশীয়েরা ব্যস্ত, সাহেবদের হাটের কোন দরকার নাই। এই জন্যে সাহেবদের কিছু প্রলোভন দেখাতে হয়।"

জেম্‌স্। "তুমি আমার মনের কথা বলেছ, সাহেবদের কিছু বিশেষ প্রলোভন দেখাতে হয়, অতএব আমি প্রস্তাব করি যে সেদিন যেরূপ ভোজ হইয়া গিয়াছে, সেইরূপ প্রত্যেক সপ্তাহে বাজারের নিমিত্ত একটা একটা ভোজ হয়।"

উমেশ। "হিয়ার! হিয়ার!"

ন্যাশানাল রঙ্গমঞ্চে প্রহসনখানি অভিনীত হইলে দেশে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। দুই একটি কথায় নাট্যকার বেতনভোগী ভাইসচেয়ারম্যান উমেশচন্দ্রের চরিত্র বড় সুন্দরভাবে ফুটাইয়াছেন। তোষামোদকারী হইলেও এদেশীয়গণের প্রতি ইংরাজদিগের কিরূপ বিশ্বাস, জেম্‌স্ সাহেবের একটী কথায় তাহা নাট্যকার সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এ গ্রন্থেও শিশিরকুমার স্বীয় নাম অপ্রকাশ রাখিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে এ গ্রন্থ আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রহসনখানিতে নাটকীয় সৌন্দর্য্যের অভাব পরিলক্ষিত হইলেও, ইহাতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

৩। নিমাই সন্ন্যাস।

গ্রন্থের নামকরণ হইতেই পাঠক বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই নাটকখানি মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের ব্যাপার অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। নাট্যকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "এই চারিশত বৎসর হইল, কাঞ্চননগরে (কাটোয়া) শ্রীনিমাই পণ্ডিত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সেই সন্ন্যাসের দিন সেই স্থানে শ্রীমহাপ্রভুর আকর্ষণে অসংখ্য লোক সমবেত হয়। সেই সময় কারুণ্য রসের এরূপ তরঙ্গ উঠে যে বহুতর লোক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সংসার ত্যাগ করে। তখন যে ক্রন্দনের রোল উঠে, তাহার প্রতিধ্বনি এখন শুনা যায়। মহাজনগণ এই অপূর্ব্ব ও অদ্ভুত ঘটনা নাটকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ ১৩৭ খানা নাটকের কথা শুনা যায়। যখন সেখানে এই নাটক অভিনীত হইয়াছে, সেইখানেই দর্শকগণের মধ্যে তরঙ্গ উঠিয়াছে ও তাহাতে তাঁহারা অভিভূত হইয়া পবিত্রকৃত হইয়াছেন। দুঃখের মধ্যে এই সমুদায় নাটকের মধ্যে স্থানে স্থানে আনুমানিক কথা আছে। সেই দোষ সংশোধন করিবার নিমিত্ত আমি এই নাটকখানি লিখিলাম। ইহাতে প্রকৃত ঘটনা লিখিত হইয়াছে, বিন্দুমাত্রও কল্পনা নাই।"

এ নাটকখানি কোন সাধারণ রঙ্গ মঞ্চে অভিনীত হয় নাই। উড়িষ্যার অন্তর্গত ধেন্‌কানালের রাজার যত্ন, চেষ্টা ও উৎসাহে রাজ-বাটীতে নাটকখানি একটি অবৈতনিক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই অভিনয়কালে দর্শকগণের এক অতি অভূতপূর্ব্ব ভাবের তরঙ্গ উঠিয়াছিল। নাটকখানিতে নাট্যকার কয়েকটী মধুর ও ভক্তিভাবোদ্দীপক সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। নাটকের ভাষা যেরূপ হওয়া উচিত, এ নাটকে তাহা

হয় নাই। কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া কেবলমাত্র কঠোর ঐতিহাসিক সত্য অবলম্বনে নাটকখানি রচিত হইয়াছে বলিয়াই ইহা সাধারণের আশানুরূপ মনোরঞ্জন করিতে পারে নাই। নাটকখানিতে নাট্যকার যথোপযুক্ত নাটকীয় আববণ প্রদান করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু এই নাটকের অভিনয় দর্শন করিলে দর্শক উপকৃত হইবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

আমরা উপরে তিনখানি নাটকের পরিচয় প্রদান করিলাম; ইহা ব্যতীত শিশিরকুমাব আর একখানি নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা প্রকাশিত হয় নাই। গৌরাঙ্গভক্ত হইবার পর শিশির-কুমার তাঁহাব আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব লইয়া একটি কৃষ্ণযাত্রার দল গঠন কবিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ই তাঁহার সেই নাটকখানি অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয়কালে দর্শকগণের মধ্যে যে ভাবের তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল, শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা বর্ণনাতীত।

ধর্ম্মগ্রন্থাবলী।

শ্রীনরোত্তম চরিত

শ্রীনরোত্তম চবিত শিশিরকুমারের প্রথম গ্রন্থ। ইহাকে তিনি একটি পরম ভাগবতের অপূর্ব্ব জীবন কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ কবি লংফেলো গাহিয়াছেন,—

"Lives of greatmen all remind us,
We can make our lives sublime,

অর্থাৎ মহৎ লোকদিগের জীবনী আলোচনা দ্বারা আমরাও আমাদিগকে মহত্তব পথে পরিচালিত করিতে পারি। কিন্তু স্বর্গগত মহাপুরুষদিগের চরিত-গ্রন্থ প্রকাশিত না হইলে সাধারণে তাঁহাদের মহত্বের কথা কিরূপে অবগত হইতে পারিবেন? জীব, সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, দুঃখ কষ্টে ও মানসিক অশান্তিতে কালযাপন করেন,

এমন সময় যদি ভগবৎকৃপার একটিমাত্র কণিকা প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার সকল জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হয়, তিনি হৃদয়ে পরমানন্দ লাভ করিয়া বিভোর হইয়া পড়েন। কিন্তু এই ভগবৎকৃপা প্রাপ্তির উপায় কি? উপায় এই যে, মহাপুরুষদিগের জীবনী আলোচনা করিয়া তাহাদিগের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন। অন্ধ জীব যাহাতে আলোক প্রাপ্ত হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহারই জন্য শিশিরকুমার এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি এই গ্রন্থখানি তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব হরিনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের শ্রীকরকমলে উৎসর্গ করিয়াছেন। সেই উৎসর্গপত্রের শেষ ভাগে তিনি লিখিয়াছেন, "নির্ব্বোধ জীব অন্ধ হইয়া শ্রীভগবান ভুলিয়া দুঃখে হাহাকার করিতেছে। পিতা, তুমি আমার হৃদয় জান যে, ইহা ভাবিয়া আমি বড় দুঃখ পাই। কিন্তু এই যে অভিভূত জীবকে আমি চেতন করিব, আমার সেরূপ সাধ্য নাই। তাই ভাবিলাম যে, সাধু লোকের চরিত্র লিখিয়া জীবগণের চেতন করিবার চেষ্টা করিব। সেই নিমিত্ত ঠাকুর মহাশয় নরোত্তমের চরিত্র লিখিলাম। শ্রীনরোত্তম চরিতের আখ্যায়িকা এই ঃ—

রামপুর—বোয়ালিয়া হইতে ছয় ক্রোশ দূরে গড়ের হাট পরগণার অন্তর্গত খেতরি গ্রামে কৃষ্ণানন্দ দত্ত নামক জনৈক কায়স্থ রাজা বাস করিতেন। নরোত্তম এই রাজার পুত্র। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের আকর্ষণে নরোত্তম ধরাধামে অবত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ভক্ত গ্রন্থকার শিশিরকুমার প্রেমবিলাস নামক গ্রন্থের অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন, —"যাঁহারা গৌরাঙ্গ লীলা অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, মহাপ্রভু প্রথমবার বৃন্দাবনে যাইতে গৌড়ের রাজধানীর নিকট রামকেলি গ্রাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেখানে এক দিবস তিনি খেতরি গ্রামের দিকে চাহিয়া 'বাপ নরোত্তম' বলিয়া বারম্বার ডাকিয়াছিলেন। সেই আকর্ষণে নরোত্তমের জন্ম হয়। আর তিনি ও শ্রীনিত্যানন্দ সেই সময়ে পদ্মাবতী নদীর নিকট 'প্রেম' ধন গচ্ছিত

রাখিয়াছিলেন। প্রভু পদ্মাবতীকে ইহাই আদেশ করেন যে, 'যখন নরোত্তম দাস জন্মগ্রহণ করিবেন, তখন তুমি তাঁহাকে ইহা দান করিবে।' পরে নরোত্তম জন্মগ্রহণ করিলে, সময় বুঝিয়া শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহাকে স্বপ্নে বলিলেন, নরোত্তম! তুমি কল্য প্রতূষে পদ্মাবতী নদীতে একাকী স্নান করিতে গমন করিও, সেখানে তুমি পরম ধন পাইবে। এই কথা শুনিয়া নরোত্তম পদ্মায় গমন করিয়া স্নান করিলে, পদ্মাবতী নদী দেহ ধারণ করিয়া তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গের গচ্ছিত ধন প্রদান করিলেন ও তাহাতেই তিনি তদ্দণ্ডে প্রেমে উন্মত্ত হইলেন।" রাজপুত্র নরোত্তম, বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী নরোত্তম, জনকজননীর বড় আদরের ধন ও একমাত্র পুত্র নরোত্তম যখন প্রেমের দেবতা শ্রীগৌরাঙ্গের সমধুর আস্বাদন পাইলেন, তখন তাহার নিকট সংসারের সকল সুখ তুচ্ছদপি তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল, তিনি বৃন্দাবনে গমন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। রাজা কৃষ্ণানন্দ ও রাণী নারায়ণী, পুত্রের ভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদাই চোখে চোখে রাখিতেন, কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া নরোত্তম বৃন্দাবনে পলায়ন করেন। বৃন্দাবনে বৈষ্ণবচূড়ামণি লোকনাথ প্রভুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। প্রভু লোকনাথ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, তিনি জীবনে কখনও কাহাকেও শিষ্য করিবেন না, কিন্তু নরোত্তমের সেবায় তিনি মুগ্ধ হইয়া সঙ্কল্পচ্যুত হইয়াছিলেন। প্রভু লোকনাথের অজ্ঞাতে নরোত্তম এক বৎসর হাড়ির সেবা করিয়াছিলেন।* শেষে প্রভু একদিন নরোত্তমকে—

"পুছয়ে, কে তুমি কেন কর হেন কাজ।"

তাহাতে নরোত্তম সভয়ে উত্তর করিলেন,—

"কেবল তোমার প্রসন্নতা চাই প্রভু।
এই কৃপা কর মোরে না ছাড়িব কভু॥"

নরোত্তমের কাতরোক্তি প্রভু লোকনাথের হৃদয় দ্রবীভূত করিল; প্রভু শেষে নরোত্তমকে বলিল, "তুমি আমার আদি, মধ্যম ও শেষ

*হাড়ির সেবা অর্থাৎ হাড়ির কার্য্য—মল-মূত্রাদি পরিস্কার।

সেবক। তোমার ন্যায় শিষ্য জগতে দুর্লভ। এরূপ শিষ্য পরম ভাগ্যে মিলিয়া থাকে। আমি এরূপ ভাগ্য কেন ত্যাগ করিব?" প্রভু লোকনাথ নরোত্তমকে দীক্ষাদান করিলেন। তৎপর নরোত্তম "ঠাকুর মহাশয়" উপাধি লইয়া, গুরুর আদেশে ভক্তিগ্রন্থ প্রচারার্থ স্বদেশেপ্রত্যাগমন করিলেন। বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী রাজপুত্র নরোত্তম নিজ রাজধানীতে অতি দীনহীনভাবে অবস্থান করিয়া পরমানন্দে শ্রীভগবানের ভজন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বহু ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের মন্ত্রশিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ, ঠাকুর মহাশয়ের প্রেমের আকর্ষণে সংসারে যুবতী সহধর্ম্মিনী, কনিষ্ঠ সহোদর ও আত্মীয় স্বজনগণ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ঠাকুর মহাশয় কিরূপে গয়েসপুরের প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ধনী ও ভগবতী উপাসক শিবানন্দ আচার্য্যের পুত্রদ্বয় রামকৃষ্ণ ও হরিরামকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, কিরূপে ব্রাহ্মণেতর বৈষ্ণবগণের প্রতি দ্বেষভাবাপন্ন ব্রাহ্মণগণকে প্রেমে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, কিরূপে রাজা নরসিংহ ও তাঁহার ভ্রাতাকে মন্ত্রদান করিয়াছিলেন, কিরূপে ব্রাহ্মণ জমিদার রাঘবেন্দ্র রায়ের পুত্র চাঁদরায়কে মৃত্যু মুখ হইতে উদ্ধার করিয়া প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, ভক্ত শিশিরকুমার তাহা এই গ্রন্থে এমন মধুর ও হৃদয়গ্রাহী ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে পাঠকের হৃদয়ে প্রেমের তরঙ্গ উত্থিত হইবে। গুরু ও শিষ্যের মধুরভাব গ্রন্থকারের সুনিপুণ তুলিকায় অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঠাকুর মহাশয় নরোত্তম অলৌকিক ভাবে অপ্রকট হয়েন। তিনি গাম্ভীলায় আসিয়া কার্ত্তিক মাসে, কৃষ্ণাপঞ্চমীতিথিতে গঙ্গায় অবগাহন করিয়া শেষে আধ-গঙ্গাজলে বসিলেন। তাহার ভক্তদ্বয় গঙ্গানারায়ণ ও রামকৃষ্ণ তাঁহার অভিপ্রায় মত তাঁহার অঙ্গ-মার্জ্জন করিতে লাগিলেন; কিন্তু মার্জ্জন করিতে করিতে এক অদ্ভুত কাণ্ড উপস্থিত হইল। যথা নরোত্তম বিলাসে :—

"দেহে কিবা মার্জ্জন করিবে, পরশিতে।
দুগ্ধ প্রায় মিশাইলা গঙ্গার জলেতে ॥
দেখিতে দেখিতে শীঘ্র হৈল অন্তর্ধান।
অত্যন্ত দুর্জ্জেয় ইহা কে বুঝিবে আন ॥
অকস্মাৎ গঙ্গায় তরঙ্গ উঠিল।
দেখিয়া লোকের মহা বিস্ময় হইল ॥
শ্রীমহাশয়ের ঐছে দেখি সঙ্গোপন।
বরিষে কুসুম স্বর্গে রহি দেবগণ ॥
চতুর্দ্দিকে হইল মহা হরি হরিধ্বনি।
কেহ ধৈর্য্য ধরিতে না রহে ইহা শুনি ॥"

সাধারণ লোকে এরূপ সঙ্গোপন হয়ত বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু ভক্তগণের নিকট ঠাকুর মহাশয়ের এইরূপ অন্তর্ধান অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না।

সমালোচ্য গ্রন্থখানিতে ভাষার কোনওরূপ আড়ম্বর লক্ষিত হইবে না, কিন্তু গ্রন্থকারের বর্ণনার বিশেষত্বে, বর্ণিত বিষয় পাঠকের চক্ষের উপর স্ফুরিত হইতে থাকে। ঠাকুর মহাশয় নরোত্তম নবদ্বীপে মহাপ্রভুর বাড়ী দেখিতে গিয়াছেন এবং ভক্তগণ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী দেখাইতেছেন, এ দৃশ্যটী গ্রন্থকার যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম,—"ঠাকুর মহাশয় ধূলায় ধূসরিত হইয়া আঙ্গিনায় বসিলেন। হায়! সেস্থান শ্রীগৌরাঙ্গের নয়নজলে কর্দ্দমময় থাকিত, যে স্থানে দিবানিশি কৃষ্ণ কীর্ত্তন হইত, যে বাড়ী বেষ্টন করিয়া লক্ষ লক্ষ লোকে হরিধ্বনি করিত, সেই স্থানের আজ একি দশা! ইহা ভাবিতে ভাবিতে ঠাকুর মহাশয়ের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। তখন ঈশান ও শুক্লাম্বর ঠাকুর মহাশয়ের আগ্রহে তাঁহাকে প্রভুর লীলার স্থান ও দ্রব্যগুলি দর্শন করাইতে লাগিলেন। এই পুষ্পবন, এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রথমে শ্রীবাসকে আলিঙ্গন প্রদান করেন। এই ঠাকুর ঘর। এই প্রভুর শয়ন ঘর। এই শচীমাতার শয়ন ঘর।

এই রন্ধন শালা। এই সব প্রভুর পুঁথি। এই তাঁহার বসিবার কম্বল। এই প্রভুর পায়ের খড়ম। এই প্রভুর গলার চাদর। এই প্রভুর পট্টবস্ত্র। এই প্রভুর পায়ের নূপুর। এই প্রভুর জলপাত্র। এই প্রভুর পালঙ্ক। এই প্রভুর শয্যা, উহা আর উঠান হয় নাই, প্রভু যে অবস্থায় উহা রাখিয়া যান, সেই অবস্থায়ই আছে। দেবী এই পালঙ্কের নীচে ভূমিতলে শয়ন করিতেন।” এ ভাষায় শব্দ বিন্যাস কৌশল নাই, অলঙ্কারের ঝঙ্কার নাই, কিন্তু ইহাতে এমন একটী হৃদয়-উন্মাদকারিণী শক্তি রহিয়াছে যে, তাহাতে ভক্ত পাঠকের চিত্ত মুগ্ধ হইয়া যায়। এই গ্রন্থ নাটক কিম্বা উপন্যাস নহে যে আমরা গ্রন্থকারের চরিত্র চিত্রণ সমালোচনা করিব। এ গ্রন্থ ভক্ত লেখনী প্রসূত ভগবৎ কৃপাসিদ্ধ মহাপুরুষের জীবনী, ইহা পাঠ করিলে পাঠক আনন্দে আত্মহারা হইবেন, তাঁহার হৃদয় ভগবানের অনুগ্রহ লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। গ্রন্থের শেষভাগে গ্রন্থকার একটী স্বপ্নের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। সেই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে ইহাই মনে হয় যে, ভগবান অলক্ষ্যে গ্রন্থকারকে এই গ্রন্থ প্রণয়নে সহায়তা করিয়াছেন। ঠাকুরমহাশয় নরোত্তম দেখিতে কিরূপ ছিলেন, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণনা করিবার জন্য গ্রন্থকার শিশিরকুমার বহু বৈষ্ণবগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ভক্তের বর্ণনা ব্যতীত স্বাভাবিক বর্ণনা না পাইয়া শিশিরকুমার যখন অধীর হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি ঠাকুর মহাশয়কে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলেন। নিম্নে আমরা স্বপ্ন বৃত্তান্তটী উদ্ধৃত করিলাম—

“আমি রাত্রিতে শয়ন করিয়া আছি, নিদ্রা যাইতেছি, রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, এমন সময় দেখি যে ঠাকুর মহাশয় আসিয়াছেন, আর তাঁহার সমভিব্যাহারে আরও তিনজন আসিয়াছেন। এই তিনজন সঙ্গী, ঠাকুর মহাশয়কে প্রণাম করিয়া একটু দূরে দাঁড়াইলেন, আর তিনি আমার অগ্রে আসিলেন, এইরূপ ভাব, যেন তাঁহারা ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে আসিয়াছেন মাত্র, তাঁহাদের কোন

প্রয়োজন নাই। এই তিনজন কে তাহা জানি না, তবে যেন ঠাকুর মহাশয় আমাকে ইঙ্গিত দ্বারা জানাইলেন যে, তাহাদের মধ্যে একজন, পদকর্ত্তা শ্রীবলরাম দাস। আমার বোধ হইল, যেন তিনিও 'মিতা' বলিয়া অতি অস্ফুট স্বরে আমাকে সম্বোধন করিলেন। শ্রীবলরাম দাস ঠাকুরের মুখ সুগোল, মস্তক মুণ্ডিত, বয়ঃক্রম পঞ্চাশ, অনেকটা বৈদ্যনাথের ওঝা ঠাকুরের মত।

"কিন্তু বলিতে কি, আমার মিতা ঠাকুরের দিকে আমি বড় দৃষ্টি করিতে পারিলাম না। আমার সমুদায়খানি প্রাণ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইল। তিনি যে ঠাকুর মহাশয়, তাহা আমি কিরূপে জানিলাম, তাহা বলিতে পারি না।"

"ঠাকুর মহাশয়ের বয়ঃক্রম আন্দাজ চল্লিশ, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম ও দেহ অতি ক্ষীণ। যেন উপবাস করিয়া দেহ শুখাইয়া গিয়াছে। পরিধান কৌপীন নহে, একখানি পল্লীগ্রামস্থ সেকালের মোটা ধুতি, স্কন্দে সেইরূপ একখানি চাদর, গলায় তুলসীর মালা।

"দেখিলাম, ললাট অতি প্রসর ও দন্তগুলি একটু বড়, কথা বলিতে দন্ত দেখা যায়। যখন কথা বলেন তখন যেন হাসিতেছেন, কিন্তু প্রকৃত হাসিতেছেন না। ঠাকুর মহাশয়ের পরিধান যে কেন কৌপান নহে তাহার কারণ মনে মনে এই বুঝিঝাম যে, কৌপীনের উপর আমার একটা স্বাভাবিক ঘৃণা আছে। তাই তিনি পল্লীগ্রামের ভদ্রবেশে আমাকে দর্শন দিতে আসিছেন।"

"ঠাকুর মহাশয়কে দেখিয়া স্তম্ভিত, চরণে পড়িব, কিন্তু সাহস হইতেছে না। কারণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমার প্রেমের উদয় হয় নাই; আমার মনের এই ক্ষোভ তখন প্রবল হইয়াছে যে, আমি ঠাকুর মহাশয়কে দর্শন করিলাম আর আমার প্রেমের উদয় হইল না? ধিক্ আমাকে!

ঠাকুর মহাশয় যেন আমার মনের ভাব বুঝিয়া আমাকে বলিতে-ছেন এখন অধিক রাত্রি হইয়াছে, তুমি চঞ্চল হইও না।' এই কথা

বলিলে আমি তখন কাতর হইয়া তাঁহার চরণে পড়িতে গেলাম, কিন্তু ঠাকুর মহাশয় তাহা পড়িতে দিলেন না, তিনি আমাকে দুই বাহু দিয়া ধরিয়া হৃদয়ে করিলেন, আর বলিলেন, 'তুমি আমার চরণ কেন ধরিবে, আমার হৃদয়ে আইস, তোমাকে স্পর্শ করিয়া আমি পবিত্র হই।'

"এই দৈন্যুক্তি করিয়া ঠাকুর মহাশয় আমাকে বুকে করিলেন। তাঁহার হৃদয় আমার হৃদয়ে সংলগ্ন হইল, আর আমার যেন চেতনা গেল; ঠাকুর মহাশয়ও যেন একটু বিহবল হইলেন, আর সেই অবকাশে আমি তাঁহার চরণে পড়িলাম।

"ঠাকুর মহাশয় একটু বিহ্বল আছেন বলিয়া হউক, কি আমাকে কৃপা করিবেন বলিয়া হউক, চরণ খানি সরাইলেন না। আমি তখন দুই হাত দিয়া ধরিয়া একখানি চরণতল দেখিতেছি। দেখি কি, যেন পদ্ম-পুষ্পের দল। ঐরূপ কোমল ও ঐরূপ রাঙ্গা। আমি মোহিত হইয়া চরণ-পদ্ম দেখিতেছি, ঠাকুর মহাশয় কিছু বলিতেছেন না, যেন বিহ্বল অবস্থায় আছেন। এমন সময় দেখি, পদতলে কয়েকটী রেণু আছে। তখন যেন কেহ আমাকে বলিয়া দিলেন যে ঐ রেণুগুলি তোমার প্রতি করুণা, উহাতে তোমারই অধিকার। এই কথা শুনিয়া আমি উবুড় হইয়া জিহ্বা দ্বারা পদ হইতে ঐ রেণুগুলি লেহন করিয়া লইলাম। ঠাকুর মহাশয় বিহ্বল হইয়া আছেন, কোন কথা বলিতেছেন না।

"পরে বোধ হয় অৰ্দ্ধঘণ্টা পৰ্য্যন্ত আমাকে অনেক কথা বলিলেন! সে অনেক কথা, তাহার প্রায় সমুদায় আমি ভুলিয়া গিয়াছি, আমার স্মরণ হয়, তিনি আমাকে বলিলেন যে, এ সমুদায় কথা তোমার প্রয়োজনমত মনে হইবে। শেষে আমাকে বলিলেন, 'অনেকক্ষণ আসিয়াছি, আমি যাই। ইহাই বলিতে বলিতে তিনি অন্তর্দ্ধান করিলেন। তখনি আমি জাগিয়া বসিলাম।"

ভক্ত শিশিরকুমারের দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহার এই পুস্তকের জন্যই

তিনি উক্ত স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন। ভগবানের চিহ্নিত দাস ব্যতীত সাধারণ লোকের ভাগ্যে এরূপ স্বপ্নদর্শন সম্ভব নহে। গ্রন্থকার উৎসর্গ পত্রে লিখিয়াছেন, "সাধুলোকের চরিত্র লিখিয়া জীবগণের চেতন করিবার চেষ্টা করিব।" তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, মোহান্ধজীব, এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে উপকৃত হইবেন,— তাঁহার অন্ধ নয়ন দীপ্তি পাইবে, তাঁহার অচেতন হৃদয় চৈতন্য লাভ করিয়া মুক্তি ও শান্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে।

প্রবোধানন্দ ও গোপালভট্ট।

এ গ্রন্থখানিও ভক্তের জীবনী। কাবেরী নদীর তীরে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বেঙ্কট ভট্ট, ত্রিমল্লভট্ট ও প্রকাশানন্দ নামে তিন সহোদর বাস করিতেন। বাল্যেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন প্রকাশানন্দের যশঃসৌরভ চতুর্দিকে প্রসারিত হইয়া পড়ে এবং জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে সংসারে তাঁহার বৈরাগ্য জন্মে। সংসার ত্যাগ করিয়া প্রকাশানন্দ সরস্বতী ভারতবর্ষের সমুদয় তীর্থ দর্শন করিয়া কাশীধামে আসিয়া বাস করেন। পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীধাম চিরদিনই সাধুসন্ন্যাসীদিগেব প্রধান আশ্রয় স্থান। প্রকাশানন্দ সরস্বতী ভক্তিপথের বিরোধী মায়াবাদী সন্ন্যাসি-গণের নেতা ছিলেন। শ্রীভক্তমাল নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে সরস্বতীর সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"প্রকাশানন্দ সরস্বতী কাশীপুরে বাস।
জ্ঞানযোগ মার্গে স্থিতি চিন্তয়ে আকাশ॥
বেদান্ত পণ্ডিত যে শাঙ্করিক ভাষ্যমতে।
শ্রীবিগ্রহ নাহি মানে দুই নাশে যাতে॥
যতেক দণ্ডীর গুরু কাশীতে প্রমাণ্য।
আপনারে মানে ইষ্টদেবেতে অভিন্ন॥

অপিচ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলিয়াছেন,—

"প্রকাশানন্দ নাম ইহঁ সন্ন্যাসী প্রধান।"

প্রকাশানন্দ সরস্বতীর পূর্ব্বপুরুষগণ বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু তিনি জ্ঞানপথের পথিক হইয়া কুলধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়েন।

প্রকাশানন্দের জ্যেষ্ঠ সহোদর বেঙ্কট ভট্টের গোপাল নামে একটী পুত্র ছিলেন। গোপাল কনিষ্ঠ পিতৃব্য প্রকাশানন্দের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়া অতি অল্প বয়সেই সুপণ্ডিত বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। সরস্বতী কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও তাঁহার জ্যেষ্ঠগ্রজদ্বয় তাঁহার অনুসরণ করেন নাই। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব দক্ষিণ পরিভ্রমণকালে বেঙ্কট ভট্টের গৃহে চারিমাস কাল অবস্থান করেন; সেই সময় গোপাল, পিতার অনুমতি অনুসারে মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত হন ও শেষে তাঁহার মধুর ভাবে মুগ্ধ হইয়া পড়েন।

গ্রন্থকার উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন—"শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু যে ধর্ম্ম প্রচার করেন তাহার সর্ব্ব প্রধান শত্রু সন্ন্যাসীরা ছিলেন। ইঁহারা একে সকলের নিকট সম্মানিত ছিলেন, তাহাতে আবার কঠিন বৈরাগ্য ও বহুতর শাস্ত্রাভ্যাস করিয়া সমাজে প্রায় নারায়ণের ন্যায় শ্রদ্ধা আহরণ করিতেন। বিখ্যাত শঙ্করাচার্য্য ইঁহাদের নেতা। ইঁহারা আপনাতে ও ভগবানে পৃথক ভাবিতেন না। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের যে ভক্তিপথ, সন্ন্যাসীদিগের মত উহার ঠিক বিপরীত। এই সন্ন্যাসিগণ ব্রাহ্মণের পদের উপর উঠিয়াছিলেন। কথা আছে বর্ণ মাত্রেরই গুরু ব্রাহ্মণ, কিন্তু সন্ন্যাসিগণ ব্রাহ্মণের প্রণম্য হইলেন। তখন ভারতবর্ষে সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান প্রকাশানন্দ সরস্বতী ছিলেন। তাঁহার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের তর্ক ও মিলন কাহিনী বর্ণনা করাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য। এই প্রকাশানন্দের নাম পরিবর্ত্তিত হওয়ার পরে প্রবোধানন্দ হয়।" এই গ্রন্থে গ্রন্থকার সরস্বতীর চরিত কথার সহিত তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র গোপালভট্টের কাহিনীও সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন।

যাঁহারা জ্ঞান পথের পথিক; তাহারা ভক্তিকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রবোধানন্দে পরিবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে,

ভক্তি সম্বন্ধে যেরূপ মত হৃদয়ে পোষণ কবিতেন, গ্রন্থকার তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"তাঁহার মতে, ভাবুকের ধর্ম্ম স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। পুরুষ আবার অশ্রুবারি ফেলিবে কেন? যে পুরুষ ক্রন্দন করে তাহার মরিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ! ভক্তি আবার কি, কাহাকে বা ভক্তি করিব? যাহাকে ভক্তি করিব, সেই ত আমি? নির্ব্বোধ দুর্ব্বল লোকে একটী ভগবান সৃষ্টি করিয়া তাহাকে পূজা করে। আর আমার শিষ্য গোপাল, যাহার এমন সতেজ বুদ্ধি, সে একটি ভাবুক সন্ন্যাসীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া এইরূপে আপনার উজ্জ্বল জ্ঞানকে জলাঞ্জলি দিলে?" সরস্বতী তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোপালকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, সুতরাং তাঁহার পরিবর্ত্তনে তিনি আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়াছিলেন। তিনি অনুসন্ধানে যখন জানিতে পারিলেন যে, গোপাল যে সন্ন্যাসীর ভাবে মুগ্ধ হইয়াছেন, তিনি নীলাচলে অবস্থান করেন ও তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তখন তিনি প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে অপমানিত করিবার জন্য স্বহস্তে এই মর্ম্মে একটি শ্লোক লিখিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন যে, "হে মূঢ়! এই কাশীনগরীতে স্বয়ং মহাদেব মুক্তি দিয়া থাকেন। তুমি সেস্থান ফেলিয়া নীলাচলে কেন বৃথা যাপন করিতেছ?" মহাপ্রভূ সরস্বতীর শ্লোক পাঠ করিয়া কেবল হাস্য করিলেন মাত্র এবং শেষে অতি বিনীতভাবে তাঁহার শ্লোকের প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বাণপ্রদ চরণকমল ভজনা করিতে উপদেশ দিয়া একটি শ্লোক রচনা করিয়া পাঠাইলেন। ইহার পর, মহাপ্রভু কাশীধামে আসিয়া তপনমিশ্রের বাটীতে অবস্থান করিয়া যখন জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রেম বিতরণ করিতে আরম্ভ করেন, তখন প্রকাশনন্দ সরস্বতীর হৃদয়ে দারুণ ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এই কাশীধামে প্রকাশানন্দ সরস্বতী এক সভায় কিরূপে মহাপ্রভুর নিকট শাস্ত্রীয় বিচারে পরাভূত হইয়াছিলেন, কিরূপে ভাবুকের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, কিরূপে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, গ্রন্থকার তাহা

অতি মধুরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার প্রকাশানন্দের অবস্থা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন,—"প্রকাশানন্দের তখন এক প্রকার পুর্ণজন্ম হইল। প্রথমে প্রভুর উপর সম্পূর্ণ ক্রোধ, দ্বেষ ও ঘৃণা ছিল। ঘৃণা ইহা বলিয়া—যে তিনি মূর্খ ও বঞ্চক। ক্রোধ ইহা বলিয়া—যে তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোপালভট্টের মাথা খাইয়াছেন। দ্বেষ ইহা বলিয়া —যে কৃষ্ণ চৈতন্য জগতে অনেকের নিকট তাঁহার অপেক্ষা পূজিত। এখন দেখিলেন, কৃষ্ণচৈতন্য পরমভক্ত, পরম পণ্ডিত, সর্ব্ব প্রকারে পরম সুন্দর। দেখিলেন, তাঁহার প্রকৃতি মধুর। আর দেখিলেন যে, ভক্তি বলিয়া যে দ্রব্য, উহা অতি সুস্বাদু, আর এই মহাতত্ত্ব সেই বালক সন্ন্যাসীর নিকট তিনি শিখিলেন। এই সমস্ত কারণে তাঁহার প্রভুর প্রতি প্রগাঢ় মমতা ও শ্রদ্ধার উদয় হইল। তখন মনে হইল যে তিনি এই সুন্দর প্রকাণ্ড বস্তুটীকে অন্যায় করিয়া নিন্দা করিয়াছেন। তাহা মনে হওয়াতে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।" দাম্ভিক প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাপ্রভুর পাণ্ডিত্যে ও মধুর ভাবে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। তিনি তখন শ্রীগৌরাঙ্গের কথা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, —"এই যে সুবর্ণকান্তি বিশিষ্ট নবীন পুরুষটি ইনি কে? ইনি প্রেমপূর্ণ নয়নে আমার পানে চাহিলেন, কেন? ইনি আমার কাছে চান কি? ইনি আমার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন কেন? আর আমার চিত্ত আমার কথা না শুনিয়া উহার চরণ মুখে কেন ধাবিত হইতেছে? এ বস্তুটি কে? এটি কি মনুষ্য, কি কোন অনির্ব্বচনীয় দেবতা?"

জ্ঞানী, সন্ন্যাসী কিম্বা নাস্তিক হইলেও মানব যদি একবার ভক্তি ও প্রেমের আস্বাদন প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। মহাপ্রভুর প্রেমের ফাঁদে পতিত হইয়া প্রকাশানন্দ সরস্বতীর এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল,—"এ যাবত বহুতর কঠোর নিয়ম পালন করিয়া আসিয়াছেন। অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান, আর অধিক নিশিতে শয়ন করেন, এ পর্যন্ত নানা নিয়ম পালন বহুদিন হইতে করিয়া আসিয়াছেন, এখন সে সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। বেদ

পাঠ করিতে আর প্রবৃত্তি হয় না। যে সমস্ত বিধি পালন করিয়াছিলেন, সে সকল নিয়ম পালন করিতে আর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা হইতেছে না, তবে করিতেছেন কি, তাহা বলিতেছি। করিতেছেন কি না, একটু একটু গীত গাইতেছেন আর প্রভু যেমন করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহাই অনুকরণ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। ক্ষণে ক্ষণে চেতন হইতেছে, আর আপনার মনকে তল্লাস করিয়া বেড়াইতেছেন। মনকে পাইতেছেন না। আর যেস্থানে তাঁহার মন ছিল, সেস্থানে দেখিতেছেন সোনার বরণ নৃত্যকারী গৌরাঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। আর সরস্বতী বলিতেছেন,—কি সুন্দর মুখশ্রী, কি মধুর নৃত্য !"

অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী ভক্তি ও প্রেমকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিতেন, কিন্তু আজ মহাপ্রভুর কৃপায় তিনি জ্ঞানপথ পরিত্যাগ করিয়া ভক্ত ও প্রেমিক হইলেন। পূর্ব্বে তিনি ভক্তি ও ও প্রেমধর্ম্ম কাপুরুষের ধর্ম্ম বলিয়া উপহাস করিতেন, এখন তিনি সেই প্রেমধর্ম্মেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সরস্বতী ঠাকুরকে মহাপ্রভু প্রবোধানন্দ নাম দিয়া বৃন্দাবনে গমন করিয়া বাস করিতে আদেশ করেন। যে গৌরাঙ্গ প্রভুকে সরস্বতী উপহাস করিতেন, ঘৃণা করিতেন ও তাঁহার নাম পর্য্যন্ত শুনিতে ইচ্ছা করিতেন না, তাঁহাকে ছাড়িয়া তিনি বৃন্দাবনে যাইতে হৃদয়ে নিদারুণ বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। ভক্ত গ্রন্থকার সরস্বতীর এই সময়ের মানসিক অবস্থা একটী সঙ্গীতে বর্ণনা করিয়াছেন প্রবোধানন্দ বলিতেছেন,—

"কি হলো কি হলো প্রাণনাথ একি করিলে। ধ্রু।
চিত্ত হরে নিলে, বাউল করিলে,
এখন তুমি আমায় ফেলি চলিলে ॥
ছিলাম প্রবীণ, অটল গম্ভীর,
টলিত না মন কোন কালে।
নাথ, করিলে কি কাজ, গেল ভয় লাজ,
বালকের মত চপল করিলে ॥

সংসার বন্ধন, করিয়া ছেদন,
সকল তেজে সন্ন্যাসী হইলাম।
আমি, কাটিলাম বন্ধন একি বিড়ম্বন,
আবার তুমি প্রেমে ফাঁদে ফেলিলে ॥"

প্রবোধানন্দ মহাপ্রভুর নির্দ্দেশমত বৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন এবং শেষে "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত" নামক উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোপালভট্টও শ্রীগৌরাঙ্গের অনুগ্রহ লাভ করিয়া বৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন। তাঁহার "হরিভক্তি বিলাস" ও "সংস্কারসার দীপিকা" বৈষ্ণবদিগের প্রধান স্মৃতিগ্রন্থ। খুল্লতাত প্রবোধানন্দের সহিত গোপাল-ভট্টের জীবনী আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভক্ত গ্রন্থকার পুরাতন বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে ভক্তের জীবনকথা সংগ্রহ করিয়া এমন মধুর ও চিত্তাকর্ষক ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, গ্রন্থখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে এক নিশ্বাসে শেষ না করিয়া ছাড়িতে পারা যায় না। অনেক সময় মধুর জিনিসও অযোগ্য হস্তে পড়িয়া এরূপ বিকৃত আকার প্রাপ্ত হয় যে, পাঠকের তাহা আদৌ তৃপ্তিপ্রদ হয় না। কিন্তু ভক্ত শিশিরকুমার মধুর জিনিসকে কিরূপে মধুরতর করিয়াছেন, পাঠক তাহা যদি অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করুন। গ্রন্থকার সরস্বতী ঠাকুরের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ ছিলেন বলিয়া তাঁহার জীবনী লিখিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থের উপক্রমণিকায় শিশিরকুমার লিখিয়াছেন, —"একদিন যখন আমি সাধ্য সাধন নির্ণয় লইয়া বড় ব্যাকুল ছিলাম, তখন প্রকাশানন্দের একখানি গ্রন্থে গুটিকয়েক শ্লোক পড়িয়া বড় উপকার প্রাপ্ত হই। সে গ্রন্থখানির নাম "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত।" * * * সেই গ্রন্থের কয়েকটি কবিতা পড়িয়া আমি প্রথমে কৃষ্ণপ্রেম কাহাকে বলে তাহার আভাস পাই।" এই উপকারের জন্যই শিশিরকুমার প্রকাশানন্দের জীবনী লিখিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন এবং প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যই তিনি সরস্বতীর জীবনী প্রকাশ করেন। সাধারণে এই

গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রভূত উপকার পাইবেন, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

পাঠক, ভক্ত গ্রন্থকার শিশিরকুমার প্রকাশানন্দ সরস্বতীর ন্যায় সন্ন্যাসীও শাস্ত্রজ্ঞ না হইলেও আমরা সরস্বতীর সহিত তাঁহার কতকটা সাদৃশ্য লক্ষ করিয়া থাকি। প্রকাশানন্দের ন্যায় যৌবনে শিশিরকুমারও দারুণ জ্ঞানাভিমানী, তেজস্বী ও ভক্তিশূন্য ছিলেন। সহোদর হীরালালের আত্মহত্যার পর শিশিরকুমার ও তাঁহার সহোদরগণ মুক্তি পথের অন্বেষণে ব্যাকুল হইয়া পড়েন। শেষে তাঁহারা যখন বুঝিতে পারিলেন যে, মানব জ্ঞানপথ ও ভক্তিপথ অবলম্বনে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তখন শিশিরকুমার জ্ঞানপথ ও তাঁহার মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমার ভক্তিপথ গ্রহণ করেন, এসকল কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। শেষে শিশিরকুমার কিরূপে গৌরাঙ্গ প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তাহাও পাঠকবর্গ অবগত হইয়াছেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী "শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত" লিখিয়া জীবের উপকার করিয়াছিলেন, শিশিরকুমারও শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত লিখিয়া মানবকে শান্তির পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত।

বামনের চন্দ্র ধরিবার প্রয়াসের ন্যায় আমাদের ভগবদ্ভক্ত শিশির-কুমারের হৃদয় বিনির্গত অমিয়পূর্ণ শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত গ্রন্থ সমালোচনার প্রয়াস হয়ত উপহাসকর হইবে। যেগ্রন্থ পাঠ করিতে পাঠক আত্মহারা হইয়া পড়েন, যে গ্রন্থ আলোচনায় পাঠক শান্তির পথ প্রাপ্ত হইয়া পুলকিত হন যে গ্রন্থ পাঠ করিবার সময় পুলকাশ্রু-ধারায় তাঁহার কপোল পরিপ্লুত হয়. সে গ্রন্থের আমরা কিরূপে সমালোচনা করিব. শ্রীঅমিয়নিমাই চরিতে ভক্তির প্রবল তরঙ্গ প্রবাহিত ; যিনি সেই তরঙ্গে অবগাহন করিবেন, তাহার অন্তর বাহির শীতল হইবে, তিনি ধন্য হইবেন। ভক্তি গ্রন্থের সমালোচনা অসম্ভব,

ইহা কেবল আস্বাদনের বস্তু। পাঠককে আমরা সেইজন্য এ গ্রন্থখানি একবার মনোনিবেশ সহ অধ্যয়ন করিতে বলি। আমরা যাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিব না, তিনি স্বয়ং তাহা উপলব্ধি ও উপভোগ করিতে পারিবেন।

ধর্ম্মের অধঃপতন হইলে শ্রীভগবান ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য সংসারে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। গীতায় শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন,—

পরিত্রানায় সাধুনাম্ বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

একদিন পশুর রক্তে এই ভারতভূমি কলঙ্কিত দেখিয়া শ্রীভগবান দয়া ও মৈত্রী প্রচারের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সমাজের অবস্থা বিশেষে সেই যুগাবতারের পুনরাবির্ভাব আবশ্যক হইয়াছিল। তাই তান্ত্রিকগণ যখন তন্ত্রের প্রকৃত উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া পশু হনন, মদিরা সেবন প্রভৃতি কুকার্য্যে প্রকৃত ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তখন আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে, বাঙ্গালীর ঘরে, ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য শ্রীভগবান আবার আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বেদান্ত বিশুষ্ক দেশে প্রেমের বন্যা আনয়ন করিয়া তিনি তাপিত হৃদয়ে শান্তি, নিরাশ হৃদয়ে আশা এবং শুষ্ক ও কঠোর হৃদয়ে সরসতার ও মাধুর্য্যের সঞ্চার করিয়াছিলেন। ভক্ত গ্রন্থকার শিশিরকুমার সেই প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সমধুর লীলাকাহিনী এই গ্রন্থে সুধাবর্ষিণী ও শান্তিময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

মহাপ্রভুর শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সুধামধুর লীলাকাহিনী তাঁহার ভক্ত ও অন্তরঙ্গগণের মধ্যে অনেকেই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশই কবিতায় লিখিত হইয়াছে। গৌরাঙ্গলীলার গদ্যগ্রন্থ বর্তমানে কয়েকখানি প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বে তাহা অতি বিরল ছিল। ভক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মা ও সাধু জগদীশ্বর গুপ্তই এ সম্বন্ধে আধুনিক বাঙ্গালী লেখকদিগের অগ্রণী। চিরঞ্জীবের চৈতন্য-চন্দ্রিকাও জগদীশ্বরের চৈতন্যলীলামৃত অতি উপাদেয় গদ্য গ্রন্থ। চৈতন্য-

ভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি প্রামাণিক প্রাচীন গ্রন্থগুলি উচ্চাঙ্গের হইলেও, সাধারণ পাঠকবর্গ, অনেক সময় তাহা হইতে রস আস্বাদন করিতে সমর্থ হন না। কিন্তু ভক্ত শিশিরকুমার এই সকল প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া প্রাণের ভাষায় যে শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিত রচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিবার সময় পাঠক সহজেই তত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। মহাপ্রভু কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়াই শিশিরকুমার এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"প্রভু ভাবিলেন যে, তাঁহার লীলাকথা জগতে প্রচার করিতে হইবে, আর সেই নিমিত্ত আমাকে বাছিয়া লইলেন। আমাকে যে বাছিলেন, সে আমি ভাল বলিয়া নহে, তবে কেন না, আমাকে জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নীচ ভাবিয়া। আপনারা জানেন যে শ্রীভগবান পঙ্গুকে নৃত্য করাইয়া থাকেন। তাই আমার ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা নীচ জীবের দ্বারা তাঁহার লীলা লেখাইলেন। কিন্তু লীলা লিখিতে শক্তির প্রয়োজন। তাই বোধ হয় আমাকে লীলা লিখিবার উপযোগী করিবার নিমিত্ত অসাধনে আমাকে পূর্ব্বরাগের রস কিঞ্চিত আস্বাদ করাইয়াছিলেন, কারণ তিনি ভাবিলেন যে এরূপ আস্বাদ না করাইলে আমার দ্বারা তাঁহার লীলা লেখা হইবে না।" আলোচ্য গ্রন্থের প্রারম্ভেই মঙ্গলাচরণে গ্রন্থকার কাঁদিয়া বলিতেছেন,—

"তপ্ত বালুকায়, আছিনু শুইয়া,
চকিতের মত এলো।
শীতল নিকুঞ্জে, যথা ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
গৌর আমায় নিয়ে গেল॥
কিগুণে আইল, কেন দয়া হলো,
কিছু আমি নাহি জানি।
সরল বলিতে, গৌরাঙ্গ আমার
অসাধন চিন্তামণি॥"

সন্দেহবাদী, অবতারে অবিশ্বাসী, একেশ্বরমতানুসারী, শিশির-কুমার শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমে বিভোর হইয়া যখন হৃদয়ে পরমানন্দ ও শান্তি লাভ করিলেন, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন,—

"যেন উপকার আপনি করিলে,
আমি শোধ দিব ধার।
এই জগমাঝে, গৌর গুন গাব,
যতদিন বাঁচি আর ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা লিখিয়া লিখিয়া
আগে জানাইব জীবে।
শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা কর্ণেতে পশিলে
অবশ্য তোমার হবে ॥"

শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিত ছয় খণ্ডে সমাপ্ত। প্রামানিক গ্রন্থ ও প্রাচীন মহাজন গণের পদাবলী অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত জনশ্রুতি হইতেও দু একটী লীলা গৃহীত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের উপক্রমণিকায় পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য গ্রন্থকার মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের আর্বির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন। উপক্রমণিকা বাদে প্রথম খণ্ড উনবিংশ অধ্যায়ে সমাপ্ত এবং এই খণ্ডে মহাপ্রভুর জন্ম হইতে জগাই মাধাই উদ্ধার পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"প্রথম খণ্ডে রস বিস্তারের চেষ্টা করি নাই এবং লীলাগুলি কিছু সংক্ষেপে লিখিয়াছি। তাহার কারণ এই যে রস শাস্ত্রে রস বিস্তার ক্রমে ক্রমে করিতে হয়। একেবারে রস প্রস্ফুটিত করিলে উহা কেহ আস্বাদ করিতে পারেন না। অনেক সময় অনিষ্টও হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে আমি রস বিস্তারের প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি। আর এক কথা প্রভুর আদিলীলা কোথাও বিস্তার করিয়া বর্ণিত হয় নাই। প্রকৃত কথা, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড না পড়িলে সকলে শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার ধর্ম্ম কি, তাহা সম্যকরূপে আস্বাদন করিতে

পারিবেন না। যিনি গৌরলীলা রসে সাঁতার দিতে চাহেন, তাঁহাকে দ্বিতীয় খণ্ডও পড়িতে হইবে।" দ্বিতীয় খণ্ড কেন, আমরা বলি ছয়খণ্ডই পড়িতে হইবে। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, তিনি প্রথম খণ্ডে রস বিস্তারের চেষ্টা করেন নাই। রস কাহাকে বলে, আলঙ্কারিকগণ তাহা আলোচনা করিয়াছেন। সে আলোচনার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, যাহা শুষ্ক হৃদয়কে আর্দ্র, অদৃশ্যকে দৃশ্যমান ও অজ্ঞেয়কে জ্ঞাতব্য করিতে পারে, তাহাই যদি রস হয়, তাহা হইলে প্রথম খণ্ডেও রসের অভাব নাই। চারি বৎসরের শিশু নিমাইচাঁদ, অন্যান্য বালকগণের সহিত নৃত্য করিতেছেন, ভক্ত গ্রন্থকার তাহা বর্ণনা করিয়া, লিখিয়াছেন,—

"সবশিশু মেলি গলে বনমালা পরেছে।
করতালি দিয়া হরি হরি বলে নাচিছে,"

এই দুই পংক্তি ও তাহার পরবর্ত্তী পংক্তিগুলিও শৈশবে জননী শচীদেবীর নিকট হইতে নিমাইচাঁদের ষষ্ঠী পূজার নৈবেদ্য কাড়িয়া লইয়া ভক্ষণ করার বিবরণটী পাঠ করিলে অতি শুষ্ক হৃদয়ও অননুভূত পূর্ব্ব আনন্দরসে পরিপ্লুত হইবে। স্যার আইজাক নিউটনের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, তাঁহার পূর্ব্বে কত লক্ষ লক্ষ লোক বৃক্ষ হইতে ফলপতন দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার ন্যায় তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে তাহা দেখেন নাই। সেইজন্য অপর কেহ নয়, কেবল তিনি কেন্দ্রাভিসারনী শক্তির আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বাহ্য জগতের ন্যায় আধ্যাত্মিক জগত সম্বন্ধেও এই উদাহরণ প্রয়োজ্য। নিমাইচাঁদের পূর্ব্বে ও পরে কত লক্ষ লক্ষ নরনারী হিন্দুদিগের অন্যতম প্রধান তীর্থ গয়াধামে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম দর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় প্রেমদৃষ্টিতে আর কেহ তাহা দেখেন নাই। ভাবোন্মত মহাপ্রভু নয়নজলে বুক ভাসাইয়া ভগবানের পাদপদ্ম নিরীক্ষণ করিতেছেন, ভক্ত শিশিরকুমার এই চিত্রটী এরূপভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, গ্রন্থ পাঠ করিবার সময় পাঠকের চক্ষের উপর মহাপ্রভুর

সেই মধুর মুর্ত্তি স্ফুরিত হইতে থাকে। জগাই মাধাই-এর উদ্ধার কাহিনী বর্ণনা করিয়া গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ড শেষ করিয়াছেন। ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির হৃদয়ে ভক্তি ও প্রেমের বন্যা আনয়ন করা সহজসাধ্য ; কিন্তু বর্হিমুখ জীবের হৃদয় কৃষ্ণপ্রেম রসে অভিষিক্ত করা যে কিরূপ দুঃসাধ্য, তাহা পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারেন। মহাপ্রভু এই দুঃসাধ্য কার্য্য অতি সহজেই সম্পন্ন করিয়াছিলেন। জগতে এমন কোন পাপ কার্য্য নাই যাহা জগাই মাধাই করে নাই। মহাপ্রভু সেই পাষণ্ড ও ঘোর পাতকীদ্বয়কে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ভক্তগ্রন্থকার এই জগাই মাধাই-এর পরিত্রাণ কাহিনী তাঁহার শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিতে এরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিবার সময় বুকের ভিতর এমন একটী ভাবের উদয় হয় যে, সেভাব ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এই জগাই মাধাই উদ্ধারের বর্ণনা, ধর্ম্ম বিশ্বাসের কথা বাদ দিয়া, কেবল ভাবের দিক দিয়া দেখিলে, আমাদের বিশ্বাস, জগতের সাহিত্যে অতুজ্জ্বল রত্নরূপে বিরাজ করিবে। প্রেমের সাধন ভগবৎ কৃপা প্রাপ্তির অন্যতম প্রধান উপায়। মানব ভক্ত না হইলে প্রেমিক হইতে পারে না, সেইজন্য শ্রীগৌরাঙ্গদের নবদ্বীপে প্রথমে ভক্তিধর্ম্ম ও পরে প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ভক্ত গ্রন্থকার প্রধানতঃ ভক্তির কথাই আলোচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—"আমি ভক্তির কাণ্ড সংক্ষেপে লিখিয়া প্রেমের কাণ্ড বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেছি। সেই প্রেম হিল্লোলের আমার যথাসাধ্য বর্ণনা পাঠক দ্বিতীয় খণ্ডের কয়েক অধ্যায় পরে পাইবেন। জীবগণ সেই তরঙ্গে সাঁতার দিবেন, এই আমায় বাসনা।" দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম হইতে সপ্তম অধ্যায় পর্য্যন্ত পাঠক ভক্তির কথা দেখিতে পাইবেন, এবং অষ্টম অধ্যায় হইতে প্রেমের আস্বাদ অনুভব করিবেন। দ্বিতীয় খণ্ড পরিশিষ্ট ব্যতীত একবিংশ অধ্যায়ে সমাপ্ত এবং ইহাতে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভক্তগণের সহিত গঙ্গায়

জলকেলি হইতে তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের পর, বৃন্দাবন ভ্রমে শান্তিপুরে প্রত্যাগমন এবং জননী শচীদেবীও ভক্তগণের সহিত পুনর্মিলন পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—"মাধুর্য্য-ভজনে তিনটী অবস্থা হয়; যথা পূর্ব্বরাগ, মিলন ও বিরহ। শেষ ভাবই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কারণ বিরহে পূর্ব্বরাগ ও মিলনসুখ উভয়ই আছে। শ্রীনিমাই এই সমুদয় রস আপনি আস্বাদ করিয়া জীবকে আস্বাদ করাইয়াছেন। আমি এই সমুদয় রস কিছু কিছু যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়াছি বটে, কিন্তু আমার সাধ মিটে নাই। হয়ত এ সমুদয় রস ভাষার দ্বারা সম্যক প্রকারে বর্ণনা করা অসাধ্য। না হয় আমার শক্তিতে কুলায় নাই। আর যাহা হউক, এ দুঃখ আমার চিরদিন থাকিবে যে, আমি হৃদয়ে যে রস আস্বাদন করিলাম, তাহার এক কণা ব্যতীত, আমার কৃপা-পরায়ণ পাঠকগণের নিমিত্ত এই গ্রন্থে রাখিতে পারিলাম না"। পাঠক! এই দ্বিতীয় খণ্ডেরও যে কোন অংশে আপনি নেত্রপাত করিবেন, সেইখানেই প্রেমের প্রস্রবণ এবং ভগবৎ মাধুর্য্যের ধারা প্রবাহিত দেখিতে পাইবেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে শ্রীকৃষ্ণলীলাভিনয়, বৈষ্ণবদ্বেষী কাজিকে হরিনামে দীক্ষিত করিয়া অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ, শ্রীবাসের আঙ্গিনায় হরি-সংকীর্ত্তন, নৃত্য ও তাঁহার পুত্রশোক মোচন, নাস্তিক ও পাষণ্ড-গণের হৃদয়ে হরিনামের বীজ বপন পূর্ব্বক তাহাদিগকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করিবার জন্য সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণ প্রভৃতি কাহিনীগুলি পাঠ করিতে করিতে পাঠকের প্রেম-সিন্ধু উথলিয়া উঠিবে, তিনি বাহ্য জগতের কথা বিস্মৃত হইয়া যাইবেন। অষ্টম অধ্যায়ে ভক্ত ও প্রেমিক গ্রন্থকার প্রেম ও ভক্তি, ঐশ্বর্য ও মাধুর্য্য, শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বরস, রাম-লীলা, ও রাধাকৃষ্ণ লীলা, শ্রীভগবানের নরলীলা, মাধুর্য্য ভজনে কি কি প্রয়োজন, ব্রজের নিগূঢ় রস প্রভৃতি বড়ই মধুর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। নিদ্রিতা সহধর্ম্মিনীকে স্বীয় হৃদয় হইতে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিমাইচাঁদ সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য গৃহত্যাগ করিতেছেন,

এই স্থানটী পাঠ করিবার সময় পাঠক অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিবেন না। বিরহিনী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার হৃদয়বল্লভকে দুইখানি পত্র লিখিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। গ্রন্থকার জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া যে দুইখানি পত্র কবিতায় রচনা করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেকেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। এই পত্রিকা দুইখানি তৃতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।* গ্রন্থকার সে পূর্ব্বরাগ, মিলন ও বিরহের কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার রস আস্বাদন করিতে হইলে সাধন ভজন আবশ্যক। গ্রন্থকার যথার্থ ই বলিয়াছেন,—"এ সমুদয় রস শুধু গ্রন্থ পড়িয়া পাইবার কথা নয়। একটু সাধন ভজন করুন। নয়নের আবরণ আপনি পড়িয়া যাইবে।" এই দ্বিতীয় খণ্ডের সর্ব্বশেষ অর্থাৎ এক বিংশ অধ্যায় শিশিরকুমার এই বলিয়া সমাপ্ত করিয়াছেন, —অদ্য আমার ভাগ্য ফুরাইল। আমার প্রতি যে আদেশ তাহা পালন করিলাম। প্রভুর বয়স তখন চতুর্ব্বিংশতি, প্রভু আরও চতুর্ব্বিংশতি বৎসর প্রকট ছিলেন। যাঁহার ভাগ্যে থাকে তিনি প্রভুর এই সন্ন্যাসলীলা লিখিবেন। এ লীলা অতিগুহ্য। প্রভু স্বরূপ ও রাম রায়কে লইয়া গম্ভীরায় অর্থাৎ কুটীরের গুপ্ত স্থানে দ্বাদশ বৎসর যে অতি গুহ্য লীলা করিয়াছিলেন, তাহা জীবের নিকট গোপন রহিয়াছে। আমার মনের সাধ ছিল যে আমি সেই লীলার যে কিঞ্চিত জানি, জীবগণের নিকট প্রকাশ করিব। যে সাধ আপাততঃ পুরিল না। যেহেতু আমাতে আর শক্তি নাই। প্রভু যাহাকে শক্তি দেন তিনিই লিখিবেন।"

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, শিশিরকুমার গৃহী গৌরাঙ্গের

*এই প্রসঙ্গে একটী আখ্যান বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, শিশিরকুমার কবিভূষণ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথবসু প্রণীত কবিতা প্রসঙ্গ সন্নিবিষ্ট "শ্রীচৈতন্যের প্রতি বিষ্ণুপ্রিয়া" নামক কবিতা পাঠ করিয়া এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, বালকের ন্যায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে কবিকে বলিয়াছিলেন, "তুমি অতি সুপাত্র! তুমি অতি সুপাত্র! শ্রীভগবান তোমাকে কৃপা করিবেন।"

উপাসক ছিলেন, সন্ন্যাসী শ্রীগৌরাঙ্গ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উপাসক ছিলেন না। শিশিরকুমারের উপরি লিখিত পংক্তি কয়টী হইতে ইহাই অনুমান হয় যে, শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসলীলা বর্ণনা করা তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল না। ইহা ব্যতীত তাঁহার শারীরিক অবস্থাও ভাল ছিল না। কিন্তু তিনি অসুস্থ হইলে কিম্বা তাঁহার অভিপ্রায় না থাকিলে কি হয়? তিনি যে প্রেমময়ের লীলা কাহিনী বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তিনিই তাঁহার সন্ন্যাসলীলা প্রচার করিবার জন্য ভক্ত গ্রন্থকারকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার মহাপ্রভুকে তাঁহার জননী শচীদেবীর ক্রোড়ে রাখিয়া আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত করিয়াছেন। তৃতীয় খণ্ডে তাহার পর হইতে নীলাচলে নদীয়া ভক্তগণের গমন ও মহাপ্রভুর সহিত মিলন পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন,—'রসলোলুপ পাঠক প্রভুর নবদ্বীপ লীলায় যে রস আস্বাদন করিয়াছেন, প্রভুর নবদ্বীপের বাহিরের লীলায় যে রস প্রত্যাশা করিতে পারেন না। প্রভুর মাধুর্য্য লীলাই মধুর, আর মাধুর্য্য লীলা, শ্রীজগন্নাথ, শচী, বিশ্বরূপ, বিষ্ণুপ্রিয়া, নদেবাসী ভক্ত ও সখাগন লইয়া, প্রভু যখন গৃহত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার নিজজন প্রায় সকলেই শ্রীনবদ্বীপে রহিলেন। প্রভুর নীলাচল লীলাতেও কারুণ্যরস প্রচুর আছে সত্য বটে, কিন্তু তবু 'নিমাই সন্ন্যাস' একবার বই দুইবার হয় না। বলিতে কি যিনি নিমাইচাঁদ শচীর দুলাল, বিষ্ণুপ্রিয়ার বল্লভ, গদাধরের প্রাণ, শ্রীবাস ও মুরারি প্রভু তিনি কাটোয়া হইতে গুপ্ত হইলেন কি গুপ্তভাবে শ্রীনবদ্বীপে রহিলেন। যিনি নীলাচলে গমন করিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভারতী, ত্রিজগতের গুরু, জীবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ধরাধমে অবতীর্ণ। নবদ্বীপে যিনি গুপ্তভাবে রহিলেন তিনি পূর্ণ; নীলাচলে যিনি গমন করিলেন তিনি নারায়ণ শ্রীভগবানের সং ও চিৎ শক্তি। এখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর লীলা বলিতেছি, সুতরাং স্বভাবতঃ ইহাতে অধিক পরিমাণে শিক্ষার কথা থাকিবে। অতএব এখণ্ডে শুদ্ধ রসচর্চ্চা চলিবে না। এই

উপক্রমণিকার পর গ্রন্থকার বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি প্রচলিত বিদ্বেষ অপনোদনের জন্য অনেক যুক্তিমূলক তত্ত্ব অবতারণা করিয়াছেন। যাঁহারা মহাপ্রভুর ধর্ম্মকে নেড়ানেড়ীর ধর্ম্ম বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন, তাঁহারা শ্রীঅমিয়নিমাই চরিতের এই তৃতীয় খণ্ডে পরকীয়া রসের ব্যাখা পাঠ করুন, তাহা হইলে তাঁহারা আপন আপন ভ্রম উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এই খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে গ্রন্থকার মহাজ্ঞানী ও পরমযোগী বাসুদেব সার্ব্বভৌমের উদ্ধার কাহিনী অতি বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তেজস্বী ও সূক্ষ্মদর্শী বাসুদেব কিরূপে মহাপ্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার চরণে আত্মবিক্রয় করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, তাহা অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর মুখে বেদান্তের অর্থ শ্রবণ করিয়া তাঁহার চরণে পড়িতে গিয়া দেখেন যে, "সম্মুখে নবীন সন্ন্যাসী আর নাই, তবে সেস্থানে একটী বিদ্যুৎল্লতামণ্ডিত সুবর্ণ বর্ণের অঙ্গ লইয়া একজন অতি সুন্দর পুরুষ ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া। তাঁহার ষড়ভুজ। উর্দ্ধে দুইবাহু দুর্ব্বাদলের ন্যায় বর্ণ, উহাতে ধনুর্বাণ। মধ্যের দুই বাহু নীলকান্ত মণির ন্যায়, উহাতে মুরলী। নিম্নের দুই বাহু সুবর্ণ বর্ণের, উহাতে দণ্ড ও কমণ্ডুল।' গ্রন্থকার বলিতেছেন এই ষড়ভুজের অর্থ 'আগে রাম, পরে শ্রীকৃষ্ণ পরে গৌরাঙ্গ অর্থাৎ আমিই সেই রাম, আমিই সেই কৃষ্ণ, আমিই সেই গৌরাঙ্গ।" অভিমান দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডিত্যাভিমানী সার্ব্বভৌম দিব্যচক্ষু পাইলেন। জ্ঞানসর্ব্বস্ব বৃদ্ধ সার্ব্বভৌম প্রেম ও ভক্তির মাদকতায় উত্তেজিত হইয়া শেষে নৃত্যও করিয়াছিলেন। ভক্ত শিশিরকুমার তাঁহার এই নৃত্যের ব্যাপার ব্রজের দুইটী সখীর কাহিনীর সহিত বড়ই সুন্দরভাবে তুলনা করিয়াছেন। কাহিনীটি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

প্রথম সখী। "ভদ্রে,। একি? তুমি যে নৃত্য করিতেছ?"

দ্বিতীয় সখী। "কেন? একটু নাচিব না? তোরা নাচিস্ আমি কেন নাচিব না?"

প্রঃ সঃ। "আমরা নাচি, আমরা কুলটা, আমরা কুল হারাইয়াছি, লজ্জা জলাঞ্জলি দিয়াছি। আমাদের ও তোমাদের অনেক প্রভেদ। তুমি কুলবালা, ধীর, গম্ভীর ; আমাদের লজ্জাবিহীন আচার ব্যবহার দেখিয়া তুমি ঘৃণায় মুর্চ্ছিত হইতে, আমাদিগকে নিন্দা করিতে, এমনকি আমাদের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে না। তোমার এদশা কেন ?"

দ্বিঃ সঃ। "সই আমিও শ্যামের হাতে কুল হারাইয়াছি।"

প্রঃ সঃ। "সে কি ? সই, তুই অত বড় গম্ভীর, তোর এদশা হইল কেন বল দেখি ?"

দ্বিঃ সঃ। "শুনবি ?"

শুন সই মনের মরম। ধ্রু।

এতদিন জাতি কুল রাখিয়াছিলাম গো,
হাতে হাতে মজাইলাম কুলের ধরম ॥
কানু সেই কালিন্দী তীরে, মুই গেনু যমুনা নীরে,
গা খানি মাজিতেছিলাম একা।
যুবতীর চিত চোরা জলের ভিতর গো,
যৌবন রতনে দিল দাগা ॥
হৃদয়ের মাঝারে শ্যাম, লুকাইয়া রাখি গো,
উপরেতে ঝাঁপি দিলাম বাস।
হেন কালে গুরু জনা, চিনিতে নারিল গো,
অনুমানে কহে কানুদাস ॥

সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করিয়া প্রভু দক্ষিণ দেশ পরিভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। যাইবার সময় তিনি এই কীর্ত্তনটী গাহিয়াছিলেন,—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষমাং।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহিমাং ॥

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষমাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাং।।

এই কীর্ত্তনে পদলালিত্য বা ভাব গাম্ভীর্য নাই বটে, কিন্তু ইহা ভক্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বলিয়া ইহাতে এক অপূর্ব্ব চিত্তদ্রবকারিণী শক্তি নিহিত রহিয়াছে। এ কীর্ত্তন পুরাতন হইবার নহে, ইহা নিত্য নূতন এবং ভক্তগণ এখনও এই কীর্ত্তন গান করিবার সময় প্রেমে গদগদ হইয়া থাকেন। নবীন যুবক কৌপীন পরিধান করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে গমন করিতেছেন, তাঁহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল; আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়নদ্বয় হইতে অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু নিপতিত হইয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেছে; ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, পাপী দুঃখী নির্ব্বিশেষে সকলকেই আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু দুইটী প্রসারিত করিয়া রহিয়াছে, এ অপরূপ দৃশ্য দর্শন করিলে কাহার হৃদয় না ভক্তিরসে আপ্লুত হয়? ভক্ত শিশিরকুমারের অমিয়নিমাই চরিতে এই বিবরণটী পাঠ করিলে বর্হিন্মুখ জীবের হৃদয়েও কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গ উত্থিত হইবে। এই দক্ষিণ ভ্রমণ সময়ে বিদ্যানগরে মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ের সহিত মিলিত হন। তাঁহার সহিত মহাপ্রভুর ভক্তি ও প্রেমধর্ম্ম সম্বন্ধে যে অতি পবিত্র ও উচ্চভাব পূর্ণ কথোপকথন হইয়াছিল, ভক্ত শিশিরকুমার তাহা এরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, পাঠ করিবার সময়ে পাঠকের হৃদয়ে ভক্তি ও প্রেমের মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। রামানন্দের সহিত মহাপ্রভুর কথোপকথন বর্ণনার প্রসঙ্গে গ্রন্থকার গীতা ও ভাগবত, রাধার প্রেম. প্রেমের শক্তি, স্বীয় ও পরকীয় প্রেম প্রভৃতি বিষয়গুলি এরূপ সরল, সহজবোধ ও মধুরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাধারণ পাঠকবর্গও তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। এই তৃতীয় খণ্ডে ভক্ত গ্রন্থকার মাধবেন্দ্র পুরীর কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন; সেই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীকে কায়স্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়া তিনি অনেকের প্রাণে ব্যথা দিয়াছেন।

গ্রন্থকার চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—“এই চতুর্থ খণ্ডে

শ্রীগৌরাঙ্গের বয়স সাতাইশ বৎসর হইতে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত তিন বৎসরের, অর্থাৎ সন্ন্যাস লইয়া মাতৃভূমি বা নবদ্বীপ দর্শন পর্য্যন্ত লীলা বর্ণিত হইয়াছে।” মহাপ্রভুর দক্ষিণ অঞ্চল হইতে প্রত্যাগমনের পর নদীয়াবাসী ভক্তগণের সহিত লীলাচলে মিলন, মহারাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপাপ্রদর্শন, সার্ব্বভৌমের জামাতা অমোঘের প্রাণ দান, শিখি মাহাতিকে আলিঙ্গন দান, মুসলমান অধিকারীর বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ, মহাপ্রভুর জন্মভূমি ও বৃন্দাবন দর্শনের জন্য নীলাচল পরিত্যাগ ও নবদ্বীপে আগমন ও জননী শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত মিলন কাহিনী পাঠ করিবার সময় পাঠকের আত্মবিস্মৃতি হইবে, একথা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। নদীয়াবাসী ভক্তগণ লীলাচলে প্রবেশ করিয়া ভগবান শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন ও প্রণাম না করিয়াই তাঁহাদের প্রাণারাম মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানকে দর্শন বা প্রণাম না করিয়া প্রথমে সন্ন্যাসী দর্শন অনেকেরই নিকট অস্বাভাবিক ও বিধিবিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ভক্তগণ ভক্তিস্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া লীলাচলধামে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য দেবের সহিত চারিমাস কাল অবস্থান কালে অনেক সময় বিধি বিগর্হিত কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেখানে প্রেমের তরঙ্গ উত্থিত হয়, সেখানে বিধির বাঁধ সুদৃঢ় হইলেও শতধা খণ্ডীকৃত হইয়া যায়। প্রেম ও ভক্তির উচ্ছ্বাস কিজন্য বিধির বাধ্য নহে, তাহা যদি সুন্দররূপে বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পাঠক শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত অধ্যয়ন করুন। বিধির প্রয়োজনীতা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমানে অনেকেই তাহা উপলব্ধি না করিয়া এবং প্রেমের ধর্ম্ম কি তাহা না বুঝিয়া বিধি লঙ্ঘন পূর্ব্বক ; যথেচ্ছাচারী হইয়া ধর্ম্ম সমাজে কলঙ্ক আনয়ন করিয়াছেন। মহারাজা প্রতাপ-রুদ্রের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা প্রদর্শনের বিবরণ পাঠে সাকার ভজন অপেক্ষা নিরাকার ভজন বহুগুণে শ্রেষ্ঠ কেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। লীলাচলে ভক্তগণের সহিত প্রভুর লীলা কাহিনী পাঠে অনেকেই

হয়ত প্রভুর চাপল্য লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইবেন, কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। কারণ ভক্ত গ্রন্থকার যথার্থই বলিয়াছেন,—"এ ভজনে ত্যাগ নাই, যাগ নাই, যজ্ঞ নাই, মন্ত্র নাই, তন্ত্র নাই, তবে ভজন কি লইয়া, না স্নান লইয়া, আহার লইয়া, নৃত্যগীত লইয়া, উদ্যান ভ্রমণ লইয়া। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মে জীবের প্রবৃত্তি ধ্বংসের প্রয়োজন নাই, সমুদয় কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত নিযুক্ত রাখিতে হইবে। সব প্রবৃত্তিরই প্রয়োজন আছে, নতুবা শ্রীভগবান উহা দিতেন না। আর সমুদয় বৃত্তির সদ্ব্যবহার শিক্ষাই শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মের সার উদ্দেশ্য।"

জগতে এক শ্রেণীর জীব আছে, যাহারা ধর্ম্ম অধর্ম্ম, পাপ পুণ্য কিছুই মানিয়া চলে না, এমনকি ভগবানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করে না। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় কাণ্ডারী জগতে দুর্লভ; তিনি এই শ্রেণীর জীবের উদ্ধারের জন্য অস্থির হইয়া বলিয়াছিলেন—

"যাও নিতাই সুরধনী তীরে"

* * *

কৃত পাপী দুরাচার, নিন্দুক পাষণ্ডী আর,
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয়, জীবের যেন নাহি হয়
সুখে যেন হরিনাম লয়॥"

নিত্যানন্দের হরিনাম প্রচার কাহিনী পাঠ করিলে পাঠক বুঝিবেন যে, যে যত কাঙ্গাল, তাহাতে তত করুণা ও যে যত পাপী, তাহাকে তত দয়া করাই শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম ছিল। এই নিত্যানন্দের জীবনে মহাপ্রভু দেখাইয়াছেন যে, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম বৈষ্ণবাচারের বিরোধী নয়। নিত্যানন্দ হরিনামের সহায়তায় গৌড়ে কিরূপে ভক্তির তরঙ্গ আনয়ন করিয়াছিলেন, পাঠক তাহা এই খণ্ডে দেখিতে পাইবেন। গ্রন্থকার এই ভক্তির তরঙ্গের মধ্যেও রাষ্ট্রনীতির উপযোগিতা সুন্দরভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "নির্জ্জীব হিন্দুগণ যদি এখন জীবনে কোন লক্ষণ দেখাইতে পারেন, তবে সে ধর্ম্ম লইয়া। যদি এদেশবাসিগণ

আবার ভক্তির তরঙ্গে পড়িয়া যাইতে পারেন, তবে আবার জাতিরূপে পরিগণিত হইতে পারিবেন।" মহাপ্রভুর সহিত সহধর্ম্মিনী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মিলন বর্ণনা করিয়া গ্রন্থকার এই খণ্ড সম্পূর্ণ করিয়াছেন। রসজ্ঞ পাঠক এই মিলন কাহিনী পাঠ করিলে ব্রজের নিগূঢ় রস আস্বাদন করিতে পারিবেন।

পঞ্চম খণ্ড নয় অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। এই খণ্ডে মহাপ্রভুর তাঁহার জননীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবন দর্শনে গমন হইতে লীলাচলে রাস-রসে বিভোর হইয়া আইটোটায় বিচরণ করিতে করিতে, রাসের জলকেলি কি তাহা আস্বাদ করিবার জন্যই হউক বা জীবগণকে শিক্ষাদানের জন্যই হউক সমুদ্রে ঝম্পদান কাহিনী পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। বৃন্দাবনের পথে অগ্রসর হইলেও মহাপ্রভু প্রথম বারে বৃন্দাবনে গমন করিতে পারেন নাই। অসংখ্য লোক লইয়া তিনি গৌড় নগরের নিকট উপস্থিত হইলে বাঙ্গালার তদানীন্তন মুসলমান রাজার দবিরখাস ও সাকর মল্লিক উপাধিধারী দুইজন হিন্দুমন্ত্রী তাঁহার সমীপে উপনীত হন। গ্রন্থকার বলিতেছেন,—"এই দুইজন দাক্ষিণাত্যের কোন রাজবংশীয় ব্রাহ্মণ, দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া বাঙ্গলাদেশে বাস করিয়াছেন। ইহারা দুই ভাই বুদ্ধি ও বিদ্যাবলে মুসলমান রাজার মন্ত্রিপদ লাভ করিয়াছেন। মুসলমান রাজার অধীনে কাজ করেন, সুতরাং হিন্দুদের পক্ষে যাহা মহা অকর্ত্তব্য কর্ম্ম এরূপ কাজও তাঁহাদের অনেক করিতে হয়। মুসলমানেরা যে মন্দির ভগ্ন করিতেছে, গো বধ করিতেছে, দেশ ওজাড় করিতেছে; এ সমস্ত কার্য্য ইহারা দুই ভ্রাতা নিজহাতে না করুন, ইহাতে তাঁহারা সহায়তা করিতেছেন। ইহারা বাহ্যদৃষ্টিতে ঠিক মুসলমান, কার্য্যেও অনেকটা মুসলমানের মত, অথচ অন্তরে ঘোর হিন্দু; নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণকে পালন করেন। পণ্ডিত সাধু বৈষ্ণবগণে তাঁহাদের বাড়ী অহোরহ পূর্ণ থাকে।" প্রভু এই দুই ভাইকে সনাতন ও রূপ নাম দিয়াছিলেন। সনাতন প্রভুকে বলিয়াছিলেন,—"প্রভু, এত লোক

লইয়া বৃন্দাবনে গমন করিলে সুখ পাইবেন না।" মহাপ্রভু, সনাতনের কথা যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করিয়া গৌড় হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমনেব জন্য দেশাভিমূখে ফিরিলেন। পরে প্রভু লীলাচল হইতে বৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। সনাতন ও রূপ দ্বারা জীব উদ্ধার করিতে হইবে। সেইজন্য মহাপ্রভু তাঁহাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। সনাতন ও রূপের কাহিনী আলোচ্য খণ্ডে বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে। মহাপ্রভু এই দুই সহোদরের জীবনে দেখাইয়াছেন যে, মানব বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও যদি তাঁহার অন্তঃকরণে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে কৃষ্ণরস আস্বাদন অসম্ভব নয়। রাজমন্ত্রীরূপে সনাতন ও রূপের কার্য্য পরিচয় পাঠক উপরে অবগত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন, "তোমার আমার প্রিয়, এমনকি এই গৌড় সান্নিধ্যে আসিবার আমার যে কি প্রয়োজন তাহা কেহ জানে না। সে কেবল তোমাদের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত। তোমার নিশ্চিন্ত থাক, কৃষ্ণ তোমাদিগকে অচিরাৎ কৃপা করিবেন।" যাঁহারা মহাপ্রভুর প্রিয়, তাঁহাদের কাহিনী কত মধুর, ভক্ত গ্রন্থকার তাহা এই খণ্ডে হৃদয়গ্রাহীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

নৈয়ায়িকগণ ও মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণ প্রেম ও ভক্তিধর্ম্মের প্রধান বিরোধী। নৈয়ায়িক শিরোমণি প্রবল প্রতাপান্বিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম কিরূপে প্রভুর অনুগত হইয়াছিলেন, পাঠক তাহা অবগত হইয়াছেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের সময় কাশীধামে মায়াবাদিগণের অগ্রণী প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে কিরূপে উদ্ধার করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান খণ্ডে গ্রন্থকার তাহা আলোচনা করিয়াছেন! প্রকাশানন্দের কাহিনী আমরা গ্রন্থকারের "প্রবোধানন্দ ও গোপাল ভট্ট" নামক গ্রন্থের আলোচনায় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছি; সুতরাং এখানে তাঁহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

বৃন্দাবন হইতে লীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়া মহাপ্রভু আর

কোথায়ও গমন করেন নাই। ইহার পর তিনি অষ্টাদশ বৎসর প্রকট ছিলেন। ভক্ত গ্রন্থকার এই অষ্টাদশ বৎসরের মহাপ্রভুর জীবনের কয়েকটী প্রধান ঘটনা এই খণ্ডে বর্ণনা করিয়াছেন। ভক্তে ও ভগবানে কত প্রীতি এবং ভক্তের শক্তি কত, গ্রন্থকার হরিদাসের অন্তর্দ্ধান প্রসঙ্গে তাহা অতি সুন্দর ও বিশদভাবে দেখাইয়াছেন। ভক্ত হরিদাস তাঁহার হৃদয়ের আরাধ্য দেবতাকে বলিতেছেন,—"আমার স্পর্দ্ধার কথা শ্রবণ করুন। আমি যাইব, কিন্তু তোমার শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে রাখিয়া আর তোমার চন্দ্রবদন দেখিতে দেখিতে আর তোমার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে। বল প্রভু, আমায় এই বর দিবে?" হরিদাসের স্পর্দ্ধা হইবে নাই বা কেন? ভক্তবৎসলই যে স্বয়ং ভক্তের স্পর্দ্ধা দিয়া থাকেন। প্রভু তাঁহার ভক্ত হরিদাসের উক্তির প্রত্যুত্তরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "তুমি যাহা ইচ্ছা কর, কৃষ্ণ তাহাই পালন করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।" ভক্তের আদেশ ভগবান কি পালন না করিয়া থাকিতে পারেন? ধন্য হরিদাস, আর ধন্য সেই প্রেমাবতার, যাঁহার প্রেমের বন্যায় পুণ্য ভূমি ভারতবর্ষ প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। যবন হরিদাসের অন্তর্দ্ধানের পর মহাপ্রভু তাঁহার মৃতদেহ কোলে করিয়া উঠাইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর এই লীলা লক্ষ্য করিয়া ভক্ত গ্রন্থকার যথার্থই বলিয়াছেন,—"ভক্তি জাতির উপরে, সকলের উপরে।" হরিদাসের অন্তর্দ্ধান মহাপ্রভুর লীলা সম্বরণের প্রথম লক্ষণ। বর্ত্তমান খণ্ডে শিশিরকুমার ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ, শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান কিনা, শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্ত্বার প্রমাণ, প্রভুর রাধাভাব, বিহ্বলতা ও বিরহবেদন রাসলীলা প্রভৃতি বিষয়গুলি বড়ই চিত্তাকর্ষক ও মনোরঞ্জক ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন।

শ্রীঅমিয় নিমাই চরিতের পঞ্চম খণ্ড সম্পূর্ণ হইলে ভক্ত গ্রন্থকার মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়াছে; ষষ্ঠখণ্ড লিখিবার সঙ্কল্প তাঁহার আদৌ ছিল না। ষষ্ঠ খণ্ডের উপক্রমণিকায় তিনি বলিয়াছেন,—"যখন এই গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড শেষ হইল, তখন

ভাবিলাম যে আর লিখিব না, কি লিখিতে পারিব না। আপনার অবস্থা ভাবিয়া এই পদটী প্রস্তুত করিয়াছিলাম, যথা—

গোরা জানা নাহি ছিল, তখন আছিনু ভাল,
কাল কাটাইতাম আমি সুখে।
গৌরনাম কাণে গেল, কেবা সেই মন্ত্র দিল,
হুতাশে পিয়াসে মরি দুঃখে ॥
যারা গুণের সঙ্গী ছিল, তারা ফেলে পলাইল,
কাহাকে কহিব মনের ব্যথা।
কেবা দুঃখ ভাগ নিবে, সঙ্গে সঙ্গে কে কান্দিবে,
কে শুনাবে মনোমত কথা ॥
হৃদয়ে গৌরাঙ্গ ছিল, এবে কোথা পলাইল,
আগে মোর চিত্ত করি চুরি।
আপনি মোরে ডাকিল, মন আমারে ভূলি গেল,
এবে করে মো সনে চাতুরী ॥
আমি পাছে পাছে যাই, মোরে দেখিয়া পলায়,
এবে আমার শক্তি নাই অঙ্গে।
রোগে শোকে অভিভূত, ক্রমেতে আত্ম-বিস্মৃত,
ক্লান্তচিত বিশ্রাম সে মাগে,,
আর তো চলিতে নারি, লহ মোরে হাত ধরি,
যদি কেহ থাকে নিজ জন।
এই ছিল মোর ভাগ্যে, ধরণী বিদায় মাগে,
বলরাম দাস অকিঞ্চন।”

সমালোচ্য গ্রন্থ শ্রীঅমিয়নিমাই চরিতের পাঁচখণ্ড যাঁহারা পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে মহাপ্রভুর সর্ব্বশেষ লীলা লিখিবার জন্য বারংবার বিশেষভাবে অনুরোধ করিলে গ্রন্থকার বলিয়াছিলেন,—“আমার আর লিখিবার শক্তি নাই, আর লিখিবার নিমিত্ত প্রভুর অনুজ্ঞাও অনুভব করিতেছি না।” গম্ভীরা লীলাই প্রভুর সর্ব্বশেষ

লীলা এবং ইহা এত নিগূঢ় যে, কেবলমাত্র সাড়ে তিনজন মহাপাত্র এই লীলারস মহাপ্রভুর সহিত আস্বাদন করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। সেই সাড়ে তিনজন মহাপাত্র হইতেছেন—স্বরূপ, রামরায়, শিখি মাহিতী ও মাধবী দাসী। মাধবী শিখি মাহিতীর ভগিনী, স্ত্রীলোক বলিয়া তিনি অৰ্দ্ধজন। মহাপ্রভু শেষ দ্বাদশ বৎসর এই গম্ভীরা লীলা করিয়াছিলেন। অসংখ্য ভক্তের মধ্যে যে লীলা কেবল মাত্র সাড়ে তিনজন মহাপাত্র আস্বাদ করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন, সে লীলা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব কিনা, তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন। গ্রন্থকার উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন, "এই গম্ভীরা লীলা শ্রীরাধাকৃষ্ণের সহিত যে সম্বন্ধ তাহা লইয়া। এই লীলা দ্বারা প্রভু সেই সম্বন্ধ পরিস্ফুট করেন। শ্রীমতী রাধা কে? না যিনি ঐশ্বর্য্য বিবর্জ্জিত মাধুর্য্যময় যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রধান প্রেয়সী। ইহার অর্থ এই যে শ্রীমতী রাধার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের অনুগত আর কেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই রাধার কি ভাব প্রভু গম্ভীরা লীলায় তাহাই বর্ণনা করিয়াছিলেন।" মহাপ্রভুর চরিত লেখকদিগের মধ্যে এই গম্ভীরালীলাটী বিশদভাবে ও সুন্দররূপে কেহই বর্ণনা করেন নাই। ভক্ত শিশিরকুমার আলোচ্য খণ্ডে সেই গম্ভীরা লীলাবর্ণন ও প্রভুর লীলারহস্যের বিচার করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত গ্রন্থকার এই খণ্ডে জগতের দুইটী সর্ব্বপ্রধান অমীমাংসিত সমস্যার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেই সমস্যা দুইটি এই —(১) শ্রীভগবান যে আছেন তাহার প্রমাণ কি? (২) যদি তিনি থাকেন তবে তিনি কিরূপ বস্তু?

বর্ত্তমান খণ্ডে শিশিরকুমার অতীব গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া তিনি এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহই মনে করিতেন যে, পরদিন প্রাতে হয়ত আর তাঁহাকে কেহই ইহজগতে দেখিতে পাইবেন না এবং তাঁহার বড় আদরের শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিত গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ড অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে। যেদিন তিনি ইহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া

অমরগ্রামে প্রস্থান করেন, সেইদিন নিয়মিত সময়ে স্নানাহার সমাপন-পূর্ব্বক শিশিরকুমার আলোচ্য খণ্ডের শেষ ফর্ম্মার প্রুফ সংশোধন করিয়া তাহা তাঁহার স্বজনগণের হস্তে প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আজ আমার কার্য্য শেষ হইল।" এই প্রুফ দেখিবার দুই ঘণ্টাকাল পরে তিনি তাঁহার পুত্র, কন্যা, সহোদর, আত্মীয়স্বজন ও দেশবাসিগণকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া "গৌরনিতাই' বলিতে বলিতে প্রেমময়ের শীতল চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন শিশিরকুমার ষষ্ঠখণ্ডটী নিজের মনের মত করিয়া লিখিতে পারেন নাই। সঙ্গীতজ্ঞ স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কেবলমাত্র শ্রোতার অনুরোধে, কোনও সঙ্গীত আলাপ করিলে সে সঙ্গীতে যেমন গায়ক ও শ্রোতা উভয়েই মধুরতা আস্বাদন করিতে পারেন না, যাঁহারা মনোনিবেশসহ বর্ত্তমান খণ্ড অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহারাও তেমনই এই খণ্ডে শিশিরকুমারের "আর আমার লিখিবার শক্তি নাই, আর লিখিবার নিমিত্ত মহাপ্রভুর অনুজ্ঞাও অনুভব করিতেছি না" এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া অনুভব করিবেন। যাহা হউক বর্ত্তমান খণ্ডেও অনেক শিক্ষার বিষয় বর্ণিত আছে। ভক্ত গ্রন্থকার মহাপ্রভুর দক্ষিণ পরিভ্রমনকাহিনী বিস্মৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠক এই প্রসঙ্গে ভক্ত তুকারামের কথা অবগত হইতে পারিবেন।* মহাপ্রভুর শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে প্রবেশ ও শ্রীবিগ্রহের লীন হওয়ার বর্ণনা পাঠ করিলে পাঠকের আত্মবিস্মৃতি ঘটিবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস। অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভক্ত শিশিরকুমার "নদীয়া পথিকের রোদন" শীর্ষক যে একটী মধুর কবিতা লিখিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে পাঠক মুগ্ধ হইয়া যাইবেন। প্রথম পঞ্চম খণ্ড অমিয়নিমাই

শিশিরবাবুর এসম্বন্ধে ভ্রম হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের প্রায় পঁচাত্তর বৎসর পরে তুকারাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব ১৫৩৩ খ্রীঃ অঃ দেহত্যাগ করেন এবং তুকারাম ১৬০৭ কিম্বা ১৬০৮ খ্রীঃ অঃ জন্মগ্রহণ করেন।

চরিত পাঠ করিয়া পাঠক হৃদয়ে যে আনন্দ ও শান্তিলাভ করিতে পারিবেন, বর্ত্তমান খণ্ডে সে পরিমাণ আনন্দ ও শান্তি না পাইলেও অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে পারিবেন, ইহা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। চরিতামৃতের ন্যায় আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থ শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিতও যে বিশেষ শক্তিবিশিষ্ট তাহা পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। চরিতামৃত কবিরাজ গোস্বামীকে অমর করিয়াছে, শ্রীঅমিয় নিমাই চরিতও ভক্ত শিশিরকুমারকে বৈষ্ণব সাহিত্যে অমরত্ব প্রদান করিবে। গ্রন্থকার তাঁহার এই গ্রন্থখানিকে কেবল শ্রীনিমাই চরিত নাম না দিয়া শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত নাম দিয়াছেন। ইহার কারণ পাঠক এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের উৎসর্গ পত্রে অবগত হইবেন। আমরা নিম্নে উৎসর্গ পত্রখানি উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

শ্রীমান্ অমিয়কান্তির প্রতি—

"তুমি ওপারে গিয়াছ, আমি এপারে আছি। এরূপ পিতাপুত্রে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে বড়ই কষ্টকর। কিন্তু তোমার কি আমার, ইহাতে দুঃখ করিবার কারণ নাই, যেহেতু তুমি এখন সেই সকলের পিতার শ্রীহস্তদ্বারা প্রতিপালিত হইতেছ। পুত্রের নিকট পিতা অনেক আশা করিয়া থাকে। তুমি অতি শিশুবেলা ভবসাগর পার হইয়াছ, তাই পিতৃঋণ কিছু শোধ করিতে পার নাই বলিয়া ক্ষোভ করিও না। এই সংসারে নানা কুপ্রবৃত্তি দ্বারা বিচলিত হওয়ায় আমার অন্তর অঙ্গার হইতেও মলিন হইয়াছিল। তোমার বিয়োগজনিত নয়নজল দ্বারা আমার অন্তর কিয়ৎপরিমাণে ধৌত হয়, তাহা না হইলে আমার যে কি দশা হইত, তাহা মনে করিতে আমার হৃৎকম্প হয়। তারপরে আমার সর্ব্বস্বধন নিমাইচাঁদ। তাঁহাকে কত চেষ্টা করিয়া এক ভালবাসিতে পারিলাম না। তাই তাঁহার প্রতি একটু প্রীতি বাড়াইবার আশায় আমি তোমার নাম তাঁহার নামের সহিত মিশাইয়া দিয়াছি। প্রকাশ্যে তাঁহাকে আমি শুধু 'নিমাই' বলিয়া ডাকি। কিন্তু

মনে মনে যখন ডাকি, তখন তাঁহাকে অমিয়নিমাই বলিয়া সম্বোধন করি। দেখি যদি তোমার সাহায্যে তাঁহাকে পাই।"

শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত শতশত জনের হৃদয়ে শান্তিদান করিয়াছে। ভক্ত কবি পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় বাল্যকাল হইতেই তারামাকে সাধনা করিয়া আসিতেছেন। পণ্ডিত মহাশয় শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিত পাঠে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন ও ও পণ্ডিত তারাকুমার চিরসুহৃৎ ছিলেন। নবীনচন্দ্র তারাকুমারকে একখানি অমিয়-নিমাই চরিত প্রদান করিয়া তাহা পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। একে পুস্তকখানি বাঙ্গালাভাষায় লিখিত, তাহার উপর তাহার গ্রন্থকার শিশিরকুমার রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া সুপরিচিত, সুতরাং নিমাই চরিত পাঠে পণ্ডিত মহাশয়ের প্রথমে প্রবৃত্তি হইল না। কিন্তু বন্ধুবর নবীনচন্দ্রের বিশেষ অনুরোধে তিনি পুস্তকখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। গ্রন্থপাঠ শেষ হইতে তিনি নবীনচন্দ্রকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"শ্রীতারা ব্রহ্মময়ী মা।
অপূর্ব্ব মর্ত্ত্যাকৃতিরাবিরাসীৎ
যঃ পাপিনামুদ্ধরণায় লোকে।
অপার কারুণ্যনিধিং সুরম্যং
নমামি গৌরং স্বয়মীশ্বরং তং ॥
তাপীতাপী জীবগণে করিতে উদ্ধার,
অপূর্ব্ব মনুষ্যরূপে যাঁর অবতার,
নমি সেই গৌরচন্দ্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর,
অপার কৃপার সিন্ধু প্রত্যক্ষ ঈশ্বর।

"সত্য ঘটনামূলক 'অমিয়নিমাই' পড়িয়াও গৌরাঙ্গঠাকুরকে যাঁহার ভগবান বলিতে ইচ্ছা না হয়, তাঁহার কথা বলিতে পারি না। কিন্তু তিনি যে পূর্ণ ব্রহ্ম একথা স্বীকার করিতে আমি আর অণুমাত্র সঙ্কুচিত নই। যাঁহার 'অমিয়-নিমাই' পড়িয়া আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি,

সেই প্রাতঃস্মরণীয় গ্রন্থাকারের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

ভাই নবীন! তুমিই আমাকে 'অমিয়নিমাই' পড়িতে দিয়াছিলে, এজন্য তোমার কাছে আমি চিরঋণী রহিলাম। ৪র্থ খণ্ড পড়িয়াছি। উহার অন্যান্য খণ্ড প্রকাশ হইলেও যেন জানিতে পারি। আমি উন্মুখ হইয়া রহিলাম।" ইতি।

তোমার বাল্যবন্ধু—শ্রীতারাকুমার!"

বাণীর বরপুত্র স্বর্গগত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত পাঠ করিয়া একটী কবিতায় স্বীয় মনোগত ভাব প্রকাশ করেন। কবিতাটী এই,—

"নব জলধর, শ্যামসুন্দর, গগনে উদয় ভেল।
জলদে জড়িত থির তড়িত, নয়ন ভরিয়া গেল॥
মেঘ ঝলকে, চপলা চমকে, অমিয় বরিখে তায়।
সেই অমিয়ে, সিনান করিয়ে, পরান জুড়ায়ে যায়॥"

ভক্ত গ্রন্থকার শিশিরকুমার তাহার এই সমালোচ্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন—

গৌরলীলাগুণ, শ্রবণ পঠন,
করি প্রাণ এলাইল।
গৌরাঙ্গ কৃপায়, গৌরাঙ্গ ভাবিতে,
নয়নে আইল জল॥
বৈষ্ণব দেখিলে, আনন্দ উথলে,
ভাবি এরা নিজ জন।
যারে আমি ভজি, আমার শ্রীগৌর
ইহারা তাঁহারি গণ॥
খোল করতাল, ধ্বনি কাণে গেলে,
শ্রীগৌরাঙ্গ পড়ে মনে।

আনন্দিত মনে, ধ্বনি লক্ষ্য করি,
ধাই যাই সেই স্থানে ॥
বৈষ্ণবের পুঁথি, চরিতামৃতাদি,
দেখিলে বুকেতে করি।
পড়িতে না পারি, সূচীপত্র হেরি,
কান্দিয়া কান্দিয়া মরি ॥
পুস্তক বিক্রেতা, পুঁথি শিরে করি,
পথে পথে যথাভ্রমে।
তার পাছ পাছ, ঘুরিয়া বেড়াই,
চেয়ে থাকি পুথি পানে ॥
বটতলা যাই, দু'ধারেতে চাই,
বৈষ্ণবের পুঁথি আছে।
ইহাই ভাবিয়া, থাকি দাঁড়াইয়া,
সেই দোকানের কাছে ॥
সেই সব কথা, কি হবে কহিয়া,
কহিতে বুক ফেটে যায়।
মনে মনে কত, দারুণ প্রতিজ্ঞা,
ক'রেছিনু প্রভু পায় ॥
ব'লেছিনু প্রভু, অকারণে তুমি,
করুণা করেছ মোরে।
রাখিব যতনে, তোমারে আদরে,
হৃদয়ের রাজা করে ॥"

সাধনা ব্যতীত সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। মহাপ্রভুর লীলাকাহিনী প্রচারের জন্য শিশিরকুমার আপনাকে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গদেব পূর্ণব্রহ্ম ছিলেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে সমস্তই সম্ভব ছিল। তিনি জগাই মাধাই উদ্ধার করিবেন, ইহাতে আশ্চার্য্যের কিছুই নাই।

বর্ত্তমানে কালের পাশ্চত্য শিক্ষিতাভিমানী নাস্তিকগণের প্রকৃতি জগাই মাধাই-এর প্রকৃতি অপেক্ষা সহস্রগুণে ভীষণ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না; সুতরাং সেই নাস্তিকগণের হৃদয়ে যিনি ধর্ম্মবীজ বপন করিতে পারেন, তিনি সে অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন পুরুষ, তাহাতে সন্দেহ নাই। শিশিরকুমারের অমিয়নিমাই চরিত বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে এক নূতন ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে কত নাস্তিক আস্তিক হইয়াছে, কত পাষণ্ডের হৃদয়ে ভক্তি ও প্রেমেরমন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ধন্য শ্রীঅমিয়নিমাই চরিতের গ্রন্থকার শিশিরকুমার। প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় যথার্থই লিখিয়াছেন—"তাঁহার মত শিক্ষিত ব্যক্তি অমন সরল ও সরসভাষায় গৌরকথা প্রচার না করিলে আজ শিক্ষিত সমাজে এত আগ্রহের সহিত গৌরকথা বলিবার ও শুনিবার লোক পাইতাম বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত যে অন্য কোনই উপায় নাই, একথা তিনি যেমন বর্ত্তমান কালের উপযোগীভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তেমনটী আর কাহাকে করিতে দেখা যায় না। তাঁহার সাধনা সফল হইয়াছে,—তাঁহার অমিয়নিমাই চরিতের অমৃতরসে আজ বিশ্বসংসার অভিষিক্ত, শান্তির পথ পাইয়া আজ সকলেই পুলকিত।"

শিশিরকুমারের ইংরাজী গ্রন্থ লর্ড গৌরাঙ্গ (Lord Gouranga) পাশ্চাত্য প্রদেশে কিরূপে আনয়ান করিয়াছে, আমরা তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

শ্রীকালাচাঁদ গীতা

আলোচ্য গ্রন্থখানি সচিত্র কাব্য। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে শ্রীভগবানের স্বরূপ, তিনি আমাদের কিরূপ আত্মজন, জীবের সহিত তাঁহার ও জীবের সহিত জীবের সম্বন্ধ, পরকালতত্ত্ব, অবতার প্রকরণ প্রভৃতি বিষয়গুলি অতি মধুরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকালাচাঁদ গীতা

আমাদের সাহিত্য ভাণ্ডারের একটী অত্যুজ্জ্বল রত্ন। গ্রন্থের ভাষাও ও ভাব হইতে গ্রন্থকারকে আধুনিক কবি বলিয়া মনে হয় না, তাঁহাকে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সমসাময়িক কোন প্রাচীন কবি বলিয়াই ধারণা হয়।

পূর্ণানন্দ লাভই মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মা শ্রীভগবানকে স্তব* করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, তোমার চরণে ভক্তিই মঙ্গলের একমাত্র নিকেতন; ভক্তির প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া যিনি জ্ঞান লাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহার পরিশ্রম বৃথা হয় এবং তিনি অভিলষিত আনন্দ লাভ করিতে পারে না। জ্ঞান পথের পথিক হইয়া মানব তীক্ষ্ণধী হইতে পারেন; কিন্তু শ্রীভগবানে প্রেম সংস্থাপনই যে পূর্ণানন্দ লাভের প্রকৃষ্ট উপায়, গ্রন্থকার এই খণ্ডে তাহাই দেখাইয়াছেন। যে হৃদয়ে ভক্তির তরঙ্গ উত্থিত না হয়, সেখানে প্রেমের স্রোত প্রবহিত হইতে পারে না। জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম এই তিনটি পরস্পরের সহিত এরূপভাবে সংশ্লিষ্ট যে, সাধকের পক্ষে তিনটীর কোনটীই পরিত্যাগ করা সম্ভবপর নহে! নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গদেব একাধারে জ্ঞানী, ভক্ত ও প্রেমিক ছিলেন। সাধারণের পক্ষে জ্ঞানপথের সাধন নীরস ও অতীব দুরূহ বলিয়াই তিনি ভক্তি ও প্রেমের বন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীকালাচাঁদ-গীতার গ্রন্থকার গৌরগত প্রাণ শিশিরকুমার তাঁহার প্রাণের দেবতার জীবন হইতে যে প্রেম শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে! শিশিরকুমারের অনুজ শ্রীযুক্তবাবু মতিলাল ঘোষ মহাশয় গ্রন্থখানির যে ভূমিকা লিখিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। কিরূপ অবস্থায়ও কিরূপভাবে গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল, পাঠক তাহা এই ভূমিকা হইতেই সুন্দররূপে বুঝিতে পারিবেন।

"**** শ্রীঅমিয়নিমাই চরিতের ন্যায়, শ্রীকালাচাঁদ গীতারও জন্ম

---

* শ্রেয়ঃ স্মৃতি; ভক্তি মুদশ্যতে বিভো
ক্লিশ্যান্তি যে কেবল বোধ লব্ধয়ে।

দেওঘর, বৈদ্যনাথ। একদিন গ্রন্থকার দেওঘরের কোন পাহাড়ের উপর একটী অপূর্ব্ব নীলবর্ণের বনফুল দেখিলেন, দেখিবামাত্র চমকিত হইলেন। ভাবিলেন, যিনি ফুলটী আঁকিয়াছেন তিনি শুধু কারিগর নহেন, রসিকও বটেন কারণ এত স্থান থাকিতে পাহড়ের উপর এই সুন্দর ফুলটী, যেন পাছে কেহ দেখে, এই ভয়ে লুকাইয়া রাখিয়াছেন।

"আবার ইহা মনে করিয়া তাঁহার ক্ষোভ হইল যে, এই কারিগরী দেখিবার স্পৃহা কাহার নাই। তখন তিনি এই দুইটী চরণ কবিতা মনে মনে লিখিলেন—

"এই বনফুল, সুন্দর অতুল, থুইলেন তৃণ মাঝে।
কত লোক যায়, নাহি দেখে তায়, বিব্রত সংসার কাজে॥

"এই প্রথম কালাচাঁদ গীতার দুই ছত্র লেখা হইল। ইহা যে বৃহৎ গ্রন্থ আকারে লিখিত হইবে' তখন গ্রন্থকারের মনে তাহা উদয় হয় নাই। কিছুকাল পরে, সেই দেওঘরে একদিন অতি প্রত্যুষে গ্রন্থকার দেখিলেন যে, কোন বৃক্ষের ডালে একটী পেচক তাহার প্রিয়ার সহিত প্রীতি সম্ভাষণ করিতেছে। পেচক পক্ষীর মুখখানি হাস্য উদ্দীপক তাহা সকলেই জানেন। আবার যেমন তার দুটি চোখ, তেমনি তার ঠোঁট। পেচক প্রিয়ার সম্মুখে যাইয়া নানাবিধ রঙ্গ করিতে লাগিলেন। সেই যুগোল সুগল মোটা মোটা চক্ষু পাকাইয়া বদন ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহার ভাষার নানারূপ প্রিয় সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। পেচকী ইহাতে অভিমানের সহিত মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে সরিয়া বসিলেন। তখন পেচক আবার ঘুরিয়া সম্মুখে আসিলেন, আসিয়া আবার এইরূপ মুখ ঘুরাইযা আরো যেন অধিকতর প্রিয় সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। তখন পেচকী কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হইয়া এরূপ সুস্বরে এবং ঐরূপ ভঙ্গি করিয়া তাহার কি উত্তর দিলেন।

"ইহা দেখিয়া গ্রন্থকারের প্রাচীন একটী কবিতা মনে হইল। যথা

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ; যথা স্থুল তুষাবঘাতিনাং॥

'পেঁচা দেখে পেঁচী গড়ে।' 'পেঁচা পেঁচীদের ভাষা পল্লী গ্রামবাসীরা এইরূপ অনুবাদ করিয়া থাকেন। যথা পেঁচা পেঁচীকে বলিতেছেন, 'সুন্দরি, বুঝ্‌লি বুঝ্‌লি বুঝ্‌লি?' আর পেঁচী উত্তর করিতেছেন, 'সুন্দর! বুঝ্‌লুম, বুঝ্‌লুম, বুঝ্‌লুম।' গ্রন্থকার এই সকল কথা মনে করিয়া, আর সম্মুখের কাণ্ড দেখিয়া, হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তখনই তাঁহার সম্মুখের এরূপ অদ্ভুত রঙ্গটি আর কেহই দেখিল না। হঠাৎ তখনই মনে উদয় হইল, কেন? আর একজন ত তাঁহার সঙ্গে পেচক পেচকীর কাণ্ড দেখিয়া হাস্য করিতেছেন? তিনি কে? না শ্রীভগবান! সেই মুহূর্ত্তে এই চিত্তরঞ্জক অদ্ভুত জ্ঞানটি তাঁহার স্ফুরিত হইল যে, যিনি এই পেচক পেচকীর প্রীতি সম্ভাষণ প্রভৃতি হাস্যকর ব্যাপার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই অতি কৌতুকপ্রিয়, রসিক ও মধুর প্রকৃতি হইবেন।

"উপরি উক্ত বনফুল ও পেচক পেচকীর রঙ্গ লইয়া গ্রন্থকার 'রসরঙ্গিনী' অর্থাৎ প্রথম সখীর কাহিনী লিখিলেন।

"এইরূপ খণ্ডে খণ্ডে অল্প অল্প করিয়া গ্রন্থ প্রথমে লিখিত হয়। তখনও গ্রন্থকার জানিতেন না যে, এ সমস্ত লেখার একটি সামঞ্জস্য আছে এবং ক্রমে ক্রমে একখানি গ্রন্থ লেখা হইতেছে গ্রন্থকার প্রত্যহ অনেক সময় ভজনে যাপন করেন। সেই সময় কখন কখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান মাত্র থাকে না, কখন কখন অতি অল্পমাত্র বাহ্যজ্ঞান থাকে। এই শেষোক্ত অবস্থায় কালাচাঁদগীতার অধিকাংশ লেখা হয়। এইরূপে তিনি অল্প অল্প লিখিতেন। কিন্তু ইহাতে যে পরস্পারে মিল ও সামঞ্জস্য আছে, আর তিনি যে এইরূপে তাঁহার এক প্রকার অজ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে একখানি গ্রন্থ লিখিতেছেন, তাহা তিনি পূর্ব্বে লক্ষ্য করেন নাই।

"যখন গ্রন্থ সমাপ্ত হইল, তখন দেখা গেল যে, ইহার গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত একটী সুন্দর মিল রহিয়াছে, এক তত্ত্বের সহিত অন্য তত্ত্বের বিরোধ নাই, বরং তত্ত্বগুলি পরস্পারকে বরাবরই সহায়তা ও

পুষ্ট করিয়া আসিয়াছে। গ্রন্থকার গ্রন্থের সর্ব্বস্থানেই শ্রীভগবানকে অতি উপাদেয় করিয়া আঁকিয়াছেন। গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে বোধ হইবে যে, শ্রীভগবান অতি মধুর প্রকৃতি ; অতি নিজজন, ভালবাসায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ গঠিত, তিনি রসিক, কৌতুক প্রিয়ও চঞ্চল, সর্ব্বদাই নিকটে আছেন অথচ আড়ালে রহিয়াছেন, এবং একটু চেষ্টা করিলেই তাঁহাকে ধরা যায়। শ্রীভগবানের এই চিত্রটি যিনি হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে পারিবেন, তাঁহার সমস্ত দুঃখ দূর হইবে ও তিনি আনন্দ সাগরে ভাসিবেন।

"তত্ত্বজ্ঞ রসিক পাঠক একটু মনোযোগ পূর্ব্বক গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, যেমন শ্রীগীতা হইতে শ্রীভগবতের উদয় শ্রীভাগবত হইতে শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়, সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা হইতে শ্রীকালাচাঁদগীতার উদয় হইয়াছে। গ্রন্থকারের যথাসর্বস্ব ধন যেন শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা তিনি বেশ বুঝাইয়াছেন। এই গ্রন্থের মধ্যে যেখানে সুবিধা পাইয়াছেন, সেইখানেই শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট তাঁহার প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা যতদূর সাধ্য প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। গ্রন্থখানির নাম যে শ্রীকালাচঁদে গীতা হইয়াছে ; ইহাও ঠিক হইয়াছে। জ্ঞান রত্নের আকার যে শ্রীগীতা, তাহার নায়ক শ্রীহরি। এই গ্রন্থের নায়ক শ্রীকালাচাঁদ, কি রসিক-শেখর, কি সজল নয়ন, কি শ্রীকৃষ্ণ। ইহারা সকলে শ্রীহরি বটেন, তবে শ্রীভগবদ্গীতায় শ্রীহরির ঐশ্বর্য্য অংশ, এবং শ্রীকালাচাঁদগীতায় তাঁহার মাধুর্য্য অংশ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীহরির বাহিরে ঐশ্বর্য্য, অন্তরে মাধুর্য্য, শ্রীকালাচাঁদের বাহিরে মাধুর্য্য অন্তরে ঐশ্বর্য্য। গীতা যে পদ্ধতিক্রমে লেখা হইয়াছে, এ গ্রন্থও সেই পদ্ধতিতে লিখিত। গীতায় তর্ক বিচার নাই, ইহাতেও তাই। গ্রন্থ পাঠে বোধ হইবে যে, গ্রন্থকার যাহা চক্ষে দেখিতেছেন, তাহাই সরল ভাবে বর্ণনা করিতেছেন। আবার কাহারও তাঁহার তত্ত্বে ভুল ধরিতে, এমনকি, তাঁহার সহিত বিচার করিতে রুচি হইবে না। গ্রন্থখানি পাঠ করিতে হৃদয়ে শ্রীভগবানের যে মধুর ছবি উদয়

হইবে, তাহা বৃথা তর্ক দ্বারা মলিন কি নষ্ট করিতে পাঠকের প্রবৃত্তি হইবে না।”

ভক্ত শিশিরকুমারের জীবনের ভিতরকার প্রকৃত জিনিস কি, পাঠক যদি তাহা অবগত হইতে চান, তাহা হইলে কালাচাঁদগীতা পাঠ করুন। মানুষের দুইটি ভাব আছে, অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। কালাচাঁদ গীতায় আমরা প্রকৃত শিশিরকুমারের পরিচয় পাই, কালাচাঁদগীতায় আমরা শিশিরকুমারের আত্মরস দেখিতে পাই। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি যে রসের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভক্ত কবি শিশিরকুমার এই গ্রন্থে তাহাই অভিব্যক্ত করিয়াছেন। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস প্রভৃতির পর আর কেহ এমন করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভক্তিরস বিতরণ করেন নাই। যাঁহার অপেক্ষা মনোহর, যাঁহার অপেক্ষা সুন্দর আর কিছুই নাই গ্রন্থকার এই গ্রন্থে সেই কালাচাঁদকে অতি মধুরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। মহাজনগণের রচিত পদাবলীতে যে একটী মধুর ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা অনেক সময় উচ্চ শ্রেণীর কবিদিগের কবিতায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার কারণ এই যে ভক্তগণ ধ্যানমগ্নাবস্থায় শ্রীভগবানের যে অপূর্ব্ব লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাঁহাদের পদাবলীতে তাহাই বর্ণনা করেন। তাঁহাদের অমূল্য পদাবলী ভক্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বলিয়া তাহাদের মধ্যে যে এক অপূর্ব্ব চিত্তদ্রবকারিণী শক্তি নিহিত থাকে, তাহা অন্য কবি-গণের কবিতায় পরিলক্ষিত হয় না। মনোনিবেশ সহ শ্রীকালাচাঁদ গীতা অধ্যয়ন করিলে পাষণ্ডের হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে! ভূমিকায় আছে,—“গ্রন্থকার প্রত্যহ অনেক সময় ভজনে যাপন করেন। সেই সময় কখন কখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান মাত্র থাকে না। কখন কখন অতি অল্পমাত্র বাহ্যজ্ঞান থাকে। এই শেষোক্ত অবস্থায় কালাচাঁদ গীতার অধিকাংশ লেখা হয়।” শ্রীকালাচাঁদ গীতা ভক্ত কবির হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বলিয়াই, তাহা পাঠ করিবার সময় পাঠকের হৃদয়ে প্রেমের স্রোত ও ভগবৎ মাধুর্য্যের ধারা প্রকাশিত হইতে থাকে।

আমরা এক্ষণে গ্রন্থের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব। গ্রন্থের প্রথম উচ্ছ্বাস বিরক্তি। জনৈক গৃহস্থ সাংসারিক ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া এবং মৃত্যুর পর স্ত্রী, পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত বিচ্ছেদ হইবে জানিয়া, শ্রীভগবানকে পাইবার আশায়, সাধনার জন্য, অরণ্যে গমন করিয়াছেন, তাঁহার সহধর্ম্মিনীও শিশুপুত্রকে লইয়া স্বামীকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহার অনুগামিনী হইয়াছেন। ভগবৎ প্রেম-পিপাসু গৃহত্যাগী সাধু, চিন্তা করিতে করিতে বুঝিতে পারিলেন যে, ভগবানকে পাইতে হইলে তাঁহাকে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা সেবা করিতে হইবে। যাঁহাকে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা সেবা করিতে হইবে, তিনি নিরাকার হইতে পারেন না। সেজন্য সাধু ভগবানকে মনুষ্যের ন্যায় সাকার বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন। প্রেমে জীব যেরূপ বশীভূত হইয়া থাকে, অন্য কিছু দ্বারা সেরূপ হয় না। সাধুর হৃদয় প্রেম শিক্ষার জন্য অস্থির হইয়া পড়িল। তখন তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে বলিলেন,—

"শুন প্রিয়ে আমি তোর পতি হই।
আমারে পূজিতে তোর দোষ নাই॥
আমারে পূজিয়া শিক্ষা দাও তুমি।
কেমনে তাঁহারে পূজা করি আমি॥
মোর যত দোষ সব ভুলে যাও।
মোরে প্রেম তোর সকলি জাগাও॥
মোরে ভগবান ভাবিয়া অন্তরে।
ভক্তিভাবে পূজা করহ আমারে॥
গন্ধ পুষ্প আনো করি আহরণ।
পূজা মোরে, আমি করি দরশন॥
ক্ষণেক এরূপ করহ সেবন।
সেবা শিখি তাঁরে করিব ভজন॥
তুমি যেন মোরে ক'রেছ বন্ধন।
সেই মত বশ করিব সেজন॥"

মধুর, অতি মধুর ভাব। প্রেমিক কবি দেখাইতেছেন যে, প্রেম শিক্ষা আপনার প্রিয়জনের নিকট যেরূপ হইবে, অন্য কাহারও নিকট সেরূপ সম্ভব নয়। নিরাকারে প্রেম সংস্থাপন অসম্ভব, তাই সাধু প্রার্থনা করিতেছেন,—

"অতএব শুন পরম কারণ।
প্রেমডোরে তোমা করিব বন্ধন॥
পিরীত করিব কেমনে তোমায়।
তুমি যদি তার না কর সহায়?
মানুষের সঙ্গে পিরীতি করিতে।
মনুষ্য তোমায় হইবে হইতে॥
কিবা হও প্রভু কিবা হও পিতা।
ভাই কি ভগিনী প্রাণনাথ মাতা॥
কিবা বন্ধু হও দুহিতা তনয়।
কি মানুষ হ'য়ে হও হে উদয়॥
রূপে গুণে প্রাণ কাড়িয়া লইয়া।
শীতল চরণে লও আকর্ষিয়া॥
তবে ত কান্দিব চরণে পড়িয়ে
যেন নারী কান্দে পতি মুখ চেয়ে॥',

সাধুর উল্লিখিত উক্তি দ্বারা কবি ভগবানের অবতারের প্রয়োজনীতা দেখাইয়া দিতেছেন; সাধু উক্তরূপ চিন্তা করিতে করিতে জ্ঞানহারা হইয়া স্বপ্ন দেখিতেছেন যে, একটী সুন্দর কানন মধ্যে মাধবী তলায় কুসুম শয্যার উপর জনৈকা যুবতী অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন, এবং আর চারিটী যুবতী তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছেন। কবি এই পঞ্চ সখি সভা নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,—

"ভুবন মোহিনী রূপরস খনি
শৈশব যৌবন মেলা।

মাধবী তলায় কুসুম শয্যায়
অচেতন নব বালা ॥
বসিয়া নিকটে করিছে বীজন
রূপবতী একজন ।
বালার বদনে তরঙ্গ খেলিছে
করিছে তা নিরীক্ষণ ॥
আর তিন নারী ক্রমে তথি এল
কোথা হ'তে নাহি জানি ।
দেখিছে চাহিয়া বসি চারিভিতে
মুখে কারু নাহি বাণী ॥
রমণীর মেলা দৈবে মিলিয়াছে
কেহ কারে নাহি চিনে ।
অচেতন বালা দেখে সবে চাহি
সেবা করে এক মনে ।।"

কবি এই পঞ্চ যুবতীকে রসরঙ্গিনী, কাঙালিনী, কুলকামিনী, প্রেম তরঙ্গিনী ও সজল-নয়না নামে অভিহিতা করিয়াছেন। এই পঞ্চ সখি আপন আপন প্রাণ পতির বিচ্ছেদে অধীরা হইয়াছেন এবং ক্রমে স্ব স্ব কাহিনী বিবৃত করিতেছেন। কবির এই কল্পনাংশটীকে পারস্য চাহার দরবেশের সহিত কিয়ং পরিমাণে তুলনা করা যাইতে পারে।

জগতে এক শ্রেণীর জীব আছেন, যাঁহারা ভগবানের সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া মুগ্ধ এবং শেষে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতারসে পরিপ্লুত হইয়া যান মাত্র, কিন্তু তিনি কিরূপ বস্তু, তাঁহাকে পাওয়া যায় কিনা, যদি তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাহা হইলে কি উপায়েই বা পাওয়া যাইতে পারে, ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করেন না। কিন্তু প্রথম সখী রসরঙ্গিনী একটী পুষ্পের সৌন্দর্য্য লক্ষ করিয়া মুগ্ধা হইয়া বলিয়াছিলেন,—

"দৈবে একদিন সম্মুখে দেখিনু
ফুটেছে দোপাটি ফুল।
কলি এক তুলি চাহিয়া দেখিনু
চিত্রের নাহিত তুল ॥
দলে দলে দেখি সুন্দর এ কেছে
মরি একি অপরূপ।
দেখি তত ফুল এঁকেছে সুন্দর
দিয়েছে মধুর রূপ ॥
ধরিব সেজনে যেবা আঁকে বনে
দিবানিশি ভাবি তাই।
জিজ্ঞাসি সবারে তার পরিচয়
যাহারে সম্মুখে পাই ॥"

ফুলের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া রসরঙ্গিনী যে কেবল মুগ্ধা হইয়াছিলেন তাহা নয় তাঁহার হৃদয় সেই সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি কর্ত্তাকে পাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে তিনি অনুসন্ধানে যখন জানিতে পারিলেন যে,—

"নির্জ্জনে বসিয়া কুসুম আঁকয়ে
রসিক শেখর নাম।"

তখন তাঁহার হৃদয় মধ্যে সুখের তরঙ্গ উত্থিত হইল; সেই রসিক শেখরকে ধরিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ব্যাকুলতা ভগবৎ কৃপা প্রাপ্তির অন্যতম প্রধান উপায়। হৃদয় মধ্যে যখন অন্য কোন চিন্তা স্থান পায় না; শয়নে, স্বপনে, জাগরণে হৃদয় যখন কেবল শ্রীভগবানের শ্রীচরণ পাইবার জন্য ছট্ফট্ করিতে থাকে, তখন করুণার ধারায় ভক্তের ব্যাকুল হৃদয় সিক্ত করিয়া থাকেন। চৈতন্য চরিতামৃত বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ আদি নর নারী করয়ে চঞ্চল ॥"

রসরঙ্গিনী রসিক শেখরকে ধরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, কাজেই রসিক শেখরও তাঁহাকে ধরা না দিয়া থাকিতে পারিলেন না ; কিন্তু তিনি প্রথমে রসিক-শেখর রূপে দেখা দেন নাই। তাঁহার বিরাট মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। রসরঙ্গিনী বলিতেছেন,—

"যাই ধীরি ধীরি পদাঙ্গুলে দিয়া ভর।
পাঁজর খুলিয়া চলি সভয় অন্তব ।।
পথে পাছে ধরা পড়ি ইতি উতি চাই।
বন্ধুজনে ধরে পাছে লুকাইয়া যাই ।।
গোপনীয় পথে চলি আড়ালে আড়ালে।
ক্রমে ক্রমে দাঁড়ালাম কামিনীর তলে ।।
বুঝিনু বসিকবর কুঞ্জের ওধারে।
কি করিব কি কহিব চিন্তিনু অন্তরে ।।
চুপে চুপে গেনু দেখি বৃক্ষ ঠেস্ দিয়ে।
বসিয়া আছেন কেহ ভয়ঙ্কর হয়ে ।।"

রসিক-শেখরকে ধরিবার জন্য রসরঙ্গিনী যাইতেছেন, তাঁহার মনের অবস্থা কিরূপ তাহা পাঠক তাঁহারই উক্তি হইতে বুঝিতে পারিলেন। তিনি রসিক-শেখর-কে না পাইয়া এক ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখিয়া ভীতা ও দুঃখিতা হইয়াছিলেন। শ্রীভগবানের বিরাট মূর্তি দর্শনে হৃদয়ে স্বভাবতঃই ভীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। বসরঙ্গিনী স্ত্রীলোক সুতরাং তাঁহার হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হওয়া আশ্চর্য্য নহে। অর্জ্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্টা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব সে দর্শয় দেবরূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ।।

রসরঙ্গিনী ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা তিনি এইরূপ বর্ণনা করিলেন,—

"গৃহেতে ফিরিয়া নিরাশ হইয়া
পড়িয়া রহিনু ধরা।
এই কি আমার রসিক-শেখর
দেখি ভয়ে প্রাণ হারা।
রসিক শেখরে কাজ নাই মোরে
কাজ নাহি বাঁচি প্রাণে।
জলে ঝাঁপ দিব পরাণ ত্যজিব
দৃঢ় করিলাম মনে॥"

রসরঙ্গিণী যখন জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন, তখন ভগবান তাঁহার নিকট মধুর বেশে প্রকটিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। রসিকশেখরের সহিত সাক্ষাতের পর, একত্রে অবস্থানের ফলে রসরঙ্গিণীর তাঁহার নিকট বাঁধ বাঁধ ভাবে ক্রমেই দূর হইয়া গেল। তিনি রসিকশেখরের সহিত তাঁহার সৃষ্টি রহস্যের ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবানও তাঁহাকে সুখ দুঃখ, ইহলোক পরলোক সম্বন্ধে অনেক কথা বুঝাইয়া শেষে বলিলেন—"জীবের সৌভাগ্যে পিরীত সৃজন।" অর্থাৎ প্রেমই সকল সুখের আকর, রসিক শেখর সৌন্দর্য্য শোভাময় গহন কাননে রঙ্গিণীর নিকট আগমন করিয়া আলাপ করেন, উপদেশ দেন, তাহাতে মুগ্ধ রঙ্গিণী কি করেন বলিতেছেন,—

"প্রতি পদে দেখি তার কারিগিরি।
সুখেতে বিভোর ঝুরে ঝুরে মরি॥

দ্বিতীয় সখি কাঙ্গালিনী দাস্যরসে শ্রীভগবানকে ভজন করেন, কবি ইহাই বর্ণনা করিয়াছেন। হৃদয়ের মলিনতা দূর না হইলে এবং হৃদয় পবিত্র না হইলে সেখানে শ্রীহরি উদয় হন না। যুবতী কাঙ্গালিনী যখন শুনিলেন যে, শ্রীভগবান জিনিষটী অতি সুন্দর, অতি মধুর এবং তিনি করুণাময়ও বটেন, তখন তিনি স্থির করিলেন,—

"তাঁর যোগ্য হব তাঁর কাছে রব
রসিব পালঙ্কতলে।
ত্বটী রাঙ্গাপদ হৃদয়ে ধরিয়া
দুঃখভার দিব ফেলে ॥"

স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ স্বীয় রূপ ও শারীরিক সৌন্দর্য্য দ্বারা পুরুষকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ভগবানের দাসী হইতে হইলে প্রথমে তাঁহার মন আকর্ষণ করিতে হইবে, সুতরাং কাঙ্গালিনী আপনার বেশবিন্যাস জন্য একখানি দর্পণ লইয়া তাহার সম্মুখে উপবেশন করিলেন। কিন্তু দর্পণে তিনি কি দেখিলেন? তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার মুখখানি অতি কদাকার, সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন। তিনি তখন দর্পণখানি বার বার পরিষ্কার করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেও যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় শুকাইয়া গেল, তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার কুরূপ ক্রমশঃই ফুটিয়া উঠিতেছে। কবি দেখাইতেছেন যে, যতই আত্মার মলিনতা দূর হইয়া যায়, জাব ততই আপন আপন দোষ উপলব্ধি করিতে পারে। কাঙ্গালিনী মলিনতা দূর করিয়া স্বীয় হৃদয় নির্ম্মল ও পবিত্র করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। শেষে তিনি জনৈক সুন্দরীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"এইরূপ খানি, অঙ্গের লাবণ্য
পাইলে কি তপস্যায়?"

প্রত্যুত্তরে সুন্দরী—

"মধুর হাসিয়া কহিল চাহিয়া
কেন ভগ্নি দুঃখ কর।
যমুনায় নিতি, দেহটি মাজিবে,
ডুবি রবে যত পার ॥
যত অঙ্গ দাগ সব লুকাইবে,
দেহ হবে মনোহর।

ধৈর্য্য ধরি অঙ্গ নিতুই মাজিবে
মিলিবে ঠাকুর বর ॥

কবি সুন্দরী দ্বারা কাঙ্গালিনীকে বলাইতেছেন যে, যমুনারূপ ভক্তিস্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিলে, হৃদয়ের মালিন্য দূর হইয়া হৃদয় নির্ম্মল ও পবিত্র হইবে, এবং শ্রীভগবানও তখন সেই হৃদয়ে আবির্ভূত হইবেন। কাঙ্গালিনী ভগবানের শ্রীচরণে স্বীয় মনপ্রাণ অর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুলা, সুতরাং তিনি সুন্দরীর পরামর্শ মত ভক্তিস্বরূপা যমুনায় অবগাহন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা শান্ত-জ্ঞানী, তাঁহারা ভক্তির বিশেষ পক্ষপাতী নহেন। রসরঙ্গিনী কাঙ্গালিনীকে বলিতেছেন,—

"সিংহাসনে বসি, হাতে লয়ে অসি,
যেই ঠাকুরালী করে।
ক্ষুদ্রজন যারে ত্রাহি ত্রাহি করে
সম্মুখেতে যোড় করে ॥
সবে মুখে বলে, 'তু বড় দয়াল'
তা শুনে ভুলিয়া যায়।
কিছু ত্রুটি পেলে, অমনি মেরে ফেলে,
দিবানিশি ছিদ্র চায় ॥
এমন প্রভুর মুখেতে আগুন
যারে এত কর ভয়।
ভক্তি কর তারে কেমন করিয়া
বুঝাইয়া বল ভাই",

রসরঙ্গিণীর উক্তি কাঙ্গালিনীর অন্তর বিদ্ধ করিল ; তিনি প্রত্যুত্তরে বলিতেছেন,—

"ও তার বুক হতে শ্রীচরণ মধু। ধ্রু।
সে ত বুক দিয়াছিল, আমি পদ মাগি নিনু,
তাহাতে দুঃখিত আমার বঁধু ॥
ও তার পদতলে করি আমি বাস।

বুকে যদি সখি যাই,　　　পড়ি পড়ি হয় ভয়
চরণে নাহিক সেই ত্রাস ॥
ও তার হিয়া মাঝে প্রেমাগুণ জ্বলে।
মোর বুকে প্রেম নাই　　বন্ধুর প্রেমে দুঃখ পাই,
তাই যাই স্নিগ্ধ পদতলে ॥
সখি, নিজ সুখ লাগি স্তুতি করি।
যবে বলি দয়াময়,　　　অঙ্গ এলাইয়ে যায়,
সুখময় ত্রিজগত হেরি ॥
স্তুতি শুনে বন্ধু লজ্জা পায়।
স্তুতি করি সুখ পাই,　　　দেখি বন্ধু দয়াময়,
নিষেধ না করেন আমায় ॥
কেশে পদ মুছাইতে যাই।
পহুঁ মোর ধরে হাত,　　আমি বলি এই কেশ,
কিবা অপরাধী তুয়া পায় ॥
একবার মুছায়ে দেখ সখি।
তুমিত মুছাওনি সখি,　　আমি মুছাইয়া থাকি,
দেখ দেখি কেবা বড় সুখী ॥
স্তুতি শুনি বন্ধু ভুলে সাধে।
যদি বন্ধু নাহি ভুলে,　আমি কি ভুলাইতে পারি,
বন্ধু ভুলে মোর অনুরোধে ॥
কে ছোট কে বড় কে তা জানে।
বন্ধু ছোট হতে চায়,　　আমি নাই দেই তায়,
ঠেলাঠেলি করি তার সনে ॥
সাধ কি ভাই পাগবান্ধে মাথে।
ক্ষুদ্রজীব নিরাশ্রয়,　　　ক্ষমতা মাত্রত নাই,
তবু বাদ করে তার সাথে ॥
আমরা সব তার কাছে দোষী।

কিবা বড়াই কর সখি, চোর সুখ সুসম্পত্তি,
পেয়েছ সেই চরণ পরশি ॥
সবে যেতে চায় তার বুকে।
আমি যদি বুকে যাই, পদসেবা নাহি হয়,
পদসেবা ভার দিব কাকে ॥
জান না নদের গৌর-হরি।
দাস্য সুখ স্বাদ করে, মজিলেন একেবারে,
পাসরিল নিজ ব্রজপুরী ॥
সর্ব্বেশ্বর সে আনন্দময়।
যা করে তোদের লাগি, কবি হয় নিন্দা ভাগী,
তোদেব কাছে নাহি কিছু চায় ॥"

ভক্তি তরঙ্গে ডুবিয়া কাঙ্গালিনা শ্রীহবিব কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাব হৃদয় নির্ম্মল ও পবিত্র লইলে: তিনি প্রাণ ভরিয়া তাঁহার সুন্দর ঠাকুবকে ডাকিতে লাগিলেন। তখন,

"দুটি করে ধরি, বলিলেন হরি,
মোরে কত ডাকিয়াছ।
দেখা না পাইয়া, প্রাণ উঘাড়িয়া,
কতই না কান্দিয়াছ ॥
অপরাধী আমি, ক্ষমা কর তুমি,
এমন আর না হবে।
আমারে দেখিতে, সাধ হলে চিতে,
তখনি আমার পাবে ॥"

ডাকিবা মাত্রই ভগবানকে পাওয়া যাইবে, কাঙ্গালিনী একথায় কিরূপে বিশ্বাস করিবেন? তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন স্থির করিলেন। তিনি বলিতেছেন,—

"ডাকিলাম কোথা জগন্নাথ !
লুকায়ে ছিলেন হরি, আইলেন দয়া করি,
দাঁড়ালেন আমার সাক্ষাৎ ॥"

কবি দেখাইতেছেন যে শ্রীভগবান সর্ব্বদাই আমাদের নিকটে রহিয়াছেন এবং চেষ্টা করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়।

তৃতীয়া সখী কুলকামিনী ভক্তি ও প্রেম দ্বারা শ্রীভগবানের ভজনা করিতেছেন, কবি ইহাই বর্ণনা করিয়াছেন। কুলকামিনীর কাহিনীতে কবির জীবনের বহু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। জগতে জীব মাত্রেরই হৃদয়ে কোন না কোন এক সময়ে পূর্ব্বরাগের উদয় হয়। যাঁহারা শ্রীভগবানের প্রতি এই অনুরাগ পরিবর্দ্ধন করিয়া সাধন পথে অগ্রসর হইতে পারেন, তাঁহারাই ধন্য হন ; আর যাঁহারা বিষয়ের আকর্ষণে এই অনুরাগ নষ্ট করিয়া ফেলেন, তাঁহাদের হৃদয় হইতে চিরদিনের জন্য সুখ শান্তি অন্তর্হিত হইয়া যায়। অতি শৈশবে কুলকামিনীর বিবাহ হইয়াছিল ; পতি জিনিসটী কিরূপ তাহা তিনি জানিতেন না। যৌবন সমাগমে স্বামীর জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি দিবানিশি স্বামী চিন্তায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন ; শেষে একদিন রজনীযোগে স্বপ্ন দেখিলেন, —

"তড়িতের মত এল যে সেজন।
বাহু পসারিয়া চুমিল বদন ॥
হৃদয়ে ধরিল অতি অল্পক্ষণ।
নয়ন মেলিতে হল অদর্শন ॥
ঘুমের আবল্লি নয়ন বিভোর।
লখিতে নারিনু মোর চিতচোর ॥
কয় দিন র'নু পাগল মতন।
বুঝিতে নারিনু সত্য কি স্বপন ॥
যবে সত্য ভাবি আনন্দ উথলে।
মিথ্যা ভাবি যদি ভাসি আঁখিজলে ॥"

ভক্ত কবি শিশিরকুমারও উক্ত স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহার প্রাণের ঠাকুরকে ধরিবার পথ পাইয়াছিলেন। তাঁহার এই গ্রন্থপ্রাপ্তি তিনি কুলকামিনীর "স্বামীর সংবাদ প্রাপ্তি" রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ব্যাকুলা কুলকামিনী তাঁহার স্বামীর নিকট হইতে যে পত্র পাইয়াছিলেন, তাহা এই—

"যাইতে না পারি এই কয় ছত্র।
পাঠানু তোমারে উপদেশ পত্র ॥
চাহ অলঙ্কার পাঠাব তোমারে।
যদি চাহ মোরে যাইব সত্বরে ॥
তেমনি হইব যেমন হইবে।
যেরূপ বাঞ্ছহ সেরূপে পাইবে ॥
যখন দেখিতে ব্যাকুল হইবে।
তখন নিশ্চয় দেখিবারে পাবে ॥
বহুদিন হল ছিল পরিচয়।
আবার মিলিতে চঞ্চল হৃদয় ॥
কি তোরে লিখিব কি তুই বুঝিবি।
ক্রমে ক্রমে মোরে জানিতে পারিবি ॥"

ভক্ত কবি শ্রীভগবানকে স্বামী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত পত্রের অর্থ এই যে,—শ্রীভগবান অবতার দ্বারা মর জগতে তাঁহার সংবাদ পাঠাইয়া থাকেন; তিনি অলঙ্কার অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যরূপ সিদ্ধি কামনা করেন, তিনি তাঁহার অনুগ্রহে তাহা পাইয়া থাকেন; যিনি তাঁহাকে পাইবার কামনা করেন; তিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। ভগবানকে যিনি যেরূপ ভাবে ভজনা করেন, তিনিও তাঁহাকে সেইরূপে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।"* স্বামীর পত্রোত্তরে কুলকামিনী যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এই—

সখী সনে বনে বুলি, মহানন্দে ফুল তুলি,
কতবা গাঁথিব আর মালা।
গাঁথিমালা তুমি নাই, ফেলে দিই যমুনায়,
দিবানিশি করি এই খেলা ॥
পেতেছিনু কুসুম শয্যা। ধ্রু।
জ্বালিয়া মোমের বাতি, জাগি পোহাইনু রাতি,
বিফল এসব মোর সজ্জা ॥
এস নাথ ছাড় চতুরালী।
যা চাহিবে তাহা দিব, কৃপণতা না করিব,
দিবানিশি দুইজনে কেলি ॥
মোর নৃত্য দেখিবারে চাও ?
আধ সে বদন ঢাকি, নয়নে নয়ন রাখি,
নাচিব, ত্যজিয়া লাজ ভয় ॥
যদি ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আঁচলে বাতাস দিব, উপন্যাস শুনাইব,
উরুপর শির তব রাখি ॥
আসে পাশে রসের বালিশ।
হৃদয় মাঝারে থো'ব, আদরে ঘুম পাড়াইব,
মিটাইও অঙ্গের আলিস ॥"

পত্রখানি পাঠ করিয়া আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় বোধ হয় উহা অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট ও কুল কামিনীকে সাতিশয় লজ্জাহীনা বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু প্রকৃত ভক্ত ও প্রেমিক পাঠক কুলকামিনীর পত্রের প্রত্যেক পংক্তির প্রত্যেক শব্দে প্রগাঢ় ভাব ব্যঞ্জনার এক মনোমুগ্ধ কাহিণীর শক্তির স্ফূরণ দেখিতে পাইবেন। স্বামীর চরণে ভক্তিই কুলকামিনীর প্রধান ধর্ম্ম ; কিন্তু হৃদয়ে প্রেম উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি ক্রমশঃই লাঘব হইয়া যায়। কুলকামিনীর হৃদয়ে প্রেমের উদয় হইয়াছে ; সুতরাং স্বামীর নিকটে তাঁহার ভয়, লজ্জা কিম্বা অন্য

কোনরূপ বাধবাধ ভাব আর নাই; সেইজন্য তিনি সরল প্রাণে হৃদয়ের সকল কথা তাঁহার প্রিয়তমের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। ভক্ত কবি এখানে দেখাইয়াছেন যে, ভক্তির সাধন দ্বারা মানব যখন হৃদয়ে প্রেম ভাব আনয়ন করিতে পারেন, তখন ভগবান যে এক অতি বৃহৎ বস্তু তিনি যে দুষ্পাপ্য, ইহা আর তাঁহার মনে স্থান পায় না; তাঁহার হৃদয়ে আনন্দধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। যাঁহারা প্রেমের ও কামের পার্থক্য সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা মনোনিবেশ পূর্ব্বক কুলকামিনার পত্রখানি পাঠ করিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, যে সুনিপুণ তুলিকা দ্বারা উহা চিত্রিত হইয়াছে, তাহাকে অশ্লীলতা স্পর্শ করিতে পারে নাই, বরং তাহা পবিত্রতায় নিস্কলঙ্ক। কুলকামিনী ভক্তি ও শেষে প্রেমের সাধনা দ্বারা তাঁহার প্রাণনাথের হৃদর অধিকার করিয়াছিলেন। মানব চেষ্টা করিলে ভক্তি ও প্রেম দ্বারা শ্রীভগবানের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইতে পারেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই প্রেমেরই পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। ভক্ত কবি শিশিরকুমার শ্রীগৌরঙ্গ-দেবকেই কুলকামিনীর স্বামীর পত্র বাহক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

চতুর্থা সখী প্রেম তরঙ্গিনী অবিমিশ্র প্রেম দ্বারা শ্রীভগবানকে ভজনা করেন, কবি ইহাই বর্ণনা করিয়াছেন। মধুর মুরলীর প্রেম তরঙ্গিণীর কর্ণে প্রবিষ্ঠ হইলে তাঁহার প্রাণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রিয়তমের আশায় তরঙ্গিনী কত ঘুরিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার সহিত যখন মিলন হইল না, তখন তিনি স্থির করিলেন যে, বরদায়িনী দেবী ক্যাতায়নীর নিকট বর প্রার্থনা করিবেন। কন্যা জননীর নিকট বর প্রার্থনা করিলে, মা অবশ্যই তাহা প্রদান করিবেন, এই ভাবিয়া তিনি কুসুমচন্দনে মায়ের চরণ পূজা করিয়া বলিলেন,—

"দাও মোর প্রাণপতি ॥

মাতার হৃদয়ে স্নেহরূপ হয়ে,

তুমি মা বিরাজ কর।

অন্নপূর্ণা হয়ে, জীবে অন্নদিয়ে,
ক্ষুধার্ত্তের দুঃখ হর ॥
বিপদে পড়িলে, তোমারে ডাকিলে,
'মাভৈ' বলিয়া এস।
ত্রৈলোক্য-তারিণী ভক্তি প্রদায়িণী,
ঘুচাও আমার ক্লেশ ॥
তুই মা জননী, মমতার খনি,
দুঃখিনী তনয়া তোর।
যৌবন হয়েছে, পরান কান্দিছে
কোথা প্রাণনাথ মোর ॥
আমারে ছুঁয়েছে পরাণ নিয়েছে,
পশেছে হৃদয়ে রূপ।
বান্ধা কটি আঁটি রাঙ্গা আঁখিদুটি
দে মা সেই রস কূপ ॥

কন্যার দুঃখে জননী কি কখনও স্থির থাকিতে পারেন? তিনি তরঙ্গিনীর প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ করিলেন,—তাঁহার মুকুট হইতে ফুল খসিয়া পড়িল। ব্যাকুল-হৃদয়া প্রেম তরঙ্গিনী ভক্তি ভরে সেই পুষ্পে স্বীয় বেণী সুসজ্জিত করিয়া তাঁহার প্রাণনাথের অন্বেষণে গহণ কাননে গমন করিলেন। কিন্তু কই, যাহার জন্য তিনি অধীরা, তিনি ত তাঁহাকে দর্শণ দিতেছেন না। মধুর মঞ্জীর-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রেমতরঙ্গিণী বুঝিতেছেন যে তাঁহার হৃদয় সর্ব্বস্ব নিকটেই রহিয়াছেন, কিন্তু দেখা দিতেছেন না। তখন তিনি নয়নজলে বুক ভাসাইয়া বলিতেছেন,—

"কি হল দুরাশা, মোর ভালবাসা
সঁপিনু কাহার পায়।
আমি বাসি ভাল, তার কিবা বল,
তার কিবা এসে যায় ॥"

"আমারে খুঁজিয়া, কান্দিয়া ভ্রমিয়া
পাইয়াছ প্রিয়ে দুখ।
দুর্লভ না হ'লে চাহিলে মিলিলে
মিলনে নাহিক সুখ॥"

পঞ্চমা সখীর নাম সজল-নয়না। ইনি প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক-রূপে সংপ্রাপ্তা, সেইজন্য তাঁহার প্রধান সম্বল নয়নজল। সজল নয়নজল। সজল-নয়না নয়নজলে শ্রীভগবানকে ভজনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার আরাধ্য দেবতাও সজল-নয়ন। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।"

এই সজল-নয়নার কাহিনীতে কবি এক অতি অপরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ভগবান নিভৃতে বসিয়া ভক্তের জন্য নয়নজলে বুক ভাসাইতেছেন, এই দৃশ্য পাঠক একবার আপনার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ধ্যান করুন, আপনার হৃদয় এক অতি মধুর অনির্ব্বানীয়

"দুঃখের কাহিনী বলিতে না জানি,
দুঃখ সদা শুনে থাকি।"

তিনি ত্রিজগতের দুঃখ হরণ করিয়া থাকেন; তিনি আবার কাহার নিকট স্বীয় দুঃখ-কাহিনী বিবৃত করিবেন? সজল-নয়না তাঁহার প্রাণ-নাথকে নানারূপে সেবাশুশ্রূষা করিয়া শেষে তাঁহকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তুমি কান্দ কেন, যেন দীন হীন,
তুমি ত্রিজগত স্বামী।"

সজল-নয়না পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায় নাগর আর নীরব থাকিতে পারিল না; তিনি গদগদ হইয়া বলিলেন,—

"যদি মোর নাম শুন প্রিয়ে।
কান্দয়া উঠহ প্রেমে, ধারা বহে দুনয়নে,
আমি স্থির থাকি কি করিয়ে?"

আবার বলিলেন,—

"দিবানিশি কান্দ মোর লাগি।
দেখি তোর আঁখি বারি, স্থির থাকিবারে নারি,
কান্দি হই তোর দুঃখ ভাগা।"

নাগর নিরস্ত হইলেন না, তিনি আরও বলিলেন,—

"পিরীতি যেখানে সেথা আঁখিবারি।
সেই জলে বাড়ে পিরীতি অঙ্কুরি ॥
মোর মত যাবে পিরীতে মজিবি।
তুই দিবানিশি এমনি কান্দিবি ॥
নয়নের জল জাহ্নবী যমুনা।
স্নান কৈলে আর ত্রিতাপ থাকে না ॥
প্রিয়া দুঃখে কান্দে, মোর কান্দে হিয়া।
পরাণ জুড়াই নিভৃতে কাঁন্দিয়া ॥

এইরূপে সজল-নয়নার সহিত সম্ভাষণ করিয়া ভগবান অন্তর্হিত হইলেন। তখন সজল-নয়না অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন।

বিরহে মিলন সুখ যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আর কিছুতেই সেরূপ হয় না; সেইজন্যই ভগবান যুবতী সখীগণকে দর্শন দিয়া অদর্শন হইয়াছিলেন। রসরঙ্গিনী, কাঙ্গালিনী, কুলকামিনী, প্রেমতরঙ্গিনী ও সজল-নয়না স্ব স্ব সাধনকাহিনী বিবৃত করিয়া নিকুঞ্জে বসিয়া আছেন, এমন সময় সাধু সেখানে উপস্থিত হইলেন। সাধুকে দেখিয়া সখীগণ সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। করি এই চিত্রে পরিহাস রসিকতার সহিত পরমার্থ তত্ত্বের লড়ই সুন্দর সংমিশ্রণ করিয়াছেন। সখীগণ সাধুকে বলিলেন,—

"কৃষ্ণধন হারা বেড়াই বিপিনে
বল পাব কি উপায়ে।"

সাধু প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—কৃষ্ণকে পাওয়া কি সহজ কথা? সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াও যাঁহাকে ধ্যানেও ধারণা করিতে পারা যায় না, তাঁহাকে তোমরা পাইবার কামনা করিতেছ। তাঁহাকে পাইতে হইলে, সাধু বলিতেছেন,—

"উপবাস করি, শরীর শুখাও,
তবে কৃষ্ণ কৃপা পাবে।

কৃষ্ণের করুণা ক্রমে বাড়ি যাবে,
যত দেহ শীর্ণ হবে ॥"

সখীগণ সাধুর নিকট বিধিভক্তির কথা শুনিয়া বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, ইহা অসম্ভব; আমরা দুঃখভোগ করিলে শ্রীকৃষ্ণ যে সুখী হইবেন, ইহা কখন সম্ভব হইতে পারে না। তাঁহারা সাধুকে বলিলেন,—

"দুঃখের কাহিনী শুনিলেই তিনি,
কান্দ হন আত্মহারা।
দুঃখ মোরা নিব, তারে কান্দাইব,
এ ভজন কেমন ধারা ?"

সখীগণের কথা শুনিয়া সাধু হাসিয়া বলিলেন,—তোমরা এখন অল্পবয়স্কা সুতরাং সে বৃহৎতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার সামর্থ তোমাদের নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া বড় সহজ কথা নহে; তাঁহাকে পাইতে হইলে,—

"কেশের মমতা, ঘুচাইতে হবে,
মুড়াইতে হবে মাথা।
তুলসী তলাতে মস্তক কুটিলে,
তুষ্ট হবে কৃষ্ণ পিতা।"

রসরঙ্গিনী সৌন্দর্যপ্রিয়া; সুতরাং সাধুর কথায় তিনিই প্রথমে শিহরিয়া উঠিলেন। কেশই রমণীর সৌন্দর্য্য, সেজন্য তিনি সাধুকে বলিলেন,—মস্তক মুণ্ডনে কালাচাঁদ কখনই সুখী হইবেন না, বরং তিনি প্রাণে কষ্টই অনুভব করিবেন। সাধুর কথায় যুবতীগণ একে একে এইরূপ উত্তর দিলেন। রসরঙ্গিণী বলিলেন,—

"কেশ ঘুচাইব বেণী না বান্ধিব,
কোথা গুঁজি থোব চাঁপা।
মালতীর মালা, চিকণ গাঁথিয়া,
কেমনে বেড়িব খোঁপা ॥

সে ভঙ্গিম বেণী, রসিক শেখর,
দেখি যত সুখ পাবে।
তার মন জানি রসে যত সুখ,
উপবাসে তা না হবে॥"

দ্বিতীয় সখী কাঙালিনী বলিলেন,—
"রাঙ্গাপদ ধুই, নয়নের জলে,
মুছাইয় থাকি কেশে।
কেশ মুড়াইব, বন্ধু পদ-ধুয়ে
মুছাইব বল কিসে?"

তৃতীয় সখী কুলকামিনী বলিলেন,—
"যোষ যাগ করি তারে ভুলাইব,
সে ত মোর পর নয়।
স্নেহ সেবা করি তাহারে তুষিব,
সে রে মোর স্বামী হয়॥"

চতুর্থ সখী প্রেমতরঙ্গিনী বলিলেন,—
"বিরহে যখন বড় দুঃখ পাই,
কেশ এলাইয়া দেখি।
সেই কেশ মোর কৃষ্ণের স্মরায়,
মুড়াতে নারিব সখি॥"

পঞ্চম সখী সজল-নয়না বলিলেন,—
"কেশ মুড়াইয়া কৌপন পরিয়া,
ধরিলে দুঃখিনী বেশ।
কাঁন্দিয়া আকুল হবে কালাচাঁদ,
আমি তারে জানি বেশ॥"

সাধুর কথায় শ্রীকালাচাঁদের সখীগণের হৃদয় আশ্বস্ত হইল না। তাঁহারা তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব তাঁহাদের প্রাণনাথের চরণে অর্পণ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা তাঁহাকে বাঁধিয়া পারিতেছেন না।

ত্রিভুবনের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, তাহাকে ধরিতে হইলে পৃথিবীর জন্য যিনি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী তাঁহার সহায়তা বিশেষ আবশ্যক। চঞ্চল কালিয়াকে বাঁধিতে কেবলমাত্র শ্রীরাধিকাই সমর্থা, সেই সখীগণ তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন,—

"কোথা তুমি কৃষ্ণ মনোহরা !! ধ্রু।
এস আহ্লাদিনি ভুবন-মোহিনী,
কাম শশি—চিত্ত চোর।
কত রবে শুনি, এসে লজ্জাবতী,
হাতে লয়ে প্রেম ভোর ॥
চপল চঞ্চল সে চিকণ কালা,
আর কেবা ধরে তারে।
কারো সাধ্য নয় সদা স্বেচ্ছাময়
বন্ধ তারে প্রেম ডোরে।"

শ্রীমতী রাধিকাকে আহ্বান করিয়াই সখীগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না; তাঁহারা বরদায়িনী দেবী কাত্যায়নীর নিকট প্রার্থনা করিলেন,—

"ভগবান আধা সুন্দরী শ্রীরাধা
দে মা জীবে কৃপা করে।
পুরুষ প্রকৃতি রূপে তাঁর স্থিতি,
দেহ মা বিভাগ করি।
শ্রীরাধা ভজিব তা হ'লে পাইব
সেই গোলকের হরি ॥"

অতঃপর শ্রীরাধিকার উৎপত্তি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার মধুর মিলন বৃন্দাবন লীলা রহস্য, সাধুর সাধনা সিদ্ধি প্রভৃতি নিগূঢ় তত্ত্ব ও রস মাধুর্য্য ভক্ত কবি এরূপ প্রাণস্পর্শিনী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিবার সময় পাঠকের হৃদয়ে ভক্তি ও প্রেমের মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতে থাকে; যাহা সম্ভোগের বিষয়,

তাহা সমালোচনার অতীত। সংসার ত্যাগী সাধু বুঝিতে পারিয়া-যে,—শ্রীভগবান সর্ব্বদাই জীবের কাছে কাছেই রহিয়াছেন এবং চেষ্টা করিলে তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। তিনি প্রেমের ভজন দ্বারা ভগবৎ কৃপা লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। তখন ভক্ত কবি

বলাই বলিছে, "শুন ভক্তগণ।
মাথাকুটি তাঁরে না পাবে কখন॥
মাথা কুটি তার সম্পত্তি পাইবে।
কিন্তু শ্যাম চাঁদে ধরিতে নারিবে॥
তারে ভালবাস তবে তারে পাবে।
গৌরাঙ্গ ভজিলে এসব শিখিবে॥"

গ্রন্থের শেষে কবিও শ্রীগৌরাঙ্গের কথোপকথন পাঠে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে মহাপ্রভুর প্রতি ভক্ত শিশিরকুমারের কিরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস, ভক্তি ও ভালাবাসা ছিল।

বিগত পঞ্চাশ বৎসর কাল বাঙ্গালা কাব্য ও কবিতার ক্ষেত্রে যুগান্তর আসিয়াছে। সে কবিতা পাঠকের অন্তরের অন্যতম প্রদেশ স্পর্শ করিতে পারে, সেই কবিতা, শিল্পাংশে উচ্চ না হইলেও, প্রকৃত কবিতা। বাঙ্গালার প্রাচীন কবিতায় শিল্প চাতুরী ও সৌন্দর্য্য প্রবণতার অভাব পরিলক্ষিত হইলেও তাহা সহজ বোধ্যতার জন্য বাঙ্গালীর নিকট চিরদিন আদরণীয়। বর্তমান যুগের কবিদিগের মধ্যে কয়েকজন বাঙ্গালী পাঠকের অন্তাস্তলে আঘাত করিতে সমর্থ হইয়াছেন? অধুনা দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কবিতা পাঠ করিয়া পাঠক তাহার ভাব গ্রহণে অসমর্থ হন, সেই কবিতাই উচ্চাঙ্গের কবিতা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, যে কবি অতি সরল ও সহজ বোধ্য ভাবগুলি জটিল করিয়া বর্ণনা করিতে পারেন, তাঁহার যশ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। কাব্য ও কবিতা বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন নহে; বরং পূর্ব্বে কাব্য কবিতাই আমাদের উচ্চাঙ্গের সাহিত্য

ছিল এবং এই সকল কাব্যও কবিতা দেশের সাধারণ লোকেও বুঝিতে পারিত। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত আমাদের কাব্য সাহিত্যে যে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে, তাহা বোধ হয় অন্য কোনও জাতির কাব্য প্রাপ্ত হয় নাই। অথচ সেই রামায়ণ ও মহাভারত আমাদের দেশের কৃষাণ-কৃষাণী পর্য্যন্ত বুঝিতে সক্ষম; এবং সেই জন্যই এই অমূল্য গ্রন্থদ্বয় বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান কালের কবিতা কৃষাণ-কৃষাণীত দূরের কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণও সম্যক বুঝিয়া উঠিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না। শ্রীকালাচাঁদ গীতার ভক্ত কবি শিশিরকুমার কবি -যশঃ প্রার্থী হইয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই। শিশিরকুমার যে তেজস্বী লেখনী হইতে Political geometry (রাজনৈতিক জ্যামিতি) প্রসুত, সেই লেখনী হইতেই মধুর কালাচাঁদ গীতার উদ্ভব যে অতি বিস্ময়কর ব্যাপার, তাহাতে সন্দেহ নাই। লেখনা ইংরাজ রাজ কর্ম্মচারিগণের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিয়া ছিল, সেই লেখনীই যে বাঙ্গালীর শুষ্ক হৃদয় ক্ষেত্রে ভক্তি ও প্রেমের স্রোত বহাইয়াছে, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? শিশিরকুমার খাটী বাঙ্গালী ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার ভাষাও খাটি বাঙ্গালা; তাঁহার রচনার মধ্যে ইংরাজী গল্প পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে নাই। শিশিরকুমার ব্যাকরণের বাঁধনে বাঁধা ছিলেন না, তাঁহার এই কাব্য খানিতে ব্যাকরণ দোষ পরিলক্ষিত হয়। ভাষার আড়ম্বর কিম্বা শিল্প কৌশলের প্রতি কবির দৃষ্টি থাকিলে বোধ হয় আসল জিনিসটী নষ্ট হইয়া যাইত। আলোচ্য গ্রন্থে শিশিরকুমার মানবজীবনের সর্ব্বোচ্চ সমস্যার বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং সে সমস্যা মহা মহা পণ্ডিত ও তত্ত্ববিদগণের বিশেষ বিবেচনার বিষয় হইলেও ভক্ত কবির সরল ও সহজবোধ্য বর্ণনার গুণে তাহা সাধারণ জনসম্প্রদায়ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে! শিশিরকুমারের আবেগময়ী লেখনীর মুখে যাহা আসিয়াছে, তিনিই তাহাই লিখিয়াছেন; তিনি

এই গ্রন্থে আত্ম হৃদয় উন্মুক্ত ও অভিব্যক্ত করিয়াছেন। সেইজন্য ভাষা কিম্বা সৌন্দর্য্যের দিকে কবির দৃষ্টি না থাকিলেও ভক্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বলিয়া কাব্যখানি স্বাভাবিকতায় সৌন্দর্য্যে বাঙ্গালীর অন্তরতম প্রদেশে স্পর্শ করিতে সক্ষম হইয়াছে। তন্ময় চিত্তে, মধুর ভাষায়, ভক্ত কবি শিশিরকুমার বাঙ্গালীকে যাহা উপহার দিয়া গিয়াছেন, তাহা দ্বারা দীনা বঙ্গ ভাষা যে সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। রাজনীতি ক্ষেত্রে শিশিরকুমার পরিচিত, সম্মানিত ও পূজিত হইলেও ভক্ত বলরাম দাস বেশে তিনি যে ভক্তজনোচিত কুটীরে বাস করিতেছিলেন, এই অমূল্য কাব্য তাঁহাকে সেই কুটীর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া কাব্য সিংহাসনে উপবেশন করাইয়াছে। পাঠক! গ্রন্থখানি পাঠ করুন, দেখিবেন আপনার হৃদয়ে কেবল রস সম্ভোগের স্পৃহা বলবতী হইবে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মতিবাবু ভূমিকায় যথার্থই লিখিয়াছেন,—"গ্রন্থখানি পাঠ করিতে করিতে হৃদয়ে শ্রীভগবানের যে মধুর ছবি উদয় হইবে, তাহা বৃথা তর্ক দ্বারা মলিন কি নষ্ট করিতে পাঠকের প্রবৃত্তি হইবে না।"

দ্বাদশ অধ্যায়

(উপসংহার)

বর্ত্তমান অধ্যায়ে মহাত্মা শিশিরকুমারের সম্বন্ধে কয়েকটী কথা উল্লেখ করিয়া আমরা গ্রন্থ শেষ করিব। বৈদ্যনাথ দেওঘরে শিশির-কুমারের একখানি বাড়ী আছে। কলিকাতার জনকোলাহল হইতে দূরে থাকিতে পারিলে ভজন সাধনের সুবিধা হইবে বলিয়া এবং স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় তিনি শ্রীযুক্ত মতিবাবুর উপর অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদনের ভার অর্পণ করিবার পর, অধিকাংশ সময়ই তাঁহার এই দেওঘরের বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। এই বাড়ীতে বসিয়াই তিনি শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত, শ্রীকালাচাঁদ গীতা ও লর্ড গৌরাঙ্গ প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থাবলী প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পাঠক! আমরা বহুবার বলিয়াছি যে শিশিরকুমারের প্রত্যেক কার্য্যেই বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে সাধারণতঃ যে ইষ্টক দ্বারা ইমারত নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, শিশিরকুমার তাঁহার দেওঘরের বাটী নির্ম্মাণের সময় সে ইষ্টক ব্যবহার না করিয়া, তাঁহার এক ইঞ্জিনিয়ার আত্মীয়ের পরামর্শ অনুসারে একপ্রকার ইষ্টক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কঙ্কর ও চূর্ণ একত্র মিশ্রিত কেরোসিন তৈলের বাক্সের ন্যায় প্রকাণ্ড ফর্ম্মায় ইষ্টক তৈয়ারী করিতেন। এই প্রকাণ্ড ইটগুলি শুকাইলে দুই তিনজন লোকের কমে তাহা নাড়িতে পারা হইত না। প্রস্তরের ন্যায় কঠিন নবাবিষ্কৃত ইষ্টক দ্বারা শিশিরকুমার তাঁহার দেওঘরের বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় বিভিন্ন স্থান হইতে দেওঘরের বহু সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তির সমাগম হইয়া থাকে। স্বদেশ প্রেম ও স্বধর্ম্মানুরাগ শিশিরকুমারকে তাঁহার দেশবাসী নিকট আত্মীয় মনে করিতেন যাঁহারা বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দেওঘরে গমন করিতেন, তাঁহারা

শিশিরকুমারের সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা শিশিরকুমারের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি স্বীয় সরল ও মধুর ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ করিতেন। সমাগত সভ্যগণ শিশিরকুমারের বেশভূষা লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেন। অন্তর্দৃষ্টি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবের বাহ্য বিষয়ের প্রতি কোন লক্ষ্যই থাকে না। পোষাক পরিচ্ছেদের পারিপাট্যের দিকে শিশিরকুমারের কোন দিনই দৃষ্টি ছিল না। যৌবনেও তাঁহাকে বিলাসিতা স্পর্শ করিতে পারে নাই। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার আত্মকাহিনীতে শিশিরকুমারের রূপ ও বেশভূষা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন ;—"একখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠ বিশেষ বলিলেও চলে। বয়স অনুমান ত্রিশ বৎসর। সমস্ত শরীরে কয়েকখানি হাড়। নাকের, মুখের এমনকি সর্ব্বশরীরের অস্থি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। চক্ষু কোটরস্থ কিন্তু তীব্র, উজ্জ্বল, হাস্যময়। মুখে গাল ভরা পান ও গাল ভরা কেমন একপ্রকার বিদ্রূপাত্মক হাস্য। পানের অলক্তরাগে। অধর প্রান্তদ্বয় প্লাবিত। পরিধান সামান্য সাদাধুতি, সাদা পিরাণ, তাহারও নাস্তি বোতাম। তাহার উপর একখানি চাদরের দড়ি—বুকের উপর অঙ্কশাস্ত্রের পূরণের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া প্রান্তদ্বয় স্কন্দের উপর দিয়া পৃষ্ঠে পড়িয়াছে। এই ত রূপ! কিন্তু মূর্ত্তিখানি দেখিলে বোধ হয় কি যেন একটী অদ্বিতীয় লোক।" দেওঘরে বেড়াইবার সময় তিনি একখানি সামান্য ধুতি ও একটী জামা পরিধান করিয়া এবং মাথায় প্রকাণ্ড এক সোলার টুপি পরিয়া বাহির হইতেন। জামাটা প্রায় তিনি উল্টা করিয়া গায়ে দিতেন। জামা এইরূপ উল্টা করিয়া গায়ে দিবার কারণ যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, তাহা হইলে তিনি বলিতেন, 'বাপুহে, আমি তোমাদের মত সৌখীন নহি যে, নিজে কষ্ট পাইয়া লোককে বাহার দেখাইব। তোমরা জামায় যে দিকটার সেলাই ও -মাড়া থাকে, সেই খোঁচার মত দিকটা গায়ে দিয়া কষ্ট পাও আর আমি, যে দিকটা বেশ সমান, গায়ে দিলে আরাম বোধ হয়, সেই দিকটাই গায়ে দি।" অনেক সময়

তিনি স্ত্রীলোকদিগের জামাও গায় দিয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। শিশিরকুমার সুপুরুষ ছিলেন না; তিনি তাঁহার রুগ্ন ও অস্থিচর্ম্মসার দেহে এইরূপ অদ্ভুত পরিচ্ছেদ পরিধান করিয়া যখন বাহির হইতেন, তখন সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতেন। দেওঘরের ডেপুটী ম্যাজিস্টেট মিষ্টার স্মিথ একদিন শিশিরকুমারকে তাঁহার অদ্ভুত পরিচ্ছদ দেখিয়া, তাঁহার সঙ্গের লোককে জিজ্ঞাসা করেন,—"লোকটা কে, পাগল নাকি?" শেষে সাহেব যখন শুনিলেন যে লোকটী পাগল নহে, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ, তখন তিনি স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। আর একবার ভাগলপুর হইতে সিবিল সার্জ্জন সাহেব কার্য্যোপলক্ষে দেওঘরে আসিয়াছিলেন। তিনি শিশিরকুমারের নাম পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে কখনও দেখেন নাই। সাহেব দেওঘরে আসিয়া শুনিলেন যে, শিশিরকুমার দেওঘরে রহিয়াছেন। তিনি শিশিরকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বাহিরের ঘরে শিশিরকুমার একখানি ছোট কাপড় পরিয়া বসিয়া আছেন; সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শিশিরবাবু কি বাড়ীতে আছেন?"

শিশির—'কি প্রয়োজন?'

সাহেব—'তিনি বাড়ীতে আছেন কি? আমি ভাগলপুরের সিবিল সার্জ্জন, তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিব।"

শিশির—"তিনি বাড়ীতে আছেন, কি প্রয়োজন বলুন।"

সাহেব—"তাঁহাকে একবার সংবাদ দিন; আমি দেখা করিয়া যাইব।"

শিশির—"আমার সঙ্গে দেখা করলেই হবে।"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন,—"কি রকম?"

শিশির—"আপনি ত শিশিরকুমার ঘোষের সহিতই কথা বলিতেছেন।"

সাহেব অবাক হইয়া গেলেন। তিনি যে শিশিরকুমারের সহিত কথা কহিতেছেন, তাহা তিনি প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। শেষে শিশিরকুমারের সরল ও মধুর ব্যবহারে সিবিল সার্জ্জন সাহেব মুগ্ধ হইয়াছিলেন। জগতে এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা প্রকৃতির অপেক্ষা আকৃতিরই অধিক সম্মান করিয়া থাকেন; কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিরা প্রকৃতির আদর করেন। শিশিরকুমার বিলাসী না হইলে এবং পরিচ্ছেদের পারিপাট্যের দিকে তাঁহার আদৌ দৃষ্টি না থাকিলেও তিনি স্বীয় প্রকৃতি গুণে তাঁহার দেশবাসীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি করিতে না পারিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হওয়া অসম্ভব একথা বর্তমানে আমাদের দেশের জনসাধারণে বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু শিশিরকুমার বহু পূর্ব্বেই তাহা বুঝিয়াছিলেন এবং স্বয়ং শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। আমরা এ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুই একটী কথা উল্লেখ করিব। দৈবদুর্বিপাকে, পরিদর্শনাভাব ও কর্মচারিগণের অবিশ্বস্ততাই শিশিরকুমারের অকৃতকার্য্যতার কারণ হইয়াছিল।

১৯৯৩ খৃঃ অঃ শিশিরকুমার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য একবার রাণীগঞ্জে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে অবস্থান কালে তিনি স্থানীয় চাউলের অন্ন ভোজন করিয়া বলিয়াছিলেন, "এ চাউল ত বেশ; এ চাউল কলিকাতায় চালান যায় না কেন?" তাহার পর তিনি যখন শুনিলেন যে, চাউল ভাল হইলেও তাহাতে কঙ্কর মিশ্রিত থাকে বলিয়া কলিকাতায় লোকে তাহা আদৌ পছন্দ করেন না, তখন তিনি বলিয়াছিলেন,—"যে চাউল ভক্ষণ করিয়া স্থানীয় লোক বাঁচিয়া রহিয়াছে, সে চাউল খাইলে কি কলিকাতার লোক মরিয়া যাইবে কলিকাতার বাবুরা অধিক মূল্যের চাউল খাইয়াও নানাবিধ রোগ ভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু এখানকার লোকেরা অল্প মূল্যের চাউল খাইয়াও বেশ সুস্থ শরীরে থাকে। আমার মনে হয়, এখান হইতে

যদি কলিকাতায় চাউল রপ্তানি করা যায়, তাহা হইলে কলিকাতার অনেক গরীব দুঃখী বাঁচিয়া যায়।” সঙ্গে সঙ্গে শিশিরকুমারের হৃদয়ে রাণীগঞ্জ হইতে কলিকাতায় চাউল আমদানি করিয়া ব্যবসা করিবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠিল। তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া চাউলের ব্যবসায়ে বন্দোবস্ত করিলেন। কিছুদিন ব্যবসা চলিবার পর উপযুক্ত পরিদর্শনাভাবে ও কর্মচারিগণের অন্যায় ব্যবহারে, শিশিরকুমারকে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল; সুতরাং তিনি বাধ্য হইয়া দোকান বন্ধ করিয়াছিলেন। চাউলের ব্যবসায় অকৃতকার্য্য হইবার পর, শিশিরকুমার তাঁহার জন্মভূমি অমৃতবাজার হইতে কলিকাতায় পাট আমদানি করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহাকে পাটের ব্যবসা বন্ধ করিতে হইয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধগুলি যাহাতে বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত হয়, তাহার জন্য শিশিরকুমার ১৮৯৯ খৃঃ অঃ ভারত ভৈষজ্যনিলয়’ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯০০ খৃঃ অঃ শিশিরকুমার স্বীয় পল্লী অমৃতবাজারে একটী চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যৌবনে তিনি কোটচাঁদপুর, চৌগাছা প্রভৃতি স্থানে চিনির কারখানা দেখিয়াছিলেন এবং শেষে আমাদের দেশে ক্রমে ক্রমে যাবা ও মরিশাসের চিনি আমদানী হওয়ায় কিরূপে দেশী চিনির কারখানাগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহাও লক্ষ করিয়াছিলেন। জার্ম্মানীতে যখন প্রচুর পরিমাণে বিঠের চিনি উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইল, তখন স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট ব্যবসায়িগণকে উৎসাহ প্রদান জন্য অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন। আমাদের দেশেও যাহাতে গভর্ণমেণ্ট এইরূপ বাণিজ্যের উন্নতির জন্য সাহায্যদানের ব্যবস্থা করেন, শিশিরকুমার স্বীয় পত্রিকায় তাহার আন্দোলন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে আন্দোলনে কোন ফল হয় নাই। বিদেশীয় চিনি ক্রমশঃই বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে দেখিয়া শিশিরকুমার একদিন কাশীপুরের চিনির কারখানার তদানীন্তন কার্য্যাধ্যক্ষ মিষ্টার অস্‌গুডের

(Mr. Osgood) সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন,—"আপনারা কেবল মাত্র চিনি পরিষ্কার না করিয়া, চিনি তৈয়ারী করিবারও ব্যবস্থা করিতে পারেন, এবং তাহাতে আপনাদের যথেষ্ট লাভেরও সম্ভাবনা আছে। শিশিরকুমারের বিশেষ অনুরোধে, মিষ্টার অস্‌গুড, যশোহরের বিভিন্ন স্থানে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিনির কারখানা ছিল, তাহা পরিদর্শন করিয়াছিলেন। শেষে তিনি শিশিরকুমারকে বলিলেন,—"নূতন কারখানা খুলিতে হইলে অনেক অর্থ ও অনেক সময়ের আবশ্যক; সুতরাং আমাদের পক্ষে এখন চিনির নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে না। তবে আপনার নিকট আমি এই অঙ্গীকার করিতেছি করিতেছি যে, আপনি যে পরিমাণ চিনি আমাকে দিলেন, আমি তাহা ক্রয় করিব।" মিষ্টার অসগুডের কথা শুনিয়া শিশিরকুমার ১৯০০ খৃঃ অঃ কপোতাক্ষী নদীর তীরে একটি প্রকাণ্ড চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় অন্যান্য স্থানেও চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। তিনি তাঁহার নিজ কারখানা হইতে ও অন্যান্য স্থানের কারখানা হইতে চিনি সংগ্রহ করিয়া মিষ্টার অস্‌গুডের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। চিনির কারখানা বেশ সুন্দররূপে চলিতে ছিল; কিন্তু সহসা একদিন রাত্রিতে শিশিরকুমারের কারখানাটি আগুন লাগিয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শিশিরকুমার চিনির ব্যবসা বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে শিশিরকুমার তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি ঘোষকে বোম্বাই ও আমেদাবাদের মিল সমূহের সত্ত্বাধিকারিগণের নিকট প্রেরণ করিয়া যাহাতে সুবিধাদরে কলিকাতায় প্রচুর পরিমাণে স্বদেশীয় বস্ত্রের আমদানী হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি প্রায় দুই মাস বোম্বাই, আমেদাবাদ ও রাজপুতানায় অবস্থান করিয়া তথাকার মিলের কার্য্যাধ্যক্ষগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পিতার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন। শিশিরকুমার কলিকাতায় কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে

স্বদেশী বাজার নামে একটি স্বদেশী বস্ত্রের দোকান প্রতিষ্ঠা করিয়া যাহাতে সাধারণে সুলভ মূল্যে স্বদেশী বস্ত্র পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এই দোকানটীও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে নাই। শিশিরকুমার স্বয়ং কোনও বিষয়ে তত্ত্বাবধারণ করিতে পারিতেন না। যাঁহাদের উপর দোকানের ভার ন্যস্ত ছিল, তাঁহারও নিময়মত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে না পারায় প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসর পরেই দোকানটী বন্ধ হইয়া যায়। ক্ষুদ্র কার্য্যেই হউক বা বৃহৎ কার্য্যেই হউক যথাশক্তি পরের উপকার করা শিশিকুমারের জীবনের প্রধান লক্ষ ছিল। তিনি তাঁহার পল্লীবাসিগণকে নানা উপায়ে সহায়তা করিবার চেষ্টা করিতেন। পল্লীগ্রামে কুসীদজীবিগণের হস্তে দরিদ্র অধমর্ণগণ কিরূপে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকে তাহা পঠকগণ অবগত আছেন। শিশিরকুমার এই দরিদ্র অধমর্ণগণের রক্ষার জন্য যাহারা নিতান্ত দরিদ্র তাহাদিগকে বিনাসুদে এবং অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে আবশ্যক মত অল্প সুদে টাকা ধার দিতেন তাঁহার পরিচিত ও অনুগত ব্যক্তি ইহা দ্বারা উপকৃত হইয়াছিলেন।

আমরা এক্ষণে শিশিরকুমারের সহধর্ম্মিণী ও পুত্রকন্যাগণের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। শিশিরকুমার প্রথমবারে যশোহর জেলার অন্তর্গত খাজুরা গ্রামে স্বর্গীয় গুরুচরণ মিত্র মহাশয়ের কন্যা ভুবনমোহিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা প্রতিষ্ঠার কয়েকদিবস পর তাঁহার এই সহধর্ম্মিণী ইহলোক পরিত্যাগ করেন এবং তাহার কয়েক মাস পরই তাঁহার একমাত্র শিশুপুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়, পাঠকবর্গ একথা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। শিশিরকুমার সহধর্ম্মিণী ভুবনমোহিনীর সম্বন্ধে দুইটী সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। আমরা এখানে সেই সঙ্গীত দুইটি উদ্ধৃত করিলাম ; পাঠক তাহা হইতে ভুবনমোহিনীর সম্যক পরিচয় পাইবেন।

১

"নাম ভুবনমোহিনী, প্রেমময় তনুখানি
সাত বৎসর ছিনু তার সাথ !
ভাল মন্দ ত জানিনে, ফাল্গুনের পাঁচদিনে
অদর্শন হলো অকস্মাৎ ॥
যাবার বেলা ডেকেছিল, ধীরে ধীরে কি বলিল,
ভাল করে স্মরণ না হয় ।
আমার কোলে মাথা দিল, মনে হয় এই বলিল,
মনে রেখো, মাগিছি বিদায় ॥
চল্লিশ বৎসরের কথা, তবু সে সমান ব্যাথা,
আমি তারে পাসরিতে নারি ॥
শুধু প্রেম কারে বলে, সেই মোরে শিখাইলে,
প্রেমের গুরু সেই ত হামারি ॥"

২

"নূতন সঙ্গীত করি কারে শুনাইব ।
প্রেম বিকি কিনি কার সঙ্গেতে করিব ॥
কে আর আমার দোষ গুণ করি কবে ।
বহুদূর হতে মোর কে কথা শুনিবে ॥
কাহার নয়ন শুধু মোর মুখে রবে ।
বহুদিন পরে দেখি মুরছিত হবে ॥
কত ধার ধারি তার বলিতে না জানি ।
চিরদিন সুখে রহুক ভুবনমোহিনী ॥

সাত বৎসর অবিবাহিত জীবন অতিবাহিত করিবার পর, শিশির-কুমার তাঁহার সহোদর সহোদরাগণের ও আত্মীয় স্বজনগণের বিশেষ অনুরোধে নদীয়া জেলায় অন্তঃপাতী হাঁসখালি গ্রামের স্বর্গীয় রামধন বিশ্বাস মহাশয়ের একমাত্র কন্যা কুমুদিনীর পাণিগ্রহণ করেন। সরলতা,

পয়সকান্তি ঘোষ।

চরিত্রের মধুরতা ও সেবাগুণে কুমুদিনী আদর্শ পত্নী ও গৃহিণী ছিলেন। কোনও বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করা তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। এই বিবাহে শিশিরকুমারের ছয়টী পুত্র ও দুইটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। শিশিরকুমারের জীবদ্দশাতেই পয়সকান্তি পঁচিশ বৎসর বয়সে, অমিয়কান্তি শিশু অবস্থায় ও অন্য একটী সন্তান জন্মের একমাস মধ্যেই এজগত হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। আমরা এখানে পয়সকান্তির সম্বন্ধে দুই একটী কথা উল্লেখ করিব। পিতার ন্যায় তাঁহার হৃদয়খানি প্রশস্ত উদার ও ভালোবাসায় পূর্ণ ছিল। পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জনে পয়সকান্তি কখনও পরাঙ্মুখ ছিলেন না। সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর সেবা শুশ্রূষা করা বিপজ্জনক হইলেও পয়সকান্তি তাঁহার পিতৃদেবের ন্যায় বিসূচিকা কিম্বা বসন্তরোগ গ্রস্ত ব্যক্তিগণের পরিচর্য্যায় আনন্দ অনুভব করিতেন। দুরারোগ্য রোগাক্রান্ত বিপন্ন ব্যক্তিগণের শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিলে তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। বাল্যে তাঁহার যে পরিচারিকা তাঁহাকে লালন পালন করিয়াছিল, মৃত্যুকালে সে তাহার সঞ্চিত অর্থ পয়সকান্তির হস্তে প্রদান করে এবং পয়সকান্তি সেই অর্থ কুষ্ঠ রোগীর চিকিৎসার জন্য সুপ্রসিদ্ধ কুষ্ঠ চিকিৎসক পণ্ডিত কৃপারামের হস্তে অর্পণ করেন। বিদ্যালয়ে তাঁহার আশানুরূপ বিদ্যাশিক্ষা হয় নাই বটে, কিন্তু গৃহে তিনি পিতৃদেবের তত্ত্বাবধানে ইংরাজী ও বাঙ্গালায় উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। পিতার ন্যায় পয়সকান্তির হৃদয়ও ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণ ছিল। গৌরাঙ্গ সমাজের সভ্যরূপে পয়সকান্তি যখন সভাসমিতিতে মধুর কণ্ঠে কীর্ত্তন ও সুললিত ভাষায় বক্তৃতা করিতেন, তখন উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহার মধুর ভাবে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। শিশিরকুমার তাঁহার অমিয়নিমাই চরিতের ষষ্ঠখণ্ড পুত্র পয়সকান্তিকে উৎসর্গ করিয়া লিখিয়াছেন ; "শ্রীমান পয়সকান্তি।

"এই গ্রন্থের ষষ্ঠখণ্ড আমি তোমার হস্তে দিলাম। আমার বয়ঃক্রম সত্তর, তোমার পঁচিশ এইরূপ সময়ে তুমি আমাকে হঠাৎ

একদিনের পীড়ায় ছাড়িয়া গেলে। আমি তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারিব ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই, কিন্তু তবু সহ্য করিতেছি। ইহা কিরূপে করিলাম?"

"তুমি আমার নিত্য সঙ্গী ছিলে। অতি জীর্ণ রুগ্ন, আমার দ্বারা ভজন সাধন সম্ভবনা ছিল না। কিন্তু তুমি আমার সে অভাব পূরণ করিতে। তুমি বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য ছিলে, তোমার কণ্ঠে মধু বর্ষণ হইত। তুমি আমাদের কীর্ত্তন, কি শ্রীতানসেনের ভজন, যখন গাহিতে, তখন পশুপক্ষী পর্যন্ত মুগ্ধ হইত। তুমি আমার সঙ্গে থাকিয়া আমাকে অনুক্ষণ ভগবৎ গুণসুধা পিয়াইতে। সুতরাং তুমি যখন আমাকে ছাড়িয়া গেলে, তখন বিরহের সঙ্গে সঙ্গে আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। আমার ভজন এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল। তবু, তুমি যখন আমায় ত্যাগ করিয়া গেলে, তখন আমি শ্রীভগবানকে মনের সহিত ধন্যবাদ দিয়াছি। ইহা যদিও শুনিলে বিশ্বাস হয় না, কিন্তু তিনি (শ্রীভগবান) জানেন ইহা সত্য কি না। তানসেনের ন্যায় সঙ্গীতজ্ঞ জগতে কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি যে পদ প্রস্তুত করেন, তাহা ভাবে ও তাললয়ে অদ্বিতীয়। তাহা লোপ হইয়া যাইতেছিল। যাহা এখন কিছু আছে তাহা রঙ্গপুরের শ্রীমান্ রামলাল মৈত্রের কণ্ঠে ছিল, তুমি তাহার নিকট এই তানসেনের পদগুলি অভ্যাস করিয়াছিলে। তুমি সর্ব্বদা বলিতে কবে আমি তানসেনের নিকট যাইব, যাইয়া তাঁহার সমুদায় পদ শিখিব। এখন তোমার সেই সুযোগ হইয়াছে।

"তুমি প্রভুর কৃপায় ভক্তিধন পাইয়াছিলে, এখন মহানন্দে শ্রীভগবানের ভজন করিতেছ; সুতরাং তোমার এ ভাবের নিমিত্ত আমি স্বার্থপর হইয়া কেন দুঃখ করিব। বিশেষতঃ সংসারে তোমার কোন বন্ধন ছিল না, তুমি চিরদিন মুক্ত ছিলে।"

"তুমি আমাকে ছাড়িয়া গেলে, আমার তোমার একখানি ছবি আনিবার ইচ্ছা ছিল। মার্কিন দেশের এক বিখ্যাত মিডিয়ম আমার

সে মনস্কাম পূর্ণ করিয়াছেন চিত্রখানি ২০ মিনিটে দিবাভাগে লোকের সাক্ষাতে অদৃশ্য হস্তে চিত্রিত হয়। সে এত চমৎকার যে এ জড় জগতে বোধ হয় এরূপ সূক্ষ্ম কারিকরী হইতে পারে না, অন্ততঃ কোন কারিকর এক মাসের কমে ওরূপ সম্পূর্ণ ছবি আঁকিতে পারেন না। সেই ছবিখানি সর্ব্বদা আমার সম্মুখে থাকে।

"আমি সেই ছবি দেখি, আর আমার মনে উদয় হয় যে, আমাদের জীবনদাতা আমাদিগকে জীবন দিয়া একেবারে ভুলিয়া যান নাই, আমাদের কথা তাঁহার মনে থাকে। কারণ তিনি ভালবাসার আকর, তিনি জীবন দিয়া এ জগতে কিছুকাল রাখিয়া, পরে মৃত্যু অন্তে আমাদিগকে আর এক জগতে লইয়া যান।"

"সেখানে শোক তাপ মৃত্যু রোগ কি অহঙ্কার নাই, সেখানে আমরা আমাদের প্রীতির বস্তু লইয়া চিরদিন বাস করিব। যখন ইহা মনে উদয় হয়, তখন সেই যে ভগবান, আমাদের জীবনের জীবন, তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভজনা করিতে পারি না, ইহাতে মাথা কুটিয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। তুমি সুস্বরে গীত গাহিয়া তাঁহাকে অর্চ্চনা কর আর আমি যাহাতে শীঘ্র মোচন হই, সে নিমিত্ত তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিও।"

শিশিরকুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত পীযুষকান্তি বর্তমানে শ্রীযুক্ত মতিবাবুর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। পিতার বহু সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছেন। কলেজে অধ্যয়নের সময় হইতেই ইনি অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। হিন্দু-স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনও অমৃতবাজার পত্রিকায় তাঁহার বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। কি উপায়ে পল্লীগ্রামের উন্নতি করা যাইতে পারে, শ্রীযুক্ত পীযুষকান্তি সে সম্বন্ধে ধারাবাহিক রূপে অমৃতবাজার পত্রিকায় কতকগুলি অতি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। পিতার ন্যায় তাঁহার হৃদয়ও পরের দুরবস্থা দর্শনে বিচলিত হইয়া উঠে। বর্ত্তমানে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোনও এক স্থানে, একটি কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত পীযুষকান্তি এ কার্য্যে

অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন ; আশা করি শীঘ্রই কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাঁহার কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত নীহারকান্তিও অমৃতবাজার পত্রিকা পরিচালনে নিযুক্ত। সর্ব্ব কনিষ্ঠ শ্রীমান তুষারকান্তি এখনও ছাত্রাবস্থা অতিক্রম করেন নাই। তিনিও তাঁহার স্বর্গগত মধ্যমাগ্রজ পয়সকান্তির ন্যায় সঙ্গীতজ্ঞ। আমরা তাঁহার সমধুর কীর্ত্তন শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। কোনও ওস্তাদ সঙ্গীত আলাপ করিলে, তুষারকান্তি সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া স্বরলিপি প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। কন্যাদ্বয়ের মধ্যে প্রথমা শ্রীমতী পঙ্কজনয়নার নিমতলা ঘাট স্ট্রিট নিবাসী জমিদার ও সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী স্বর্গীয় গিরীন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার দত্তের সহিত ও কনিষ্ঠ শ্রীমতী সুহাস নয়নার রামবাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত নাটুগোপাল সরকারের সহিত বিবাহ হয়। শিশির-কুমারের এই কন্যা দুইটি বুদ্ধিমতী, পরন্তু ভক্তিমতী। কনিষ্ঠা শ্রীমতী সুহাস নয়না বিদুষী বলিয়া জনসাধারণের নিকটা পরিচিতা নহেন, কিন্তু যাঁহারা তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ও ভগবদ্ভক্তির পরিচয় পাইবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা মুগ্ধও বিস্মিত হইয়াছেন। মাতার গুণেই পুত্র কন্যাগণের চরিত্র গঠিত হইয়া থাক। শিশির কুমারের সহধর্ম্মিণী কুমুদিনী বাস্তবিকই আদর্শ রমণী ছিলেন। শ্রীমতী পঙ্কজ নয়না ও শ্রীমতী সুহাস নয়না তাঁহাদের জননীর সদ্‌গুণাবলীর অধিকারিণী হইয়াছেন। শিশিরকুমারকে তাঁহার সহধর্ম্মিণী কুমুদিনী ভজন সাধনে সহায়তা করিতেন। বৈদ্যনাথ দেওঘর হইতে শিশিরকুমার তাঁহার স্ত্রীকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন ; আমরা সেই পত্রখানির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতে পাঠক স্বর্গীয়া কুমুদিনীর পরিচয় পাইবেন।

পত্র

***এখানে স্বপনের ন্যায় থাকি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর যে আবার সকলে একত্র হই। সংকীর্ত্তন করিতেছ শুনিলাম। বড় সুখের বিষয়। তুমি যদি ভজনা কর তবে আমার না করিলে চলে।

এখানে জীবের সঙ্গ ভাল না। আমি জীবের সঙ্গ বড় একটা করিও না; আমার সঙ্গ গাছ, পাখী ইত্যাদি। ***ভগবান তোমাকে ভক্তি দিউন যে আমি তোমার প্রসাদে তরিয়া যাই

শিশিরকুমারের শরীর যৌবনেই ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। অজীর্ণ রোগে এবং অনিদ্রায় দীর্ঘকাল অবধি তিনি কষ্ট পাইতেছিলেন। অপর কেহ হইলে সেরূপ শরীর লইয়া কোন কার্য্যই করিতে পারিত না। কিন্তু ভগবানের প্রিয় সেবক শিশিরকুমার তাঁহারই আদেশে জীর্ণ রোগ সম্বল দেহ লইয়া অমানুষিক পরিশ্রম করিতেন। বিশ্রাম তাঁহার নিকট উপেক্ষণীয় এবং শ্রমই আদরণীয় ছিল। মনের বলই এতদিন তাঁহাকে সমর্থ ও কার্য্যপটু রাখিয়াছিল। কিন্তু দেহ ও আর মন নয় যে অপার্থিব শক্তিতে বলীয়ান থাকিবে। শরীর ক্রমেই বলহীন হইয়া আসিল এবং মৃত্যুর করাল ছায়া ধীরে ধীরে তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের উপর পতিত হইল। অবশেষে ১৩১৭ বঙ্গাব্দে ছাব্বিশে পৌষের বিষাদময় দিন উপস্থিত হইল। এই দিন বাঙ্গালির জাতীয় ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কারণ ঐদিন বেলা ১টা ৩৫ মিনিটের সময় কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীর শিশিরকুমার মরজগত পরিত্যাগ করিয়া নিত্যাধামে চলিয়া যান। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে, তিনি শিয়ালদহে ডাক্তার প্রিয়নাথ নন্দীর বৈদ্যুতিক চিকিৎসাগারে চিকিৎসিত হইতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে ডাক্তার নন্দী শিশিরকুমারকে তাঁহার বাগবাজারের বাটীতে আসিয়া দেখিয়া যাইতেন। শিশিরকুমারের নিকট তাঁহার শ্যালক হরি মোহন বাবু প্রায় সপ্তবিংশতি বৎসর তাহাকে পরিচর্য্যা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। মৃত্যুর দিন ভোরে শিশিরকুমার হরিমোহন বাবুকে বলিলেন,—"ডাক্তার নন্দীকে সংবাদ দাও, তিনি যেন আজ আসিয়া আমাকে দেখিয়া যান। আমি আজ বড় দুর্ব্বল বোধ করিতেছি; তুমি সাবধানে থাকিও।" হরিমোহন বাবু হাসিয়া বলিলেন,—"আপনি রোজই দুর্ব্বল বলেন এবং আমি রোজই সাবধানে থাকি; আজ

আবার নূতন কি সাবধান হব ?" হরিমোহন যে সপ্তবিংশতি বৎসর শিশিরকুমারের সঙ্গে ছিলেন, সেই সময় তিনি দেখিতেন যে, শিশির-কুমার প্রত্যহই রাত্রি দুই ঘটিকার সময় শয্যা ত্যাগ করিতেন। পরে প্রাতঃ কৃত্যাদি সমাপনান্তর শিশিরকুমার সংকীর্ত্তন করিতেন এবং শেষে ছাদের উপর দ্রুতবেগে পদচারণা করিতেন, এমনকি সময়ে সময়ে ছুটাছুটীও করিতেন। মৃত্যুর দিনও তিনি যথাসময়ে সংকীর্ত্তন ও ছাদের উপর ছুটাছুটী করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল—

"ধর নাও সে কিশোরীর প্রেম নিতাই ডাকে আয়।
নিতাই ডাকে আয় আয় গৌর ডাকে আয়।
এ প্রেম কলসে কলসে বিলাস তবু না ফুরায় ॥"

মৃত্যুর দিন শিশিরকুমার যেরূপ মত্ততার সহিত এই সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেরূপ মত্ততা হরিমোহন বাবু খুব কমই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। যথা সময়ে শিশিরকুমার অন্যান্য দিনের ন্যায় রুদ্ধ গৃহে শীতল ও গরম জল মিশ্রিত করিয়া স্নান করিলেন। তাহার পর তিনি আহার করিতে বসিলেন। আহারের সময় তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহার নিকট বসিয়া গল্প করিতেন এবং তিনি অতি ধীরে ধীরে আহার করিতেন। মৃত্যুর দিন তিনি আহারান্তে শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিতের ষষ্ঠ খণ্ডের সর্ব্বশেষ ফর্ম্মার প্রুফ্ সংশোধন করিয়া বলিলেন,—"আজ আমার কার্য্য শেষ হইল।" শিশির যে সেই দিনই তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও স্বদেশ বাসিগণের হৃদয় অন্ধকার করিয়া মহাপ্রস্থান করিবেন তাহা তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে কেহই বুঝিতে পারেন নাই। চার পাঁচদিন পূর্ব্বে তাঁহার একটু সর্দ্দি লাগিয়াছিল। এই সময় তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান তুষারকান্তি, অসুস্থ ছিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রত্যহই ডাক্তার আসিতেন। সর্দ্দির জন্য ডাক্তারবাবু শিশির কুমারকেও দেখিতেন। মৃত্যুর দিন ডাক্তার বাবুকে শিশিরকুমার বলিলেন,—"ডাক্তার, দেখ দেখি আমার হাত।" ডাক্তার বাবু হাতে

ধরিয়া বলিলেন,—"আপনি বেশ ভালই আছেন ; আজত আপনার সর্দ্দিও নাই।" শিশিরকুমার পুনরায় বলিলেন,—"আজ আমায় খুব ভালো দেখ্‌লে ? আচ্ছা আর একবার ভাল করে দেখ। আর যাই বল ডাক্তার, ওবেলা যখন তুষারকে দেখ্‌তে আস্‌বে, তখন আমার সঙ্গে তোমার আর দেখা হবে না।" ডাক্তার বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আপনার কথার ত আর উত্তর দিতে পারি না। আপনার মৃত্যুর এখন ২।৫ বৎসর দেরী আছে।" হরিমোহন বাবু নিকটেই ছিলেন, তিনি বলিলেন,—"আপনি কেন এরূপ কথা বলে আমাদের প্রাণে কষ্ট দেন ?" শিশিরকুমার প্রত্যুত্তরে বলিল,—"দেখ ভাই, তুমি স্বার্থপরের ন্যায় কথা বলিতেছে। আমার যাইবার সময় হইয়াছে। আমি এখন আর প্রভুর কাজ করিতে পারিতেছি না। আমি আর কি জন্য পৃথিবীতে থাকিব ? মোটের উপর, হরিমোহন, তুমি সাবধানে থেকো।" হরি মোহন বাবু স্নানাহার করিবার জন্য চলিয়া গেলেন।

শিশিরকুমার মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে একখণ্ড কাগজে পেন্সিল দ্বারা তাঁহার পুত্রগণের উদ্দেশ্যে লিখিয়াছিলেন,—

(1) If your hearts want any demonstration after my death, seek Jotindra, Prodyut kumar and Rash behari Ghosh,

(2) Live brothers together including Natu. Cherish Horimohan.

(3) My songs are to be published by satis etc. of Bhangamora.

(4) Add two or there articles to the sketches vol II and publish it. I wish I could see it before I died.

(5) If possible make a Bunglow at Jhinkargacha aud increase landed properties in that quarter.

অর্থাৎ

(১) আমার মৃত্যুর পর কোন কোনরূপ অনুষ্ঠান করা যদি তোমাদের অভিপ্রেত হয়? তাহা হইতে যতীন্দ্র (টাকীয় সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী) প্রদ্যোৎ কুমার (মহারাজা সার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর বাহাদুর) ও রাসবিহারী ঘোষের (ডাক্তার স্যার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ) সহিত পরামর্শ করিবে।

(২) নাটুকে (কনিষ্ঠ জামাতা) লইয়া সকল সহোদর একত্রে থাকিবে। হরিমোহনকে প্রতি পালন করিও।

(৩) ভাঙ্গামোড়ার সতীশ প্রভৃতি কর্ত্তৃক আমার সঙ্গীতগুলি প্রকাশিত হইবে।

(৪) কয়েকটী প্রবন্ধ সংযোগ করিয়া "ইণ্ডিয়ান স্কেচের" দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিও। মৃত্যুর পূর্ব্বেই ইহা প্রকাশিত দেখিবার ইচ্ছা ছিল।

(৫) যদি সম্ভব হয়, ঝিকর গাছায় একখানি বাংলো নির্ম্মাণ ও সেই অঞ্চলে বিষয় সম্পত্তি বৃদ্ধি করিবে।

এইখানে আমরা একটী কথা উল্লেখ করিব। শিশির কুমারের বহু অপ্রকাশিত সঙ্গীত আমরা পাঠ করিয়াছি। সেগুলি বৈষ্ণব সাহিত্যে অমূল্য রত্নরূপে বিরাজ করিবে। এই সঙ্গীতগুলি প্রকাশ করিবার অধিকার, শিশিরকুমার তাঁহার জনৈক অনুরক্ত ভক্তকে প্রদান করিয়াছেন বলিয়াই আমরা তাহা প্রকাশে বিরত রহিলাম।

শিশির কুমারের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুহাসনয়না পিতার সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট অবস্থান করিতেন। শিশিরকুমার কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাড়ীর সকলের আহারাদি হইয়াছে কি?" কন্যা প্রত্যুত্তরে জানাইলেন,—"হ্যাঁ, সকলেরই আহার হইয়া গিয়াছে।" তিনি যখন শুনিলেন যে পরিবার-বর্গের আহারাদি হইয়া গিয়াছে, তখন তাঁহার বদন প্রফুল্ল হইল এবং অল্পক্ষণ পরেই উপবিষ্ট অবস্থায় তর্জ্জনী উত্তোলন করিয়া "নিতাই

গৌর" বলিয়া চক্ষু মুদিত করিলেন। শ্রীমতী সুহাস নয়না পিতার ভাব লক্ষ্য করিয়া ভীতা হইলেন। তাঁহার আহ্বানে বাটীর সকলে সমবেত হইলেন, দেখিলেন যে তাঁহাদের গুরুদেব পৃষ্ঠদেশে একটা বালিস অবলম্বন করিয়া মুদ্রিত নয়নে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। শিশিরকুমার অনেক সময় উপবিষ্ট অবস্থাতেই নিদ্রা যাইতেন। প্রথমে তাঁহার পুত্র কন্যা ও আত্মীয় স্বজনগণ মনে করিলেন যে, তিনি ঘুমাইতেছেন ; কিন্তু শেষে তাঁহারা প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয় স্বজনগণের করুণ বিলাপধ্বনি গৃহপূর্ণ হইল। মুহূর্ত্তগত হইতে না হইতে কাহার প্রতিধ্বনি কলিকাতায় সহস্র সহস্র গৃহে উত্থিত হইল অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, জননী জন্মভূমির একনিষ্ঠ সেবক, ধর্ম্মপ্রাণ শিশিরকুমার ঘোষ আর ইহজগতে নাই, যখন এই সংবাদ প্রচারিত হইল, তখন চতুর্দ্দিকেই হাহাকার ধ্বনি উঠিল। স্বদেশ প্রেমিকগণ রাজনীতি ক্ষেত্রে শিশিরকুমারের তাঁহাদের সেনাপতি বলিয়া মনে করিতেন, সুতরাং সেনাপতির মৃত্যুতে তাঁহারা নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। দেশের দীন দুঃখিগণ শিশির কুমারকে তাহাদের অবলম্বন বলিয়া মনে করিত সুতরাং শিশির কুমারের লোকান্তর গমনের সংবাদে তাহারা চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। . দেশের ধনী সম্প্রদায় শিশিরকুমারকে তাঁহাদের একজন প্রধান স্বার্থ সংরক্ষক বলিয়া মনে করিতেন, সুতরাং তাঁহারা শিশিরকুমারের বিয়োগ সংবাদে বিচলিত হইয়া পড়িলেন। বাণীর বরপুত্র ও সাহিত্য সেবিগণ শিশিশিরকুমারের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারা শিশিরকুমারের পরলোকগমন সংবাদ হৃদয়ে নিদারুণ বেদনা অনুভব করিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় শিশিরকুমারকে বৈষ্ণবধর্ম্মের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ স্বরূপ মনে করিতেন, সুতরাং শিশিরকুমারের স্বর্গারোহণে তাঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িলেন।

যাহা যায় তাহা ফিরিয়া পাওয়া যায় না। শিশিরকুমারের মৃত্যুতে

জন্মভূমি ভারতবর্ষ একটী অতুজ্জ্বল রত্ন হারাইয়াছেন। শিশিরকুমারের চরিত্রের নির্ভীকতা, তেজস্বিতা ও ন্যায়নিষ্ঠা তাঁহাকে তাঁহার দেশ-বাসীর নিকট বরেণ্য করিয়াছে। তাঁহার পত্রিকা ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকার অকুতোভয়ে রক্ষা করিয়াছে। শিশিরকুমার যেন ন্যায়ের গৌরব রক্ষা করিবার জন্যই লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি বাহ্যাড়ম্বরশূন্য নীরব কর্ম্মী ছিলেন। তাঁহাকে ভারতীয় সংবাদপত্র সমূহের সম্পাদকগণের আদর্শ বলিয়া বর্ণনা করিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। তিনি নিঃস্বার্থ স্বদেশ সেবক ছিলেন। তিনি কখনও কোন উপাধির প্রত্যাশা করিতেন না। তাঁহার ন্যায় স্বদেশ সেবক এদেশে অতি বিরল। লোকমান্য স্বর্গীয় বালগঙ্গাধর তিলক মহোদয় আপনাকে গৌরবান্বিত করিবার জন্য শিশিরকুমারের ষষ্ঠ বার্ষিক স্মৃতি-সভার সভাপতিরূপে ভক্তির উচ্ছ্বাসে বলিয়াছিলেন,—"I have learnt many lessons sitting at his feet. I revered him as my father, and I venture again to say that he in return loved me as his son," অর্থাৎ—আমি তাঁহার (শিশির-বাবুর) চরণ প্রান্তে বসিয়া অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়াছি; আমি তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতাম, তিনিও আমাকে পুত্রের ন্যায় ভাসবাসিতেন। ব্রাহ্মন ধর্ম্মের পরিপোষ্ঠা, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সমর্থক মহাত্মা তিলক, শিশিরকুমারের চরণ প্রান্তে বসিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছি, একথা বলিয়া একদিকের নিজের উদারতা, অপর দিকে শিশিরকুমারের মহাত্ম্য উভয়েরই পরিচয় দিয়াছেন*।

ইংরাজ সম্প্রদায় অমৃতবাজার পত্রিকায় তিক্তরসের আস্বাদ অনুভব করিতেন। কিন্তু যাহারা পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমারকে ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। কলিকাতায় লাটভবনে একবার এক সান্ধ্য সম্মিলনে জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারীর সহিত দেশপূজ্য স্বর্গগত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নানা বিষয়ের কথাবার্তা
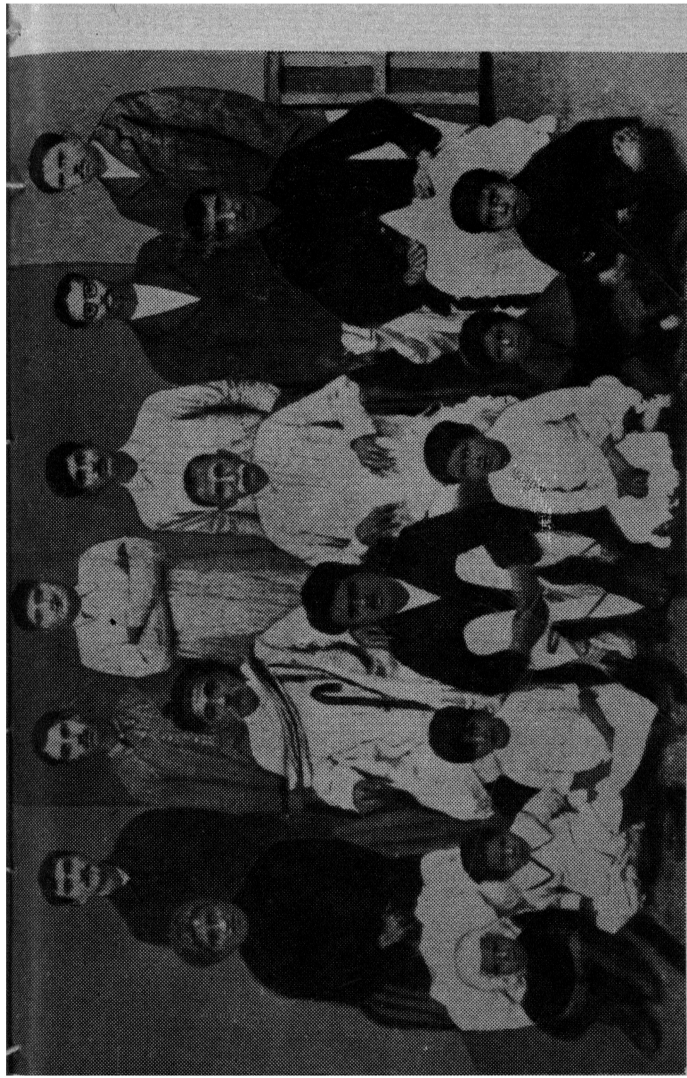
বাল্ গঙ্গাধর তিলক

পত্রিকা কার্য্যালয়ে, (১৯১৮)

দাঁড়িয়ে বাদিক থেকে ঃ—নীহারকান্তি ঘোষ, পরমানন্দ দত্ত, বিজনকান্তি ঘোষ, তুষারকান্তি ঘোষ, সত্যগোপাল দত্ত. সুনীলকান্তি ঘোষ।

চেয়ারে " গোলাপলাল ঘোষ, বাল্গঙ্গাধর তিলক, মতিলাল ঘোষ, মৃণালকান্তি ঘোষ।

হইতেছিল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন হাইকোর্টের বিচারপতির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকার কথা উঠিলে, ইংরাজ কর্ম্মচারীটি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, অমৃতবাজার পত্রিকার লেখা ভাল, জ্ঞান ও দূরাদর্শিতা যথেষ্ট, তবে মধ্যে মধ্যে উহাতে বড় তিক্ত রসের আস্বাদ পাওয়া যায়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন,—"আপনি যদি পত্রিকার সম্পাদক শিশির-কুমার প্রণীত শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত নামক গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, ঐ মধুর গ্রন্থ যাঁহার হৃদয়ে গ্রথিত, তাঁহার সম্পাদিত সংবাদপত্রে তিক্তরস প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব।" অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার আমাদেরই একজন, সুতরাং আমরা ভারতবাসী, তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও স্বদেশ প্রেমের প্রশংসা করিব, ইহা আশ্চর্য্য নহে। তিনি দেশ হিত ব্রতে স্বীয় স্বার্থ বিসর্জ্জনে কুণ্ঠিত হইতেন না, তিনি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণের ভ্রূকুটীতে স্বীয় কর্ত্তব্য সাধনে বিচলিত হইতেন না, সুতরাং আমরা, তাঁহার

---

*এলাহাবাদের "ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন" নামক পত্রিকা যথার্থই বলিয়াছেন,—"Free from all desire of securing an importance for his own personal self, and devoid of all ideas of shamming and tall talk, we belive Babu Shishir kumar Ghosh of the Patrika should always be held up as a model for all Indian Editors to fallow.

† মাদ্রাজের হিন্দু নাম পত্রিকা শিশিরকুমারের সম্বন্ধে বলিয়াছেন'—"He is a patriot of rare type modest, disinterested, extremely earnest and never caring for notorety or titles; he is an exception to the ordinary type of patristism."

*এই প্রসঙ্গে আরও একজন স্বদেশ প্রেমিক, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের উদারতার কথা আমাদিগের স্মরণ হইতেছে। স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সহাধ্যায়ী ও সুহৃদ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের গুণে এরূপ মুগ্ধ ছিলেন যে, একবার তিনি আপনার কণ্ঠ হইতে উপবীত উন্মোচন করিয়া তাঁহার কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছিলেন।

দেশবাসী, যে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিব, তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিব, ইহা বিচিত্র নহে। শিশিরকুমারের অমৃতবাজার পত্রিকা এদেশে ইংরাজ সম্প্রদায়ের চক্ষুশূল হইয়াছিল, কিন্তু ইংলণ্ডে আণ্ডার সেক্রেট্যারী মিষ্টার অন্‌স্‌ল (Mr, Ouslaw) পত্রিকাখানি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতেন। মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত শরৎ-কুমার মল্লিক লণ্ডনে অবস্থান কালে একদিন ইণ্ডিয়া অফিসে গমন করিয়া টেবিলের উপর অমৃতবাজার পত্রিকা ব্যতীত অন্যান্য সংবাদ পত্র দেখিয়া তত্রত্য ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করেন, "অমৃত বাজার পত্রিকা দেখিতে পাইতেছি না কেন?" কর্ম্মচারীটি প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, "আণ্ডার সেক্রেটারী মিষ্টার অন্‌সল অমৃতবাজার পত্রিকা অতিশয় যত্নের সহিত পাঠ করেন। তিনি বলিয়া থাকেন যে, পত্রিকা হইতে ভারতীয় রাজনীতিক সমস্যার মীমাংসায় তিনি যথেষ্ট প্রাপ্ত হন। পত্রিকার লেখা তীব্র হইলেও তাহাতে ভারতের প্রকৃত অবস্থা সুস্পষ্ট ও দৃঢ়রূপে বর্ণিত হয়। অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে ইণ্ডিয়া অফিস ব্যবস্থাদি প্রণয়নে যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হন, সেই কারণেই আণ্ডার সেক্রেটারী পত্রিকাখানি মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিবার জন্য বাড়ীতে লইয়া যান।" অমৃতবাজার পত্রিকা সম্বন্ধে মিষ্টার ডিগবি তাহার "Condemned unheard" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"The patrika has an honoutable record forits devotion to the interests of the Indian people and the Indian princes, combined with a sincere and deep rooted layalty to the maintenance of the British connexion with India."—অর্থাৎ অমৃতবাজার পত্রিকা ভারতের জনসাধারণ ও রাজন্যবর্গের স্বার্থ সংরক্ষণে যত্নবান ও ভারতে ইংরাজ শাসনের প্রতি অনুরক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। আমরা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, রুষ গভর্ণমেণ্ট অমৃতবাজার পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন।

ইংরাজ শাসিত বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস যদি কখনও রচিত

হয় তাহা হইলে শিশিরকুমারের কার্য্যাবলী তাহার অনেক পৃষ্ঠা অধিকার করিবে। ভগবান যেন শিশিরকুমারকে দেশের ও সমাজের কার্য্য করিবার জন্যই সংসারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি লোকান্তরগত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কার্য্য শেষ হয় নাই; হইতে পারে না। নির্ভীক নিঃস্বার্থ ভাবে রাজনীতির চর্চ্চা দেখিলে, অত্যাচারগ্রস্তের প্রতি সুবিচারের চেষ্টা দেখিলে, রাজনীতির অন্তরালে ধর্ম্মনীতি প্রতিষ্ঠার উদ্যম দেখিলে শিশিরকুমারের কথা স্মরণ হয়। যে বীজ তিনি বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ক্রমে অঙ্কুরিত ও ফলপ্রসূ হইতেছে। তাঁহার স্মৃতি বিলুপ্ত হইবার নয়। পাঠক! যদি দুর্দ্দশাগ্রস্ত জননী জন্মভূমি ভারতবর্ষের দুর্দ্দশা মোচনের আকাঙ্ক্ষা আপনার হৃদয় জাগরূক হয়, তাহা হইলে আপনি নিঃস্বার্থ স্বদেশ সেবক, নীরব কর্ম্মী, প্রেমিক শিশিরকুমারকে আপনার সম্মুখে আদর্শ স্বরূপ রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হউন, ভগবানের আশীর্ব্বাদে আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে!

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট।

পরিশিষ্ট

Introduction to

"INDIAN SKETCHES".

My friend, Babu Moti Lal Ghosh, the editor of the Amrita Bazar Patrika, has asked me to write a brief introduction to this book, and I gladly comply with his request. I do so, if perchance some words of mine may induce Europeans, who look below the thin surface with which Anglo-Indians are apt to veneer Indian questions, to read with care these articles, which are written by a man of rare and profound knowledge of his Hindu fellow-country men ; though neither they nor I may agree with all their expressed views.

There is little need for me to commend this deeply interesting volume the cultured Hindu. Every educated Indian has heard of the author, Babu Shishir Kumar Ghosh, who, for nearly forty years, has been a potent force in Hindu Society ; whose metaphysical acumen versatile, talents, pure patriotism, noble character and earnest cosistent piety, oave endeared him to all Bengal. The articles, which are here published in a collected form for the first time, originally appeared in the columns of the best-known native journal in India, the Amritra Bazar Patrika, a newspaper, printed in English and published at Calcutta by the brothers Ghose, and which has beyond any other press influence, helped to mould that New India which has given

birth to those patriotic aspirations, finding their mouth-piece and interpreter in the Indian National Congress mevement.

In his youth, Shishir Kumar Ghosh had few of the advantages, now possessed by young Indians. His education was local and elementary ; and he owes entirely to himself and his extraordinary energy of character, all the intellectual culture he possesses. One of his own favourite sayings is, "time is the best gift of God to man", and he has always lived up to this Principle. From his earliest youth, he has utilised every spare moment, which he has Seized in passing to press into his own Service for the improvement of his mind, or to add to that marvellous store of knowledge concerning India and her people, which is the wonder of all his friends.

He is best known as the founder and chief editor of the Amrita Bazar Patrika, published, at first, 30 years ago, by himself and his brothers, in his native village of Amirta Bazar, in jessore, so named after his mother, Amrita. They began with a wooden printing press, and a few founts of second-hand type, issuing their paper weekly in Bengali. The three brothers set the type, printed the paper, made the ink, wrote the copy, all by themselves, Shishir quickly becoming so adept a typesetter that he composed his articles into his stick direct, instead of working them out on paper first.

The Amrita Bazar Patrika was published weekly, enjoyed a circulation of about 500, attacked abuses and advocated reform with the same fearless courage which has always characterised its columns, very quickly attained a foremost position in Native Indian Journalism, arriving at the dignity

of a prosecution within five months of its birth. An action for libel was brought by an English Deputy Magistrate in consequence of some sharp criticism of him in its columns; but after eight months of weary and costly litigation, Shishir Kumar Ghosh emerged victorious.

With an exchequer swept completely bare, except one hundred rupees borrowed at a high rate of interest, Shishir Kumar boldly struck out for Calcutta, borrowed a hand-press, and in February 1872, brought out his first issue of the Amrita Bazer Patrika as a metropolitan Journal, still in the vernacular. The new paper caught the taste of the Calcutta public. It breathed national life for India with an ardent patriotism, expressed with vigour, originality and humour, from which it has never receded, and rapidly took the front rank in vernacular Journalism.

I think Shishir Kumar Ghosh may fairly claim the honour of having been conspicuous among the men who first established political Associations in India. At the time he migrated to Calcutta, native society formed its public opinion under the influence of the British Indian Association, whose leaders were the most brilliant men of their time, but mainly drawn from the landholding and other wealthy classes. Shishir Kumar naturally was absorbed into this association, where his wide practical knowledge of Mofussil life was of great value.

Presently, however, he felt himself at variance with his colleagues on the introduction, by Sir Fitzames Stephen, of his Criminal Procedure Code, and subsequently still more so, with regard to the income-tax which he supported, but

which was strongly opposed, as he thought, from interested motives, by the British Indian Association. His articles in the Amrita Bazar Patrika, attracted to his side a large number of the younger men, resulting in a friendly revolt, and the organization, by Babu Shishir Kumar Ghosh, of the "Indian League", a definitely Political Association, with its head quarters at Calcutta, and branch committees formed at Krisnagar, Barisal, Berhampur, Dacca, and other large towns in the Mofussil. Its organ was the Amrita Bazar Patrika, and this movement undoubtedly paved the way for the latter and more intensely national movement of the Indian National Congress.

The Indian League is identified in the social and political developement of India, with many most important reforms, notably that of trial by jury and the municipal system, which containing the germs of representative Government, led on to the establishment of the elective system municipality as well as in its higher development of elected members of the provincial and viceregal councils. Shishir Kumar Ghosh was constantly consulted by that brilliant Indian administrator, Sir Richard Temple, then Lieutenant Governor of Bengal, in drafting the Act which gave effect to the Calcutta Municipality, which he carried in the teeth of firce opposition of the British Indian Association and the Anglo-Indian Community, mainly by the help of Shishir and the Amrita Bazar Patrika.

There can be no doubt that Shishir Kumar Ghose was the pioneer of technical education in India. When the Prince of Wales paid his state visit to India in the year 1875, the leading

citizens of Calcutta were naturally anxious to honour so auspicious and memorable an occasion by some substantial and permanent memorial. For some time past, Shishir had been urging on Sir Richard Temple and the Bengal Government the importance of establishing, in the metropolis of India, a well-equipped permanent technical college. Seizing the opportunity within five days immediatly precediatly the landing of the prince at Calcutta, Shishir succeeded in collecting nearly two lakhs of rupees for this purpose from his wealthy fellow citizens; and at a meeting, convened by the council of the Indian League, over which the Lieutenant—Governor himself presided, the Albert Temple of Science was agreed upon, and the Government afterwards voted Rs. 8,000 per annum for its maintenance.

When Lord Lytton's press Gagging Act was first broached, and it became evident that journals, published in vernacular, would be more or less heavily shackled, the brothers Ghose, believing that the Act was specially aimed at their journal, determined that the Amrita Bazar Patrika, which at that time was printed in both vernacular and English, should in future he published in the English language alone; and the change was effected in a single day with the help of borrowed type, a very remarkable feat of Journalism. At first, the circulation fell off terribly, as might be expected, but the brillint editing of the paper by Shishir kumar Ghose, who almost killed himself by hard work and anxiety, quickly brought it back to its old issue,

*The Grant was withdrown by his success or, Sir A. Eden, immediately on taking office.

and eventually far beyond it until it became the most influential newspaper in Bengal, and probably in all India, where it circulates from the Himalayas to Cape Comorin. For thirty years it has been one of the most potent factors in Indian society and politics; and during that period there has been no solid and lasting reform, which does not owe much to its influence and advocacy. To my mind, it is the most courageous and outspoken journal in all India. It is read by the Viceroy and his council, and is alike the organ of Indian prince and Indian peasant.

It cannot be denied that the Amrita Barar Patrika has often written bitterly, may, savagely, with regard to many acts of the Government, and especially on what its editor considered acts of injustice and harshness on the part of individual administeators. But no candid Englishman can read the articles, which are gathered together in this volume, without realising that they are not written by a mere vulgar hater of a dominant race, but that they are the utterances of a man of broad views and generous sympathies, intensely to oppression and wrong, filled with a passionate love of his countryman and a desire to help them to nobler and higher national and social life.

Of late years, Shishir kumar Ghose has withdrawn himself from the hurly-burly of political life, and from active participation in the editorship of his paper, which has been taken over by his brother, Moti Lal Ghose, who does his difficult work with conspicuous ability. He has retired to his native village where his time is largely spent in that religious contemplative life, which it is the constant desire

of every pious and devout Hindu to attain. In this quiet and restful country life, his time is spent mainly in the study of his favourite hero, Sree Gauranga, the renowned prophet of Nuddea whom he looks upon with veneration as the great Messiah. It is Shishir kumar Ghose's amibition to be the interpreter of Sree Gouranga, not only to men of his own faith. but to devout students of western religion, believing that Jesus of Nazareth is equally a Messiah, and that in the mastery of the teachings of bath these God-sent messengers, lies the solution of the unity of the world's faiths, and the only successful check to that materialism and agnosticism, bred by western culture, which, to his view, threatens to overwhelm all faith in a Supreme Creator and saviour of mankind.

The first volume of his life of Sree Gauranga has just been published ; and whatever its readers may think of the views therein propounded by the author, it is a book that merits, and will undoubtedly secure the respectful study of every religious Hindu as well as every Christian who realizes the oriental origin of his faith, and desires to follow the development of the influence of Christ's teaching over oriental races.

It is not possible to be long in the company of this remarkable man without realizing that he lives and moves on higher planes than his fellows, or without being profoundly touched by his simple and guileless nature, and his intense reverence for almighty God, in whom he tries to live, to move and have his very being. No man of other faith than my own brings home to me, like Shishir Kumar Ghose,

the strength and truth of Paul's Sermon at Athens on the alter, inscribed "to the unknown God," in which he declared that "God giveth to all life and breath and all things, and hath made of one blood all nations of men, to dwell on the face of the earth···that they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, though he be not far from every one of us".

I heartily commend to every cultured and earnest Indian, to every Christian Missionary, and also to every European who cares to look beneath the surface of Indian life and thought, the contents of this deeply interesting volume of miscellaneous articles from the pen of Shishir kumar Ghose, which will be rendered doubly interesting by the careful perusal, at the same time, of his life of Sree Gouranga.

REFORM CLUB, W. S. CAINE.

London, October I, 1897.

স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষের স্মৃতি।

যখন আমি প্রথম শিশিরবাবুকে দেখি তখন আমি মেট্রোপলিটান্ কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতাম। বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছিলাম যে বাঙ্গালীর ভিতর শিশিরবাবু একজন অদ্বিতীয় লোক। কিন্তু তাঁহাকে কখন চক্ষে দেখি নাই। আমার শ্বশুর মহাশয় কার্যোপলক্ষে দেওঘরে থাকতেন এবং শিশিরবাবু তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। পূজার বন্ধের সময় তিনি একদিন বৈকালে দেওঘরে শিশিরবাবুর সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। শিশির- তখন তাঁহার দেওঘরস্থিত বাটীর সম্মুখে প্রশস্ত মাঠে বালকের ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিলেন। আমি পদধূলি লইয়া শিশিরবাবুকে প্রণাম করিলাম।

শিশিরবাবু আমার পরিচয় শুনিয়া একেবারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি পড়িতেছ" ? "আমি বলিলাম "philosophy আর সংস্কৃত।" শুনিয়াই তিনি যেন একটু দুঃখিত হইলেন এবং শেষে বলিলেন Mathematics লও নাই ? Mathematics না শিখ্‌লে কি Mind এর culture হয় ?" এই কথা বলিয়াই অন্য একজন ভদ্রলোকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দেখ ছেলেদের যদি কিছু শেখবার থাকে তবে সে কেবল Mathematics আর Music. আমি কতদিন থেকে ঐ কথা বলে আস্‌ছি। তা দেখ লোকে সে কথা শোনে না। দু'কথা ভাল ইংরাজিতে বল আর খারাপ ইংরাজীতে বল তাতে বড় একটা কিছু আসে যায় না। কিন্তু বল্‌বার কি লেখবার মত জিনিস্‌টা ত হওয়া চাই। তা Mathematics না শিখ্‌লে সে জিনিস্ হবে কেন ?" এই কথা বলিয়াই আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তোমার শ্বশুরের কাছে শুন্‌ছিলাম যে তোমার মাথার অসুখ হয়েছে, তা তুমি অষুধ পত্তর বেশী খেও না। তুমি আমার সঙ্গে দিন কয়েক বেড়াবে, তা হলেই সব সেরে যাবে। আমি খুব ভোরে উঠে বেড়াতে যাই। কাল সকালে তোমাকে ডেকে নিয়ে যাব। এখন যাও তুমি একটু বেড়িয়ে এস গিয়ে।" এই কথা বলিয়া তিনি একা বালকের মত সেই মাঠে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অন্য যে সকল ভদ্রলোক সেখানে ছিলেন তাঁহারা দাঁড়াইয়া আপনা আপনি গল্প করিতে লাগিলেন। শিশিরবাবুর সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। তিনি বালকের ন্যায় সদানন্দ। ছোট ছেলের মত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আমার মনে হইতে লাগিল এই যে আজীবন এমন একজন বড়লোকের কথা শুনিয়া আসিতেছিলাম তাঁহাকে দেখিয়া ত পাগলের মত বোধ হইল। মনে মনে যেন একটা কেমন অশান্তি ও নৈরাশ্য আসিল।

প্রাতঃকালেই যে আবার সেই মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাইব তাহা মনে করি নাই। বড়লোকের দেখা পাইতে হইলে কত সাধ্য সাধনা করিতে হয়। কিন্তু অতি প্রত্যুষে সূর্য্যোদয়ের বহুপূর্ব্বে দেখি বাহির হইতে শিশিরবাবু আমাকে ডাকিতেছেন। আমি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলাম। শিশির-বাবু বলিলেন, "চল একটু বেড়াইয়া আসি।" এই বলিয়াই তিনি আমার হাত ধরিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। অগত্যা বাধ্য হইয়া আমাকেও ছুটিতে হইল। তিনি বলিলেন, "দেখ, ছুটাছুটি করাটা বেশ ভাল Exercise, এতে

সমস্ত শরীরটার Exercise হয়। তবে খুব জোরে ছুটবে না। তাহলে শীঘ্রই হাঁপিয়ে পড়্‌বে। এই রকম আস্তে আস্তে ছুট্‌লে দু'তিন মাইল ছোটা যাবে। তা হলে শরীরে বেশ স্ফূর্ত্তি হবে।" যা হক তাঁর সঙ্গে রাস্তায় ছুটাছুটি করা ভিন্ন তখন আর আমার উপায় নাই। কেন না শিশিরবাবু সজোরে আমার হাত ধরিয়া ছুটিতেছিলেন। দুইজনে কখন রাস্তা দিয়া কখন মাঠের পথ দিয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাল ছুটাছুটি করিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

এক একদিন বৈকালেও শিশিরবাবুর রাস্তায় ছুটাছুটি করিবার সখ্ হইত। আমি যে কতদিন সকালে বিকালে তাঁহার সহিত এই প্রকার ছুটাছুটি করিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই। দেওঘরের নিকটবর্ত্তী বারমেসিয়া প্রভৃতি অনেক গ্রামের কৃষকদিগের সহিত শিশিরবাবুর আলাপ ছিল। সাধারণতঃ আলাপ বলিলে যাহা বুঝায় শিশিরবাবুর আলাপ সে প্রকার নয়। বেড়াইতে গিয়া যেদিন পথে কোন পরিচিত কৃষকের সহিত দেখা হইত সেদিন তাহাদের ঘরকন্না সমাজধর্ম্ম লইয়া শিশিরবাবুর যে কত কথাবার্ত্তা হইত তাহার বর্ণনা করা অসাধ্য। কোন কোন দিন কাহারও আঙ্গিনায় খাটিয়ার উপর বসিয়া যখন কোন কৃষকের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হইত তখন মনে হইত যেন শিশিরবাবু তাহার বাল্যবন্ধু। কৃষকেরাও অবাধে বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় তাঁহার সহিত কথা-বার্ত্তা কহিত। হায়, আমাদের দেশে কয়েকজন বড়লোক এই প্রকারে দরিদ্র লোকের সহিত মিশিতে পারেন? সময়ে সময়ে কৃষকেরা তাহাদের বাগান হইতে ফলমূল কি আনাজ তরকারী শিশিরবাবুকে উপহার দিত। তিনি সাদরে তাহা গ্রহণ করিতেন। নিজে সেই সকল জিনিস এক মাইল দেড় মাইল দূর হইতে বহন করিয়া আনিতেন। তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ হইত না। তাঁহার বিচিত্র চরিত্রের প্রত্যেক ঘটনাই বিচিত্র। প্রথম দর্শনের পর অনেকবার শীত গ্রীষ্ম ও শারদীয় পূজোর বন্ধে দেওঘরে শিশিরবাবুকে দেখিয়াছি। তাঁহার ন্যায় আড়ম্বরশূন্য, নিরহঙ্কার, সদানন্দ ব্যক্তি কখনও দেখি নাই।

দেওঘরে অবস্থানকালে শিশিরবাবুর প্রাত্যহিক জীবনের বিস্তর ঘটনা লক্ষ্য করিতাম। তিনি বার মাস অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিতেন। সেই প্রত্যূষে অগ্নি জ্বালিয়া নিজের হস্তে চা প্রস্তুত করিয়া চা পান করিতেন। তৎপরে প্রায় এক ঘণ্টাকাল ইতস্ততঃ বালকের ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেন।

তাহার পরে বাড়ীতে ফিরিয়া লেখাপড়ার কার্য্য করিতেন। তাঁহার বাটীতে বিস্তর বড়লোকের সমাগম হইত। কিন্তু তাঁহার নিকট দরিদ্র ও বড়লোকের কোন প্রভেদ ছিল না। সকলেই সমান আদর, সমান অভ্যর্থনা পাইতেন। বেলা ৮২টা হইতে ৯টার ভিতর শিশিরবাবু আহার করিতেন। আহারের পরে প্রায় এক ঘণ্টাকাল প্রতিবেশীদের বাটীতে গিয়া প্রত্যেকের সংবাদ লইতেন। এই সময়ে তিনি কৃশ দেহে থানের ধুতি ও একটা হাতকাটা জামা পরিয়া পায়ে চটি জুতা ও মাথায় সোলার হ্যাট দিয়া বাহির হইতেন। এই প্রকার বেশ-ভূষায়ও তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব প্রকাশ পাইত।

তৎপরে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া প্রায় এক ঘণ্টাকাল শয়ন করিতেন। বিশ্রামের পরে পুনরায় কাগজ পত্র লইয়া লেখাপড়া করিতে বসিতেন। বেলা অনুমান ৪টার পর যৎসামান্য জলযোগ করিয়া আবার ছুটাছুটি খেলা করিয়া বেড়াইতেন। সন্ধ্যার সময় শিশিরবাবুর গৃহ আনন্দধামে পরিণত হইত, তখন ছোট বড় বিস্তর লোক একত্রিত হইতেন। এই সময়ে একদিন সাহিত্যাচার্য স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় ও ভক্তাগ্রগণ্য স্বর্গীয় হরলাল রায় প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ শিশিরবাবুর গৃহে সমবেত হইতেন। শিশিরবাবুর মধুর স্বরে কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার ভ্রাতা ও পুত্রেরা এই কীর্ত্তনে যোগ দিতেন। শিশিরবাবু সঙ্গীতজ্ঞ ও সুগায়ক ছিলেন। তিনি যখন মধুর কণ্ঠে কীর্ত্তন আরম্ভ করিতেন তখন শ্রোতাগণ মুগ্ধ হইয়া যাইত। কীর্ত্তনকালে শিশিরবাবুর দুই চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারে অশ্রুনির্গত হইয়া তাঁহার বক্ষ দেশ পর্য্যন্ত সিক্ত করিত। কীর্ত্তনকালে যখন শিশিরবাবু ভক্তিজড়িত মধুরকণ্ঠে গান ধরিয়া হয়ত কোন বালকের না হয় কোন খোলবাদক বৈষ্ণবের গলা বা হাত ধরিয়া বালকের ন্যায় অবিরল রোদন করিতেন তখন সেই স্বর্গীয় দৃশ্যে উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। এই মনোজ্ঞ দৃশ্য যিনি স্বচক্ষে না দেখিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কল্পনা করা সুকঠিন।

শিশিরবাবুর বিদ্যাবুদ্ধি বা জ্ঞানের পরিচয় লইতে বা দিতে পারি এমন স্পর্দ্ধা আমার নাই। তবে তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যে তাঁহার যে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইতাম তাহাতে বিস্ময়ের অবধি থাকিত না। এই সময়ে শিশিরবাবু অনেক সময়ে স্বহস্তে কিছু লিখিতেন না। তিনি বলিয়া যাইতেন অপরে লিখিত। তিনি নিজে যদি কখনও কিছু স্বহস্তে লিখিতেন, তাহা হইলে তাহার পাঠোদ্ধার

করা একপ্রকার দুঃসাধ্য কার্য্য হইত। তাঁহার নিজের হাতের লেখা ছাপাখানায় দিলে তাহা মুদ্রিত হইবার ভরসা খুব কম ছিল। সেইজন্য তাঁহার লেখার নকল করাইয়া সেই নকল ছাপাখানায় প্রেরিত হইত। আমি অনেক সময়ে এই প্রকার লেখার নকল করিয়াছি। লেখার ভিতর সবগুলি অক্ষর থাকিত না। অনেক কথা আন্দাজ করিয়া নকলে বসাইতে হইত। যদি কখনও নিতান্ত বিপাকে ঠেকিয়া শিশিরবাবুকে স্থান বিশেষে কি লেখা আছে জিজ্ঞাসা করিতাম শিশিরবাবু অমনি বলিয়া বসিতেন, "তোমরা লেখাপড়া শিখেছ, ওখানে যে কথাটা হয় তাই বসিয়ে দাও। আমি লিখে চুকেছি, আবার ওর জন্য মাথা ঘামাব কেন?"

যখন Lord Gouranga নামক দেশ বিদেশে সমাদৃত পুস্তক লিখিত হয় তখন অনেক সময়ে শিশিরবাবুর মুখের কথা আমি স্বহস্থে লিখিয়াছি। তাঁহার এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল যে অতবড় গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে যাহা লিখেতেন কখন আর তাহা চক্ষে দেখিতেন না। এমন কি কতদূর লেখা হইল তাহা পর্য্যন্ত পড়িয়া শুনাইতে বলিতেন না। সময়ে সময়ে এমন হইয়াছে যে শিশিরবাবু বারান্দায় পায়চারি করিতে করিতে বলিয়া যাইতেছেন আর আমি লিখিয়া যাইতেছি হয়ত একটা বাক্যের আধখানা লেখা হইয়াছে এমন সময়ে কোন বিশিষ্ট ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। দশ মিনিট ধরিয়া তাঁহার সহিত শিশিরবাবুর কথাবার্ত্তা হইল। আমি কলম হাতে হাঁ করিয়া বসিয়া আছি। কথাবার্ত্তা শেষ হইলে শিশিরবাবু অসমাপ্ত বাক্যের অবশিষ্ঠাংশ বলিয়া গেলেন। মধ্যে তাঁহার চিন্তার স্রোতে যে বাধা পড়িয়াছিল সেই বাধা অপস্হত হইবামাত্র যতদূর বলিয়াছিলেন আবার ঠিক তাহার পর হইতে বলিয়া যাইতে লাগিলেন। পূর্বে কতদূর কি লেখা হইয়াছে তাহা পড়িয়া শুনাইতে বলিতেন না।

শুনিয়াছি কখনও কখনও নাকি শিশিরবাবু দুইজন লেখককে দুইটি বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে ঐ প্রকারে একসঙ্গে বলিতে পারিতেন। কিন্তু আমি যতদিন ছিলাম ততদিনের ভিতর ও প্রকার বলিতে শুনি নাই।

শিশিরবাবু বলিয়া দিয়াই খালাস। লর্ড গৌরাঙ্গের মত গভীর দার্শনিক তথ্যে পরিপূর্ণ পুস্তক সম্বন্ধেও সেই এক কথা।

সময়ে সময়ে কোন কোন স্থলে শেষ প্রুফটি তাঁহাকে একবার দেখাইবার জন্য অনেকে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণোপম অনুজ

শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল ঘোষ মহাশয় ব্যতীত অপর কাহাকেও সাহস করিয়া তাঁহাকে এরূপ কথা বলিতে শুনি নাই। যদি কখনও ইচ্ছা করিয়া একবার প্রুফ দেখিতেন তাহা হইলে হয়ত উপর উপর একবার দেখিয়া কোন কিছু পরিবর্তন না করিয়াই প্রুফটি ফেলিয়া দিতেন। আবার যদি কোনদিন খেয়ালের উপর পরিবর্তন করিতে আরম্ভ করিতেন তাহা হইলে আবার সম্যক অংশটী নূতন করিয়া ছাপিতে হইত।

তিনি যে কথা বলিতেন তাহা এ প্রকার স্বরেও এ প্রকার একাগ্রতার সহিত বলিতেন যে তাহা একেবারে শ্রোতার হৃদয়ে গাঁথিয়া যাইত। বাস্তবিক Lord Gauranga লিখিবার সময় অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তিনি যে যে জায়গায় বলিয়াছিলেন ও তাহা যে প্রকার আমার মনের ভিতর গাঁথিয়া গিয়াছিল মুদ্রিত পুস্তক পড়িয়া ততদূর মনের আবেগ হয় নাই। আমার মনে হইত যেন ঐশ্বরিক শক্তির প্ররোচনায় (Inspiration) তিনি যাবতীয় কথা বলিতেন।

আমার ক্ষুদ্র জীবনে আমি এ প্রকার বিবিধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি আর কখনও দেখি নাই। তবে শিশিরবাবুর ন্যায় ব্যক্তির প্রতিভার পরিচয় আমি কি দিতে পারিব, স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন যে ছোট ছেলে পর্বত দেখিয়া আসিয়া তাহার ছোট হাত খানি উর্দ্ধে তুলিয়া বলে 'যে পাহাড় এত বড়।' আমিও সেই প্রকার নিজের নগন্য বুদ্ধির মাপ কাটিতে ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিকে দেখিয়া যাহা বুঝিয়াছিলাম তাহাই বলিলাম।

ইতি—

শ্রী হরিনাথ ঘোষ।

পুরুলিয়া
বৈশাখ ১৩২০

ADDRESS OF LOKMANYA TILAK

As president at the 6th anniversary meeting on the 29th December 1917.

Lokamanya Bal Gangadhar Tilak then rose amidst loud cheers and said :—

Friends and gentlemen, we have all heard a number of incidents relating to the life of one whose memory we have come here to commemorate to-day. As for myself, I want to add only a few words to what has already been said. I must say first that I had the pleasure and honour of being personally acquainted with Shishir Babu. I have learnt many lessons sitting at his feet. I revered him as my father. (Hear, hear,) and I venture again to say that he in return, loved me as his son. I can call to mind many an interview that I had with him at the "Patrika" office some of which lasted for hours. I have distinct recollections of what he told me of his experiences as a Journalist with tears in his eyes and sympathy in his words. I then requested him, I remember now, to put down those incidents, at least to leave notes in writing, so that they might serve the future historian of the country or even the writer of his life.

To me, Shishir Babu, figures as the pioneer of jouralists in this country. After the Mutiny when he was only 15 years of age, came the establishment of the British Bureaucracy in this countey—it was a despotic rule and the country wanted a man who would cope with their devices,—who would see the inner meaning of their devices,—who was courageous enough to meet them, bold and honest enough to expose them, and take defeat calmly and coolly in order to resuscitate for future strength. Such was Shishir Kumar Ghosh, The 'Patrika' is the manifestation of the spirit of which he was full-nobody may talk of the 'Patrika' without being reminded of shishir kumar Ghose. At this time a man was required with a feeling heart to realise the

position of the masses who were then governed by a desopotic rule-one who must have sympathy with the people who were unjustly treated and did not know what to do but only looked up to heaven for help. The people were dumb. Bureaucracy had full power. The Mutiny had just been over and British Rule had been firmly established in the land. At such a time a man was required to steer the national ship to a safe harbour constitutionlly and legally—a man of courage, a man who could see through the actions of the bureaucracy—actions which were calculated to bear fruit in the distant future.

It is a very difficult task now to criticise the Government —it was more so in those days and not only biting sarcasm but great resourcefulness, great courage, great insight and large sympathy was required to make honest journalism a success in the land. Shishir Babu had these qualities in abundance. The authorities feared him. They could not raise their finger to crush him. You have just now heard the story of Sir Ashley Eden who wanted to strike at him but could not. What was it due to? It was not due to legal or any other protection it was due to the character of the man which was his only protection. Sir Ashley feared not so much the writing of the man, but the character of the man who would persist in writing such things so long as the injustice was not removed.

In Shishir kumar we had a man who would not care for honour or favour but would stand boldly by his guns until success was attained (Hear, hear). Even a strong man at times is not able to do much—for strength is to be joined

with prudencde, prudence is to be coupled with foresight—both with courage and keenness of perception, which is granted only to a few people in the world. In Shishir kumar all these qualities were combined. Such a man I had the honour and the pleasure of knowing.

Journalism—independent and free journalism was not an easy task in those days—60 years ago, when many of you were charmed with Government Service. You looked upon such a man as rather eccentric—he might be independent, might be honest, but, certainly not worldly. He had calmly to bear the reproaches of friends for having refused Government favours and other things that make life happy and easy. He stood alone and his conscience with his stand. He thought that he had a message to give to the world—he thought that he had a duty to do and he did it unflinchingly. That was the man who led Bengal in the last decades of the nineteenth century. I am glad to say that those traditions of the paper are being faithfully maintained to this day (cheers). I myself have something to do with journalism and when I take a survey of the papers that have been carried on for two generations with the same policy and with the same spirit—I can point to one paper and that is the 'Amrita Bazar Patrika' (cheers). I had a talk on that subject with my friend Babu Matilal Ghose. I asked him how was it that he could copy his brother so exactly in language, style and sentiment, and he told me that he had studied his brother and nothing else and hence he had been able to maintain the spirit of the paper.

These high ideals are out of the reach of the common

people and the common people judge these men by their own standards, attribute to them motives which are foreign to them. Shishir Babu also had to face this and he did the work which can truly be called the work of an angel. He saw that the service of humanity was a stepping stone to the service of God. When he gave up, owing to physical feebleness, his work at the "Patrika" office, he devoted his time to the service of God with the same enthusiasm and fervour with which he did service to the people. Such was the man we have lost. I am sorry I am not an adept in character-sketching, but if I have given you certain prominent characteristics of his life, I think I have done enough. Such a man is rare to find. You have his life written; and from it you may know the story of his life but underneath all this do not fail to find out and properly value the man who had made journalism what it is in India.

I know with what enthusiasm and eagerness the 'Patrika' was awaited in my province every week 40 years ago. I know how people were delighted to read his sarcasm, his pithy and critical notes written in his racy style, simple but at the same time effective. How people longed to see the paper on the day it was due by post, how people enjoyed it—I know it personally. (Hear, hear). You in Bengal cannot know what we felt and thought in the Maharastra. Strange stories Circulated about these brothers in my province. People used to say that Shishir Babu was writing with one foot in jail and the other brother was waiting simply to see when the elder is sent to jail. There were stories like that and if they do not correspond with facts they at

least illustrate the feeling and the reverence with which the paper was read in my part of the country. They show how the man was appreciated. They were really delighted as see his writings but very few had the courage to quote those remarks before others—they enjoyed them in secret.

I may further tell you that when we started our paper in vernacular, we tried to follow the editor of the "A. B. patrika." This was the time when one had to teach the people how to criticise the bureaucracy and at the same time keep oneself safe, bodily at least if not pecuniarily. That was the idea fully developed by Shishir kumar in those days of journalism. Bureaucracy is always anxious to conciliate its critics not by mending its way but by offering bribes to them and the dignity of Shishir kumar lay not so much in his writings as in the courage which he showed at a critical time, when favours were offered to him and he rejected them with contempt. Such a man he was.

Babu Shishir kumar was a true political saint and I regret as much as you do that that kind of character is getting rare in these days, as it is bound to be by the demoralization of the despotic Government. We thank God that we had such a man in the early years of journalism in India. He was a hero in true sense of the word. He did not see his aspirations fulfilled. It might be fulfilled in a generation or two or more, but we cannot forget that it was he who laid the foundation. Such a man deserved to be respected not only during his life but for all time to come. I wish you to study his life—to look not to his failings but to his great

achievements—to draw inspiration from him and follow in his footsteps as far as it is possible for you to do.

PRESS OPINION

THE STATESMAN, a leading Anglo-India paper (April 1888), says ;—

There is no native journal in India, we suppose, upon the merits of which English opinion is so widely divided, as the Amrita Bazar Patrika, published in his city. From the Viceroy downwards, we belive, the Amrita Bazar is read by nearly all classes ; but while some Englishmen can see nothing but Sedition in its columns, others judge it with more candour and with a truer discernment of its spirit.······

*   *   *   *   *

We should like to say a word or two as to the general character of the Amrita Bazar Patrika, and the criticisms made thereon in the Anglo-Indian Press. No one who has any personal knowledge of the two gentlemen who, we believe, jointly edit the paper,—the brothers Shishir Kumar Ghose and Matilal Ghose, can fail to respect them. That they frequently write with extreme bitterness, is true ; and they will, we hope forgive our saying that we have on more than one occasion remonstrated privately with them on the Subject, as injuring their own cause. But can we really give them no excuse for this error ? We have known the elder brother for many years,—the younger one not for so long a period,—and we say truthfully that there are probably no two men in India to-day, for whom we entertain a more genuine respect. They are exceptionally able and

earnest men, endowed with strong instincts ofn right ad wrong, They are not narrow men who merely "hate the English", but men of broad and generous sympathies, whose nervous temperament makes them peculiarly sensitive to the injustice and brutality of the terms in which our public writers too commonly speak of their countrymen. ... ...
In their late "Appeal to Englishmen"—which has elicited our present remarks—they do justice to themselves. They say : (Here Mr. Robert Knight, the Editor of the Statesman, quotes the following from the Patrika).

"The object that we have in view, is not to provoke the ire of Englishmen, but to seek their help and patron age. Why should not we live in peace and amity ? We do not want the Empire, not the control of affairs. Nor do we want to do any injury to the legitimate interests of Englishmen. We want not battle but peace. For one step towards us, we are willing to advance ten. Let us ask a few questions, our masters. Why should you not encourage those who are struggling to better the condition of their fellow-men ? Why should you not, free as you are sympathise with the abject condition of the people of India ? Mr. Maclean tauntingly says that India has no people. Quite true ; but we are trying to make ourselves into a people. Is it in unworthy attempt ? We are making the attempt in the hope that Englishmen, who have, ever since their rise as a great power, always sided with enslaved humanity, will help us and guide us. But alas ! It seems, we must not rise, though we are under the rule of free England !"

Now those few Englishmen amongst us who know the Shishir brothers, want no assurance from ourselves that they are speaking sincerely in the appeal. We ask the pioneer itself to weigh with candour these simple appeals from the heart of two native Bengalee gentlemen, and then to say frankly whether these men, whom they so derisively rebuke, do not share, at all events, to some extent, our own better feelings. It is to show ourselves degraded if we can read such appeals to us as Englishmen, without some sympathy with the men, who, without an effort, address us in these pathetic terms ! To say nothing of its generosity, it is really right, in view of such appeals to us, to reply only with abuse which so constantly disfigures some of our prominent. Auglo-Indian Newspapers, but which, at the same time, Profess to be written "For gentlemen by gentlemen only !" If we understand aright our old and peculiar designation of a gentleman, the men who indicted this appeal and had the courage to publish it, are gentlemen in the truest sense of the word. With all India at our feet, they cannot understand how it is that, instead of generously recognizing their position and showing some sympathy with their aspirations towards the independence and freedom that we so highly value ourselves, we should be so anxious to stereotype their exclusion from these great national advantages, and pursue with abuse and ridicule every effort which they make for their attainment. They are not Englishmen of a very noble type, who sedulously seek to perpetuate the present condition of the Indian people. No such efforts can possibly succeed, and the wisest and

best of our own country men have no sympathy with them. No man can tell how near or how distant is the period when India will achieve the Independence that we have wisely and in the face of strong opposition can weakening the Empire in any way whatever. We are on the eve, we believe, of great changes in India itself that few of us seem to discern; and every wise and patriotic Eng'ishman will direct his efforts to the inauguration of those changes with as little friction and disturbance as possible. In the absence of representative institutions of any kind in the country, the press of India, Native and European alike, has duties to discharge and responsibilities to rise to, of a peculiarly grave order; and upon the prudence and moderation of its writings will depend almost wholly whether those duties and responsibilities are successfully discharged or the reverse.

The following appeared in the Indian Daily News, a leading Anglo-Indian paper, of 30 August 1818 :—

The "Somprokash" on the "Patrika"—March has been said from time to time about the Patrika. No doubt, it is occasionally very out-spoken, as people cannot well help being, when feeling that wrong has been done. As to its general character, we take an account from a native contemporary, which has always been regarded as a leading paper in the country. It is well to know the motives and inspirations that actuate public men, and in that sense, the remarks of the Somprokash which follow, are not without interest.

"The manner" says the Somprokash, "in which our sagacious and far-seeing contemporary, the Amrita Bazar

Patrika, is serving the country, cannot but call forth our sincere gratitude. The editor of the Patrika does not get up monster mass-meetings, and then send telegraphic summaries of their proceedings to the daily papers. He does not rend the skies by empty speeches in order to intimidate the Indian Government, he does not start on a 'political tour'! He does not join large Associations to trumpet out his own fame, or scream out 'Mazzini', 'Mazzini', to dub himself a 'patriot'. Neither is he anxious to purchsea a name for himself by bringing about empty political agitations. In short, he is above all sorts of vanities and empty sounds. But his heart bleeds at the sorrow of the ryots. He is not afraid, so to speak, 'to enrer into fire and water and succour the distressed'. Tales of official oppression make him simply restless. He never is found to do an act of injustice; and however high the official may be, his misconduct scarcely ecapes his lynx eyes, and the official is fearlessly exposed. He is ever ready to advocate the interests of his educated countrymen in a most vigourous and weighty manner. He never hesitates to attack sharply the English policy which makes a distinction between the white and the black. In short, he is ready to sacrifice his own private interests for the sake of the welfare of his country. Mr. Beams, a highly influential official, violated over and over again one of the most salutary rules of the India Government; but no other editor in the country took notice of it. The Amrita Bazar Patrika, to serve the interest of the public, fearlessly exposed, after a diligent enquiry, the doings of that official, without giving a thought to his

own interests, for a single moment. Many would have kept silent under such circumstances: But the patriotism of the Editor of the Patrika is of a different type. He cares little for personal danger when the good of the country is at stake.

"When the Public Service Commission held its sitting at Calcutta, the 'patriots' fell fast asleep, and it was only Babu Motilal Ghose the joint Editor of the Amrita Bazar Patrika, that satisfied members of the commission, citing innumerable instances he came to know of, after a good deal of search, that the natives of the country were gradually losing their privilege to enter Government offices. Mr—, the joint magistrate of Meherpore, flogged fifty innocent men and branded them for life. This piercedthe heart of the Editor of the Patrika, and he drew the attention of the Government to the case before others. Another man forcibly kept a helpless young woman confined in his own house with some evil motive, and the heart of the Editor of the Amrita Bazar Patrika ached deeply at the injury done to the helpless woman. He rushed forward to publish the high-handed proceedings of this monster. It is needless to cite further instances. The Editor of the Amrita Bazar Patrika does not care for the praise of others, his datriotism is unselfish. He has devoted his heart and soul to the cause of his country, and is ready to sacrifice for it. That our brother of the Amrita Bazar Patrika may continue to serve the interest of the country, in an unselfish and independent way, is our humble and sincere prayer to God".

The HOPE (Calcutta) quotes the above from the Indian Daily News, and observes:—

We make no apology in quoting the above from the Somprokash, which, we think, very accurately describes the Editor of the Amrita Bazar Patrika, who is perhaps one of the best loved and certainly the most misunderstood Editor in the country.

In every word of Somprokash we concur ; and we could add a great deal more from our own personal knowledge if that same personal knowledge did not assure us that there is nothing the Editor of the Patrika so little cares for as the praise of others. But we must point out one thing, in order to guard against a passible misapprehension which the above passage in the Somprokash may give rise to. It is true that the Editor of Patrika hates got-up mass meetings, sham agitation, and vapid resolutions that betray love for notoriety and lack of force ; but there is no man we have seen in this country, who understands better the value of sound organization, agitation in the proper spirit, and resolutions that mean purpose and are not mere words. It is an open secret that the staff of the Amrita Bazar Patrika were the animating spirit of the 'Jhinkergatcha Ryots' Meeting, perhaps the only agrarian gathering of value that we have had in this part of the country, of late, with a peaceful end in view. If Shishir Kumar Ghose keeps aloof from "Associations", it is from Associations that have no understanding of the first principles of organization. and that proceed to undertake Government of a country on the strength of quoted sentences and borrowed ideas which they themselves comprehend very little, and their countrymen less, No man believes in self-Governmet more strongly than the

Editor of the Patrika ; but he understands very well that there can be no self-Government without internal organization, and that there can be no organization, unless the people thoroughly understood one another and knew what they were about. He is a genuine Hindu, a typical Bengalee, a man of whom any country might be proud, and one who commands the love of the largest number in his own. It is seldom that he stirs out of his modest home, and never dances attendance on the great Saheblоge ; yet his office is a very reservoir of impoitant information, which comes flocking in letters and telegrams from every part of the country, sent by those who know the man best fitted to do justice to them. His services to Hindu Socity need not be recounted here. For the last twenty years or more he has been a strong bulwark of Hinduism against the assaults of go-ahead reformers and ambitious revolutionaries ; at the same time he has been fully alive the necessity of reform, and the certainty of it under the forces of modern civilization. For whatever he may say now and then in the spirit of retort, he is too intelligent and shrewed a man not to understand that there are elements of good in the civilization which at present rules his country, and that Englishmen could not be what they are to day without the conditions of greatness they had in them which we ourselves lack. Those who deny him this sense of justice, thoroughly misunderstand him as a man, and though it is not in our humble part to set him right with the public, yet we cannot but feel it a bounden duty to-bear testimony, whenever we may, to this part of his charactet whose

existence is often denied by those who object to know better.

THE TRIBUNE (Lahore) says :—

In him we have the truest model of Indian patriot and journalist. We have had opportunities of knowing him somewhat intimately, and what has always struck us when in his presence, is the utter absorption, so to say, of the man in the one thought of the national regeneration of his people. But no, he has another and a greater thought in which he has seemed to us to be always absorbed,—it is the thought of his Maker, for, we have never seen him without the name of Hari in his mouth every evening we have seen him having his Hari—Sankirtan in his little garden in his house at Bag-Bazar. But what is rare in India. in Shishir kumar Ghose his bhakti or love of God has not swallowed up his reason or made him useless to the world,—it has, on the contrary, taught him to devote himself entirely to the cause of his country. He lives the austere life of a rishi and his work is ceaseless.****

We have called him the truest model of the Indian Patriot and journalist; and we have called him so advisedly. He has no humbug about him, he knows no tall-talk—he never sees officials—he knows only work, and work in silence and for the people. The Shomprokash, a leading journal in Bengali, has recently given. We give below the translation with the 'Daily News' introductory remarks (Quoted above).

THE MAHARATTA (poona) says :—

The Babu is a rare specimen of unostentatious, self denying workman. The Shomprokash, a Bengali paper, in an appreciative article on the Babu, paints him with great fidelity. The picture is worth preserving for more reasons than one. The Editor of the patrika is good enough to say that though the ideal of a patriot is very good, yet the Shomprokash is wrong in choosing Babu Shishir as the model. This does great credit to our brother's modesty. In these days of calculating patriotism, when every public man looks to the main chance and in his mind's eye keeps shining ribbons and stars in view, it is well to place before the younger generation a purer picture of the patriotic virtues. We hope many of our younger friends who have yet to enter upon life, will contemplate with attention the following ideal of how our patriots ought to be.

সমাপ্ত